শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞাপন

শিশুকালে হাঁটার সুরু থেকেই সুরের পথে হাঁটা সুরু হয়েছে।

এই হাঁটা আজ এই পঁচাত্তোর বছর বয়স পর্য্যন্ত সমানে চলে আসছে, এবং ভগবানের যদি আশীর্বাদ থাকে তাহলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই চলার নিবৃত্তি হবে না।

যেখানে জন্মে আমি সুরের সন্ধান পেয়েছি সেই ঘরাণাবংশের কিছু পরিচয় এবং বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সম্বন্ধে কিছু ইতিবৃত্ত ও বিবিধ বিষয় প্রথমতঃ জ্ঞাপন করলাম।

তারপর, সঙ্গীতের বিরাট ও অনন্তবিস্তারি রূপের আকর্ষণে ও দর্শন কামনায় তার অফুরন্ত পথে দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রভাবে ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও সংযম রেখে চলার মাধ্যমে একের পর এক অভিজ্ঞতার যে সব সম্পদে লাভ করেছি এগিয়ে যাবার উপায়, মহৎ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য, মহান গুরুর কৃপা, দিক্ নির্ণয়ে সত্যের সন্ধান, বহুবিধ বৈচিত্র্যময় রাগরূপের অপূর্ব দৃশ্যসমূহ, নানান পথে নানান ঘটনার মাধ্যমে অপূর্ব পরিচয় ও মিলন সমাবেশ, যাত্রা পথে এগোতে এগোতে পেয়েছি সমাদর, স্নেহ, আশীর্বাদ, উৎসাহ প্রভৃতি এবং তার সংগে নানান অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পেয়েছি বহু সময়ে বহু দুঃখ-কষ্ট, রাখতে হয়েছে সংকল্পে কঠোর দৃঢ়তা, এগিয়ে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—সেই সবের পরিচয় পাঠকের পাঠের যোগ্য হবে এই মনে করে "চলার পথে একটি জীবন," এই নাম দিয়ে ঘটনাবহুল বিষয়বস্তুকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলাম।

এর মধ্যে সংস্পর্শে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, সঙ্গীতজ্ঞদের, সঙ্গীত-বোদ্ধাদের, বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলন সম্বন্ধে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নানান বিষয়ের ও নানান তত্ত্বাঙ্গের পরিচয়, বহুবিধ ঘটনা ও সংসার জীবনের ইতিবৃত্তও কিছু রইল।

লেখার পরিশ্রম সার্থক হবে যদি পড়তে ভাল লাগে এবং কারো উপকারে আসে।

পরিশেষে,—লেখা খুব দীর্ঘ হয়ে গেল— এ জন্য যদি কোন বিষয়ের পুণরুক্তি-দোষ এবং ভুল-ত্রুটি ঘটে থাকে তাহলে তার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে সবিনয়ে সংশোধন করে নেবার অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম।

এর আগে আমার 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থটি বাঁকুড়ার 'জ্যোতি-প্রেসে' ছাপিয়ে ছিলাম। প্রেস স্বত্বাধিকারী শ্রীশুকদেব উপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে আগ্রহ, উন্নত মনের পরিচয় ও বহু সুযোগ সুবিধা পাওয়ায়, ওই গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছিল। সেই আকর্ষণ নিয়েই এই গ্রন্থটির মুদ্রণ এখানেই ঘটল— শুকদেববাবুর কাছ থেকে সব বিষয়ে সহায়তার আশা পাওয়ায়। প্রথম গ্রন্থটির ছাপার সময় বাঁকুড়ায় সত্যনারায়ণজীর প্রাসাদোপম বাগানবাড়ীতে যন্ত্রাদির সহিত মাসাধিক কাল ছিলাম প্রুফ দেখা ইত্যাদির জন্য কিন্তু এই গ্রন্থটির ছাপাকার্য্যের প্রারম্ভিক সময় থেকে মাসাধিক কাল থেকেও ছাপার অগ্রসরের অত্যন্ত মন্থরতার জন্য সব ভার স্বত্বাধিকারীকে দিয়ে কোলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হতে হয় শিক্ষকতার দায়িত্বের জন্য। এই সব কারণবশতঃ এই গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্তই আমার নজরে ছিল। এই প্রেসের বিবিধ বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন ছাপার ত্রুটিমুক্ত বিষয়ে কল্যাণীয় নেপালবাবু। তাঁর যত্ন ও প্রচেষ্টার কথা আমি কোন দিনই বিস্মৃত হব না। অবশ্য সকলেই যত্ন নিয়েছেন। আমি এঁদের প্রত্যেককেই জানাই আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ইতি—

গ্রন্থকার

সুরের পথে একটি জীবন

—ঃ(০)ঃ—

(১)

সূচনা—

বাল্যজীবনে দেখেছি ভোর হবার আগেই প্রৌঢ় গৃহস্বামীর কণ্ঠে গেয়ে উঠত সময়োপযোগী রাগরূপ নিয়ে প্রার্থনা ও আরাধনার স্তোত্র। রোওয়াকে জপের মত বসে সে সময় তাঁর প্রৌঢ়া ভগিনী গাইতে শুরু করতেন দেব-দেবীর ভাব বর্ণনামূলক ও দেহতত্ত্বের গান।

গৃহস্বামীর পুত্রদ্বয় শয্যাত্যাগের পর প্রস্তুত হয়ে পৃথক পৃথক কক্ষাভ্যন্তরে শাস্ত্রীয়সংগীতকে ধরে ভগবৎ ভজনায় নিমগ্ন হতেন। গৃহের পরিবেশ তখন হয়ে উঠত যেন সামবেদীয় ভাবধারায় স্বর্গীয় সংগীতের মত। সমষ্টিগত সেই প্রভাবান্বিত সংগীত কর্ণে প্রবিষ্ট হয়ে গৃহপরিজনদের চিত্তকে ভাবাবিষ্ট করে তুলত এবং শিশু সন্তানদেরও সেই সুর অন্তরে প্রবেশ করে' যেন সম্মোহিত করে রাখত।

এক এক সময় পার্শ্ববর্ত্তী পৃথক বাস্তুগৃহ হতে তিন ভ্রাতার মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ সেই সুরসাধক গুণীর হাতে ব্রহ্মমুহূর্তে ললিত প্রভৃতি রাগে যখন সুরবাহার যন্ত্র ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত, তখন সেই রাগরূপের অপূর্ব স্বরলহরী বায়ুর উপর হিল্লোলিত হয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করে' মনকে যেন কোন এক ভূমালোকে নিয়ে যেত।

শাস্ত্রীয় সংগীতের পীঠস্থান ও কেন্দ্র বাংলাদেশের বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া জেলা) এই রকম আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে আমার জন্ম হয়েছিল বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সালের ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে। জন্মাবধি সংগীতের ঐরূপ মহিমাময় রূপের প্রভাব অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তার তৃপ্তিময় রূপ আমাকে আকর্ষিত করেছিল এবং তার প্রেরণার আবেগ য়েন অজান্তিকেই টেনে নিয়েছিল শাশ্বত সংগীতের পথে এবং মনকে তাতে সর্বদাই ঘোরাচ্ছন্ন করে রাখত।

তারপর প্রথম বর্ণিত সেই গৃহস্বামী কমণ্ডলু ও পুষ্পপাত্র হাতে নিয়ে ছয়টি প্রধান স্বরে গঠিত প্রাতঃচিত্তের ভাব সমাহিত বিভাস রাগের শাশ্বত রূপ কণ্ঠে তুলে—"হে দামোদর মুরদ দমন দয়াময় দীন-হীন জনবন্ধু, হে যদুনন্দন যশোদা-জীবন সুরবন্দন সুখসিন্ধু···।" এই নাম গান করতে করতে ভাবানন্দে বিগলিত হয়ে গৃহ হতে বহির্গত হতেন।

গৃহদ্বার পার্শ্ববর্ত্তী গোশালা হ'তে গাভীরা সে সময় তাঁকে দেখে কর্ণ অবনত করে আনন্দে হাম্বারব তুলে দিত। গোবৎসরা তাঁর কাছে যাবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করত। গৃহস্বামীর গানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ামাত্র সন্নিকটবর্ত্তী দেবদারু গাছের উপর টিয়াপাখীরা সমস্বরে কলরব তুলে দিত। দু'একটা পাখী উড়ে এসে প্রাচীরে বসত এবং গ্রীবা আন্দোলন করতে থাকত তাঁর দিকে যেন তাকিয়েই।

পরিচয়—

পূর্ববর্ণিত গৃহস্বামী ছিলেন আমার পিতামহ—নাম রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বংশ শুধু শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা নিয়েই ছিল না, তার সংগে যুক্ত হয়ে এসেছিল আমার পিতা এবং খুল্লতাতের সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা, শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণ পাঠ ইত্যাদি।

পিতা, পিতামহ প্রভৃতির কাছে শুনেছি ওই সমস্ত বিদ্যার চর্চা নিয়ে এবং পূর্ববর্ণিত ভাবধারায় শাস্ত্রীয় সংগীতকে ধরে বেশ কয়েক পুরুষ ঊর্দ্ধ হতে একক সন্তানরূপে বংশের ধারা নেমে এসেছিল আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীধরচন্দ্র পর্য্যন্ত।

তারপর শ্রীধরের তিনটি পুত্র লাভ হয়। এই তিন পুত্রের মধ্যে বড় ছিলেন গঙ্গানারায়ণ, মেজ নিরঞ্জন এবং কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। শেষোক্ত ইনি আমার প্রপিতামহ। গঙ্গানারায়ণ এবং ঈশ্বর, শ্রীধরের এই দুই পুত্রের দ্বারা আমাদের বংশের দু'টি ধারা চলে আসছে। মধ্যম নিরঞ্জনের পুত্রসন্তান ছিল না।

শ্রীধরের বড় পুত্র গঙ্গানারায়ণ সংগীত এবং সংস্কৃত বিদ্যাদির চর্চা করেন নি। জমি-জমাদির আয় এবং যাজকক্রিয়ার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। মধ্যম নিরঞ্জন বিবাহের পর একটি কন্যা

জন্মানর কিছুকাল পরে সংসারে বিরাগী হয়ে যান। কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র (আমার প্রপিতামহ)ই এই বংশের ধারাবাহিক ঐতিহ্য যথা শাস্ত্রীয় সংগীত এবং উক্ত বিদ্যাদিতে পারঙ্গম ছিলেন। সে যুগে তিনি পুরাণ ও ভাগবত পাঠেও অদ্বিতীয় হয়ে প্রচুর সুনাম ও অর্থ উপার্জন করেন।

গঙ্গানারায়ণের একটিই মাত্র পুত্রসন্তান ছিল,—যাঁর সুবিদিত নাম অনন্তলাল। অনন্তলাল প্রথমতঃ তাঁর খুল্লতাত ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত ও ভাগবত পাঠ শিখতে আরম্ভ করেন এবং তার সঙ্গে কণ্ঠসংগীতও। প্রথম দু'টির উপর অত্যন্ত বিরাগ বুঝতে পেরে এবং গানের উপরই আগ্রহ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র ভাইপো অনন্তলালকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের উপর শিক্ষার ভার দেন।

উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহু শিষ্য ছিল,—তার মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট এবং অনন্তলাল এই তিনজনই বিশেষরূপে গুরুর যোগ্য শিষ্য হয়ে উঠেন এবং সে সময়কার বিষ্ণুপুর ঘরাণাসৌধের এঁরা বিরাট স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ক্রিয়াঙ্গবিদ্ আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন ছিলেন বিখ্যাত রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতগুরু এবং স্বরলিপির প্রকৃত রূপদানের প্রবর্ত্তক। 'কণ্ঠ-কৌমুদী', 'সংগীত-সার' 'যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা' প্রভৃতি কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের গ্রন্থ স্বরলিপি সহ প্রকাশ করে প্রথম আদর্শ গ্রন্থকার রূপে পরিচিত হন।

যদুভট্ট ছিলেন ধ্রুপদ গানে অদ্বিতীয়। সারা ভারতে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়েছিল। ইনি ত্রিপুরা মহারাজার দরবার গায়ক ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'তানরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন। কিছুকাল যখন পঞ্চকোট রাজ দরবারে ছিলেন তখন সেখান হতে 'রঙ্গনাথ' উপাধি লাভ করেন। অতি উত্তম সুর সংযোজনা ও বন্দেজযুক্ত অনেকগুলি ধ্রুপদগান ইনি রচনা করেছিলেন। সেগুলির ভনিতায় তিনি তাঁর উপাধিই দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক নিবন্ধে লিখেছিলেন "যদুভট্ট বাংলার 'তানসেন'। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

অনন্তলাল ছিলেন বিষ্ণুপুরে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত ধ্রুপদাদি গানের বিরাট ভাণ্ডার স্বরূপ। বহু শিষ্যকে এই ভাণ্ডারের অমূল্যবস্তু সকল অকাতরে দান করে গেছেন॥ তাঁর যে যে শিষ্যরা দেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন, অম্বিকাচরণ,

গোপেশ্বর।

অনন্তলালের স্মৃতিশক্তি ও মেধা অসাধারণ ছিল। সমস্ত গানের বাণী ও তার হুবহু সুর সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে রেখেছিলেন। বিষ্ণুপুর ঘরাণার শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর অবদান সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়ে আছে। তিনি যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ না করতেন তাহলে মনে হয় তখন থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার গৌরব রবি অস্তমিত হয়ে পড়ত।

অনন্তলাল সমস্ত সংগৃহীত ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গানকে রক্ষাকল্পে পরম পবিত্র জ্ঞানে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

অনন্তলালের চার পুত্র, যথা, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ (ইনি কৈশোরে মারা যান)। উক্ত তিনপুত্র সংগীতে দেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন।

আমার প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম বিবাহিত পত্নীর একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হবার পর মৃত্যু হয়। সেই পুত্রই আমার পিতামহ। পরে দ্বিতীয় পত্নীর দু'টি পুত্র ও দু'টি কন্যার জন্ম হয়। এই দুটি পুত্রের প্রথমটির নাম কার্ত্তিকচন্দ্র এবং দ্বিতীয়টির নাম উমেশচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামকুমার (আমার পিতামহ) এবং কনিষ্ঠ উমেশচন্দ্র সংগীতে, সংস্কৃত বিদ্যায় এবং ভাগবত পাঠে বিশেষভাবে কৃতবিদ্য ছিলেন। উমেশচন্দ্র সমগ্র গীতাকে বাংলাগানের আকারে রচনা করে তাতে রাগ-তাল যুক্ত করে পুস্তকাকারে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত করেছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্ব-অদ্ভুত রচনা-শক্তি ও প্রতিভার অপূর্ব এক পরিচয়। খুবই দুঃখের বিষয় 'গীতা-গীতি' নামক এই গ্রন্থটি এখন লোকচক্ষের অন্তরালে চলে গেছে। আমার কাছে থাকা এই পুস্তকটি কোন্ ব্যক্তির হস্তগত হয়ে যে উধাও হয়ে গেছে তার সন্ধান আর পেলাম না। নাড়াজোল রাজ নরেন্দ্রলালের আনুকূল্যে উক্ত গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থকারের মুখে গীতার এই সব গান আমি বহুবার শুনেছি।

কার্ত্তিকচন্দ্র সংস্কৃতবিদ্যায় জ্ঞানবান এবং যন্ত্রসংগীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। বাংলা গান এবং নাটক রচনায় এঁর দক্ষতা ছিল অদ্ভুত; এঁর রচিত 'হিড়িম্ববধ' 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'রামের বনবাস', ইত্যাদি তখন যাত্রায় অভিনীত হত। কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্র রামপদ ছিলেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী। এঁরও বিবিধ বিষয়ে রচনা শক্তি যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথদের

সিলাইদহের গৃহে বহুদিন থেকে উক্ত ঠাকুর পরিবারের এক আপন ব্যক্তিকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বহু বৎসর ধরে শিক্ষকতা করেছিলেন—'সঙ্গীত সম্মিলনী'তে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে।

আমার পিতামহ রামকুমারের ছিল দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আমার পিতা শ্রীপতিচরণ, কনিষ্ঠ অম্বিকাচরণ। এঁরা দু'ভাই-ই ছিলেন সংস্কৃত বিদ্যার বিবিধ বিষয়ে সুপণ্ডিত, সংগীতগুণী, ভাগবতপাঠক এবং গান ইত্যাদিতে সুরচয়িতা।

আমার পিতার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামসত্য, কনিষ্ঠ আমি। জ্যেষ্ঠ শাস্ত্রীয় সংগীতের বিবিধ বিষয়ে কিছু শিক্ষা নিয়েছিলেন, তবে এর উপর নির্ভর করতে পারেন নি, চাকরীই উপজীব্য হয়েছিল।

খুল্লতাত অম্বিকাচরণের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠই এখন জীবিত। এঁর নাম রামশঙ্কর। ইনি কোলকাতাতেই সংগীতের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে ইনি বিশেষ পারদর্শী।

বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণের দ্বারা বংশের ঐ সমস্ত ঐতিহ্য রক্ষা পায় নি, ছেদ পড়ে গেছল। তাঁর পুত্র অনন্তলাল বংশের এই শাখাটির সংগীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করেন।

বংশগত শাস্ত্রীয় সংগীত ইত্যাদির ঐতিহ্যময় গৌরব দ্বিতীয় শাখা ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং তাঁর বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরের পর সন্তানদের দ্বারা বিপুলভাবে বিস্তৃত ও গভীরত্ব নিয়ে চলে আসছে এখন পর্য্যন্ত আমার পাঁচ পুত্রের দ্বারাও।

এস্থলে বলতে হচ্ছে; যে সব লেখক বিষ্ণুপুর ঘরাণা সংগীতের ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের নানান ভ্রান্তিযুক্ত সীমাবদ্ধ ইতিহাসে আমাদের বংশের যথাযথ সত্য পরিচয় প্রকাশিত হয় নি। সেখানে বহু সত্য ও তথ্য চাপা পড়ে গেছে। আমার প্রণীত 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে বহু পূর্বের থেকে সংগীত চর্চার সন্ধান দিয়ে পরের পর বিশদভাবে তথ্য সমাবেশ করে ইতিহাসের সত্য নিরূপণ করেছি। আমার লিখিত সেই ইতিহাস বহু যুক্তিবাদী ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছে বিশ্বাসযোগ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

(২)

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আগমনের সঙ্গে—

বিষ্ণুপুরের কিছুদূরে প্রদ্যুম্নপুর নামক একস্থানে মল্লরাজাদের আদি রাজধানী ছিল। ক্রমশঃ যখন এই রাজাদের রাজত্বের পরিধি বিস্তৃত ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হতে লাগল তখন তাঁদের অপরিসর সেই আদি স্থানে থাকা অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় বিষ্ণুপুরে রাজধানী গড়ার বাসনা জাগে তখনকার মহারাজা জগৎমল্লের।

ওই উদ্দেশ্যে ইনি বিষ্ণুপুরের যেখানে ৺মদনমোহন জীউএর মন্দির সেই অঞ্চলে সাময়িকভাবে গৃহাদি নির্মাণ করিয়ে চলে আসেন প্রয়োজনীয় লোকজনদের সংগে নিয়ে। সেই সংগে আমাদের তখনকার পূর্ব্বপুরুষও আসেন পূর্বাপর গায়ক ও পণ্ডিত পদের অধিকার নিয়ে। সেই থেকে ওই অঞ্চলেই গৃহাদি নির্মাণ করে আমাদের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুপুরকেই চিরস্থায়ী-রূপে বাস্তুদেশ করে নিয়েছিলেন। এর সময়কাল বঙ্গাব্দ ৭০৬ সাল বলে জানা গেছে।

বিষ্ণুপুরের পাহাড়ভঙ্গিমাময় বিরাট বিস্তৃত স্থানে রাজা জগৎমল্ল সুদৃঢ় ও দর্শনীয়ভাবে দুর্গ, দুর্গদ্বার, পরিখা, নগর সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং তার সঙ্গে বাসোপযোগী গৃহাদিও। ক্রমশঃ এইস্থানে অপূর্ব শিল্পকলার দ্বারা বহু মন্দির নির্মিত হয়। এখন পর্য্যন্ত রাজাদের এই সব নির্মাণকীর্ত্তি বিস্ময় সহকারে দর্শকদের মন আকৃষ্ট করে রেখেছে।

মল্লরাজারা ক্রমান্বয়ে বিবিধ অস্ত্রাদি নির্মাণের ব্যবস্থা, বহুবিধ শিল্পজাত বস্তুর উৎপন্নের প্রচেষ্টা, বিবিধ শিল্পের উৎকর্ষের জন্য সৃষ্টির নব নব বিকাশ ও তার সুফল এনে দিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে বীরত্বের গরিমা, সৌর্য্য-বীর্য্যের শক্তি যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া ভার হবে। এই নগরীতে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ সংগীত ঘরাণা, রেশমজাত বস্তুর শিল্পসমৃদ্ধি নিয়ে মূল্যবান বস্ত্রাদি, কাংশধাতু নির্মিত পাত্রাদির বিপুল সম্ভার, শঙ্খশিল্পের প্রাচুর্য্য, মৃত্তিকা শিল্পের কৃতিত্বপূর্ণ গঠনরূপ, তাম্রকূটের বিখ্যাত পরিচয়, বহুবিধ মিষ্টান্নের উপাদেয় স্বাদের মধ্যে বিখ্যাত মতিচুর মিষ্টান্নের অপূর্ব্ব সুনাম, বহুবিধ অস্ত্র নির্ম্মাণের কারিগর, স্বর্ণশিল্পীদের উচ্চমানের শিল্পশক্তি, ভাস্কর্য্য শিল্পীর সংখ্যাধিক্য, ঢাক-ঢোল বাদকদের

তালবাদ্যে কৃতিত্ব প্রভৃতির এই সকল সৃষ্টবস্তুর উৎকর্ষ লাভ হয়ে, তার ফলশ্রুতি এখনও যেভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে, তাতে মনে হয় তুলনামূলক বিচারে ভারতে আর অন্য কোথাও নেই। অর্থাৎ একইস্থানে এত রকমের সৃষ্টির উৎকর্ষ আর কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় না। এই সঙ্গে কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃত বিদ্যাদির চর্চাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্ম্মাদি সম্বন্ধীয় নানান বিষয়ের বহুকালের প্রাচীন পুঁথি-পত্রাদি সংরক্ষিত এবং পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য শাখা মন্দিরে আমাদের ঘরের বহু বিষয়ের বহু প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত হয়ে আছে।

রাজা জগৎমল্লের প্রথম অবস্থিত স্থানের পরিচয়—

উক্ত রাজা বিষ্ণুপুরের যেখানে এসে বসবাস করেন সেই অঞ্চল ক্রমশঃ বাইশপাড়া নামে. চৌহদ্দিভুক্ত হয়। এই বিষ্ণুপুরে কিছু কম নিয়ে এই রকম চৌহদ্দিভুক্ত পাড়া বহু আছে। তবে আমাদের অঞ্চলের বাইশপাড়াই রাজাদের দুর্গাভ্যন্তরের নিকটবর্ত্তী পাড়া এবং এই অঞ্চলেই বিবিধ বিষয়ের শিল্পী ও নানান ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে উক্ত রাজা পূর্ব রাজধানী হতে আনয়ন করে তাঁদের জন্য বাসগৃহাদি নির্মাণ করিয়ে দেন এবং তার সংগে তাঁর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও।

মল্ল মহারাজ জগৎমল্লের প্রথম অবস্থিত স্থানের এখনও কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশেষ হল রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ত্রিনয়নী মাতার' মন্দিরটি। এই মন্দিরটির প্রায় অর্দ্ধেক মৃত্তিকাগর্ভে প্রথিত অবস্থায় দেখে এসেছি ছেলেবেলা থেকে। এখানেই পাথরে নির্মিত বিচিত্র ও অপূর্ব্ব শিল্পমণ্ডিত ৺মদনমোহন জীউ এর বিরাট মন্দিরটি উক্ত রাজার স্মৃতিরক্ষা কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এই অঞ্চলেই মল্লেশ্বর মহাদেবের বৃহৎ মন্দিরটি নির্মিত হয়। সেই সময় থেকে আমাদের বংশের মাধ্যমে বহু সঙ্গীতজ্ঞের সৃষ্টি হয়। পরে আরো দু'চারটি ঘরাণা গড়ে উঠে, তবে গদাধর চক্রবর্ত্তীর পাঁচ-ছ' পুরুষের ঘরাণা ছাড়া অন্য যে সব বংশে সংগীতের চর্চা এসেছিল তার ধারা দু'তিন পুরুষ পর্য্যন্তই টিকেছিল।

এই বাইশপাড়া অঞ্চলেই রাজাদের মহন্তরা ছিলেন। এখনও তাঁদের জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় প্রাসাদোচিত গৃহাদির অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এই বাইশপাড়া অঞ্চলের সব পাড়াই জাতিগত ও ব্যবসাগত

এবং কর্মগত নামে পরিচিত হ'য়ে আছে। যেমন আমাদের পাড়া ওস্তাদ পাড়া তেমনি কবিরাজ পাড়া, মহাপাত্র পাড়া, ভট্চাই পাড়া, পাঠক পাড়া, অধিকারী পাড়া, পূজারু পাড়া, গোঁসাই পাড়া, শাঁখারী পাড়া, তাঁতি পাড়া ইত্যাদি। এই অঞ্চলেরই পূর্বপ্রান্তসীমায় রাজদরবারের সন্নিকটে শ্যামবাঁধের উপর 'লালবাঈ' এর মহল তৈরী হয়েছিল। এখনও ভগ্নাবশেষ নিয়ে তার বহু চিহ্ন আছে। এর সময় পরিচয় তিনশ' বছর হতে চলল।

(৩)

বংশের কথায়,—

আমাদের বংশে সংগীত চর্চার প্রথম উৎপত্তি কোন্ সময়, কার দ্বারা এবং কোন্ গুরুর মাধ্যমে হয়েছিল তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়নি। সব সংবাদই কানে কানে চলে আসায় কালান্তরে স্মৃতিভ্রম হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের নয়। শুনা যায় পূর্বপরিচয় লিখিতভাবে কিছু সংরক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরে আসার পর সেই পরিচয়ের দলিলটি আগত আমাদের সেই পূর্বপুরুষ খুঁজে পান নি। ইতিহাস ইত্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে অবহেলা তখন খুবই বেশী ছিল। এজন্য বহুস্থানের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের সত্যতা নিরাকরণে অনুসন্ধান করা খুবই কষ্টকর ও সম্ভবাতীত হয়ে পড়ে।

এই অবহেলা যদি আমি না করতাম তাহলে পিতা-পিতামহ প্রভৃতির কাছে যে সব তথ্য সংবাদ ও বংশ-পরিচয় পেয়েছিলাম সেগুলি লিখে রাখলে আজ তা'র অনেক কিছু ভুলে যাওয়ার আপসোশ করতে হত না। তবে তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংবাদ মনে রাখতে পেরেছিলাম।

আগেই জানিয়েছি যাঁরা বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরাণার ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা এমন সব গুরুত্ব বিষয়ের পরিচয় প্রদানে অবহেলা বা সত্যানুসন্ধানে ক্ষমতার অভাব দেখিয়েছেন যে তারমধ্যে তাঁদের দেওয়া ইতিহাসে নূতন ছাঁচের রূপই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ইতিহাস যদি সেইস্থানে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তার তথ্যানুসন্ধান না করে আর এক জায়গায় বসে লেখা হয় তাহলে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য বিচারে বহু ত্রুটি থেকে গিয়ে সত্যের বিকৃতি ঘটে।

(৪)

চলার পথের প্রথম পরিচয়—

অতি শৈশবকালে সংগীতের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে যে সব কথা তখন বহুবার গুরুজনদের কাছে শুনেছি তারই দু'একটা পরিচয়। পিতামহ গানের আসরে শ্রোতাদের বলতেন,—আমার দু' ছেলে যে যে সময়ে তানপুরা নিয়ে গান সাধ্‌ত তখন এই নাতিটি সেখানে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ত.—কোলে রাখতে পারা যেত না,—নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলেই হামা দিয়ে তানপুরাটা ধরে দাঁড়িয়ে উঠে 'সা' এর মত ঠিক সুরে গলায় 'চা' শব্দ করে তানপুরার সুরে গলা মিলিয়ে দিত এবং তারের উপর আঙ্গুল চালাতে থাকত।"

দু'বছর বয়েসের সময় থেকেই পিতামহ সহজ সুরের কয়েকটি ঠাকুর-দেবতার ও বাউল-গান শিখিয়ে এসেছিলেন চার বছর বয়স পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম তিনি এক লাইন করে গাইতেন আর নাতি গানের ছন্দে নাচতে নাচতে ঠিক সুরে গেয়ে যেত।

এই রকমভাবে দাদুর কাছে অল্প অল্প করে সেই সময় থেকেই অন্তর-মধ্যে সুর ও ছন্দের পুষ্টিসাধন হতে থাকে।

সেই সময়কার একটি ঘটনা—

বিষ্ণুপুর সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে বৃহৎ সরোবরটি আছে (নাম পোকাবাঁধ) সেখানে যেদিন প্রত্যুষে পিতামহ স্নান করতে যেতেন সেদিন ওই নাতিটিকেও কোলে করে নিয়ে যেতেন। নাইয়ে দিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে বলতেন—এবার ওই গানটা গাও তো!

বলা মাত্র নাতি গান ধরে দিত—আর এঘাট ওঘাট হতে স্নানার্থীরা এসে জড় হয়ে শুনত এবং রাস্তার লোকেরাও। দাদু বলতেন ছোট থেকেই গলার জোর যেমনি ছিল তেমনি মিষ্টিও।

যাই হোক্—ওই রকম ভাবে জনসমাগম দেখে ধারণা হয়ে গেছল—গানের সময় গান শুনতে লোকজন থাকতে হয়। মনের এই ভাবটা সেই সময় একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ায় দাদুর কাছে বেশ কৌতূহল ও আনন্দ এসে গেছল। তার পরিচয়, সেই সরোবরে যাবার মাঝ পথের একটা

জায়গা বেশ নির্জন। একদিন সেখানে যেতে যেতে পিতামহ বল্লেন—কালকার শেখান গানটা গা' তো দেখি!

নাতি উত্তর দিয়েছিল লোক কৈ ?

বড় হবার পরও গানের আসরে পিতামহ হর্ষযুক্ত হয়ে সকলের কাছে এই ঘটনাটি বলতেন। তিনি দেখতেন নাতিটি বেশী লোকজনের কাছেই বেশী আগ্রহ নিয়ে গায়।

যখন তিন, চার বছর বয়স তখন থেকে নিজেদের ও অন্যান্য পাড়ায় গান গাইতে যাবার জন্য ডাক আসত। আসরটা বসত বিকেলের দিকেই। বেশীর ভাগ দাদুই সংগে করে নিয়ে যেতেন। সব জায়গায় একই গান গাইতে চাইতাম না বলে গানের সংখ্যা বাড়তে থাকত।

গান শুনিয়ে জলযোগ ও তার সঙ্গে কিছু পয়সাও সামান্য পাওয়া হত। গানের দ্বারা উপার্জন তখন থেকেই একরকম শুরু হয়ে গেছল।

বাড়ীর আবহাওয়ার গুণে খুব ছোট থেকেই ঠাকুর-দেবতার পূজা দর্শন করতে খুব ভাল লাগত। মা যে সব বার-ব্রত করতেন তাতে যোগ দিতে একান্তভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতাম। মা বাধা দিতেন না। ধর্ম্মীয় উৎসবাদির অনুষ্ঠান ও তার ব্যবস্থা আগাগোড়াই দাঁড়িয়ে থেকে দেখতাম।

স্থানে স্থানে গান গেয়ে যে ক'টি পয়সা পেতাম – তার থেকে মাটির তৈরি কৃষ্ণ ও মহাদেব ঠাকুর কিনে প্রত্যেক দিন সকালে পূজা করা নিয়মিতভাবে ছিল। সেই পয়সার থেকে কিনে আনতাম দু' পয়সার চিঁড়ে, এক পয়সার দৈ, এক পয়সার মণ্ডা। বাড়ী থেকে গুড় চেয়ে নিয়ে পাথরের থালায় এই সব বস্তু মিশ্রিত করে ঠাকুরদের নিবেদন করতাম। পরে বাড়ীর সকলকে প্রসাদ বণ্টন করে নিজের জন্য যা থাকত তাই পরম আনন্দে খেতাম।

অন্য ছেলেদের মত খেলনা ইত্যাদি কেনাকে আমি শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করা মনে করতাম।

বাল্যকাল থেকে পয়সা সঞ্চয়ের ইচ্ছেও একটু ছিল। তালাহীন একটি ছোট কাঠের বাক্সে দু'চারটি করে পয়সা ফেলে রাখতাম এবং দিন একবার করে গুনতাম—কতগুলি হল। কিন্তু প্রায়ই দেখতাম বাক্সর ভেতরে মাত্র এক-আধটি পয়সা পড়ে আছে। জানতে দেরী হত না জরুরী প্রয়োজনে মা কিংবা বাবা বের করে নিয়ে খরচ করেছেন। ফেরত

চাওয়ার দাবী থাকত না, বরং আনন্দই আসত বাবা, মা'এর কাজে লেগেছে দেখে।

দেশের ক্রিয়া-কর্মে তখন যেখানে যেখানে রাত্রে বা দিনে খাদ্যরূপে লুচির নিমন্ত্রণ থাকত সেই সেই জায়গায় পাঁচ বছর বয়স থেকেই পাড়ার সকলের সঙ্গে গিয়ে সেখানে না খেয়ে ছাঁদা নিয়ে আসতাম। পরিবেশনকারীরা ছেলেমানুষ দেখে না খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করায় তাঁরা উত্তর পেতেন—আমার মা আছেন—তাঁকে না দিয়ে আমি কোন ভাল জিনিস খাই না। পরিবেশকরা মমতাযুক্ত স্বরে বলতেন—খোকা তুমি খাও, আমরা তোমার মা-এর জন্য সমস্তই দেবো। আমি বলতাম মা-এর তো নিমন্ত্রণ হয় নি কেন আমি তাঁর ছাঁদা নেবো!

নিজের ছাঁদাটি নিয়ে গিয়ে মা-এর হাতে তুলে দিতাম। মা বিমুগ্ধ দৃষ্টি রেখে মাথায় হাত বুলোতেন। আমাকে থালায় করে সব সাজিয়ে দিতেন, নিজের জন্য একখানি মাত্র লুচি তুলে নিয়ে। আমি কিন্তু অন্ততঃ সমান সমান ভাগ না করে ছাড়তাম না। মা বলতেন তুই বাবা খেয়ে আসবি নচেৎ আমার মনে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু আমি তা কোন দিনই পারিনি। লোকের কাছে এ সব কথা কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই মা বলতেন।

এই লেখার কাজ বঙ্গাব্দ ১৩৭৬ সালে আরম্ভের সময়ে মায়ের বয়েস ছিল বিরানব্বই। বরাবর বেশ শক্ত-পোক্ত ছিলেন। দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি ও দন্তপুংক্তি নষ্ট হয়নি। ইং ১৯৭৩ সালের ১১ই মে সজ্ঞানে সাতানব্বই বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

বাস্তুগৃহের পরিচয়—

আগে আমাদের ঘর-বাড়ী-গোশালা ইত্যাদি সমস্তই মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত ছিল। গোশালায় আট দশটি দুগ্ধবতী গাভী থাকত এবং উঠোনের মাঝখানে থাকত ধানের মরাই।

বসত বাড়ীর বহির্ভাগে সদরের উপর আমাদের একটি বড় হল ও কুঠরীযুক্ত টোলবাড়ীতে পূর্ব্ব কথিত বিদ্যাদির চর্চা হত এবং আট দশটি ছাত্রকে প্রতিপালন করে তাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী শাস্ত্রীয় সংগীত, ভাগবত-পাঠ, সংস্কৃত বিদ্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত।

অনন্তলাল অনেক সময় আমাদের এই টোলগৃহে ছাত্রদের সংগীত

শিক্ষা দিতেন। এই বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ থেকে আমার বাবা-কাকার আমল পর্য্যন্ত এই সব আদর্শমূলক নিয়ম-নীতি পালিত হয়ে এসেছিল।

আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির উপার্জ্জিত অর্থ ও জমি জমাদির আয়ের যা কিছু তার অধিকাংশই নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় ও জনকল্যাণে ব্যয় হত। তাঁদের কারোরি মনে অবস্থা সচ্ছল করার কামনা এবং বিলাস-আড়ম্বর ইত্যাদির মোহ স্পর্শ করতে পারেনি।

মা, কাকীমা, ঠাকুমা প্রভৃতি সকলেই পরম নিষ্ঠার সহিত সকলের সেবা যত্ন ও নিজেদের হাতে রান্না করে খাওয়ান ইত্যাদি সমস্ত কাজই করে এসেছিলেন। তাঁদের কখনও ভাল শাড়ী ও গয়না আমি পরতে দেখিনি। ব্লাউজ-সায়া তো তখন ছিলই না।

আমাদের ওই টোলগৃহে ছাত্রদের শুনার প্রয়োজনের জন্য গানের আসর প্রায়ই হত।

(৫)

তখনকার সঙ্গীত চর্চ্চার কথা,—

আমার বাল্যজীবন থেকে বেশ কয়েক বছর পর্য্যন্ত দেখে এসেছিলাম প্রায় সর্বক্ষণই আমাদের পাড়ায় ও বাস্তুগৃহে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা হত। গৃহের সদর সম্মুখে কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ এর মন্দিরাভ্যন্তরে নানান সময়ে মুখরিত হয়ে থাকত রাগরূপের মাধ্যমে বেদ, পুরাণ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি পাঠে।

পাড়াটিকে মনে হত যেন সামবেদ চর্চার এক পীঠস্থান এবং মুনি-ঋষিদের গার্হস্থ্য আশ্রমের মত।

প্রতি সন্ধ্যায় ৺গোপীনাথের আরতির সময় পাড়ার সকলেই উপস্থিত হতেন। ঠাকুরদা কাঁশর বাজাতেন অদ্ভুতভাবে। শুনে শুনে আমরা শিখেছিলাম ঐ বাদ্যের মধ্যে কিরকম সুন্দরভাবে নানান তাল ও বোল-ছন্দ উৎপন্ন করা যায়।

মনে পড়ে একদিন মেজকাকা (গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়) আরতির সময় উপস্থিত থেকে ঠাকুরদা'র কাঁশর বাজানর মধ্যে অদ্ভুত ভৈরী হাত দেখে

খুব বিস্মিত ও আনন্দসহকারে বলেছিলেন—কি চমৎকার যে লাগছিল শুনতে, মনে হচ্ছিল আরো অনেকক্ষণ আরতি হলে খুব ভাল হত। আরতি কিন্তু কোনদিনই অল্পক্ষণ হত না।

আরতি সারা হলে আমরা সকলে মন্দিরের রোয়াকে বসতাম। দাদু বহুবিধ ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করতেন। আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম। তাঁর বচনভঙ্গী খুবই সহজ সরল ও আকৃষ্টকর হত। প্রকৃত শিক্ষার পাঠ এই সময়েই বেশী করে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আরতির পর আমার জন্য একদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেছল। তখন আমার বয়স দুইএর হয়ত কিছু বেশী। আরতি হয়ে যাবার পর সকলের প্রণাম করা দেখে আমিও প্রণাম করছি মাথা নামিয়ে কিন্তু ঠাকুরের দিকে পিছু করে। ঠাকুরদা' তাইনা দেখে বলিষ্ঠ হস্তের দ্বারা একটি মাঝারি গোছের খাপ্পড় আমার পৃষ্ঠে প্রদান করে বলেছিলেন শালা! তুই ঠাকুরের দিকে পিছু করে প্রণাম কচ্ছিস।" মাথা নামিয়ে যে ভক্তি আমি দেখাচ্ছিলাম সেই ভক্তির উপর হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে ওই রকম খাপ্পড়ের আস্বাদন আমাকে দারুণভাবে চমকিয়ে দিয়েছিল। কান্নায় ফুলতে ফুলতে দাদুকে বলেছিলাম—তুমি যে সেবাইদের বাড়ীর দিকে পিছু করে প্রণাম কল্লে তাদের কি মা কালী নাই? ওখানে ৺কালীপূজা কি হয় না? এই উত্তর শুনামাত্র অবাক বিস্ময়ে সজলনেত্রে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দাদু সকলকে বলেন—"দেখলে কি রকম ছেলে! কেমন কথায় আমাকে আক্কেল দিয়ে কত বড় কথা শিখিয়ে দিলে! এই শিক্ষা যেন ৺গোপীনাথই শিশুর মুখ দিয়ে প্রদান করলেন।

চাষি সদ্‌গোপ জাতিদের মধ্যে যারা রাজাদের দেব মন্দিরে সেবাইতের কাজ করত তাদের জাত উপাধি 'সেবাই' হয়েগেছল। এই বংশও এসেছিল আমাদের বংশের সংগেই রাজা জগৎমল্লের সময়। আমাদের মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বেই তাদের বাস্তুগৃহ ছিল। তাদের যে কুঠরীটিতে ৺মা কালীর পূজা হত সেদিকে পিছু করে প্রণাম না করলে আমাদের ঠাকুরকে সঠিক প্রথায় প্রণাম করা হয় না। কিন্তু আমার কাছে ওটা খুব খারাপ লাগত। মনে হত গরীবদের ঠাকুর ঘর তাই বুঝি পারে সকলে সেই দিকে পিছু করে প্রণাম করতে। সেইজন্যই মনে হয় ওইরূপ উত্তরটা সংগে সংগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছল।

এই ঘটনার কথা দাদু অশ্রুসিক্ত নয়নে অনেকের কাছেই বলতেন।

মা বরাবরই আমার বাল্য জীবনের এই সব ধরণের অনেক কথার পরিচয় দেবার সংগে এ-ও বলতেন,—জন্মাবার কিছুদিন পরে ঘরে শুইয়ে রেখে আমি বাইরের কাজ সেরে কাছে গিয়ে একদিন দেখি নড়াচড়া করছে না, বড় বড় চোখ করে সমানে তাকিয়ে আছে, উনি তখন পাশের ঘরে গান করছিলেন, ছেলের এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে তাঁকে বলি, তিনি গান থামিয়ে আমার সঙ্গে এসে দেখেন শিশুটি বেশ নড়াচড়া করছে, আমার কি রকম মনে হল—ওঁকে বললাম তুমি একটা গান করত! গান ধরতেই আবার সেই রকম নড়াচড়া বন্ধ এবং এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, আমরা খুবই আশ্চর্য্য হলাম…।

পথ যাত্রায়—

আমার পথ যাত্রায় যিনি বলিষ্ঠভাবে মনকে গড়ে দিয়েছিলেন। যাঁর উপদেশ দানে শক্তি সঞ্চয় করে ধর্ম ও কর্ত্তব্যকে সামনে রেখে বাধা বিপত্তিকে দূরে সরিয়ে রাখবার সাহস সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম সেই তিনি হলেন আমার দিক নির্ণায়ক যন্ত্র স্বরূপ পিতামহ। এই মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়ের অপূর্ব চরিত্র, অন্তর গঠনে এবং মানবত্ববোধে কত যে সহায়ক হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর চরিত্রের দু' চারটে দৃষ্টান্ত উল্লেখেই জানা যাবে।

(এক) আমাদের কুলদেবতা ৺গোপীনাথ জীউ এর পূজা-ভোগাদির পালা আমাদের তিন অংশের। বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীধরের জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশধারায় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন ভ্রাতার একত্রে ছ' মাস, পিতামহের দু' মাস এবং তাঁর দুই বৈমাত্রের ভাইয়ের দু'মাস করে। পালার সময় প্রত্যেকের গৃহে রেখে উক্ত দেবতার পূজাদি নির্বাহ হত। একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে ৺গোপীনাথকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে যথোচিতভাবে পূজাদির ব্যবস্থা করার একান্ত আগ্রহ ও কামনা আমার পিতামহের অন্তরে দারুণভাবে এসে যায়। কি উপায়ে এই আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে তার চিন্তায় খুব কাতর হয়ে পড়েন। সর্বদা প্রাণের ঠাকুরকে ডাকতেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য। ভক্তের এই আকুল প্রার্থনা ৺গোপীনাথ শীঘ্রই পূরণ করে দেন।

আমার জন্মের চার পাঁচ বছর আগে এক জমিদার বাড়ীতে দাদুর তিন মাস ভাগবত পাঠ হয়। বারশ টাকা সেখানে পেয়েছিলেন। তার এখনকার মূল্য অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা। সে সময় উচ্চস্তরের রাজ মিস্ত্রির ও কাঠের মিস্ত্রির বেতন ছিল দৈনিক চার আনা। ইঁটের হাজার ছিল দু' টাকা, ইত্যাদি। দাদু ওই টাকায় সুন্দর সুদৃশ্য একটি মন্দির তৈরি করিয়ে নেন এবং ঠাকুরকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠার দিনে বিপুল জাঁক-জমকের সহিত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। মা বলতেন খাওয়ানর এমন ঘটা প্রায় দেখা যায় না।

নিজের বসতবাটী জীর্ণ অবস্থায় বেমেরামত হয়ে যে পড়েছিল সেদিকে পিতামহ দৃষ্টি না দিয়ে একমাত্র ঠাকুরের এই রকম স্থায়ী দর্শনীয় ব্যবস্থা করে জীবন চরিতার্থ করেছিলেন। স্বার্থ চতুররা এদিকেই যেমন, ভাল করে গৃহাদি নির্মাণ এবং সম্বৎসরের খাদ্যোপযোগী ধানের জমি কিনে ফেলত। তখন খুব ভাল এক বিঘা ধানের জমি কুড়ি টাকা মূল্যে পাওয়া যেত।

(দুই) কর্তব্য ও ন্যায়-ধর্মের একাগ্রপূজারী এই মানুষটি তিরিশ বছর বয়সে মৃতদার হয়ে মৃত্যুকাল পর্যান্ত আদর্শ সংযম নিষ্ঠার নির্মল পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি যেমন ছিলেন আদর্শবান, পরম ধার্মিক, তেমনি ছিলেন দয়া মায়া ও করুণার অবতার স্বরূপ। প্রাণের ঠাকুর ৺গোপীনাথকে কি রকম দেহ-মন দিয়ে ভক্তি ভালবাসায় মগ্ন থাকতেন তার প্রমাণ গভীর বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি। নিজগৃহে যখন থাকতেন তখন প্রথম বর্ণিত চারদণ্ড রাত থাকতে গৃহ হতে বহির্গত হয়ে বিগ্রহাদির জন্য সহরের নানান স্থানে এমন কি সন্ধান পেলে দু' চার মাইল দূরত্বের গ্রামে গিয়েও ভাল ভাল ফুল সংগ্রহ করে তারপর লালবাঁধ নামক বিরাট জলাশয়ে স্নানাদি সমাপণ করে সেখান থেকে প্রায় দু' মাইল পথ হেঁটে এসে ৺গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করতেন। বেলা প্রায় ১২টা বেজে যেত পূজা-পাঠ সমাধা করতে।

মৃত্যুকাল পর্যান্ত কোন খাদ্যদ্রব্য ৺গোপীনাথকে নিবেদন না করে গ্রহণ করতেন না। আমার মাতুলাদি না থাকায় মাকে অনেক সময় পিত্রালয়ে গিয়ে বুড়ো দাদামশায় ও দিদিমাকে দেখা শুনা করতে হত। এই অবস্থায় ঠাকুরদা বুড়ো বয়সেও মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে স্বহস্তে রন্ধন করে ৺গোপীনাথকে অন্নভোগ নিবেদন করে গেছেন।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড গরমের সময় আহারাদির পরই ওই মন্দিরের দরজার সামনে বসে কোলের উপর শ্রীমদ্ভাগবত রেখে সারঙ্গ, ভীমপলশ্রী, মূলতান প্রভৃতি সময়োপযোগী-রাগে পাঠ করে যেতেন আর ডান হাতে সমানে ঝুলাপাখা টেনে যেতেন বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত।

দেখেছি তখন দাদুর মস্তক থেকে গা' বেয়ে দরদর ধারায় ঘাম ঝরতে থাকত। দাদু বলতেন—এত গরমে আমার ৺গোপীনাথকে যদি বাতাস না করি তাহলে তাঁর যে কষ্ট হবে।

(তিন) অনাথ, আতুরের প্রতি দাদুর কি রকম মমতা যে দেখেছি তা বলে শেষ করা যায় না। প্রত্যেকের খোঁজ-খবর নিয়ে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাধ্যমত সাহায্য করা তো ছিলই, তাছাড়া মধ্যাহ্নে আহারাদির পর রাস্তায় বেরিয়ে যদি দেখতেন কোন ব্যক্তি অভুক্ত আছে কিংবা খাদ্য যাচ্ঞা করছে তৎক্ষণাৎ তাকে সংগে এনে বাড়ীতে বলতেন—একে ভাত খেতে দাও, আমি জায়গা করে দিচ্ছি—আমরা খেয়ে থাকব আর এরা না খেয়ে থাকবে ? তাহলে ত মানুষ হয়ে জন্মানই বৃথা। এ রকম অবস্থায় মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই দেখেছি—মা-কাকীমাকে ভাতের পরিবর্ত্তে মুড়ি খেতে।

অভিভাবকহীন বা অভিভাবকহীনা কোন দুঃস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তি যদি উত্থান শক্তি রহিত হত তাহলে দাদু নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতেন তাদের জন্য অন্ন পথ্যাদি।

(চার) দাদু বিদেশে যতদিন থাকতেন তার হিসেব করে সপ্তাহে দু'দিন ক্ষৌর কার্য্যের সম্যক পয়সা বাড়ীতে এনে পরামাণিককে দিতেন। আমাদের বলতেন,—এখন অনেককেই বিদেশে থেকে বা গিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করতে হচ্ছে। দেশের ধোপা, নাপিত এই সব বৃত্তিভোগী জাতিদের রোজগারের ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতেই হবে। আমি বাড়ীতে এসেই ধোপাদের পয়সা হিসেব করে দিয়ে দিই। পয়সাগুলি দিয়ে এদের হাসি মুখ দেখে বড় তৃপ্তি পাই।

(পাঁচ) এক মাঘ মাসে দাদু এসেছিলেন কোলকাতায় ভাগবত পাঠের জন্য। বয়স তখন তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি। দাদু এসে থাকতেন বাগবাজারে বিষ্ণুপুরের ৺মদনমোহনজীউ এর মন্দিরে। তাঁর এক মামাতো ভাই এর আহিরীটোলায় বাসা ছিল। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গুণী-আচার্য্য গদাধর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র এবং মহারাজা-স্যর জ্যোতীন্দ্র-

মোহন ঠাকুরের সঙ্গীতাচার্য্য,—নাম নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। সেবারে দাদু পরের দিন সকালের ট্রেনে দেশে ফিরে যাবেন তাই মন্দিরে পাঠ সেরে তাঁর ওই দাদার সংগে দেখা করে যখন ফিরছেন তখন অনেকখানি রাত হয়ে গেছে। ভীষণ শীতের রাত্রি, যেতে যেতে হঠাৎ পাশ থেকে এক নারী কণ্ঠের ডাক তাঁর কাণে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে সেইদিকে দৃষ্টি দিতেই নারীটি তাঁকে হাত নেড়ে ডাকতে থাকে। দাদু কাছে গিয়ে বলেন,— হাঁ-গা—! তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও? —সেই নারী বল্ল শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি, এখন পর্য্যন্ত কোন খদ্দের পেলাম না, কাল যে কি খাব তার কোন সম্বলই নেই।

এই কথা শুনে পিতামহ দুঃখে ও ব্যথায় চোখে জল আসাটাকে মুছে নিয়ে—সেদিনে মন্দিরে পাঠ করার সময় মহিলারা দু' এক পয়সা করে প্রণামী স্বরূপ যা দিয়েছিল সেগুলি দাদুর হাতে থাকা হরিনামের ঝুলিতে রাখা ছিল,—রাস্তার আলোতে গুণে দেখলেন আনা বারর মত, সেগুলি সেই নারীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন—মা! আমার কাছে এই আছে মাত্র, এই পয়সাগুলি নাও, আর আমার এই শীতবস্ত্রটি দিচ্ছি,— শীতের রাতে দাঁড়িয়ে থেকে আর কষ্ট করনা। ভগবান তোমার প্রতি যেন করুণা করেন।" এই বলে দ্রুতপদে প্রস্থান করেন। সেই সময় আহিরীটোলার সেই দাদুর একটি ছাত্র আমার পিতামহের পশ্চাতে তার বাড়ীর দিকের ওই পথেই আসছিল। সে চমকে গিয়ে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে একটু আড়ালে থেকে এই ঘটনার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করে পরের দিন তার সঙ্গীতগুরুকে গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত নিবেদন করেছিল। আহিরীটোলার দাদুর কাছে পিতামহের গুণ কথন প্রসঙ্গে এই কাহিনীটি শুনেছিলাম। নারীজাতিদের প্রতি ব্যবহার ও সমবেদনার আলোচনা প্রসঙ্গে দাদু নিজেও বলেছিলেন এই ঘটনার বিষয়। আমি উভয়ের কাছেই অবাক হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে শুনেছিলাম এবং সুমহান চরিত্রের পরিচয় কিরূপ স্তরে থাকতে হয়—গভীর মানবত্ব বোধ নিয়ে; তার দৃষ্টান্ত পেয়েছিলাম।

(ছয়) পিতামহের দু'জন বৈমাত্রেয় ভাই ছাড়া দু'জন ভগিনীও ছিলেন। এই ভগিনীরা আমার পিতামহের কাছেই বেশী করে স্নেহ-মায়া-মমতা ও আদরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। ওই ভাই দু'জনও দাদুরই চেষ্টায় ও শিক্ষা দানের গুণে পাণ্ডিত্যে কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছিলেন।

এই সব ভাই-বোনেরা কোন দিনই বুঝতে পারেন নি ওই দাদা তাঁদের বৈমাত্রেয় অগ্রজ বরং সর্বদাই তাঁরা উপলব্ধি করতেন এত

আপনজন ও স্নেহপরায়ণ আর কেউ নেই। ওই ভগিনী দুটি বিবাহের পর শ্বশুর গৃহ হতে এলে আমার পিতামহের গৃহেই এসে থাকতেন। পৃথক হয়ে আলাদা থাকা সহোদর ভাইদের কাছে থাকতেন না। আমার পিতামহকেই জানতেন পিত্রালয়ের আশ্রয় ও পরম তৃপ্তির ক্ষেত্রস্থল। এক এক সময় ওই ভগিনীরা স্বামী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বহুদিন ধরে আমাদের বাড়ীতেই থেকে যেতেন।

আমি দেখেছি কোন কিছু ভাল খাদ্যসামগ্রী হলে শ্বশুরগৃহে থাকা ওই ভগিনী দু'টির ওখানে নিয়ে যাবার জন্য বেশী মাত্রায় তৈরি করা হত। একটি পরিমাপ মত পাত্রে সেই খাদ্য বস্তু ভরে নিয়ে দাদু নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। দুই স্থানের দূরত্ব ছিল বিষ্ণুপুর হতে প্রায় ছ' মাইল। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—দাদু! আপনি এই বর্ষায় সময় সাহস করে সেখানে যে নিয়ে গেলেন মাঝ পথের দ্বারকেশ্বর নদে বান ছিল না?

বললেন—ছিল ভাই,—তবে সাঁতার বান ছিল না, এক এক জায়গায় জলের গভীরতা গলা পর্যান্ত হয়েছিল, গামছা পরে—কাপড়টা মাথায় জড়িয়ে নিয়ে তার উপর খাদ্যের পাত্রটি রেখে পেরিয়ে গেলাম। বোনেরা অবশ্য এ রকম করে যাওয়ায় আবেগ জড়িত কণ্ঠে খুব বোকে ছিল।

আমি হাসতে হাসতে তাদের বলেছিলাম—না আনলে যে কষ্ট পেতাম সেটা যে এর চেয়ে অনেক বেশী হত। ৺গোপীনাথকে ধরে থাকলে কোন ভয়, বিপদ থাকে!

এ সব কথা মনে হলে ভাবি তিনি কোন্‌খানের মানুষ ছিলেন! ভগিনীদের প্রতি এ রকম অন্তরের টান সত্যই দেখা যায় না।

আমার পিতামহের শুধু বাংলা দেশেই নয়—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও যাতায়াত ছিল সংগীত পরিবেশন ও ভাগবত পাঠের জন্য আহ্বান পেয়ে। তখন নাম প্রচারের ঢক্কাধ্বনি ছিল না এবং দেশেই তাঁরা থাকতেন বেশী তাই পিতা, খুল্লতাত এবং পিতামহ প্রভৃতির সংগীত সাধনায় কৃতিত্ব পরিচয় ছড়িয়ে পড়েনি। তাছাড়া তাঁরা নাম-ডাকের আগ্রহ-প্রয়াসীও ছিলেন না।

বিষ্ণুপুর মহকুমার চতুষ্পার্শ্বের গ্রামাঞ্চলে গান ও ভাগবত পাঠাদির জন্য আমাদের কর্তারা গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। ওঁরাও তাদের আপনজনের মত দেখতেন।

এই সব গ্রামের অনেকেই প্রয়োজনে বিষ্ণুপুরে এলে আমাদের

বাড়ীতে আসতেনই এবং কেউ কেউ খাওয়া দাওয়া করে যেতেন। জলযোগ না করে কেউ যেতেই পেতেন না।

তখন আমাদের পাড়ার ৺মদনমোহনজীউএর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রত্যেক বছর বিরাট দর্শনীয় জাঁকজমকের সহিত কয়েক দিন ধরে হরিনাম সংকীর্ত্তন হত। মন্দির সন্নিকটবর্ত্তী সদর রাস্তার বিভিন্ন পথের চতুর্দিকে এবং মন্দিরসংলগ্ন স্থানে মৃত্তিকার দ্বারা অপূর্ব গঠনের উপর পৌরাণিক ঘটনার এক একটি আকর্ষণীয় দৃশ্যের ভাব মূর্ত্তির সমাবেশ রেখে সুসজ্জিত স্থানে রাখা হত। মন্দিরের চতুর্দিকের গাত্রে ও খিলানের মধ্যে রাখা হত বিভিন্ন মন্দির হতে এনে বৃহৎ থেকে মধ্যাকৃতির রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অলংকারাদি সজ্জায় সজ্জিত করে। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে মণ্ডপের মধ্যস্থলে বেদীর উপর গৌউর-নিতাইকে প্রতিষ্ঠিত করা হত। এই দু'জনের দারুময় মূর্ত্তি দুটি প্রায় মানুষ প্রমাণ এবং অপরূপ গঠনের উপর জীবন্ত সদৃশ। নিরীক্ষণ করামাত্র ভাবে অন্তর বিগলিত হয়ে যায়।

মন্দিরের চত্তরে মধ্যাহ্নে মালসা ভোগ দেওয়া হত। এর সংখ্যা থাকত ক্রমশঃ দু'শ পর্য্যন্ত। এই সব মালসা ভোগ বিশেষ করে রাত্রে কীর্তনীয়া সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে বিতরণ করা হত।

অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকত প্রচুর। শত শত লোক খেতে পেত। কেন্দুড়ি বিল্বগ্রাম, খেতুড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হতে বহু সংখ্যক বাউল, বৈষ্ণবের সমাগম হত। এই বিরাট ঘটাপর্বের বিষয় বর্ণনায় ঠিক আনা যায় না।

পল্লী অঞ্চলের কীর্ত্তনীয়ারা নাম কীর্ত্তন যেমন সুন্দর করে সুরের মাধুর্য্য নিয়ে গাইত তেমনি অনেক সম্প্রদায়ের কাছে বাদ্যের তাল থাকত চৌতাল, ধামার, পঞ্চমসাওয়ারী প্রভৃতি। বাদকরা খোলে বা মাদোলে অদ্ভুত তৈরির উপর এই সব তাল বাজাত। মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে এই কথাই ভাবতাম—এই মল্লভূমে বহুকাল হতে গীতবাদ্যের চর্চা বিপুলভাবে চলে এসেছে বলে তাই তার প্রভাবশক্তি সাধারণের কাছে এখনও এই সব পরিচয় বিস্তৃত হয়ে আছে, একেবারে লুপ্ত হয়নি। এই সব প্রামানিক বিষয় সংগ্রহ করতে পারলে তবেই ইতিহাস লেখায় প্রকৃত সত্য নির্ণীত হ'বে।

ওই নাম সংকীর্ত্তন উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে আত্মীয়কুটুম্ব আসা ছাড়াও গ্রামঞ্চল থেকে অনেক মহিলারা শিশু সংগে করে নিয়ে এসে

উপস্থিত হতেন। তাঁরা আমাদের বাড়ীতে যথেষ্ট সমাদরের সহিত ভোজন ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন পেতেন। এই উপলক্ষ্যে আগে থাকতে কয়েক মণ চাল, মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু প্রভৃতি সংগ্রহ করে রাখতে হত। মা প্রভৃতি অম্লানবদনে তাঁদের যত্নাদিতে কঠোর পরিশ্রম করে যেতেন। ঠাকুরদা সর্বদাই তাঁদের সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ওই ক'দিন মনে হত আমাদের বাড়ীটাতেও যেন নাম সংকীর্তনের ঘটা চলছে।

পরিশেষে,—দাতুর হৃদয়টি ছিল এক অপূর্ব ধরণের। কখন মনে হত নারকেলের মত ভেতরে শাঁশ ও জল, উপর ভীষণ শক্ত,—কখন মনে হত নেংড়া আমের মত ছোট আঁটিটিই শক্ত,—আবার কখন মনে হত পাকা আঙ্গুরের মত সমস্তটাই রসে টুব্‌টুব্‌। অর্থাৎ একাধারে ছিলেন কঠোর কর্তব্যপরায়ণ—নির্ভীকব্যক্তি, হৃদয়ের দিক দিয়ে ছিলেন দয়া-মায়া, মমতার প্রতিমূর্ত্তি, আবার হাসি-তামাসায় ছিলেন অদ্বিতীয়।

সুরের পথে জীবন যাত্রায় তিনিই ছিলেন আমার প্রধান দিক নির্ণয় যন্ত্র এবং শক্তি সঞ্চারক॥

(৭)

বাল্যকালের আর এক অধ্যায়,—

তিনের কম বয়স থেকে আট পর্যান্ত সময়ের মধ্যে আমাকে দাদামশায় কিংবা দিদিমা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুদিন করে তাঁদের মান্দারবনী গ্রামে রেখে দিতেন। মা অতি সহজেই ছেড়ে দিতেন।

এই গ্রামটির চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভা বেশ আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। পশ্চিম দিক হতে উত্তর পার্শ্ব ধরে পূর্ব কোণ পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শালতরুরাজীর বনানী দৃশ্য দূর হতে দেখলে মনে পড়ে যায় কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের রচিত রঘুবংশের সেই স্থানটির কথা, যেখানে আছে লেখা,—"দূরাদয়শ্চক্র নিভস্যতন্বী তমালতালি বনরাজী নীলা···।" গ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণে আছে পাহাড় ভঙ্গিমার মত উঁচু নীচু ধানের ক্ষেত ও প্রান্তর। সেখানে দাঁড়ালে মনে হয় যেন কোন ব্যথা কাতর উদাসীর ব্যাকুল সুর অলক্ষ্যে সর্বদা রণনীত হচ্ছে। তখন কামনায় আকুল মন খুঁজতে থাকে তার স্বরূপ সন্ধান কোথায়!

এখানের বৃহৎ গ্রামটিতে ব্রাহ্মণের বাসই সমধিক। আগে এই গ্রামে অনেক বিষয়েই ছিল সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয়। মানুষদের মধ্যে বিশেষ করে ছিল অনাবিল আমোদ-প্রমোদ মন। রাগসংগীত, যাত্রার আখড়া, দাবা, পাশা, ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী ছিল।

গ্রামের ৺দোলপর্ব, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও উৎসবে বেশ একটা আদর্শ নীতিধারার উপর মৌলিকত্ব দেখতে পাওয়া যেত। ৺দোলের দিনে এই অঞ্চলের থানার সমস্ত গ্রামের ব্রাহ্মণদের এবং গ্রামের সমস্ত লোককে অন্নের সহিত বিবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা পরিতোষ সহকারে খাওয়ান হত। এই খাওয়ানর চালের খরচ হত যার মনের উপর। তিনদিন ধরে আদর্শমূলক উপাখ্যানের মাধ্যমে যাত্রার পালা গান হত এবং তার সংগে কৃষ্ণযাত্রা ও কীর্ত্তন গান ইত্যাদি। আমার উপস্থিতিতে বৈঠকী গানেরও আসর হত। এই গানের উপর আগ্রহ ও বোধশক্তি গ্রামের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই ছিল।

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রভাব আমাদের দেশের সমস্ত গ্রামকেই আকৃষ্ট করে রেখে ছিল।

এখানের ৺দুর্গাপূজায় দেখেছি আবাহন থেকে বিসর্জন পর্যান্ত নানান সময়ে রাগসংগীতকে ধরে গীতাদির পরিবেশন। গাইবার মত কণ্ঠ প্রায় সকলেরই ছিল। এখনও সবই আছে তবে অন্য চেহারায়। কারণ মানুষের অন্তর, রুচি ও চেহারা সর্বত্রই পাল্টে যাচ্ছে।

এই গ্রামে ন্যায় অন্যায়ের বিচারের কাজ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই করে এসেছেন। আমার দেখা, এই সব বিচার কার্য্যে আমার দাদামশায় হতেন প্রধান বিচারক।

এই বিচার বিষয়ের একবার একটা ঘটনার মনে পড়ে,—গরীব জাতের এক বুড়ির একটি বড় রকমের ছাগল ছিল, ছাগলটা হারিয়ে যাওয়ায় তন্ন তন্ন করে বুড়ি খুঁজতে থাকে,—অবশেষে একটা ছেলে একটা বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে - দুপুরে এই বাড়ীতে ছাগলটা ঢুকেছিল কিন্তু তাকে বেরিয়ে আসতে দেখি নাই। বুড়ী সেই বাড়ীর লোকজনদের জিজ্ঞেস করে—কিন্তু তারা জানি না বলে। বুড়ী লক্ষ্য করল উঠানের চার-পাঁচটা বড় লঙ্কা গাছ একেবারে পাতা শূন্য। ছাগলটা এই বাড়ীতেই এসেছিল এবং পালাতে পারেনি এ ধারণা রেখে আমার দাদামশায়কে সমস্ত কথা জানায়। তিনি চৌকীদারকে ডাকিয়ে তাকে নির্দ্দেশ দেন

গ্রামের অন্যান্য বিচারকদের খবর দিতে তাঁরা যেন শীগগীর আটচালায় বিচারালয়ে আসেন এবং সেই বাড়ীর গৃহমালিককে ডেকে নিয়ে আসে। খবরটা রাষ্ট্র হয়ে পড়ায় আটচালায় বেশ ভীড় জমে যায়। গভীর সন্দেহ নিয়ে সেই গৃহ মালিককে নানানভাবে নরম-গরম জেরা চলতে থাকে। তার কাছ থেকে অস্বীকারের ঢোকগেলা উত্তর আসতে থাকায় দাদামশায় তার উপর শেষ দাওয়াই প্রদান করলেন। অর্থাৎ উঠে গিয়ে ঘাড় ধরে পিঠে একটি বজ্রকিল্ প্রদান করে বললেন শীগ্গীর্ সত্য কথা কবুল কর নচেৎ এই রকম খাদ্য আবার পিঠে পড়বে। সে প্রথম ওষুধেই বাবারে করে উঠেছিল—দ্বিতীয়র ভয়ে বোকা শুড়ি বলে ফেল্লে—গাছ খেয়ে দেওয়ার রাগ সহ্য করতে না পেরে ছাগলটার গলাচুমড়ে মেরে দিয়ে খড়ের গাদার মধ্যে রেখে দিয়েছি। লোকে নিয়ে এল মরা ছাগলটাকে। দণ্ড হল মাটির উপর দু' হাত নাক ঘসা, ছাগলের সম্পূর্ণ দাম বুড়ীকে দেওয়া এবং "শ্রীদুর্গামাতার পূজায় পাঁচ টাকা।

সভাভঙ্গ হল এবং যে যার গৃহে চলে গেল। দাদামশায় আসামীর হাত ধরে বাড়ীতে সস্নেহে নিয়ে এসে দিদিমাকে বললেন—একে ভাল করে দুধ-চিঁড়ে-গুড় দিয়ে ফলার করাও। দিদিমা বল্লেন—লোকের ছাগল খুন করেছে যে সেই পাজি-নচ্ছারকে আবার আদর করে খাওয়াতে হবে? দাদামশায় বললেন—ও যা অন্যায় করেছে তার তো যথাযথ বিচার হয়ে গেছে কিন্তু আমি যে ওকে ভীষণ মেরেছি—তারজন্য যে খুব মন কেমন করছে! আমি যে সত্যই নিষ্ঠুর নই—সকলকেই ভালবাসি—সেটা ও বিশেষ করে বুঝতে পারবে যত্নকরে খাওয়ানর মধ্যে। মানুষকে যত্নকরে খাওয়ানর অনেক গুণ আছে।"

লোকটা বিপুল মাত্রায় খাওয়া সেরে দাদামশায় ও দিদিমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চোখ মুছতে মুছতে বল্ল—জীবনে কখনও সে অন্যায় কাজ আর করবে না। লোকটা সত্যই দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল কিন্তু সেই থেকে সম্পূর্ণ বদলে যায়।

দাদামশায় ছিলেন বিরাট এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, দূর দূরান্তরের গ্রাম সমূহের অধিবাসীদের নিকটেও তিনি বিশিষ্ট গণ্য-মান্য রূপে পরিচিত ছিলেন, উমেশ চক্রবর্ত্তীর নামে সবাই, শ্রদ্ধা জানাত। পল্লী-অঞ্চলে এ রকম ব্যক্তির অভাব তখন ছিল না। অর্থাৎ মুখোশপরা মানুষ প্রায় দেখা যেত না। গ্রামের এখন অনেকেই বিদেশবাসী হয়ে নকল সভ্যতার রপ্ত

হয়ে পড়েছে এবং তার সংগে এসেগেছে দারুণ স্বার্থপরতা। যে কোন সুযোগের মাধ্যমে স্বচ্ছল মানুষদের মধ্যেও প্রতারণার দ্বারা অর্থ আহরণের নিকৃষ্টস্পৃহা এসে গেছে। এজন্য বুঝা দায় সত্যই কাকে মানুষ বলা যাবে। এ কথা আমি নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিয়েই জানালাম।

দাদামশায়ের আর একটু পরিচয়—তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশেষ বোদ্ধা ও অনুরাগী ছিলেন। মোটামুটি গাইতেও পারতেন। বাহার, ভীমপলশ্রী, এবং কানড়া—এই তিনটি রাগ তাঁর খুবই প্রিয় ছিল, এগুলির খেয়াল গান প্রায়ই কণ্ঠে তুলতেন। তাঁর হাতের সেতারটি আমাকে দেওয়ায় প্রথম শিক্ষায় খুব কাজে লেগেছিল।

এঁর স্বাস্থ্য ও গঠন ভারি সুন্দর ছিল। শুনেছি ইনি যখন তাঁর নিজস্ব ঘোড়ায় চড়ে যেতেন তখন সে দৃশ্য খুবই দর্শনীয় হত।

ওই গ্রামে বাল্যকালে থাকার সময় কৃষিকার্যের অভিজ্ঞতাও কিছু পেয়েছিলাম। সেখানের প্রাকৃতিক নানান মুগ্ধকর দৃশ্য আমার অন্তরের সংগীতকে জাগ্রত করে তথায় টেনে নিয়ে সাধনায় নিযুক্ত করত। বনানীর মর্মরধ্বনি মনে হত যেন সুরের স্বরূপ পাবার আহ্বান জানাচ্ছে। সাত আট বছর বয়সের সময় বনের ধারে গিয়ে রাখাল বালকদের সংগে খেলা করতাম, তাদের গ্রামীণ গানের সংগে আমিও গলা মিলাতাম। গ্রামের বাউল, ঝুমুর প্রভৃতি গান আমার মনকে মাতিয়ে দিত। বাল্যকাল হতে শুনা এই সব গানের সুর ও ভাব সংগীতের ভাবরাজ্যে যাওয়ার পথ দেখিয়ে এসেছে। ওখানে যে সময় অনেক দিন ধরে থাকা হত সে সময় দাদামশায় পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিতেন। তখন পাঠশালায় লেখা-পড়ার ব্যয় অতি সামান্যই ছিল। ঘরে কালী তৈরি করে নিয়ে শরের কলমে তালপাতায় লেখার কাজ হত।

দড়িতে ঝুলান মাটির দোয়াত, পাততাড়ি, বসার চাটাই এবং বই, এগুলি নিয়ে পাঠশালায় যাওয়া হত। পরিধানে থাকত ছোট কাপড়। তখন শিশুদের পেণ্ট, ফ্রক, বিলেতী ধরণের খাদ্য ইত্যাদির প্রচলন একেবারেই ছিল না। সম্পূর্ণ বাঙালীত্ব বজায় ছিল।

এখন ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই এমন ধরণ-ধারণ সংক্রমিত হয়েছে যা দেখে মনে হয় তারা নিজেদের বাঙালী বলতে চায় না। অপরের দৃষ্টিকটু অনুকরণে নিজেদের সব কিছু কৃষ্টির উপর যে আঘাত আসে এবং ধারাবাহিক গৌরব নষ্ট হতে থাকে সে কথা কেউই ভাবতে

চায় না। প্রত্যেক জাতি যদি নিজেদের সব কিছু বৈশিষ্ট্যে, নীতি-ধারায় এবং ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে না চলে তাহলে তার কি থাকবে? নিজেদের কৃষ্টি গৌরবের দিকে না তাকিয়ে আমরা পরভক্ত হব কেন?

যাক এ সব কথা—তখন বিশেষ করে গ্রাম্য পাঠশালায়—সূর্য্য উদয়ের পূর্বে উপস্থিত হতে হত। এ নিয়মটি স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। এই নিয়ম রক্ষা না করে পাঠশালায় বিলম্বে এলে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল। সূর্য্য উদয়ের সময়ে পাঠশালার গৃহ সম্মুখের ফাঁকা জায়গায় বসে মুক্তবায়ুর মধ্যে পড়াশুনা করতে হত।

আমার বয়স যে সময় পাঁচ বছরের-মত ছিল সে সময়ে একবার দাদামশায়ের ওখান থেকে বাড়ী আসবার সময় নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিলাম। তার পরিচয়,—অনেক দিন আছি বলে বাবা এলেন দেখতে। যেদিন তিনি বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন সেদিন আমিও তাঁর সংগে যাব বলে তাঁকে আঁকড়ে ধরে রইলাম। সকলেই বুঝলেন না গিয়ে ছাড়বে না। সে সময় চাষ-বাসের মরশুম—সুতরাং গো-গাড়ী পাওয়া গেল না। বাবা বল্লেন ষ্টেশনে পৌঁছতে ন মাইল রাস্তা আমি কি করে নিয়ে যাব! আমি বললাম—হেঁটে যেতে পারব, আমি যাবই···। মাঝে মাঝে মা, বাবার জন্য ভীষণ মন কেমন করত।

খুব সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দিদিমা আমাকে কোলে করে অনেক দূর পর্য্যন্ত এলেন, তার সংগে দাদামশায়ও। তখন খুব দুধ খেয়ে শরীর আমার বেশ মোটা ও শক্ত হয়ে গেছল। দিদিমার শরীর বলেই এতদূর কোলে করে আনতে পেরেছিলেন।

মাইল খানেক এই রকমভাবে এসে, তারপর দাদামশায়দের ছেড়ে আমি হাঁটতে সুরু করলাম বাবার সংগে দ্রুতপদে। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন দেখতে পাওয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। বনের রাস্তা ধরে চলতে চলতে খানিক পরে একটা ফাঁকা জায়গায় খুব বড় বটগাছের তলায় অল্পক্ষণ বিশ্রামের জন্য বাবা বসালেন এবং বললেন একটা গান কর। গান ধরতেই অল্প দূরে যারা গরু ছাগল চরাচ্ছিল তারা ছুটে এসে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে শুনতে লাগল।

যে কোন গানে বা যন্ত্রেই হোক্ শ্রোতারা যদি এ রকমভাবে আগ্রহের সহিত এসে তন্ময় হয়ে শুনে তবেই তাদের মধ্যে থাকে সত্যিকারের শোনার ইচ্ছা ও নিষ্ঠা।

সূর্য্য প্রায় মাথার কাছে আসার সময় ষ্টেশন গ্রাম ওন্দায় এসে গেলাম এবং রেলের বাঁশীর শব্দ দূর থেকে কাণে এল। বাবা আমাকে দৌড়ানর মত করে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন ট্রেন ধরবার জন্য কিন্তু ষ্টেশনের একেবারে কাছে যখন পৌছলাম সেই মুহূর্ত্তেই ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

বাবা ধারে-পাশের কৃষিজীবিদের বাড়ী গিয়ে অনেক বলা সত্ত্বেও চাষের সময় বলে কেউ রাজি হল না গোরুর গাড়ী ভাড়ায় যেতে। গ্রাম সদরের উপর একটা খাবারের দোকানে মুড়ি, তেলেভাজা ইত্যাদি কিনে দিলেন,—সকালের দুধ-চিঁড়ের উপর তাদের উদরে স্থাপন করলাম পরম তৃপ্তি নিয়ে।

খাওয়া যেমনি সারা হয়েছে ওমনি বাবা দেখতে পেলেন—দু'জন তাঁর পরিচিত ব্যক্তিকে, তারা তাদের বাড়ী-বিষ্ণুপুরের দিকেই যাচ্ছে, গেছল বাঁকুড়া। বাবা তাদের বললেন—তোমরা আমার এই ছেলেকে সংগে নিয়ে যাও, এখানের পোষ্টমাষ্টারের কাছে একটু বিশেষ দরকার আছে—সেটুকু সেরেই এক্ষণি তোমাদের সঙ্গ নেব। বাবার আদেশে তাদের সংগে হাঁটতে সুরু করলাম।

পা' দুটোর অবস্থা আগেই কাহিল হয়ে পড়েছিল—আবার তার উপর ভীষণভাবে পীড়ন সুরু হল। সংগের লোক দু'জন আমার জন্য যতটুকু মন্থরগতিতে চলছিল তাই আমার পক্ষে মারাত্মক দ্রুত বলে মনে হচ্ছিল। আমি পিছিয়ে পড়তে থাকি—আর তারা খানিকটা দূর থেকে হাঁক দিতে থাকে 'খোকা তাড়াতাড়ি এস' এই বলে।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে থাকি—আর পিছন ফিরে তাকাই বাবা আসছেন কি-না। প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত অবস্থায় কেঁদে কেঁদে এবং দৌড়ানর মত হেঁটে ন' মাইল রাস্তা কোন রকমে পেরিয়ে বাড়ীতে পৌছেই উঠানে আছড়ে পড়ে অজ্ঞানের মত হয়ে গেছলাম। তিন চার দিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল, পা' নিয়ে উঠতে পারিনি।

সেই সময়ের কিছুকাল পূর্বে ৺কাশীধামের বিখ্যাত হটযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট ওই যোগের ক্রিয়াতে বাবা দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর যোগে বসবার সময় উপস্থিত হয়ে পড়ায় পরিচিত পোষ্টমাষ্টারের গৃহে যেতে হয়েছিল। আমি পৌছবার অল্পক্ষণ পরেই বাবা হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকলেন এবং সেই পরিচয় দিয়ে বললেন—আমার যোগ ভাঙতে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য ছেলেটাকে এত

কষ্ট পেতে হল, আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে এসেও ছেলেটাকে রাস্তায় ধরতে পারলাম না।”

বাড়ীর সকলের কাছেই খুব বকুনি খেলেন। তখন তাঁর সেই লজ্জা-কাতর মুখ দেখে আমার শরীরের ওই অবস্থাতেও তাঁকে ভৎর্সনা করা দেখে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল এবং দুঃখে ও মায়ায় মন ভরে গেছল।

বাবা কাছে এসে বেদনাক্লিষ্ট মন নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আমার চোখ দিয়ে তখন জল আর থামে না॥

(৮)

ঘরওয়া পণ্ডিতী বিদ্যা—ও ধ্রুপদ খেয়াল শিক্ষা সম্বন্ধে-

প্রায় তিন বছর বয়স থেকে আট বছর পর্য্যন্ত একটু একটু করে লেখা-পড়ায় ও গানে এগোচ্ছিলাম, তারপর ওই দুটোর সংগে যুক্ত হল সংস্কৃত বিদ্যার সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের পাঠ মুখস্থ করা। বংশগত এই বিদ্যাটির ধারা বজায় রাখার ব্যবস্থা আমার উপরই ধার্য্য হয়েছিল। অগ্রজকে অগ্রজের পদমর্য্যাদা দিয়ে তাঁকে আগেই হাইস্কুলে ভর্ত্তি করান হয়। মনে হত ভবিষ্যতে বড় রকম চাকরী পেয়ে পদমর্য্যাদায় অসীন হবেন। কর্ত্তারা বুঝেছিলেন সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি কদর ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। ইংরেজী লেখাপড়া ও চাকরী, এই দু'টোই তখন থেকে প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেছল। যাই হোক্,—সংস্কৃত বিদ্যা আমার দখলে এলে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ সহজ হয়ে যেত কিন্তু ওই বয়সে অতবড় জটিল বিদ্যাকে অধ্যয়নের দ্বারা আয়ত্তে আনার জন্য মোটেই আগ্রহ ও আকর্ষণ আনতে পারিনি,—তাই বংশধারার ওই বিদ্যাটির স্রোত নিষ্ফল হয়ে শুধু আমার মনের বাইরে দিয়েই ভেসে গেছল। তার স্রোত ভিতরে তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারল না। এখন মনে হয় সঙ্গীতই বোধ হয় তার চতুর্দিকে উঁচু বাঁধ তুলে রেখে দিয়েছিল,—তাই চুয়িয়ে চুয়িয়ে সামান্য মাত্রই যেতে পেরেছিল।

পুঁথি খুলে বাবা কিংবা দাদুর কাছে পড়তে বসার সময় এক একবার যখন অনুঃস্বার, বিসর্গ মিশ্রিত নিরস বস্তুগুলো পড়তে বিরক্তি এসে যেত তখন গলায় সুর খুঁজতে গিয়ে মুখের আওড়ান শ্লোক বন্ধ হয়ে যেত। সেই মুহূর্তে সামনে যিনি গুরুরূপে বসে থাকতেন তিনি আমার পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মস্তকে, গণ্ডে বা পৃষ্ঠে বেশ একটি বিরাট ওজনের খাদ্যবস্তু প্রদান করতেন। সেই ভীষণ উপাদেয় খাদ্য লাভের পর আমার মনঃসংযোগের ক্রিয়া কতখানি কার্য্যকরী হত তা ভগবানই জানতেন, তবে অক্ষরগুলো যে তখন সবই ঝাপ্সা দেখাত নিষ্ঠুর চোখ দু'টা হতে জল ঝরে—তা এখনও বেশ মনে পড়ে।

সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষায় অযত্ন ও অবহেলা থাকায় টোলের ছাত্রদের এবং গৃহপরিজনদের কাছে বড় কম গঞ্জনা পেতে হত না। কারণ—এইটাকেই আমার জন্য প্রধান ভেবে নেওয়ায় গানের দিকটাকে গৌণ ভাবা হত। তাই তাঁরা বলতেন—ওর কিছু হবে না, একেবারে গণ্ডমুর্খ হয়ে থাকবে এবং অবশেষে বামুনের ছেলে পাচক-বৃত্তিই করতে হবে।

এত বড় আশীর্বাদ নিষ্ফল হবেনা জেনেও ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার পাঠক্রম শেষ করার দিকে 'তিগন্ত মূলের' অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছলাম শাসনের মধ্যে দিয়ে দশ বছর বয়েসেই। এই বিদ্যাটিকে আয়ত্তে আনবার মত বয়সটা যদি উপযোগী হত তাহলে হয়ত অতখানি জিনিষ পরিপাক করতে পারতাম। গানের দিকটায় বরং তখনই বাবার কাছে শিখে অনেকগুলি ধ্রুপদ খেয়াল আয়ত্তে আনতে পেরেছিলাম এবং নিয়মিত সাধনার জন্য কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হত না।

আগেরটির উপর অত সময় যদি ব্যয় না হত তাহলে সংগীতে বাবার কাছেই আমি আরো অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতাম এবং তৈরির উপরও। অনিচ্ছুক মনের উপর ইচ্ছার জোর চালান সম্বন্ধে—আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে; সত্যপীর বলে আমি সিন্নী নাহি খাব, বামুন ঠাকুর বলে আমি মুখে ঠেলে দেব।" মানুষ গড়ার বিচার আমাদের এই রকমই বেশী হয়। যার যেদিকে নিষ্ঠা আগ্রহ সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আবার দৃষ্টি দিলেও অনেকে নিতে চায় না। তবে আমার অদৃষ্ট সংগীতের দিকেই বরাবর সুপ্রসন্ন ছিল,- তাই ছ' বছর বয়স থেকেই আমি নানান আসরে ধ্রুপদ -খেয়াল গেয়ে আসতে পেরেছিলাম।

তখন আমাদের দেশে যে কোন ক্রিয়াকর্মে ধ্রুপদ গানের আসর হতই।

বড় বড় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে দাদু, বাবা কিংবা কাকার সংগে পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এঁরা পণ্ডিতের মান্য পেয়ে নিমন্ত্রিত তো হতেনই তাছাড়া গানের আসরের জন্যও পৃথকভাবে আহ্বান লিপি থাকত।

এইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দেখতাম—বিরাট মণ্ডপের তলায় ফরাসের উপর বসে এক স্থানে বড় বড় উপাধিধারী পণ্ডিতরা তর্কশাস্ত্র নিয়ে আলোচনায় মেতেছেন। তর্কের মূল বস্তুটির কথা এখনও মনে আছে—"পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ··· ।"

আর এক স্থানে দেখতাম—বিখ্যাত দাবাড়ীরা দাবা যুদ্ধে মেতেছেন। আর একটি বিশেষ জনসমাগমের মধ্যে চলেছে ধ্রুপদ গানের আসর। সে যুগের ধ্রুপদ গায়ক ও পাখোওয়াজীদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হতেন—ক্রিয়া অনুষ্ঠাতাদের একান্ত আগ্রহে ও শ্রদ্ধা-যত্নাদির ব্যবহারিক আকর্ষণে। দেখেছি কোন কোন প্রবীন গায়ক স্থানের দূরত্ব হেতু দু'দিন ধরে গো-গাড়ীতে চড়ে আসরে উপস্থিত হয়েছেন।

সাধারণ অনুষ্ঠানেও দেখা যেত বেশ কয়েকজন ধ্রুপদ গায়কের উপস্থিতি। গানের সাধনায় এঁদের ধ্রুপদই ছিল প্রধান হয়ে এবং তার উপরই তাঁদের পরিচয় বিখ্যাত হয়েছিল,—কিন্তু এঁরা হিন্দী ও বাংলা খেয়াল, শ্যামাসংগীত, ভজন প্রভৃতি গানও ভালই গাইতে পারতেন।

সবচেয়ে বেশী করে আমার মনে আছে এঁদের সরল ব্যবহার নির্দলীয়মন এবং মহৎ অন্তঃকরণ। আমার পরিচয় পেয়ে সর্বাগ্রে আমাকে এঁরা গাইতে দিতেন। তখন গানের সময় তানপুরা ছাড়া আর অন্য কোন সাহায্য নেওয়া হত না। তানপুরা নিয়ে গাওয়ার উপরই যে গাওয়া গান সত্যিকারের উপভোগ্য হয় বিঘ্ন আসে না এই বিচার বোধ তাঁরা রেখে চলতেন।

সেই বয়সে গান শুনার সময় দেখতাম কোন কোন ধ্রুপদীর গায়কীতে গমক-মীড়েরই প্রাচুর্য্য বেশী। কারো কারো মধ্যে থাকত কথার স্পষ্টতা ও সুরের মাধুর্য্যই বেশী, আবার কারো কারো গানে পাওয়া যেত সোজা-সোজা ধরণের গায়কী এবং ছন্দের বিভিন্ন কৌশল। এইসব ভিন্ন ভিন্ন গায়কী ধারার প্রমাণ পেয়ে পরে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, এইসব শ্রেণীগত গায়কীর গান পশ্চিমের বহু বিখ্যাত ঘরাণার মাধ্যমে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এসেছিল এবং বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছিল এক অপূর্ব নজিরের

মত। তার প্রমাণ পরিচয় দিয়ে গেছেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গুণী ও দিক্‌পাল বিশেষ গায়ক ও যন্ত্রীগণ—যথা,—শ্রীধর, ঈশ্বরচন্দ্র, গদাধর, রামশঙ্কর, যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহন, অনন্তলাল, রামকুমার, শ্রীপতি, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, অম্বিকাচরণ, রাধিকাপ্রসাদ, গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি। গানের দিকে জ্ঞানেন্দ্রও উচ্চ গায়কীর অধিকারী ছিল। এই সমস্ত দক্ষ শিল্পীর শিক্ষকতার মাধ্যমে বিশেষ করে বাংলার অধিকাংশ স্থানে বহু গায়ক, যন্ত্রীর সৃষ্টি হয়ে এসেছে। চর্চারত প্রায় সকলের মধ্যেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার সংযোগ আছে। আমাদের দেশে অর্থাৎ মল্লরাজত্বের চতুষ্পার্শ্বে ধ্রুপদাদি গানের চর্চার কিরূপ বিস্তৃতি ঘটেছিল তার পরিচয় তখনও যা পেয়েছিলাম তা অতীব বিস্ময়কর। গণনা করলে সহজেই পাওয়া যেত শ'খানেক ধ্রুপদ গায়ক এবং তদনুপাতে পাখোওয়াজী, যা এখন বিপুল প্রচারের উপর গুণানুসারে এত সংখ্যক খেয়াল গায়কও সারা ভারতে হয়ত পাওয়া যাবে না। বাল্যকালে আমাদের দেশের বহু পল্লীতে যাতায়াত করে দেখেছি অন্ততঃ একটা করেও তানপুরা—পাখোওয়াজ থাকতে এবং তার সংগে এসরাজ-সেতারও। ও গুলিকে ব্যবহারের উপযোগী গায়ক-বাদকও থাকত।

এইসব পরিচয়ের মাধ্যমে যে সব প্রমাণ পেয়েছি তাতে এই কথাই মনে আসে—শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাবাহিকতার প্রভাবে তখনকার মানুষের এর প্রতি কত বেশী অনুরাগ ও আগ্রহ বেড়ে উঠেছিল। এ স্থলে শাস্ত্রীয়-সংগীত বলতে আমি ধ্রুপদ গানের প্রচারের কথাই জানাচ্ছি। তখন এই গান শুনে শুনে তার সুরের বিশুদ্ধ প্রভাব ও রচনার ভাবরূপ মানুষের মনকে বড় করে তুলারও সহায়তা করেছিল। সেই ধ্রুপদ গানের উপর এখন দারুণ উপেক্ষার ভাব দেখে খুব দুঃখ আসে। ধ্রুপদের মত শাস্ত্রীয় সংগীতের এত বড় বিরাট বস্তু ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন গান,—যে গানের এক একটির মধ্যে থাকে সাধনার উদ্দেশ্যের সম্বল—অর্থাৎ রাগরূপের সত্যকে ও বিজ্ঞানকে ধরে সাধন ভজনের উপযোগী বাণী—যথা—'তুহি ভজ ভজরে মন বাসুদেব নারায়ণ···।' 'তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা-বিষ্ণু···।' 'তুঁহি আদি,—তুঁহি মন্ত্র—তুঁহি সৃষ্টি—তুঁহি অনন্ত···।' 'নাদ পরম বিদ্যা দেহি ভবানী···।' তুঁহি জগত গুরু তুঁহি পরমেশ্বর···। ইত্যাদির মত ধ্রুপদ গানকে রাগ সংগীতের চর্চায় ত্যাগ করা সঙ্গীতকে ধরার অর্থে কি করে সম্ভব হয়, এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের জনকের প্রতি এই অবজ্ঞা কেন

এল তা বুদ্ধি দিয়ে বিচারে আসে না।

খেয়াল গায়কদের মধ্যে অনেকে বলেন—সঙ্গীতের সুরই সর্বস্ব,—সেই সর্বস্ব সুরের স্বরূপ সন্ধান একমাত্র খেয়াল গানেই পাওয়া যায়, তাই সুর ও শিল্পে সর্বস্ব খেয়াল গানই শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়ে, চর্চায় এত আগ্রহ এসেছে। আমি বলব, গান বস্তুতে সুর সর্বস্ব এই কথা প্রযোজ্য হয় না, কারণ গানে থাকে সুরের সংগে তাল-লয় ও বাণী। সুর ও লয়কে ধরে ছন্দে আবদ্ধ হয়ে যে ভাববস্তু বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকেই গান বলে। গান মানে শুধু সুর—তাল নয় বা শুধু সুর সর্বস্ব নয়। একমাত্র আলাপচারীতেই আছে সুর সর্বস্ব বস্তু। কারণ সে তাল ও বাণীর অধীন নয়—স্বয়ং সম্পূর্ণ। একমাত্র সুরের মহিমাকেই প্রদর্শনের জন্য সাধনায় যদি রাখতে হয় তাহলে শুধু আলাপকেই ধরে থাকতে হবে। খেয়াল সম্বন্ধে একটি প্রমাণযোগ্য কথা,—খেয়াল গানের সৃষ্টির মূলে এবং পরে তার মধ্যে হলক্, গমক এবং তানাদি ব্যবহারের সন্ধান এসেছে ধ্রুপদের খাণ্ডারবাণীর গানের ওই সব বস্তুর প্রকাশ থেকে এবং বড় গায়কীর ধ্রুপদ থেকে বিস্তারের ক্রিয়া। অর্থাৎ ধ্রুপদের মধ্যে সব বস্তুই আছে, কেবল তার প্রয়োগ হয় কথাকে ধরেই বেশী। ধ্রুপদের কথা ও সুরের উপর দুন, ত্রিগুন, চৌগুন, ষটগুন প্রভৃতি যখন গমককে ধরে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণ্ঠে প্রকাশিত হয় তখন সেই বস্তুকে যদি খেয়ালের পদ্ধতি মত একটা অক্ষরকে নিয়ে বা বোলতানের উপর দেখান যায় তাহলে খেয়াল গানের এক অপরূপ তানে পরিণত হবে। তা ছাড়া ধ্রুপদে বাঁটওয়ারার বিভিন্ন ছন্দ বৈচিত্র্য তো আছেই।

আলাপের নীতি-নিয়মে চারপদীর ক্রিয়াজ বস্তু এবং তার বিস্তার রচনার সব কিছুই ধ্রুপদাঙ্গের রূপ থেকে এসেছে। খেয়ালের সম্বন্ধেও ওই কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, শুধু সুর নিয়েই নয় তার তালাদি নিয়েও।

ধ্রুপদের দীর্ঘ চারপদীর গান এক একটা রাগের পাঁচ ছটা করে যদি জানা থাকে তাহলে রাগের উপর বিরাট দখলই শুধু থাকবে না। তার সঙ্গে জ্ঞানের সীমাও বর্দ্ধিত হবে এবং তার প্রভাব তত্ত্ব উপলব্ধি হবে।

খেয়াল ও ধ্রুপদ একসঙ্গে চর্চায় যাঁরা রাখতে পারবেন তাঁদের কাছেই আমার এই মন্তব্য যথাযতভাবে উপলব্ধি হবে।

আমার নিজের কথায় বলতে পারি শতাধিক বাংলা খেয়াল পঞ্চাশের বেশী রাগের উপর এবং আরো অধিক সংখ্যক রাগের উপর বিলম্বিত ও

দ্রুত অঙ্গের প্রায় দু'শ হিন্দী- খেয়াল এবং আরো অন্যান্য বহু গান ও গৎ রচনা যে করতে পেরেছি, নূতন নূতন বন্দেজের উপর সুর সংযোগ করে তার সেই শক্তিটুকু পাওয়ার মূল কারণ প্রত্যেক রাগের অনেকগুলি করে ধ্রুপদ জানা। ধ্রুপদ জানা না থাকলে সংখ্যায় এত বাড়াতে পারতাম না।

মোটের উপর শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চায় ধ্রুপদকে বাদ দিলে বহু অভাব থেকে যাবে।

আমি বাল্যকাল থেকে ধ্রুপদ ও খেয়াল সমভাবে চর্চায় রেখে এসেছি বলে বিশেষরূপে জানি ওই দু'টির প্রত্যেকটির প্রভাব ও স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার কিরূপ থাকা উচিত এবং প্রয়োজনীয়তা কত। আমি শুধু চর্চাতেই রেখে আসিনি, ওই দুটিকেও পরিচয়ে রেখে এসেছি অতি কম বয়স থেকে, বড় বড় আসরে, কন্‌ফারেন্স সমূহে এবং রাজা, মহারাজাদের দরবারে। এবং তার সংগে সেতার,—সুরবাহারও। সুতরাং বিচারগতভাবে গীত-বাদ্য বিষয়ে আমার মন্তব্যের গুরুত্ব থাকবে বলেই মনে করি।

শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীতের চর্চার সংগে যন্ত্রের অর্থাৎ বীণা, সুরবাহার ও সেতারের মত যন্ত্র চর্চায় রাখলে শিল্প রচনায় অনেক উপকার হয়। তেমনি একথা যন্ত্রের চর্চার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দুইটিই পরস্পরের পরিপূরক। এখানে যন্ত্রের জন্য কণ্ঠ সংগীতকে বুঝতে একমাত্র ধ্রুপদ গানকেই বুঝাবে। ধ্রুপদ খুব ভালভাবে না জানলে যন্ত্রে আলাপ করার সময় যথাযথ নিয়মের উপর স্বর বিস্তারের ক্ষমতা আসবে না। এজন্য ধ্রুপদের ভাবমূর্ত্তি ও তার স্বর সংযোজনা কণ্ঠে অধিগত হয়ে থাকা একান্ত আবশ্যক। খেয়াল সম্বন্ধেও একথা নিশ্চয় করে বলা যায়। ৺কাশীর জমীদার বিখ্যাত বীণবাদক শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে বলেছিলেন—"ভাল গায়ক হতে হলে যন্ত্রে অধিকার থাকা যেমন দরকার তেমনি ভাল যন্ত্রী হতে হলে গানেও সমধিক অধিকার থাকা আবশ্যক। আমি প্রথমত: আট বছর ধরে সমানে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করে তারপর বীণবাদ্য শিক্ষা করি।"

শিবেন বাবুর বীণবাদন শুনে তাঁর মন্তব্যের সত্যতার সম্যকভাবে উপলব্ধি হয়েছিল। বড় বড় বীণবাদক ও সুরবাহার—সেতার বাদকদের বাদন ক্রিয়া বাল্যকাল থেকে শুনে বুঝেছিলাম তাঁরা ধ্রুপদের চর্চা ভালভাবে করেছিলেন। তেমনি আলাপ ও খেয়াল গায়কদেরও তাঁদের সাধনার বস্তু পরিবেশনের সময়ও ধরতে পারা যায় সেতার,—সুরবাহার বা বীণার উপর অধিকারের কথা। এ ছাড়াও তাল বাদ্যের উপরও ভালভাবে

অধিকার রাখতে হয়—ছন্দাদি ক্রিয়ার জন্য।

ধ্রুপদ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা, এই গান গাওয়ার পূর্বে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার উপর আলাপ বস্তুকে প্রকাশের সময় সাধনার চরম শক্তি নিয়ে তার চার অংশের উপর যথা নিয়মে বিলম্বিতগতিতে বিস্তার এবং পরে ক্রমশঃ অতি দ্রুত গতির উপর রাগরূপ যখন রচিত হয় তখন তার সামগ্রিক বিস্ময়কর চিত্ররূপকে ছাড়িয়ে যাবার মত কোন আর অন্য বস্তুতে পাওয়া যাবে না—একমাত্র অংক শাস্ত্রের অর্থাৎ তালাদির অধিকার ছাড়া। অতি দ্রুতগতিতে তে-রে-নে-রি কথার উপর স্বরের উঠা-নামা ইত্যাদি বস্তু সমূহকে গলায় আনা খেয়ালের দ্রুততানের চেয়েও অনেক শক্ত। কারণ প্রত্যেকটি দ্রুত অক্ষরের উপর স্বরকে গলায় আনতে হয়। যাঁরা এই সবের বাস্তব পরিচয় পেয়েছেন—তাঁদের কাছে বিশেষ করে বলবার কিছু নেই। ধ্রুপদ গানের সমষ্টিগত রূপাঙ্কনের আকর্ষণীয় প্রভাবকে বুঝে ঠিক মত রসস্নিগ্ধ করে যদি গাইতে পারা যায় তাহলে শুধু অভিজ্ঞ শ্রোতাদরই নয় অন্যান্য গানভক্ত শ্রোতাদেরও মনকে আকৃষ্ট করে তৃপ্তি দেওয়া সম্যকরূপে সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে গানের অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। সুরের সংগে মনের আবেগ নিয়ে যে ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ভাষায় ব্যক্ত হয় তাকেই গান বলে। এই বস্তুটির অবদান মানুষের কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশিত হয় বলেই কণ্ঠ সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে এবং গান নামের এটাই হল তাৎপর্য্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই অর্থগত নিয়মে গান নামে আখ্যাত করে তাতে যদি ভাষার ভাবের অবদান উৎপন্ন না হয়, শ্রোতারা তার সন্ধান খুঁজে না পান তাহলে তাকে গান নামে অভিহিত কি করে করা যেতে পারে?

শাস্ত্রীয় সংগীতের যে গান হিন্দীতে রচিত হয়ে খেয়াল গান নামে পরিচিত, সেই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর আবেগময়, কামনাময় এবং প্রার্থনা ইত্যাদি মূলক ভাব আছে কিন্তু সেই সব ভাবের অবদানকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে হিন্দী ভাষাভাষী গায়করা পর্য্যন্ত সুরকেই একমাত্র সর্বস্ব করে গেয়ে আসছেন। গানের কথাগুলো ব্যবহারের আবশ্যক থাকছে রাজমিস্ত্রিরা যেমন ইমারত গড়তে কর্ণিকের ব্যবহার করে তেমনিভাবে সুরের ইমারত গড়বার জন্যই। এই সব মন্তব্য শুধু আমারই নয় অভিজ্ঞ শ্রোতাদেরও। গানের অর্থ নিয়ে যদি একটা সহজ উপমা দেওয়া যায় তাহলে তা একমাত্র রসগোল্লার উল্লেখ করে

বুঝান যায়। ভাব-ভাষা তার ছানা এবং সুর-তার-রস। শুধু রসের মাধুর্য্য নিয়ে যেমন রসগোল্লার প্রয়োজন মিটে না তেমনি শুধু সুর নিয়েই গান হয় না।

গানে স্বরগ্রামের ক্রিয়া—

বাল্যকাল হতে ভারতের বিভিন্ন ঘরাণার বিখ্যাত গায়কদের গান আমি শুনে এসেছি কিন্তু তাঁরাও বড় একটা গান গাওয়ার অর্থকে আমল দেন নি, তবে গানে তাঁদের স্বরগ্রাম করতে দেখি নি। ওই সাধনার কৃতিত্ব তাঁদের 'তেলানার' মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বোধহয় তাঁরা এটা বুঝতেন যে, গানে স্বরগ্রাম করলে রাগরূপ অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে সুরের যে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবময় রূপ উৎপন্ন হয় সেখানে স্বরগ্রামকে উপস্থাপিত করে সেই ভাব মূর্ত্তির উপর আঘাত আনা চলে না।

এখন খেয়ালের বিলম্বিত ও দ্রুত, এই দুই তালের গানেই স্বরগ্রাম দেখানর যেন প্রতিযোগিতা এসেছে এবং তার সংগে প্রাধান্য নিয়েছে ঝটিকাগতির তান। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিলম্বিত গানের সৃষ্টি সেই তার উপরও স্বরগ্রাম ও দ্রুত তান করার ইচ্ছে এসে যাওয়া যেন বিলম্বিতের নীতি নিয়মের উপর স্থায়ীত্ব রক্ষায় অপারগতার মতই। শুনার আগ্রহ নিয়ে যে আকর্ষণ থাকে বিলম্বিত গানের সময়—তার সেই নীতিধারার উপর ওই দুটি ক্রিয়া যখন এসে পড়ে তখন মনে হয় এই গানের ভাবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়ে অসঙ্গত এক চিত্ররূপ উপস্থিত হল। মন তখন সেখান থেকে সরে যায় অতৃপ্ত হয়ে।

এছাড়া গানে স্বরগ্রাম করার সময় অনেকে একটা স্বরকে ধরে মীড়ের দ্বারা উপর নীচে সরাসরি করেন এবং ধারে পাশের স্বরগুলোর উপর কাঁপাতে থাকেন। এরূপ উপস্থাপন নিয়ম-নীতির বিচারে একেবারেই আসেনা।

ভাবতে থাকি—এঁরা কি জানেন না যে কোন স্বর উচ্চারণের উপর ন্যূনমাত্রও উপর-নীচে সরে গেলে স্বরভ্রষ্ট হয়ে যায়? আমার মতে স্বরের উপর এই ব্যাভিচার শুধু অন্যায়ই নয়—নিজের পরিচয়েরও খুব অভাব হয়ে পড়ে। এইসব কাণ্ড দেখে মনে হয় খেয়াল গানে কোন কৌলীন্যই এঁরা রাখতে চান না। এ জন্য অনেকে বলেন—'গানের নাম যখন খেয়াল তখন নীতি-নিয়মের আশা না রাখাই ভাল।"

শাস্ত্রীয়সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে খেয়াল গানকেই যখন প্রধান করে

নেওয়া হয়েছে তখন এই গানের উপর সব কিছু শাস্ত্রীয় বিধি নিয়ম ও বিচারবোধ যদি না রাখা হয় তাহলে শাস্ত্রীয়সংগীত নামে এই গানকে পরিচিত করা সবকিছু বিধি ব্যবস্থা বাদ দিয়েই কি চলবে ?

সঙ্গতভাবে নীতি নিয়ম পালন করলেই কি শিল্প রচনার স্বাধীন অভিপ্রায় ব্যাহত হতে পারে ? না পালনের মধ্যেই শিল্পীর যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় থাকে ?

রাগরূপের উপর যাঁর যত অধিকার থাকবে তিনি ততই বিস্তৃত করতে পারবেন গানের উপর বহু প্রকারের তানাদি অলংকার,—স্বরগ্রাম ছাড়াই। সেই লক্ষ্যস্থানে ধ্যান চিন্তা নিয়ে যত সাধনা করা যাবে ততই নূতন নূতন শিল্পের নক্সা আবিষ্কৃত হতে থাকবে। সুতরাং বিধি নিয়ম পালন করে, জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে স্বরগ্রামের কৃতিত্ব 'তেলানা' কিংবা 'আলাপে'র শেষে দেখানই আমার মতে উচিত।

অনেকে মনে করেন হিন্দীখেয়াল গানে কথার কোন গ্রহণ-যোগ্য ভাব নেই। সত্যই আকর্ষণীয় ভাব আছে কি-না প্রমাণ স্বরূপ দু'চারটি গানের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি। (১). আশাবরী রাগে "ম্যায় তুঁহার দাসি জনম জনমকী" ভাবার্থ—আমি তোমার জন্ম জন্মান্তরের দাসি···। (২) তোড়ীরাগ,—"অবমোরি নইয়া পার লগাউ, হো হজরত্-মহম্মদ-নিজামুদ্দীন আওলিয়া···।" অর্থ—হে প্রভু! হে জগদীশ্বর—হে দুনিয়ার মালিক ··তুমি আমার এই দেহরূপ নৌকো এবার পার করে দাও···। (৩) বেহাগরাগ,—"শ্যাম মেরি আঁখন বীচ সমায়ে রহো লোগজান কাজরারে···।" অর্থ—শ্যাম! তুমি আমার নয়নদ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বদা থাকো—লোকে জানবে আমার দু'চোখের কাজল···।

আশাবরী রাগে—"তুঅ চরণ কমল পর মনভ্রমর লুভানু জোঁ চন্দ্র চকোর। অর্থ,—তোমার চরণ কমলে মনরূপ ভ্রমর লোভাতুর হয়ে আছে।

গান্ধারী রাগ,—মোর কান ভনকওয়া পড়িলে এ মাই, জব আয়ে মোর মন্দরবা···।" সমগ্র গানটির ভাবার্থ,—আমার মন্দিরে যখন শ্রীকৃষ্ণ আসছেন বুঝলাম তখন তাঁর আগমন বার্ত্তা আমার কানে এসে গেল, চরণ যুগল যে মুহূর্তে আমার গৃহ দরজা স্পর্শ করল—সেই মুহূর্ত্তেই আমার উদ্বেলিত মন-প্রাণ সব কিছুই ওই চরণে উৎসর্গ হয়ে গেল···। এই রকম সব ভাবপূর্ণ গানে স্বরগ্রাম আনা মানে গান সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা করা। এ যেন সুরের শ্যামকেই মানতে চাওয়া হয় ভাষার ভাবের শ্রীরাধাকে

নয়। কিন্তু গানের অর্থে আমাদের বুঝা উচিত প্রেমময়ী রাধা ছাড়া যেমন শ্যাম নন তেমনি ভাষার ভাব ছাড়া গান নয়। আমাদের ঘরাণার প্রত্যেকটি খেয়াল গানেই উন্নতভাবের সমাবেশ আছে।

গানের উপর স্বরগ্রামের এমন এক হিড়িক এসেছে যে বাংলা রাগ-প্রধান, আধুনিক ইত্যাদি গানের মধ্যেও তার প্রভাব সংক্রমিত হয়ে যথেচ্ছচারে পরিণত হয়েছে। ইং ২৩।১১।৭২ তারিখের সকাল ৮।১৫ মিনিটের সময় রেডিও খুলতেই সুন্দরভাবপূর্ণ একটি বাংলা গান মনকে সংগে সংগে আকৃষ্ট করল। গানের কথাগুলি এইরূপ—

"পথ চেয়ে রাধিকা রয়েছে জাগি, এ নিশি পোহাল শ্যামের লাগি।
ধীরে ধীরে গেল প্রহর চলে শ্রীমতী যে ভাসে নয়ন জলে,
কোথা তুমি শ্যাম রাধা অনুরাগী।"

ভৈরবী রাগে যিনি এই গানটি গাইতে সুরু করেছিলেন— তাঁর গলা আবেগযুক্ত সুমধুরই ছিল এবং গলায় সুরের তৈরি কাজও ছিল সুন্দর কিন্তু এমন আবেগবিধুর ভাবযুক্ত গানের উপর যখন তিনি কখনও ইংরেজী পেটার্ণের কখনও ছুঁচোবাজীর চক্র পতনের মত নানান ভঙ্গীর উপর স্বরগ্রাম করতে লাগলেন তখন মনে হতে লাগল সুরের ভাবের সংগে কথার ভাবের যে একাত্ম মিলনরূপ ছিল সেই রূপকে হত্যা করে তার নাড়ি-ভুড়ি উৎপাটিত হচ্ছে।

গানে যদি ভাষার ভাবের গুরুত্ব না দিই এবং গুরুত্ব যদি না থাকে তাহলে গান রচনার এবং গান নাম দিয়ে গান গাওয়ার কোন মূল্যই থাকে না। রাগ সংগীতের উপর শিল্প সৃষ্টির বিপুল সম্ভার ভাষার ভাবকে রক্ষা করেও আনা যায়।

শাস্ত্রীয় সংগীতের শ্রেণীগত গানের কথা ধরে বলছি,—এর কোন একটিই নির্দিষ্ট গায়ন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক গায়ক তাঁর সামর্থ্য মত যে কোন শ্রেণীগত গানের বন্দেজকে ধরে সুরের শিল্প রচনা করে যান। তাতে যদি শ্রেণীর নিয়মনীতি বজায় থাকে তাহলে অঙ্কন সীমিত হলেও শ্রেণী নামের মর্যাদা ব্যাহত হয় না।

রসস্নিগ্ধ করে সুরের উত্তম প্রকাশ রেখে তার সংগে ভাষার ভাবের মর্য্যাদা দিয়ে যদি গান পরিবেশিত হয় তাহলে যে কোন শ্রেণীর গানই হোক না কেন সে তার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমার মতে কণ্ঠের দ্বারা যে সব দুরূহ ক্রিয়া কঠোর সাধনার মাধ্যমে আসে অর্থাৎ

সাধনায় যে সব বিস্ময়কর বস্তু কণ্ঠে আনতে হয় কৃতিত্বশক্তি প্রদর্শনের জন্য, সেই সব বস্তু হয়ত গানের ভাব বিঘ্নকারক হতে পারে, তা যদি মনে হয় তাহলে সেগুলি 'তেলানা'তে প্রদর্শন করাই সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। দেখেছি আগেকার বহু ভাবুক-গুণী গায়ক এই বিচার বোধ রেখে গেয়ে এসেছেন এবং এখনও অনেকে গেয়ে থাকেন, কিন্তু এই বিচার বোধ রেখেও যাঁরা গানে স্বরগ্রাম করার জন্য খুব উদ্বুদ্ধ হন তাঁরা বোধ হয় নিজের ইচ্ছাটাকেই গুরুত্ব দেন।

এই প্রসঙ্গে আমি অতি প্রয়োজনীয় একটা কথা বোল্‌ব—

যে কোন গানে নিজের মাতৃভাষা থাকাই অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক দেশে তাই আছে। কেবল শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে নেই আমাদের দেশে। সেখানে আমরা হিন্দীরই কায়েমী সত্ব রেখে আসছি। গানের ভাষা যদি বোধগম্য না হয় তাহলে সে গান যতই উচ্চস্তরের হোক, কেবল মুষ্টিমেয় শ্রোতাদের কাছেই তার কদর থাকবে, কিন্তু সেই উচ্চস্তরের গান যদি নিজের মাতৃভাষায় পরিবেশিত হয় তাহলে সকলের মনকেই আকৃষ্ট করতে পারে। ছেলে, মেয়েরা যে গান গাইবে সেই গানেতে তারা এবং তাদের মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনরা ভাবের সন্ধান পাবেন না তাঁরা বলবেন 'কি সেঁইয়া মেঁইয়া করছে…'এটাই কি আমাদের কাছে উপযুক্ত এবং চিরকাল শিক্ষার নীতি বলে গণ্য হয়ে আসবে? কেন তা হবে? যে গানের ভাব অন্তরে প্রবেশ করবে না তাকে কি আমরা নিজের জন্য গান বোল্‌ব? এজন্য আমি চেয়েছিলাম বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের নিজের ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীতের শ্রেণীগত গান গাইতে কিন্তু কর্তৃপক্ষ বললেন—বাংলা ভাষায় খেয়াল ইত্যাদি শ্রেণীগত গান যথা নামে গাইতে দেওয়া হবে না।" গাইতে দিলে এই সব গানের প্রতি সকলের মনকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করতে পারা যেত এবং তাতে সস্তা ও অস্বাস্থ্যকর গানের প্রচলন কমে গিয়ে জনসাধারণের কল্যাণ হত। এত বড় কর্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গ্রহণ করে যদি বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ আমাকে সাহায্য করতেন তাহলে বেতার কর্তৃপক্ষ এরূপ অসঙ্গত ও নিন্দনীয় নির্দেশ তুলে নিয়ে শাস্ত্রীয়সংগীতে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিতেন।

যখন দেখি বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের কেন্দ্রে একেবারে খাঁটি খেয়ালের মত এবং খাঁটি ঠুমরী-ভজন-টপ্পার মত করে গাওয়া বাংলা গানে ওই সব শ্রেণীগত নাম না দিয়ে রাগপ্রধান, লঘুসংগীত, ভক্তিমূলক, পুরাতনী নামে

প্রচার করেন—বাংলাভাষা থাকার অপরাধে, তখন ভাবি মাতৃভাষার উপর এই অবিচার আমাদের মত কানে তুলো—ও পিঠে কুলোবাঁধা মানুষ ছাড়া অন্যান্য দেশের মাতৃভাষার শিল্পীরা বোধ হয় কখনই সহ্য করতেন না।

এই প্রসঙ্গে, পরিশেষে রাগ পরিবেশন সম্বন্ধে কিছু,—

আজকাল বর্ণ সঙ্কর ও নিয়ম নীতির পরিচয় শূন্য রাগের উপর গায়ক-বাদকদের এত বেশী করে কেন যে পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা এসেগেছে এবং এতে কিই বা তৃপ্তি ও আনন্দ আছে তা আমি বিচারযুক্তিতে খুঁজে পাই না। এক সময় নানান রাগের মিশ্রণে ক্ষীণকায় স্বাস্থ্যহীন রাগরূপের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির জীবনীশক্তি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। নূতন একটা কিছু না শুনালে লোকে প্রাচীনপন্থী বলবে,—নূতন দেখানর সমর্থ্য নেই এই ভাববে, এ ধারণা নিয়ে আমার মতে শিল্পী সাধকদের চলা দুর্বলতারই এক লক্ষণ। আমি এই বুঝি সাধকদের সর্বদাই লক্ষ্য থাকবে কোন্ কোন্ বড় রাগের মধ্যে দিয়ে কতদূর লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারা যায়। সেই এগোনর উপরই বিচার থাকবে সাধক শিল্পীর শক্তি-সামর্থ্য কত বড়। নূতন রাগ সৃষ্টি করা এমন কিছুই বাহাতুরির নয় ইচ্ছে করলে এটার সংগে ওটা মিশিয়ে কিংবা কোন রাগের কোন একটা স্বর পরিবর্ত্তন করে সংগে সংগেই—করা যায়। অবশ্য বাহাদুরি থাকবে যদি সেই সৃষ্ট রাগ প্রাচীন বড় রাগের সমতুল্য অন্তত হয়। বিরাট রূপ নিয়ে নটরাগও আছে, এবং ভৈরব রাগও আছে, তাদের রূপ থেকে খানিকটা করে কেটে নিয়ে মাঝখানে সেলাই করে তাদের রূপ আঁকায় বাহাদুরি কিছু নেই বরং ওই দুটির কর্তনে নির্মমতার নাম কর্ত্তনকারী রূপেই পরিচয় থাকে। শুধু তাই নয় এই ভৈরব-নট এর সুর পরস্পর সব বিষয়ে সংযোগ বিরোধী এবং প্রকৃত শ্রোতার কাছে একেবারেই অনাকর্ষণীয়। একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। ভাটিয়া (ভট্টিহরি) কলাবতী, মারুবেহাগ, নান্দ, বাচস্পতি, শ্যামকল্যাণ, ইত্যাদি, এই সব রাগরূপের দশা সকলেরই প্রায় সমান। মজঃফরপুর কন্‌ফারেন্সে নিমন্ত্রিত হয়ে যে বছর গেছলাম—তাতে বিখ্যাত যন্ত্রী ইনায়েত খাঁও গেছলেন। আমাদের দু'জনকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল গ্রাণ্ড হোটেলে।

রাগরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে খাঁসাহেব বললেন—আমার বাবা মৃত্যুকালে বলেছিলেন—জানিস্ ইনায়েত! আমি যদি এখনও একশ' বছর বাঁচতে পেতাম তাহলে শুধু পুরিয়ারাগই বাজিয়ে যেতাম।'

আমার কাছে এই হল প্রকৃত সাধকের রাগরূপের উপর অন্তঃদৃষ্টির কথা। ইমদাদ্‌খাঁ খুব বড় দরের যন্ত্রী ছিলেন।

বাল্যজীবনের সময়কালের কথার পরিচয় প্রদানের সময় বহু পরের অভিজ্ঞতার কথা—কথার সূত্রে এসেগেল—বিষয়বস্তুর বিচার নিয়ে। এখন আবার পশ্চাতের যথাস্থানে ফিরে যাই।

(৯)

বহির্গমন—

পিতামহ যখন দেশের পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে উত্তম ব্যবস্থার উপর আহ্বান পেয়ে ভাগবতপাঠের জন্য যেতেন তখন আমাকে সংগে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখতেন। তাঁর সঙ্গে যাওয়া আমার চার বছর বয়স থেকেই এরূপভাবে সুরু হয়েছিল।

দু'বছর বয়স থেকে দাদামশায়রা আমাকে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুদিন-ধরে রেখে দিতেন। সুতরাং পিতামাতাকে ছেড়ে দাদুর সংগে যাওয়া আমার পক্ষে তেমন কষ্টকর হতনা, মনকেমনের দুঃসহ বেদনা অনেকখানি ধাতস্থ হয়ে গেছল। জন্ম থেকেই আমার মনের গঠনটা ভগবান বেশ একটু সহ্যশক্তির উপযুক্ত করেই সংসারে পাঠিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর এই কৃপায় সংগীতের পথে যাবার পক্ষে সহায়তাই করেছিল।

যাই হোক্, মোটের উপর বাল্যকালে দাদুর কাছে দেশবিদেশে বেশী সময় থাকতে হওয়ায় চরিত্র গঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। তিনি সময় পেলেই—ধর্মবিষয়ে উপদেশ, ভাল ভাল উপাখ্যান, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনাতেন। আমার চিত্ত-মন তাতে আকৃষ্ট হয়ে যেত। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, একলব্য, উপমন্যু প্রভৃতির বিস্ময়কর আদর্শ-মূলক চরিত্র আমার মনে তখন থেকে গভীর রেখাপাত করেছিল। দাদুর কাছে পড়াশুনা এবং গান শিক্ষাও নিয়মিত চলত। গলায় 'সা' সুর ধরিয়ে দিয়ে বলতেন এই সুরকে অবলম্বন রেখে সাধতে থাক। লক্ষ্য রাখতেন সুর নেমে উঠে যাচ্ছে কি-না। পরে বুঝেছিলাম—এ এক খুব বড় পদ্ধতির তালিম। দাদু কোন কোন সময় কৌতুককর গল্প, এবং নানান তথ্য সম্বলিত দেশের প্রাচীন সংবাদ ও ইতিহাস অতি সরল ভাষায় শুনিয়ে যেতেন। আমি সবকিছুই তন্ময় হয়ে শুনতাম এবং মাঝে মাঝে এটা ওটা

প্রশ্নও করতাম। অবশ্য সাত-আট বছর বয়সের সময় থেকেই এইসব তথ্য শুনাতেন।

যখন বাবা-মা'র জন্য মনকেমন করত তখন দাদুকে বলতাম একটা গান করুন। দাদু বুঝতে পেরে সংগে সংগে ঝিঁঝিট-খাম্বাজ রাগে ধরতেন 'রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজে'……। গান শুনে আমার মনকেমন দূরে সরে যেত।

দাদুর সঙ্গে যে-যে গ্রামে গিয়েছি—সেখানের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর গৃহপরিজনদের কাছে পর্য্যাপ্ত আদর পেয়েছি। আমি ছোট থেকেই সকলকে খুব আপন মনে করে তাদের সংগে মিশে যেতে পারতাম। ওই সব গ্রামের সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে এক একদিন পালা করে বিকেলে আমার গান হত। অনেকে উপস্থিত হতেন। শিশুরা সব শ্রোতা হয়ে সামনে বসত। গান গাওয়া হয়ে গেলে পারিশ্রমিক স্বরূপ পাওনা হত, বৈকালিক আহারের প্রথায় কোন বাড়ীতে ছাতু-গুড়, কোন বাড়ীতে দুধ-চিঁড়ে, কোথাও বা উন্নত অবস্থায় পুলিপিঠে, সরুচাকলি ও পায়স। এই সব খাদ্যগুলির কোনটিই আমার কাছে অনাকর্ষণীয় ছিল না। তখন খাওয়াটাকে মনে হত পেলেই হ'চ্ছে। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বয়স্ক ব্যক্তিদের হরিনাম জপ করার মত সময়-অসময় মনে হত না। তাঁদের ওটিকে পুরে রাখবার মত মনের জায়গার যেমন অভাব হয় না—তেমনি খাবার জিনিসকে পাকস্থলীতে পুরে দেবার মত স্থানের অভাব নেই এই জানতাম। হজমের গোলমালের ভয়ে খাবারের গোলমাল কোনদিনই হত না।

ডাক্তারী শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী চলার জন্য এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা সময় নির্ঘণ্টানুযায়ী শিশুদের নিখুঁত পরিমাপ মত খাওয়ানর যেরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা রেখেছেন তাতে আমার অভিজ্ঞাতায় মনে হয় আগেকার খাদ্যাদি বিষয়ে বল্গাহীন নিয়ম শিশুদের উপযোগীই ছিল। প্রবীনরা বলতেন শিশুরা হাঁসের মত খেয়ে যাবে, তাতে তাদের শরীর ভালই হবে। এখন এত নিয়মেও দেখছি ওষুধের ছাড়ান নেই। নব্যারা বই পড়ে শিশুপালনে এত বেশী যোগ্য হয়ে উঠেছেন যে, যে কোন অভিজ্ঞতার উপদেশ তাঁরা মনে করেন তাঁদের জন্য নয়। অবশ্য এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে বয়স্কদের উপদেশ কারোর জন্যই নয়।

যাক্ এ সব কথা,—এখন ভাগবত পাঠের (কথকতা) বিষয় সম্বন্ধে একটু জানাই। এই পাঠের ব্যবস্থাপনায় তখন অর্থ ব্যয় তেমন কিছুই

ছিল না। শাল গাছ ইত্যাদির ডাল দিয়ে কিংবা থলে সেলাই করে তার তলায় শ্রোতাদের বসে শুনবার জন্য ছাঁওলা তৈরি হত। বসার ব্যবস্থার থলে, চাটাই পাতা থাকত। মহিলারা সংগে করে নিয়ে আসতেন বসবার জন্য কিছু। নির্মল বায়ু চলাচলের বাধা কিছুমাত্র ছিল না। পাঠক মহাশয়ের দৈনিক পাঠের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ থাকত দুই থেকে চার টাকার মধ্যে। তবে প্রত্যহ প্রণামীস্বরূপ কিছু পাওনা হোতই। তাছাড়া শিবের বিবাহ, বামনভিক্ষা ইত্যাদি উপাখ্যানের দিনে বেশ কিছু তণ্ডুল, কাংস্যাদি ধাতুনির্মিত পাত্র, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য জিনিস পত্রও। মাসের পর মাস এই সব জিনিসে আমাদের ঘর ভরে যেত।

পাঠক মহাশয়ের প্রত্যহ পাঠ চলত তিন ঘণ্টা ধরে। এর বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিবেশন মানব মনের উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারা সৃষ্টির পক্ষে এক অপূর্ব পুষ্টিকর ও পবিত্র রসাল বস্তুর মতই থাকে হিতকর হয়ে। পাঠক মহাশয়দের উপলব্ধ এই বস্তুতে থাকে অদ্ভুত কৃতিত্ব, যেমন—বিবিধ চরিত্রের ভাব-ভাষার নিখুঁতভাবে প্রকাশ, তার সংগে শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, রূপবর্ণন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, বাদ্য ও যুদ্ধের বহুপ্রকার নাম ও কৌশল পরিচয় এবং গান ও আরো অনেক কিছু।

এই সকল বিষয় বস্তুর উপর বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করে শত শত শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখার মত তাঁদের রাখতে হয় শিক্ষা ও সাধনা। এ যে কত বড় কৃতিত্ব তা যাঁরা আমার দাদুর, তাঁর ভাই উমেশচন্দ্রের এবং দুই পুত্র যথা আমার বাবা ও কাকার মত একাধারে সাধক, পণ্ডিত এবং গায়কের কাছে ভাগবত পাঠ শুনেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। এ জিনিষটি এমন যে, বড় বড় পণ্ডিত থেকে অতি সাধারণ মানুষকেও মুগ্ধ ক'রে এবং তৃপ্তিতে মন ভরিয়ে দেয়। পাঠকদের সম্মানও ছিল অতি উচ্চে। ভাগবত (কথকতা) পাঠ ছাড়াও তখন প্রায় সকল স্থানেই যাত্রা, রামায়ণ প্রভৃতি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। মানুষের আকর্ষণ ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপরই। যাত্রার নাটকে পৌরাণিক আদর্শ চরিত্রেরই অভিনয় থাকত। এজন্য শিশুদের অন্তরে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অভিমন্যু, প্রবীর প্রভৃতি মহান চরিত্রের প্রভাব স্পর্শ প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের পথকে প্রসস্ত করত। পুরুষরাই নারীর পাঠ করত বলে বীরনারী জনার পাঠে জনার চরিত্রটাই মনে অঙ্কিত হত। যাত্রার সমস্ত গানেই থাকত ধ্রুপদাঙ্গের সুর ও তাল এবং কোন কোন গানে থাকত কীর্তনের সুর। সমস্ত আনুষ্ঠানিক বস্তুর মধ্যেই ছিল

উচ্চ আদর্শ। আমার পূর্বোক্ত গুরুজনরা ভাগবত পাঠের সময় এমন অপূর্ব ও উন্নত পর্যায়ের গান করতেন যে, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে বলত পাঠ শুনব না গান শুনব! প্রমাণ পেতাম গানের দিকে তাদের কত আগ্রহ ও গ্রহণ শক্তি ছিল।

তারপর যখন হতে সিনেমার সৃষ্টি হয়ে তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং জায়গা করে নিল প্রায় সকল স্থানেই, তখন হ'তে আরম্ভ হয়ে ক্রমশঃ এর মাদক নেশায় মানুষের মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যাঁদের ভাববার কথা তাঁরা এর ফলাফলের দিকে তাকালেন না, খুব প্রয়োজন মনে করলেন। ভেজালের উপর এই সবের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে মনের স্বাস্থ্যরক্ষার আগেকার পুষ্টিকর খাদ্যকে সরিয়ে দেওয়া হল। এই সিনেমাই নিয়ে এল মানুষের মনে নগ্ন সিনেমার রূপ। সিনেমার 'শো' এর পূর্বে তার বাইরেটাকে মনে হয় সিনেমার ছবির চেয়ে আরো জমকাল। আঁকা-বাঁকা লাইন ধরে আমাদের দেশের আশা-ভরসার ছেলেরা যখন টিকিটের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে এবং গেটের কাছে হয় ধস্তাধস্তি, ঠেলাঠেলি, মারামারি তখন সেই দৃশ্য দেখে লজ্জায় ও দুঃখে মনকে যেন কোথায় নামিয়ে দেয়।

(১০)

উপনয়নের পর—

দশ বছর বয়সের সময় চৈত্র মাসে বাবা আমার উপনয়ন কার্য্য সমাধা করলেন। তখন আমার শিক্ষা ও সাধনায় দুটি জিনিস সমানে চলছিল, যথা—গান এবং ব্যাকরণ। তার দু'মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি একদিন আমাদের টোলবাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন কাণে এল আমার সম্বন্ধে যেন কি কথা হচ্ছে মেজকাকার সঙ্গে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাবা মেজকাকাকে (গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) বলছেন,—তুমি আমার একটা কথা রাখতে পারবে? মেজ কাকা বললেন—আদেশ করুন! বাবা বললেন—আমি বোধহয় আর বেশীদিন বাঁচবনা, তাই তোমাকে বিশেষ করে আমার বলবার এই— তুমি যদি সত্যকিঙ্করের সংগীত শিক্ষার ভার নিয়ে তোমার কাছে রাখতে পার তাহলে সে উপযুক্ত

গুরু লাভ করে সংগীত বিদ্যাকে পেতে পারে। তোমার কাছে এই আশা পেলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারব। সংগীতের প্রতি ওর অনুরাগ, নিষ্ঠা এবং বুদ্ধি ও প্রতিভার অভাব নেই,— তুমি ওকে শেখালে আমি মনে-করি তোমার শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে না। আমার এই অনুরোধ রাখতে পার কি না চিন্তা করে ছাখ। আমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়াটা ঠিক হবে না।

মেজকাকা বললেন,— আমি দাদার সংগে কথা কয়ে দেখি,—অবশ্য আপনার আদেশ পালন করতে তিনি সম্মতিই দেবেন,—দাদাই শুধু নন আমরাও খুড়োমহাশয়ের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। (খুড়োমহাশয় আমার পিতামহ) তবে আপনি বাঁচবেন না এ কথা কেন বলছেন,— অমন স্বাস্থ্য আপনার এবং এত কম বয়েস, তাছাড়া সাধক ব্যক্তি আপনি?

বাবা বললেন,—শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য নয়, কিছু দিন থেকে যেন যাবার ডাক শুনতে পাচ্ছি, যাক্ সে কথা, সবই তাঁর ইচ্ছে। ওর বিষয়ে নিশ্চিন্ত করতে পার কি না তোমরা ভেবে দেখ;— জান! মন সর্বদা বলে সংগীতের প্রতি ওর এত আকুল আগ্রহ বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

এই সমস্ত কথা মেজকাকাও এক সময় আমাকে বলেছিলেন। মেজকাকা কয়েকদিন পরে সপরিবারে বর্দ্ধমানে চলে গেলেন। তখন উনি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুরের সভাগায়ক পদে নিযুক্ত। গ্রীষ্মে ও পূজার সময় আসতেন ছুটি নিয়ে। যাবার দিনে বাবাকে বলে গেলেন,—আপনার অভিপ্রায় মত ৺পূজার সময় এসে সত্যকিঙ্করকে নিয়ে যাব। তবে আপনি থাকতে আমার উপর কেন ভার দিলেন তা বুঝে উঠতে পারছি না। বাবা বলেছিলেন—ওর তোমাকেই গুরুপদে পাওয়া বেশী প্রয়োজন।

এই কথাবার্ত্তার পর কয়েকদিনের মধ্যেই অর্থাৎ আষাঢ় মাসে রথের দিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবা দেহ রাখলেন। সেইদিনের সকাল-বেলা যোগাচার্য্য কৈলাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে দেখা করতে এলেন। খানিকক্ষণ বসে তারপর যাবার সময় বাবাকে বলে গেলেন—'তোরজন্য একটা ওষুধ দেবো কেউ যেন নিয়ে আসে।' কথাটা শুনে বাবা একটু কিরকম ধরণের যেন হাসলেন। মা আমাকে পাঠালেন ওষুধ আনতে।

আমি ছুটতে ছুটতে তাঁর বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন একজন

বল্ল—যোগীমশায় দরজা বন্ধ করে যোগে বসেছেন। আমি দরজার সামনে বসে রইলাম দারুণ ভয়-ভাবনা নিয়ে। তখন হৃদ্‌পিণ্ডটায় কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। খানিকক্ষণ পরে দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়ে আবার ভিতরে গিয়ে কাগজে কি যেন লিখে ফিরে এসে আমার হাতে সেটা দিয়ে বললেন—'তোর বাবাকে এটা দিবি, পড়তে থাকলেই রোগ থেকে মুক্তি পাবে'। আমি এক দৌড়ে বাড়ীতে এসে বাবার হাতে লেখাটা দিলাম। বাবা লেখাটিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু হাসলেন মাত্র। দাদু জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে—কি ওষুধ দিয়েছেন? নূতন কিছু? বাবা বললেন, – যে ওষুধ লিখে দিয়েছেন তা আমি সর্বদাই পান করছি। দাদু তখন বাবার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে কি যেন শ্লোক আওড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে গেলেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম—দাদু কোথা যাচ্ছেন? বললেন—৺গোপীনাথের মন্দিরে। তার একটু পরেই জপ করতে করতে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আচম্‌কা এই ঘটে যাওয়ায় সবাই স্তম্ভিত! তারপরেই ভীষণভাবে সকলের কণ্ঠে কান্নার রোল উঠল। আমি সেই মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেলাম, কি হয়ে গেল তা ভাবতে মাথা গুলিয়ে গেল – যেন জ্ঞানশূন্যের মত অবস্থা। তারপরই ছুটে গিয়ে মন্দিরে দাদুর পায়ের উপর আছড়ে পড়লাম। দাদু তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর অশ্রু নীরবে আমার মাথা দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল—আর আমার অশ্রু সরবে তাঁর পায়ের উপর দিয়ে যেতে লাগল। তখন বাড়ীর ভেতরে, বাইরে এবং মন্দির প্রাঙ্গনে পাড়ার লোকে ভর্তি।

দাদু সামলে নিয়ে সান্ত্বনার বাণী বলতে লাগলেন,—এই ছাখ! এই ছেলেটি তোর চেয়ে ছোট বয়সেই বাপ হারিয়েছে, জানিস্ ভাই! এ রকম দুর্ভাগ্য বহু সন্তানেরই ঘটে আসছে, কিন্তু উপায় তো কিছু নেই ভাই সবই ঈশ্বরের হাত……। এই পর্য্যন্ত বলে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন—আর কিছু বলবার মত ভাষা আনতে পারলেন না—গলায় আটকে যেতে লাগল।

পাড়ার সেবাই জ্যেঠা (অক্ষয়কুমার) আমাকে খুব ভালবাসত। দাদু তাকে বললেন—আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্ত। দাদু চলে গেলেন বাড়ীর ভেতরে—আমি তাঁর সঙ্গেই চলে গেলাম। বাবার পায়ের উপর দিদি দারুণ কান্না কাঁদছেন,—তাঁর বয়স তখন তেরর মত। জামাইবাবুর বয়স তখন আঠার। ওই বয়সে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দু'দিন ধরে

সামনে বাবাকে পাখা করে গেছেন;—তিনিও অঝোর-ঝরে কাঁদছেন। মায়ের তো কথাই নেই, দাদামশায়, দিদিমা, বুড়োদিদি, কাকীমা প্রভৃতির কি নিদারুণ কান্না, এখনও মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। তাঁদের এই দৃশ্য দেখে আমি তখন কান্নাহারা হয়ে গেছলাম। সকলের এই অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার সব ভার নিলেন দাদু। কি অদ্ভুত ধৈর্য্য যে সেদিন তাঁর দেখেছিলাম তা মনে হলে ভাবি পুত্রহারা পিতার এত বড় ধৈর্য্যের শক্তি কি করে আসে !! সেদিন নিবিড় স্নেহের স্পর্শ দিয়ে একে একবার সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ওকে তুলে সযতনে বসিয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন, কারো মুখের অশ্রু কাপড়ের খুঁটে করে মুছিয়ে দিচ্ছেন। আবার ও-রি মধ্যে শীগ্‌গীর দাহর স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছেন।

বেলা প্রায় এগারটার সময় শবাধারের উপর বাবার দেহকে নিয়ে-গিয়ে তুল্‌ল ৺গোপীনাথের মন্দিরের সামনে— আমাদের সদর দরজার কাছে। দাদু কাছে গিয়ে মৃতপুত্রের মাথায় হাত রেখে বললেন—এই চল্লিশ বছর বয়সেই সংসারের মায়া কাটিয়ে চল্লি বাবা— সব ভার আমার উপর চাপিয়ে ! ৺গোপীনাথ এ-কি উল্টো বিচার করলেন ! না-না— তাঁর বিচার ঠিকই আছে, আমার কর্মফলের এই রকমই চরম পরিণতি ছিল, তা, কে খণ্ডাবে ? এই বলে দাদু আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না—উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে দ্রুত সরে গেলেন।

শ্মশানে আমাকে যেতে না দেবার জন্য অনেকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু যাবার জন্য আমার ভীষণ চিৎকার করে কান্না দেখে— দাদু বললেন যেতে দাও। শববাহীদের দ্রুতগতির সংগে চলতে চলতে বাবা কোথা যাচ্ছ - বলে আকুল স্বরে কান্নার শব্দ শুনে সহরের দু'পাশের লোক দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে লাগল এত বড় এক ব্যক্তি কি করে এই কম বয়েসে মারা গেলেন !!

যে শ্মশানে আমার বাবাকে নিয়ে যাওয়া হল তার নাম 'নূতনমহল'।

মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ উড়িষ্যার যুদ্ধে পাঠান সেনাপতি করিমখাঁকে নিহত করে তার বেগম লালবাঈকে তার ইচ্ছাক্রমে দেশে নিয়ে এসে প্রায় তিনশ' বছর হতে চলল এই শ্মশানের স্থানেই তারজন্য নূতন করে মহল করে দিয়েছিলেন। এখনও ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন বিশেষ ভাবেই আছে। এইজন্য এই শ্মশানের নাম 'নূতনমহল।'

তারপর সেদিন শ্মশানকালীর মন্দিরের রোয়াকে সেবাই জ্যেঠা

আমাকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে রইলেন। চিতায় তুলবার সময় দেখাগেল বাবার পৈতে জপকরা হাতে তেমনই জড়ান আছে। আমার অগ্রজ পুরোহিতের বলান মন্ত্র উচ্চারণ করে যখন মুখাগ্নি করতে লাগলেন—তখন আমি শিউরে উঠে চোখ দুটো দুহাতে ঢেকে কাঁপতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল আমার বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখলাম—সেই দেহের কি পরিণতি হল।

শ্মশানে শববাহী হয়ে এসেছিলেন আমাদের পাড়ার আয়ুর্বেদ চিকিৎসক গঙ্গাবিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সম্পর্কে ইনি জ্যেঠা মশায় ছিলেন। এঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও যথেষ্ট বোধ ছিল,— তাউসবাদ্য (এখনকার অবয়ব পরিবর্ত্তিত এসরাজ) বেশ ভাল বাজাতেন। এঁর থেকে উর্দ্ধতন চার পুরুষ হতে ধ্রুপদ গানের চর্চা চলে এসেছিল। সেই পশ্চাতের প্রথম বর্ষের সীমা থেকে গণনা করলে দু'শ বছরের বেশী হবে। সুতরাং এটিও একটি বিষ্ণুপুরের শাখা ঘরাণারই অন্তর্ভুক্ত পরিচয় স্বরূপ। ওই জ্যেঠামহাশয়ের আরো অনেকগুলি গুণ ছিল,— যে কোন বিষয়ের ভাববর্ণনা নিয়ে এবং টিপ্পনী যুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল চমৎকার।

আমাদের পাড়ার অনেকের মধ্যেই সংগীত ছাড়াও কবিতা, সাহিত্য ও নাটক রচনার উপর দক্ষতা যেন স্বভাব শক্তির মতই ছিল। সব বিষয়ে পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা রাজাদের সান্নিধ্যে থাকলে এই সব শক্তি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়।

সেদিন ওই শ্মশানে উক্ত জ্যেঠামশায় আমাদের শোকাহত মনকে সরিয়ে রাখবার জন্য কত রকমভাবে হাস্যকৌতুকের অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন। এখনও মনে হলে ভাবি তখনকার মানুষ কত দরদী ও আপন ভাবাপন্ন ছিলেন। আমাদের সেই সংগীত মুখর উজ্জ্বল-উচ্ছল পাড়া এখন একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে শ্রীহীন হয়ে গেছে। বাস্তু পাড়ায় গেলে গভীর বেদনা নিয়ে মনে হয় কি ছিল আর কি হয়ে গেল।

তারপর সেদিন দেখতে দেখতে দাহর ক্রিয়া যখন সমাপ্ত হল তখন দিবাকালের অপরাহ্ন সময় উত্তীর্ণ প্রায়। চিতাগ্নির উপর কলসী করে আমরা দুই সহোদরে জল ঢেলে অগ্নি নির্বাপিত করলাম।

তারপর স্নান সেরে পাড়হীন কোরা কাপড় এবং গলায় ছড় বেঁধে পিতৃহীনের অপূর্ব সাজে গৃহের দ্বারে উপস্থিত হলাম। শ্মশান ফেরত ব্যক্তিদের 'বলহরি'র শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করার মত কান্না বাড়ীর ভেতর

থেকে উত্থিত হল।

গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম মা উঠনে লুটিয়ে আছেন সর্বরিক্তা বিধবার বেশে। মায়ের সেই চেহারা ও বেশ দেখে আমার শেলবিদ্ধ মন বলে উঠেছিল এ রকম মায়ের মূর্ত্তি যেন কোন ছেলেকে না দেখতে হয়।, মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান মাত্র দাদু এসে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির মত আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন—যেন এক অনির্বচনীয় নিবিড় স্নেহের স্পর্শের মত মনে হল।

এখনও সেই কল্পনাতীত করুন দৃশ্য বেশী করে মনে পড়ে,—পতিহারা জননী মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন, পিতৃহারা দুটি পুত্র দাঁড়িয়ে যেন সব কিছু সম্বল হারিয়ে ভিক্ষুকের মত, আর পুত্রহারা পিতা নির্বাক নিশ্চল !!

দশ দিন পরে দাদু উদ্‌যোগী হয়ে আমার অগ্রজকে দিয়ে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া যথাযথ সুষ্ঠুভাবে করালেন। সেদিন আশ্চর্য্য ও বিস্ময় সহকারে দেখেছিলাম—পুরোহিতের মন্ত্রবলা অস্পষ্ট হ'তে থাকায় অগ্রজের উচ্চারণে ভুল হচ্ছে দেখে দাদু নিজে বলে দিতে লাগলেন—পাছে ত্রুটি হয়। এই রকম মনের জোর ও ধৈর্য্য কল্পনাতেও আনা যায় না—এ-এক যেন অসম্ভব বিস্ময় !!

(১১)

সুরের প্রশস্ত ও নির্দিষ্ট পথে—

পিতৃ বিয়োগের চার মাস পরেই আমার সংগীত জীবনের গন্তব্য পথে যথার্থভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এল।

৺পূজার সময় মেজকাকা সপরিবারে দেশে এলেন। প্রতিশ্রুতি মত ৺কালীপূজার পর আমাকে সংগে করে বর্দ্ধমানে নিয়ে যাবেন এ কথা এসেই দাদুকে জানিয়েছিলেন।

বড় কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যকালে প্রতিষ্ঠিত ৺কালীপূজা তাঁরা তিন ভাই উপার্জনে সক্ষম হবার পর থেকে খুব ঘটাকরে সমাধা হয়ে এসেছিল বড় কাকার জীবিত কাল পর্য্যন্ত। আমাদের দেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্য্যন্ত যথারীতি তিন দিন ধরে ৺কালীমাতার পূজা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ঐ উৎসবে মায়ের নাট-মন্দিরে সমস্ত রাত্রি ধরে

কাকাদের এই পূজায় গান-বাজনার বিরাট আসর হত। দেশের সমস্ত গায়ক-বাদক এবং শ্রোতারা উপস্থিত হতেন এবং দূর-দূরান্তর হতেও অনেকে আসতেন।

শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় পূজা যত নিকটবর্তী হতে লাগল ততই মন আমার কি রকম যেন শূন্যতায় ভরে যেতে লাগল। বাবাকে হারালাম তার নিদারুণ কষ্ট তো ছিলই তার উপর ওই অবস্থায় মা, দাদুকে ছেড়ে বিদেশে থাকতে হবে। কি করে মন টিকিয়ে থাকতে পারব—সে কথা যতই মনে হতে লাগল ততই চোখে জল এসে মনকে দুর্বল করে তুলতেছিল। কিন্তু বিকল্প কিছুই ছিল না তাই এগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে—সঙ্কল্পকে বড় করে নিয়ে জোর দিতে লাগলাম, আমাকে দুঃখ, কষ্ট, মনের অভাব সব কিছু সহ্য করে ভাল করে গান-বাজনা শিখে মানুষ হতেই হবে। সকলকে যেন দেখাতে পারি সংস্কৃত পড়ার আমার আগ্রহ ছিল না বলে বংশের মর্যাদার ক্ষতি করিনি।

বাবা মারা যাবার পর যেখানে যত ঠাকুরদেবতার স্থান দেখতাম সেখানে প্রণাম করে এই কথাই জানাতাম হে ঠাকুর! হে দেবি! আমি যেন তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভাল গায়ক-বাদক হতে পারি। তখনকার বয়েসের চেয়ে আরো কম বয়েস থেকেই ঠাকুর দেবতার কাছে এই কামনা জানাতাম। আমার মনের এই বাসনা জানাতে সবচে' বেশী আগ্রহ আসত সেই সব ঠাকুর থানে (স্থানে) যেখানে আছে নির্জন জায়গায় বৃক্ষ-লতা বেষ্টনীর মধ্যে মাটির বেদীর উপর পোড়া মাটির হাতী, ঘোড়া, মনসার বারি (মৃৎকলসী মত গঠনের উপর নাগমূর্ত্তি অথবা মনসাদেবীর মূর্ত্তি) মহাদেব পূজার উদ্দেশ্যে গোল পাথরের উপর রক্ত চন্দন ও বিল্বপত্র, ছোট একটা মাটির ঘট, তার উপর আম পল্লব এবং বেলপাতার সংগে আকন্দ, কঠচাপা ইত্যাদি জংলী ফুল এবং গাছের উপর পাখীদের ডাক। এরকম ঠাকুরথান আমাদের দেশের সহর ও গ্রামসমূহে যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি অনুন্নত শ্রেণী জাতিদেরই সৃষ্টি। লোকালয়ের বড় বড় মন্দির ও দালানের মধ্যে যে সব দেব-দেবী থাকেন সেখানের চেয়ে আমার মনকে আকর্ষণ করত নির্জনে প্রতিষ্ঠিত ওই রকম ঠাকুর থানগুলিই বেশী করে। মনে হত এই সব জায়গায় প্রার্থনা করলে ঠাকুর শুনতে পাবেন।

বাল্যকাল থেকেই নির্জনস্থান আমার ভাল লাগে। যেখানে দেখি

প্রাকৃতিক দৃশ্য শূন্যতা নিয়ে করুণরূপের মত, বন—প্রান্তর উদাসীর মত, সেই সেই জায়গায় আমার মন বেশী করে মিশে থাকতে চায়। মনে হ'তে থাকে এই সব জায়গাতেই সংগীতের যথার্থ রূপের সন্ধান আছে। আড়ম্বরময় কৃত্রিম যান্ত্রিক জীবন কোনদিনই আমার ভাল লাগেনা।

সারা জীবন শাস্ত্রীয় সংগীতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আছি সত্য, তবুও বাল্য-জীবনের সময় থেকে গ্রামাঞ্চলের কতকগুলি সুরের মায়াময় মূর্ত্তি আমার মনকে আকর্ষণ করে,—যেমন, রাখালদের বাঁশীর উদাসী সুর, বাউলদের নেচে নেচে গাওয়া দেহতত্ত্বের গান, বৈষ্ণব ভিখারীদের গোপীযন্ত্র নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সংগীত, হরিজনদের ঝুমুর ও পল্লীগীতি। নিরালা-পথে শাওতাল রমণীরা যখন নৃত্যের ভঙ্গীমায় হেলতে-দুলতে গান গেয়ে যেতে থাকে তখন সেই গানে সুরের সৃষ্টিতত্ত্বের একটি সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়।

ওই সমস্ত গ্রাম্যগীত ও তার সুর ক্ষুদ্র হলেও ভাবপুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করে—যা সংগীত সাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবদান স্বরূপ বলে আমার গভীর বিশ্বাস আছে।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই,—মেজ কাকার সংগে যেদিন যে সময়ে বর্দ্ধমানে রওনা হব—সেই গমনকালের সময় দাদু আমার মাথায় ৺গোপীনাথের চরণপুষ্প রেখে আশীর্বাদ করে স্মরণ করিয়ে দিলেন—উপমন্যু ও একলব্যের আদর্শ চরিত্রের কথা। বললেন—"যাখ ভাই! এই আদর্শ থেকে একটুও বিচ্যুত হয়ো না। এই আদর্শকে ধরে থাকলেই তুমি শীগ্‌গীর্ এগিয়ে যেতে পারবে।"

এই উপদেশের সময় আমি মস্তক অবনত করে তা পালন করার সঙ্কল্প মনে মনে নিয়েছিলাম।

তারপর—কুলদেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এসে—দাদু—মা—বুড়োদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ঘোড়া গাড়ীতে ওঠার জন্য সেখানে এলাম। সকলেই সংগে এলেন এবং গাড়ী চলার শেষ দৃষ্টি পর্যান্ত মা চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার জল মুছতে লাগলেন এবং বুড়ো দিদিও। দাদুর চোখও তখন জলে ছল্ ছল্ করছিল।

আমার মনের ভেতরটায় তখন কি যে করতে লাগল তা ভগবানই জেনেছিলেন। যখন তাঁদের আর দেখতে পেলাম না তখন সামলাতে না পেরে বাইরের দিকে মুখ রেখে চোখ দুটো কাপড়ে ঢেকে রেখেছিলাম—

পাছে কাকারা দেখতে পান আমি কাঁদছি।

ষ্টেশনে পৌঁছানর একটু পরেই ট্রেন এসে গেল। সকলে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

যতক্ষণ দেশের পবিত্র মায়াময় দৃশ্য নজরে এল ততক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম জন্মভূমির গৃহপানে—মা, দাদুদের মুখের উপর মনপ্রাণ নিয়োগ করে। তারপর স্বর্গশ্রেষ্ঠা জন্মভূমি মাতাকে যতই পিছনে রেখে গাড়ী ছুটতে লাগল ততই যেন পাখীর মত সেখানে উড়ে যাবার জন্য মন অস্থির করে তুলতে লাগল। মনে হচ্ছিল সমস্ত জগৎটা এবার শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

ট্রেনে যেতে যেতে যখন রাত হয়ে এল তখন সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে বেঞ্চির উপর কোনরকমে আমরা শুয়ে পড়লাম। এ রকমভাবে শুয়ে ঘুমান কখনও অভ্যাস না থাকায় ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে ভীষণ জোরে পড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দেখি পড়ে যাওয়ার দৃশ্যরূপ ও তার শব্দে বেশ হাস্যরসের উদ্ভব হয়েছে। আঘাতের দারুণ যন্ত্রণার চেয়ে লজ্জিত ও অপ্রস্তুতই বেশী হলাম। মন তখন যেন বল্ল—হে হতভাগ্য বালক! এখন থেকে তোমাকে সব বিষয়ে হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে এবং সব কিছু সহ্য করে নিতে হবে,—তুমি এখন থেকে বয়সের অনুপাতে তোমার স্বাধ্য পাওনা ও স্বভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে।" মনকে তখন এর উত্তরে মনাতীত কোন অদৃশ্য পুরুষ নিশ্চয় করে বলতে পারত, ওহে মন! তোমাকে বেশী করে আর বলতে হবে না, আমি ওকে দুঃখ, কষ্ট সহ্য করবার মত ধৈর্য্য ও সাহস শক্তি দিয়ে তার সংগে কর্মফল ও ভাগ্যের বিচার করে পাঠিয়েছি,—সব কিছুই সে মাথা পেতে নেবে॥

(১২)

বর্দ্ধমানে—

বর্দ্ধমানে যাবার পরই মেজ কাকার কাছে নিয়মিতভাবে সংগীতে তালিম পেতে লাগলাম।

সেখানের খুটি-নাটি কাজের প্রায় সবগুলিই আমি করণীয় কর্ত্তব্য-বোধে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। সেই সব কাজে কষ্ট বা ক্লান্তিবোধ আমার

কোন দিনই আসে নি। যে কোন বিষয়ে ফরমাস্ আমার কাছে ভালই লাগত। সর্বদা এই মনে হত এত বড় আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করবার সুযোগ পেয়েছি, তার সংগে থাকা-খাওয়া ইত্যাদি।

মেজ কাকার রাজ দরবারে থাকার মাইনে এমন কিছু বিশেষ ছিল না, অনেক সময় কুলিয়ে উঠতে পারতেন না—সঙ্গীত সাধকের ঘর বলে। তত্রাচ আমাকে এনে রাখা শিক্ষাগুরুর অশেষ কৃপা বলে মনে করতাম। আপনজনের কাছে মনের জন্য কতক গুলো বস্তু স্বভাবতই পাবার যে আকাঙ্ক্ষা থাকে সে গুলোর কথা কোনদিনই আমার মনে আসত না,— দাদুর বলে দেওয়া উপমন্যু ও একলব্যের কথা সর্বদাই স্মরণে রাখতাম। তবে এক এক সময় মা, বাবার জন্য চোখে জল এসে যেত। এখানে আমার দৈনন্দিনের কাজ ছিল—খুব ভোরে উঠে বেশ কিছুক্ষণ গলা সেধে নিয়ে তারপর রোদ উঠছে দেখে বৈঠকখানায় পেতে রাখা বেশ বড় রকমের শতরঞ্জীকে তুলে বাইরে ঝেড়ে নিয়ে সমস্ত মেঝেটা পরিষ্কার করে ওই পাতনটিকে ভাল করে বিছিয়ে নিতাম। পরে যন্ত্রগুলিকে ঝাড়-মোচ করে বিভিন্ন জাতের তিন চারটি হুকোয় এবং মেজকাকার গড়গড়ায় জল পাল্টে আট দশটি কোলকায় তামাক সেজে রাখতাম। এই সব কাজ আমি আসার আগে মেজকাকা নিজেই করতেন চাকর রাখতে না পারায়। আমি এসেই তাঁর হাত থেকে এই সব কাজ কেড়ে নিয়ে ছিলাম।

তামাক সাজার পর গান সাধতে বসতাম। একটু বেলাতে দোকান থেকে জল খাবার এনে দিয়ে যখন দেখতাম মেজকাকা জল খেয়ে নিয়ে তানপুরা নিয়ে বসেছেন তখন নির্দেশ মত তাঁর কাছে গান শিখে যেতাম বাজার করতে। প্রথম প্রথম দিন দুই কাকা সংগে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কোথায় কোন্ জিনিস পাওয়া যায়। আমি ঘুরে ঘুরে দরদস্তুর করে যেখানে সুবিধা দরে পেতাম সেখানেই কিনতাম। কেনা বস্তুগুলো সকলেরই কিন্তু পছন্দ হত। তবে কাকীমার বলে দেওয়া দ্রব্য তালিকার মধ্যে দু' একটা আনতে প্রায়ই ভুলে হয়ে যেত। এর কারণ— গান শিখেই বাজারে যেতে হত বলে পাছে গানটা ভুলে যাই এজন্য বাসা থেকে বেরিয়ে জিনিস কিনে ফিরে আসা পর্য্যন্ত সমানে গানটা এবং তান-বিস্তার থাকলে সেগুলো রেওয়াজ করে যেতাম। মেজকাকা বলে দিয়েছিলেন যে কোন জিনিস শিখে অন্ততঃ দু' তিনশ' বার অভ্যাস না করলে পাকাপোক্ত হয় না এবং নূতন শেখা চলে না। আমার কিন্তু

শুন্‌লে ওই সংখ্যার অনেক বেশী হয়ে যেত। ওই অভ্যাসের দরুণ এখনও গলা ছেড়ে নয়—গুন্‌গুন্‌ করে রাস্তা ঘাটে এবং অন্য কোন কাজের সময় যে কোন একটা রাগের রূপ গলায় এসে যায় এবং চলতে থাকে মালা নিয়ে জপকারীদের মত। ধ্রুব, প্রহ্লাদ যেমন হরিকে ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, তেমনিভাবে আমরা যদি সঙ্গীতকে গ্রহণ করতে পারি তবেই সংগীত দেবতার কৃপালাভ হতে পারে। সংগীতের ছুটোছুটি বস্তু নিয়ে থাকলে এই ধ্যান চিন্তা আসা অসম্ভব। আর একটা কথা, যে সংগীত মানুষের অন্তর ও মনকে ঊর্দ্ধগামী করতে সহায়তা করবে না সে সংগীত সংগীতই নয়—তার প্রভাব মানুষের মনকে একেবারে নীচে নামিয়ে দেয়।

তারপর বাজারের কথায়,—মাত্রার গতি ঠিক রাখবার জন্য হাতনাড়া এবং গলায় বেরিয়ে যাওয়া সুর শুনে বাজারের কোন কোন লোক হাসত এবং ব্যঙ্গও করত; আমি সে সব গ্রাহ্য করতাম না।

দু'একটা জিনিষ কেনার ওইজন্য ভুল হত বলে কাকীমার কাছে ভৎর্সনা প্রায়ই পেতে হত। কিজন্য যে আমি ধমকের উপর ভারি অন্যমনস্ক, বেহুঁস ইত্যাদি বাক্যে বিদ্ধ হচ্ছি তার কারণ আমি তাঁকে জানাতে পারতাম না। সে সময়ে আমার মুখের অবস্থা ভীষণ অপরাধীর মত হয়ে পড়ত। সেই ভীত সন্ত্রস্ত মুখের চেহারা দেখে কারো মায়ার সঞ্চার হবে এ আমি অবশ্য আশা করতাম না।

এখানে আসার প্রথম সময়েই কাকার মেজ ছেলেটি (নাম তার নরেশ) ভীষণ অসুখের পর সেরে উঠল। খুব নিয়মে রাখবার জন্য ডাক্তার নির্দেশ দিলেন। কারো খাওয়া দেখলে খুব চিৎকার করে কাঁদত তাই আমি দুপুরে খাবার সময়ে কাকীমার কোল থেকে জোর করে তুলে নিয়ে অন্যত্রে সরে যেতাম। তখন সে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করতে করতে দারুণ রেগে গিয়ে নখ ও দাঁত দিয়ে নানান স্থানে আমার শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে দিত। অনেকক্ষণ বাদে যখন বুঝতাম সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তখন ওই ছেলেকে কাকীমার কোলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢেকে রাখা ভাত ক্ষিদের চোটে গোগ্রাসে গিলে ফেলতাম। তারপর মুখ হাত ধুয়ে গুরুর উপদেশ মত বৈঠকখানায় বসে স্বরলিপি দেখে গান তুলার এবং শেখা গান স্বরলিপিতে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতাম বিকেল তিনটে পর্য্যন্ত। খুব মনোযোগ দিতাম বলে দু' তিন মাসের মধ্যেই ওই দুটো বিষয়ের উপর দখল

অনেকখানি সহজ করে নিতে পেরেছিলাম। গুরু বলতেন শিক্ষার এইসব নীতিধারাই প্রকৃত সত্যরূপে উদ্দেশ্য সাধনে নিয়ে যায়।

পরে বড় হয়ে ভাবতাম,—তখন আমি বয়সের সীমায় সবে এগারয় পড়েছি—সেই বয়সে এত সব বিষয়ে কর্ত্তব্যবোধ ও প্রেরণার শক্তি কোথা থেকে পেয়েছিলাম! বোধ হয় ছোট থেকেই তাঁকে আমি ডেকে এসেছি বলে তিনি কৃপাকণাদানে বঞ্চিত করেন নি, এই আমার একান্ত বিশ্বাস। মনে হয় তাঁকে ধরে না থাকলে কিছুই পারতাম না। সপ্তাহে দু'তিন দিন মেজকাকা সন্ধ্যার পর শেখাতে যেতেন—মহাতাবচাঁদের ভাইপোদের। সেই সেই দিনে কাকীমার রাত্রে রান্নার জন্য ভীষণ বাধার সৃষ্টি হ'তে লাগল। কারণ রুগ্ন শিশুটি সন্ধ্যার পর থেকে দারুণ বায়না ও কান্না জুড়ে দিত। কাকা থাকলে ভুলিয়ে রাখেন। এই অবস্থায় ধরান উনুনের আঁচ নষ্ট হয়ে যেত। বড় ছেলে রমেশ তখন ছয় বছরের। সে খেতে দাও খেতে দাও বলে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ত। এইসব দেখে আমার মনে খুব কষ্ট হতে লাগল। এই অবস্থায় তিন দিনের দিন কাকীমাকে বললাম—আপনি আমাকে রান্নার নিয়মগুলি ভাল করে বুঝিয়ে দিন—মনে হয় রাঁধতে আমি পেরে যাব,—রমেশের খেতে দাও খেতে দাও বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়া এ আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না—ভীষণ কষ্ট লাগছে।

আমার এই কথা শুনে কাকীমা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—ছেলে মানুষ তুই কখনও রাঁধতে পারিস! আর আমি তোকে রাঁধতে দিতে পারি! তুই রমেশের সংগে একটু গল্প কর—ছেলেটা ঘুমোলেই রান্না ঘরে যাচ্ছি।

আমি বললাম—গল্প শুনতে শুনতে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে, খাওয়া হবে না, আর জানেন তো ঘুমিয়ে পড়লে ওকে খাওয়ান কি কষ্ট। আপনি বিশ্বাস করুন আমি রাঁধতে ঠিক পেরে যাব, মায়ের রান্না, রুটি তৈরি ইত্যাদি করা দেখে দেখে আমার অনেকটা জানা হয়ে গেছে,—আপনি কেবল নুন-তেল ইত্যাদির পরিমাপ এবং কতটা জল দেবো বাতলে দিন। আমার একান্ত আগ্রহ দেখে বিমর্ষ হয়ে নিরুপায়ের মত দিলেন বাতলে এবং বললেন দেখিস বাছা আগুনের ব্যাপার খুব সাবধান।

রমেশকে নিয়ে গিয়ে রান্না ঘরে বসালাম,—আঁচটা ধরে এসেছিল, প্রণালী মত তরকারিটা রেঁধে দু' তিনটা রুটি তাড়াতাড়ি করে নিয়ে রমেশকে খেতে দিলাম। তারপর যখন বাকী ময়দা মেখে লেটি তৈরি

করছি সেই সময় কাকীমা এসে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমার দ্বারা এতদূর পর্য্যন্ত হয়ে উঠেছে দেখে কাকীমা হতবাক্! ছল্ ছল্ নেত্রে মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদের ভাষায় বিরাট একটা মন্তব্য প্রকাশ ক'রে আমার আকাঙ্ক্ষাকে আশান্বিত করে দিলেন। মেজকাকা রাত্রে খেতে বসে তরকারী সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করলেন না দেখে মনে আনন্দ পেয়ে ভাবলাম—তাহলে কাকীমার এই দিকটার ভারের লাঘবও কিছু করতে পারব। দাদু বলেছিলেন,—কর্ত্তব্য ভেবে সব কিছু করলে তবেই মানুষ—মানুষ হয়।

(১৩)

প্রথমের বড় অভিজ্ঞতা—

নিয়মিত শিক্ষা-সাধনা এবং কাজ-কর্মের মধ্যেদিয়ে দিনগুলি তর্ তর্ করে এগিয়ে যখন চৈত্রমাস এল তখন সেই মাসে পেলাম খুব বড় এক অভিজ্ঞতা এবং নিজের সাধনায় উৎসাহ ও আশীর্বাদ।

৺অন্নপূর্ণামাতার পূজাউপলক্ষে কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের কাছ থেকে মেজকাকা নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন। তাতে জানলাম ওই উপলক্ষ্যে সেখানে গান-বাজনার আসর হবে এবং স্বনামধন্য দেশ বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের পরিচালিত ও মহারাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা এবং কৃতিত্বানুযায়ী পারিতোষিক বিতরণ হবে। এই বিষয়ে মেজ-কাকাকে পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হবার অনুরোধ আছে এবং গানের আসরে গায়ক-যন্ত্রীরূপে সংগীত পরিবেশনেরও।

মেজকাকা কাকীমাকে বললেন,—সত্যকিঙ্করকে সংগে নিয়ে গিয়ে ওর গান শুনিয়ে আসব, এবং সেখানের বড় রকমের আসরে ওর অনেক উপকার হবে।

সত্যই, সেখানে বহু গুণীদের সংগীতাদি শ্রবণের মধ্য দিয়ে নানান গায়কীর বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যরূপ এবং বহুবিধ অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা সংগীত-জীবনের আদর্শকে বড় ও বলিষ্ঠ করে তুলে ধরার সুযোগ ও

সৌভাগ্য হয়েছিল। বড় বড় ওস্তাদদের গান বিশেষভাবে অন্তরে রেখাপাত করায় সাধনার পক্ষে বৃহৎ আদর্শকে অনুসরণ করে চলার উপায় যেন অনেকখানি খুঁজে পেয়েছিলাম।

যথাদিনে রওনা হয়ে বার দুই গাড়ী পাল্টে কাশিমবাজার ষ্টেশনে যখন আমরা নামলাম তখন ভোর হয়ে এসেছে। ওই দিনে আমাদের যাওয়ার কথা জানান থাকায় একজন রাজপ্রতিনিধি জুড়িগাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সম্বর্দ্ধনা সহকারে গাড়ীতে তুললেন আমাদের। সঙ্গীতজ্ঞদের থাকার স্থানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত সুব্যবস্থা করেছিলেন। সাজান ঘরে আরামপ্রদ শয্যাদির পরিপাটি বিন্যাস ও সুখ সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা মনকে মোহিত করে দিয়েছিল এবং খাওয়া-দাওয়া ও জলযোগাদির বিপুল আয়োজন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছলাম।

সেইদিনই গোঁসাইজীর ছাত্রদের বিকেলে পরীক্ষা হল। পরীক্ষক ছিলেন—বিখ্যাত রসাল ধ্রুপদী অঘোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বিখ্যাত ধ্রুপদী দৌলত খাঁ সাহেব, অতুলনীয় ব্যাঞ্জবাদক কৌকুভ খাঁ সাহেব, গায়ক ও সাধক কবি রামলাল দত্ত মহাশয় এবং মেজকাকা।

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন, উচ্চশ্রেণীতে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, গোপেন ঠাকুর এবং আরো দু'তিন জন। পরের স্তরে ছিলেন—ভুবনমোহন বাগচী এবং আরো তিন চার জন।

পরীক্ষকরা প্রথমে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের এক এক করে চৌতাল ও ধামার গাইতে বললেন। প্রত্যেকে যখন গাইতে লাগলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল আমিও যদি পরীক্ষা দিতে পেতাম তাহলে খুব ভাল হত। তারপর ছাত্রদের উপর যখন রাগবোধ, স্বরবোধ, স্বরলিপিবোধ, তালবোধ ইত্যাদির প্রশ্ন হচ্ছিল তখন বিলম্ব দেখে পেছন থেকে খুব আস্তে আস্তে মেজকাকাকে উত্তরগুলো গলায় সুর করে ও মুখে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। একটু দূরে থাকায় ছাত্ররা অবশ্য শুনতে পায়নি। উত্তরগুলো আমার দ্বারা নিখুঁত হচ্ছে দেখে অঘোরবাবু এবং রামদত্ত মহাশয় মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিলেন।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর পরীক্ষকরা আমাকে দেখিয়ে মেজকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেটি আপনার কে ?

কাকা বললেন—আমার খুড়তুত দাদার ছেলে—কয়েক মাস হল তিনি মারা যাওয়ায় আমার কাছে রেখে শেখাচ্ছি—খুব মেধাবী…।

পরীক্ষকরা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে যে সব কথা বললেন তা এখনও পরম সম্পদরূপে মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এবং তার সংগে গভীর শ্রদ্ধার সহিত অন্তরের আসনে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

সেইদিনেই রাত্রে গানের আসর বস্‌ল। আসরের জন্ম পৃথকভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন—নামকরা খেয়ালগায়ক মজঃফ্‌ফর খাঁ, নসিরখাঁ, বিখ্যাত টপ্পাগায়ক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোঁসাইজীর অগ্রজ ধুরন্ধর পাখোয়াজী কীর্তিচন্দ্র গোস্বামী, ভারত বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক—বৃন্দাবনের মাখনলাল চৌবে প্রভৃতি।

সঙ্গীতজ্ঞদের নির্বাচন গোঁসাইজীই করতেন। এতবড় আসর তখন এদেশে কোথাও হত না। মহারাজা অকুণ্ঠচিত্তে এই বাবদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। গায়ক-বাদকদের সম্মান স্বরূপ অর্থ গোঁসাইজীর নির্দ্ধারণ মত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম রাত্রের আসরে তিন-চার জনের সংগীত পরিবেশনে রাত ১২টা বেজে যেতেই মহারাজা অনুমতি নিয়ে যখন উঠবার উপক্রম করছেন তখন মেজকাকা তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ সহকারে বললেন—আমার এই ভাইপোটির একখানি ধ্রুপদ গান আপনাকে শোনাবার বড়ই বাসনা হচ্ছে,—যদি দয়া করে একটু বসে গাইতে অনুমতি দান করেন তাহলে ধন্ম হব।

মহারাজা আমার দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী হয়ে বললেন—এইটুকু ছেলে ধ্রুপদ গাইবে! আমি নিশ্চয়ই শুনব। তাঁর ইচ্ছেক্রমে মাখনলালজী বসলেন বাজাতে। একটু আগেই তাঁর অদ্ভুত তৈরি ও মিষ্টি বাজনা শুনে থাকায় মনে দ্বিগুণ আনন্দ ও উৎসাহ এসে গেছল। গুরুর দিকে তাকিয়ে আশীষ প্রার্থনা করে ধরলাম হিন্দোল রাগ, একটুখানি বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে আলাপ দেখিয়ে চৌতালে গান আরম্ভ করে' শেষে দুন-ত্রিগুন-ষট্‌গুন অতীত-অনাঘাত দেখালাম, তারপর খাম্বাজরাগে ধামারের গান গেয়ে শেষে তার উপর আট দশটা রকম রকম তেহাই যুক্ত বাঁট করে গান শেষ করেই গুরুর এবং গোঁসাইজীর পায়ের ধূলো মাথায় নিলাম।

সভার মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন এবং হর্ষোৎফুল্লের সৃষ্টি হয়ে গেল। এবং তার সংগে উৎসাহসূচক বহু কথা। গানের সময়েও এইরূপ হচ্ছিল। মহারাজা বললেন—এইটুকু বয়েসের ছেলের কাছে যে গান শুনলাম তা

আবার ধ্রুপদের মত এত বড় গান— এতে আমাকে বিস্মিত ও আশ্চর্য্য করে দিয়েছে, আগে জানলে আমি নিজে চিঠি দিয়ে খোকাকেও নিমন্ত্রণ করে আনতাম, এই বলে আমাকে কোলের কাছে একটু টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কথা বললেন। মেজকাকার চোখ তখন ছল্ ছল্ করছে। দৌলত খাঁ সাহেব থাকতে পারলেন না—আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রেখে উর্দ্দু ভাষায় কি সব বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগলেন। অত বড় গুণী ধ্রুপদীর কাছে এই আদর ও স্নেহাশীষ মহাসম্পদের মত লাভ করেছিলাম। এই গুণী ব্যক্তির সুমিষ্ট ভাবযুক্ত ধ্রুপদ গান এখনও কাণে লেগে আছে। আমি যত সংখ্যক ধ্রুপদীর গান শুনেছি তারমধ্যে দৌলত খাঁ, আলাবন্দ খাঁ, নসিরউদ্দীন খাঁ, অঘোরবাবু, গোঁসাইজী, মেজকাকা, অম্বিকাচরণ, মহিমবাবু প্রভৃতি এঁরা প্রকৃত সাত্ত্বিক ধ্রুপদী ছিলেন। সাত্ত্বিক খেয়াল গায়কও ছিলেন তখন অনেকেই— তারমধ্যে দু'চারজনের মুখস্থ নাম—যথা,—আহম্মদ খাঁ, ফজল খাঁ, নসীর খাঁ, বিষ্ণুদিগম্বর, গোপালবাবু, (নুলোগোপাল) পুলস্কর, গোঁসাইজী, অম্বিকাচরণ, প্রভৃতি। এবং এখনও অনেকে আছেন শিল্প রচনায় আরো উত্তম কৃতিত্বের উপর। এখনকার মত তখন শাস্ত্রীয় সংগীত রাস্তায় নেমে যায়নি বলে অর্থাৎ সাধারণকে নিয়ে টিকিট বিক্রির ব্যবসায়ে নেমে সেখানেই নাম ও টাকার ক্ষেত্র হয়ে পড়েনি বলে গায়ক-বাদকদের মধ্যে ভেজাল ঢুকেনি এবং নিজের ঘরাণা সম্পদকেই পরম পবিত্র এবং মর্য্যাদাবোধক বলে তাঁরা মনে করতেন।

আগে উদার হৃদয়বান উৎসাহদাতা গুণী এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এখন তার অনেক অভাব হয়ে পড়েছে। সংগীতকে ধরে থাকার প্রধান পরিচয় হল মহৎ হৃদয়। সেখানে গর্ব, অহংকার, হিংসা, দ্বেষ লোভ, লালসা, মাতব্বরির আগ্রহ এ সব প্রবেশ করতে পারে না, আদর্শ এবং কর্ত্তব্যই সেখানে সর্বদা উপস্থিত থাকে। মহৎ হৃদয় গড়ে উঠে যদি মনকে সর্বদা উর্দ্ধে রেখে সেই তাঁর দিকে দৃষ্টি দিয়ে সংগীত সাধনা করা যায় তবেই।

পূর্ব প্রসঙ্গে—কাশিমবাজার রাজবাটীতে সেই তার পরের দিনই ছিল ৺অন্নপূর্ণামাতার পূজা। সকাল ৮টার সময় সঙ্গীতের দ্বিতীয় অধিবেশন সুরু হল। চলল বেলা ১টা পর্য্যন্ত। তৃতীয় আসর সন্ধ্যা ৬৷৷০টা থেকে রাত ১২টা পর্য্যন্ত। দু বেলাই আমি সমানে স্থির হয়ে বসে কাণ ও মনের

ক্ষুধা মিটিয়েছিলাম পরম তৃপ্তির উপর।

সেদিন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণাদি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোজনের যেরূপ অভূতপূর্ব আয়োজন দেখেছিলাম তা সত্যই বিস্ময়কর। এ রকম বৃহৎ ও বিপুল আয়োজন দেখাও সৌভাগ্যের মত।

এই প্রসঙ্গে খাবার আয়োজনের নূতনত্ব নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় আছে শিল্প রচনার উপর। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার স্বর্গতঃ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের পাকা দেখা উপলক্ষে জলযোগের মধ্যে এক অভিনব আয়োজন দেখে আশ্চার্য্য ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। পাত্র ও কন্যাপক্ষের প্রায় একশ'র মত আমরা সেই জলযোগের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলাম। রকম রকম তৃপ্তিদায়ক খাদ্যবস্তুর সংগে প্রত্যেকের জন্য এক একটি মার্বেল পাথরের পাত্রের উপর ফলের দ্বারা এক একটি জিনিস তৈরি হয়ে রাখা ছিল— যথা—লম্বা শাঁখআলুর দ্বারা তানপুরা, আনারসের পাতলা টুকরো দিয়ে চাপগঁদার ফুল, ছানা ও শশাকে করা হয়েছিল হাঁস ও ঘাস,—ছানার হাঁসটি শশার ঘাসে বসে ডিম পেড়েছে, আকদিয়ে মন্দিরের চুড়ো, আপেল দিয়ে গোলাপ ফুল, খেজুর দিয়ে ভ্রমর, পেঁপে দিয়ে নৌকা-ইত্যাদি। ফলের উপর এরূপ শিল্প রচনা আর কোথাও দেখিনি এবং শুনিওনি। শিল্পকলার উপর গৃহপরিজনদের কত গভীর অনুরাগ, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা এবং পরিকল্পনার রচনাশক্তি ছিল তারই পরিচয় এই সব সৃষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে দিয়ে দেখার সুযোগ এসেছিল।

পাত্রের বড়দাদা মন্মথবাবু বললেন—বাড়ীর বৌএরা সমস্ত রাত ধরে ফলের দ্বারা এই জিনিসগুলি তৈরি করেছেন।

দু' একজনের জন্য নয়—প্রায় একশ লোকের জন্য এইরকম শিল্প রচনার ধৈর্য্য এবং প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরিশ্রম,— বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

কাশীমবাজারে অভিজ্ঞতার কথা বলবার মত আরো কিছু,—

সেদিন দুপুরে খাওয়ার সময় প্রত্যেকের কাছে মহারাজা হাতজোড় করে বলছিলেন—এটা নিন্—ওটা আরো নিন্—চেয়ে চিন্তে নেবেন, কোন ত্রুটি নেবেন না ইত্যাদি। নিমন্ত্রিতদের প্রতি ওই রকম আন্তরিক বিনয় বাক্য একজন প্রভাব ও প্রতাপশালী মহারাজার কাছে শুনতে পাওয়া খাওয়ার তৃপ্তির চেয়ে আরো বেশী তৃপ্তিদায়ক। সত্যই তিনি শুধু সিংহাসনের মহারাজা ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কর্ত্তব্যপরায়ণ, মহানুভব, ধার্মিক ও জনদরদী। তাঁকে দেখে ও তাঁর আচার ব্যবহারে মনেই

হত না কিছুমাত্র রাজগর্ব আছে। এইসব গুণাবলীর জন্য তিনি সকলের প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন। এইসব মহাত্মাদেরই জীবনের নীতিধারা মানুষের প্রকৃত শিক্ষায় আসে।

সেদিন বেলা দুটোর সময় কাঙালী বিদায় হচ্ছে শুনে গোঁসাইজীর এক ছাত্রর সংগে গেলাম দেখতে। এক বিরাট পাঁচির ঘেরা খামারবাড়ীর কাছে পৌঁছলাম। তার ভেতরে কাঙালীতে ভর্ত্তি হয়ে আছে। গেটের পাশে স্তূপাকার হ'য়ে চিঁড়ে-মুড়কী ও মেঠাইএর বস্তা। দরজা দিয়ে এক একজন বেরিয়ে যাচ্ছে আর তাকে দেওয়া হচ্ছে বড় মালসায় ভর্ত্তি করে চিঁড়ে-মুড়কী, চারটে বড় বড় মেঠাই এবং চার আনা পয়সা। তত্ত্বাবধানের জন্য মহারাজা দাঁড়িয়ে আছেন বিতরণকারীদের কাছে। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে নিলেন। তারপর এক সময় একটি স্ত্রীলোক তার ছোট শিশুটিকে কোলে নিয়ে ওই দ্রব্যগুলি পেয়ে চলে যাবার মুখে মহারাজার নজরে পড়তেই বললেন—ওর ছেলেটির জন্য তো কৈ দেওয়া হল না? দিন্ ওর ছেলের জন্যও সমানভাবে,—ও খেতে না পারলেও ওর মা'কে তো এখন বেশী করে খাওয়া দরকার!

স্ত্রীলোকটি মহারাজার দিকে পরমশ্রদ্ধার সহিত মাথা নামিয়ে দরদী দেবতার মত মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতাশ্রু দেখিয়ে চলে গেল।

বুঝবার বয়সে ওই ঘটনাটিতে মহারাজার কি হৃদয় ছিল তার কথা স্মরণে এলেই মনে হয় জীবন গঠনে এইসব দৃষ্টান্তই তো সবচেয়ে সহায়ক। এই সংগে এ কথাও ভাবি,—প্রতিপালক যাঁরা তাঁরা যদি ওইরূপ দয়ালু ও দৃষ্টিবান হন তবেই তাঁদের সেই যোগ্যস্থানে বসার সার্থকতা থাকে।

শুনলাম,—কাঙালী বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাজা আহারাদি করেননি। কারণ—৺পূজায় ব্রত পালন তো ওইখানেই প্রধান হয়ে থাকে। কি আশ্চর্য্য! চৈত্রমাসের ওই গরমে বেলা দুটো থেকে ওইখানে সমানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদায় তদারক করেছেন। তাই ভাবি যে দেশ এত আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করেছিল তার আজ এই দশা কেন হল? পরের দিন ঠিক বেলা ১২টার মধ্যে কাঙালীদের পাত পেতে খাওয়ান হবে, একথা শুনলাম একজনের মুখে। একেই বলে ৺অন্নপূর্ণা পূজার যথারীতি বিহিত ব্যবস্থা।

মহারাজার আর একটি বিষয়ের উপর বিচারবোধ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি গানের প্রত্যেক আসরে এসে বসতেন এবং একাগ্রচিত্তে

শুনতেন। শাস্ত্রীয় সংগীত তিনি খুব বেশী বুঝতেন তা নয়, তবে তার আদর্শের প্রতি এবং চর্চারত ব্যক্তির প্রতি যে কর্তব্য আছে তাতে তাঁর কোন ত্রুটি ছিল না। আসরে তাঁর জন্য রাজাসন পাতা থাকত কিন্তু তিনি এসেই বাঁ হাতে করে সরিয়ে দিয়ে সকলের সংগে একাসনে বসতেন। আবার এমন কোন কোন মহারাজের এবং হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের ফাঁপা অহংকার ও দাম্ভিকতা দেখেছি,—ভারতবিখ্যাত গায়ক গান করছেন নীচে বসে—(তিনি আবার খুব বড় ষ্টেটের তখনকার গায়ক) আর দেশের এক মহারাজা শুনছেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কোচে বসে গায়ককে পায়ের তলায় রেখে। অবশ্য গায়কেরও ছিল মর্য্যাদাবোধে একান্ত অভাব। তা না হলে ওই রকমভাবে কদাচ গাইতেন না,—সাম্রাজ্যের বিনিময়েও নয়। আমরা আসল বস্তুকে হারিয়ে এসেছি তাই তার সুযোগ এইসব পদগর্বী শ্রোতারা নিয়ে এসেছে।

ওখান হতে তার পরের দিন আমাদের সন্ধ্যার ট্রেণে ফেরা হবে তাই সকালে গায়ক-বাদক এবং ছাত্রদের একসংগে আলোকচিত্র তুলার ব্যবস্থা ছিল—মহারাজকে মাঝখানে রেখে।

যথাসময়ে মহারাজ এসে বসেই মেজকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন—গোপেশ্বরবাবু আপনার ভাইপোটি কৈ ?

ফটো তুলা দেখব বলে পেছনে অল্প দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। মেজকাকা এদিক ওদিক তাকিয়ে তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন। কাছে আসতেই মহারাজা তাঁর কাছে আসতে বললেন।

সকৌতুকে সকলে দেখতে লাগলেন। আমি অতি সঙ্কোচসহকারে কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াতেই মহারাজা টেনে নিয়ে কোলের কাছে বসিয়ে আমার হাত দুটো ধরে ফটোগ্রাফারকে বললেন—এবার তুলুন।

কোরা মোটা সুতার কোট ও অতি সাধারণ ধুতি পরা অবস্থায় একটি সাধারণ এগার বছরের ছেলের এই সৌভাগ্য যেন স্বপ্নের মত হয়েছিল।

ওই ফটোটি সংগ্রহের জন্য সেখানকার বিশিষ্ট রাজকর্মচারীকে মেজকাকা কয়েকবার পত্র লিখেছিলেন, তিনি পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি করে শেষ পর্য্যন্ত পাঠাতে বোধ হয় ভুলেই গেলেন। ফটোটি সকলকে দেখাবার জন্য মেজকাকার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, বিশেষ করে মা ও দাদুকে। দেবতা-সদৃশ মহারাজাকে লিখলে সত্বর পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন কিন্তু তা ত উচিত হয় না।

(১৪)

মন ও নীতির সংঘর্ষ—

কাশিমবাজার হতে ফিরে এসে যথারীতি নিয়মে শিক্ষা-সাধনা ও সংসারের কাজকর্ম করে যেতে লাগলাম। সেই সময়ের আর মাসখানেক পরেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই আমাদের দেশে যাওয়া হবে বলে তার বিপুল আগ্রহের চিন্তা অল্প অল্প করে বেড়ে চলে মনকে অধৈর্য্য করে তুলতে লাগল। যাবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হতে থাকল ততই যেন সময় আর ফুরোতে চায় না।

এর মধ্যবর্ত্তী সময়ে আমার দ্বারা অন্যায় বলে পরিচিত একটা কাজ ঘটে গেল।

তার পরিচয়,—বাজারের দোকানে সুজি, চিনি, ময়দা, সোনামুগের ডাল কিনতে গিয়ে কেবলই মনে হত এগুলোর কিছু কিছু মা,—দাদুদের জন্য বাড়ী যাবার সময় যদি কিনে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে মনটায় খুব আনন্দ আসত,—কিন্তু পয়সা কৈ? আসবার সময় মা'এর দেওয়া আট আনার মাত্র চার আনা আছে,—আর দোলের সময় মেজকাকার দেওয়া দু' আনার সবটাই আছে। অন্তত: কিছু আরও হলে ওই জিনিসগুলি কিনতে পারা যেত। চিন্তা করে দেখলাম কাকীমা প্রত্যেকের জন্য সকালে জল খাবার আনতে দু' পয়সা হিসেবে যা দেন তার থেকে বাড়ী যাওয়ার দিন পর্য্যন্ত আমার দরুণ ওই দু' পয়সা বাঁচাব, সকালে কিছু খাব না। সঙ্কল্পমত পরের দিন কাকীমা দু' পয়সার কম মিষ্টি দেখে জিজ্ঞেস করলেন—মিষ্টি কম কেন? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে ফেললাম—দোকানী আমাকে আজ মিষ্টি খেতে দিয়েছিল, এই বলে সরে পড়লাম, পয়সা দুটি ফেরত দিলাম না।

পর পর দু' দিন এই রকম অবুঝের মত কাজ করায় মেজকাকার কাছে নালিশ গেল—আমি বিশ্বাস নষ্ট করে' অসৎ হয়ে পড়েছি।

সকালে গান শিখতে বসেছি সে সময় কাকা খুব বিমর্ষ মুখে ওই কৃতকর্মের জন্য নীতি-বাচক বাক্যের দ্বারা তিরস্কৃত করলেন। সেই বাক্য-গুলির প্রত্যেকটি আমার অন্তরস্থ বস্তুর উপর আক্কেল দিতে লাগল। এরকম কাজে কখনও যাইনি—তাই ভীষণ ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম।

মনে মনে তখন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এরূপ কাজ জীবনে আর কখনও করব না,—মিথ্যা যে এত খারাপ তার প্রমাণ সেই আমার প্রথম জানা হয়েছিল।

সেদিন কম বয়সের দরুণ চোখ দুটোকে সামলাতে পারিনি,—অন্তরের কোন্ এক গভীর স্থান হতে তীব্রভাবে তার লজ্জা-বেদন-বেগ উদ্গত হয়ে চক্ষুতারকার চতুর্দিকে জলপ্রপাতের মত তার শ্রোত বেয়ে যেতে লাগল।

আমার সক্রন্দন ভীতিবিহ্বল চেহারা দেখে মেজকাকা দুঃখ পেয়ে মমতাযুক্তস্বরে বললেন—কানড়ারাগের চৌতাল তালের 'চঢ়ো চিরঞ্জীবশাহ……।' গানটা সেদিন তোমার খুব ভাল লেগেছিল—কৈ শেখতো দেখি—অতবড় কঠিন গানটা আয়ত্তে আনতে পার কি-না ?

আমার সে সময় এমন একটা আগ্রহ এসে গেছল যে, মনে করলাম গানটা যত শীঘ্র পারি শিখে নিয়ে কাকাকে সন্তুষ্ট করব,—স্নেহটুকু যেন নষ্ট না হয়ে যায়—তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভগবানের কৃপায় সমস্ত গানটা খুব কম সময়ের মধ্যেই শিখে নিয়ে মুখস্থ শুনিয়ে দিতে পারলাম। অবশ্য শেখবার সময়ও চোখ দুটো থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল,—সেজন্য ও দুটোর উপর ভীষণ রাগ এসে মনে হয়েছিল চোখ না থাকলেই ভাল হত।

যাইহোক্—খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারা দেখে মেজকাকা খুব খুসী হয়ে আনন্দের উপর একটা বড় রকমের মন্তব্য প্রকাশ করায় আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলাম। তবে এই কাণ্ডটার জন্য আমার মনে তিন চার দিন একেবারেই সুখ ছিল না, কেবলি মনে হত কি যেন ভিতরে স্ুঁচের মত একটা ফুঁড়চে। এক এক সময় মনকে এই বলে সান্ত্বনায় আনবার চেষ্টা করতাম যে, ভগবান তো জানেন আমি ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করে আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে আমার বরাদ্দ জলখাবারের দুটি পয়সাই তো সঞ্চয় করতে গেছলাম, আমি তো জানতাম না এতে চৌর্য্যবৃত্তির অপরাধ আসে।

এই ঘটনার পাঁচ-ছ'দিন পরে এলেন রাত্রে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী—মেজকাকাব গান শুনতে। তাঁর গানের পর আমার পরিচয় পেয়ে শুনতে চাইলেন আমার গান। যাবার সময় খুসী হয়ে আমার হাতে জোর করে দু'টি টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন—মিষ্টি কিনে খাবে।

টাকা দুটির দ্বারা সেই জিনিসগুলি কেনার সুযোগ এসে গেল।

মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ভগবানই পূরণ করে দিয়েছিলেন।

তারপর দেশে যাবার দিন একেবারে সামনে এসে গেল। অর্থাৎ পরের দিন আমাদের যাওয়া হবে। আগের রাত্রে একেবারেই ঘুম ধরল না। একাদিক্রমে সাত মাস থাকার পর বাড়ী যাচ্ছি। সুতরাং তার আনন্দে ঘুম এল না, কেবল মনে হচ্ছিল কখন সকাল হয়।

পরের দিন তাড়াতাড়ি খাওয়া-দেওয়া সেরে বেলা ১০টার সময় আমরা ষ্টেশনে এলাম। একটু পরেই ট্রেন এসে গেল,— সকলে উঠে পড়লাম।

ট্রেন চলতেই আনন্দে মন তখন যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তার স্বরূপ বর্ণনায় আসে না।

ট্রেনের গতিবেগ এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে থামা দেখে মন ভীষণ অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল খুব জোরে ছুটে একেবারে দেশের ষ্টেশনে থাম্‌তো তো খুব ভাল হত।

বার দুই গাড়ী পাল্টে রাত ১০টায় বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে নামলাম। ঘোড়ার গাড়ী চলতে সুরু করল গৃহের পথে। ঘোড়া দুটো খুব মন্থরগতিতে পা চালাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছিল চালক বেদম মার দিয়ে ওদের পা'গুলোকে দ্রুতলয়ে নিয়ে চলুক। কিন্তু কি করবে ও বেচারিরা! ওরা যদি আমার মনের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করত তাহলে হয়তো ওই রুগ্ন দেহ ও কৃশচরণ নিয়েই গতিলয়ের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিতো।

দেশে যাবার দিনস্থিরের সংবাদ আগেই বাড়ীতে জানান হয়েছিল। ঘোড়ার গাড়ী বাড়ীর নিকট এসে পড়তেই দেখতে পেলাম—মা, দাদু, বুড়োদিদি প্রভৃতি দাঁড়িয়ে আছেন,—গাড়ী থেকে এক লাফে নেমে ছুটলাম তাঁদের কাছে। সকলের পায়ের ধূলো মাথায় নেবার জন্য যখন তাঁদের চরণ স্পর্শ করলাম তখন যে কি তৃপ্তি এসেছিল—সে কথা বলে বুঝান যায় না। মনে হচ্ছিল কতদিনের অদর্শনের শ্রেষ্ঠবস্তু। সকলেরই তখন আনন্দোজ্জ্বল মুখ। মাকে জড়িয়ে ধরে তৃপ্তির কান্না এসে গেছল।

তারপর ৺শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সকলের সংগে যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম—তখন মনে হল আমার আকুল প্রাণের তৃপ্তি ও কামনার সর্বশান্তিময় নীড়ে ফিরে এলাম।

(১৫)

রাঁচী অভিমুখে—

বাড়ীতে এসে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মেজকাকা কাশিমবাজারের ঘটনায় আমার গান সম্বন্ধে এবং ফটোতুলার বিষয় দাদুকে সবিস্তারে জানালেন খুব উৎফুল্ল হ'য়ে। সেই সমস্ত কথা মায়ের কাছে বলতে বলতে দাদুর চোখে জল এসে গেল। মা বিমুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রাখলেন নির্ব্বাক আশিস দিয়ে।

এতদিন পরে বাড়ীতে এসে মায়ের কাছে দশ দিনের বেশী থাকা হল না, দাদু নিয়ে গেলেন রাঁচীতে—গান শুনিয়ে কিছু উপার্জন যদি হয় সেই আশায়। তাছাড়া তিনি জানতেন ছোট থেকে পাঁচ জায়গায় নিয়ে গেলে অনেক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ লাভ হবে।

জীবনের দীর্ঘকাল ধরে নিজের ব্যবসায়ে দাদু খুবই পরিশ্রম করে আসায় এবং বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর উপার্জনের উদ্যম শিথিল হয়ে যাওয়ায় আমাকে দিয়ে সংসারের বোঝা কিছুটা বইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঠাকুরদা ছাড়া আমাদের আর কেউ প্রতিপালক ছিল না। তাই তাঁর দেহের তরী জীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্বেও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় শক্ত হাতে হাল ধরে থাকতে হয়েছিল। একমাত্র যিনি আপন কাকা সেই কাকা তাঁর প্রচুর উপার্জন ও প্রতিষ্ঠার সময় বাবা থাকতেই পৃথক হয়ে যান। অবশ্য সংসারের স্বার্থ ও অর্থের মোহবন্ধন তাঁকে বেশী দিন জড়িয়ে রাখতে পারে নি। বাবার মত যোগের ক্রিয়া নিয়ে সেই পথে অগ্রসর হবার একাগ্রতায় সংসারের মায়া থেকে সরে আসেন এবং যোগ ও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধির স্তরে পৌঁছে যান। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন বড়দরের গায়ক, পণ্ডিত ও যোগী।

এই কাকা একদিন বাবার গুণকথন প্রসঙ্গে বলেছিলেন—দাদার পাণ্ডিত্য ছিল গভীর জ্ঞানের উপর। ষড়দর্শন, পুরাণ, ভাগবত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তাছাড়া সংগীতে কিরূপ দখল ছিল সে তো তুমি কিছু জান। গানে আমাদের মত বড় একটা তালিম্ নিতেন না,—শুনে শুনেই তাঁর তালিম নেওয়ার চেয়ে বেশী কাজ হয়ে

যেত। আশ্চর্য্য রকমের তাঁর বুদ্ধি প্রতিভা ছিল।

ভারতের বিভিন্নস্থান হতে সংস্কৃতের নানান মূল্যবান গ্রন্থ ভি-পি-যোগে আনান তাঁর নিয়মিত নেশার মত ছিল। নূতন গ্রন্থ আসামাত্র আহার নিদ্রা ভুলে তার পাঠে মগ্ন হয়ে থাকতেন। মনে রাখার শক্তিও ছিল অদ্ভুত। বহুক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় যে কোন বিষয়ের দ্বন্দ্বে তিনি উপস্থিত হয়ে পড়লে তার মীমাংসা করে দিতেন অল্পকথায় অকাট্য যুক্তি দিয়ে। নিজেকে কিন্তু জাহির করতে তিনি কোন দিনই চাননি। দেখেছি শ্রোতাবুঝে তাঁর ভাগবত (কথকতা) পাঠ এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হত যে হৃদয়ঙ্গম করতে ও তৃপ্তি লাভে কারো অসুবিধা হত না। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন—নির্বিরোধ—উদার এবং নির্বিকার পুরুষের মত।”

এখন রাঁচীর কথায় আসি,—যথা দিনে আমি ও দাদু রাঁচীতে গেলাম, এবং উঠলাম আমাদের দেশের রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ আরকত (কায়স্থ) মহাশয়ের বাড়ীতে। ইনি ওখানের তখন বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী।

দু'চার দিন থাকার পর বৈকুণ্ঠবাবু বাঙালী সঙ্ঘ সমিতিতে আমার গানের জন্য আসরের ব্যবস্থা করলেন।

সমিতির সভ্যরা ঠুম্‌রী ছাড়া শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যান্য শ্রেণীর গান ফরমাস্ করে বহুক্ষণ ধরে শুনলেন এবং শুনে সকলেই খুব উৎসাহ প্রদান করলেন। দাদুও গাইলেন বাংলা খেয়াল এবং টপ্পারসুরে বাংলা গান।

শেষে একটি পাত্রের উপর সকলেই কিছু কিছু দিয়ে পাইয়ে দিলেন প্রায় একশ' টাকার মত। এত টাকা পাওয়া যাবে তা ভাবতেই পারিনি। ওই টাকা এখনকার পনরশ' টাকার মত। সমবায় পদ্ধতিতে আগে অনেক বিষয়েই এই রকমভাবে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। এবং ছিল তখনকার লোকের উৎসাহদানে আগ্রহ, কর্তব্যবোধ এবং গুণগ্রহণের ক্ষমতা ও বিচারের শক্তি। সে সময়ে অতি সাধারণ গায়ক বাদকরা দেশের নানান স্থানে এবং পল্লীতেও কেবল গান-বাজনা শুনিয়ে অর্থ উপার্জনের দ্বারা সংসার পালন করে গেছেন।

রাঁচীতে ওই আসরের পর থেকেই সহরের নানা স্থানে গানের আসর হতে লাগল। তবে টাকার অংক দশ-পনের-র বেশী আর ছিল না।

সে সময় একদিন এলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার উদ্দেশ্যে।

বিরাট মণ্ডপের ভেতর মঞ্চোপরি তাঁর যেদিন বক্তৃতা হল সেদিন মাননীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়েরা উপস্থিত ছিলেন। ব্যবস্থা ছিল সভার শেষে আমার গান হবে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র বসলাম হাটুগেড়ে তানপুরা নিয়ে গাইবার জন্য। খুব কৌতুহলী হয়ে ঠাকুর মহোদয়েরা চেয়ার টেনে নিলেন আমার কাছে। আগে থাকতে বলে রাখা ছিল তাই বক্তৃতা দিয়েই রাষ্ট্রগুরু চলে গেলেন না, তিনিও কাছ বরাবর বসলেন।

একখানা গান গেয়ে থেমে যেতেই ঠাকুর মহোদয়েরা আরো দু' একটা গাইতে বললেন। শেষ হবার পর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্নেহের স্পর্শ দিয়ে পিঠ চাপড়ে আশীর্বাদ করলেন, ঠাকুর ভ্রাতারা আদর করে কাছে টেনে নিলেন। আমার ঠাকুরদাকে তাঁরা বললেন—তাঁদের ওখানে কাল সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে গান শুনাতে হবে।" দাদু খুব খুসী হয়ে সম্মতি দিলেন।

পরের দিন বেলা থাকতে থাকতে টাঙ্গায় করে আমরা গেলাম—রাঁচী হতে দু' তিন মাইল দূরে ঠাকুর ভ্রাতাদের বাসস্থানের দিকে।

পৌঁছে স্থানটির মনোরম শোভা দেখে মন পুলকে ভরে গেল। পাহাড়ের উপর নির্মিত বাড়ী, স্বভাব সুন্দর গুহা এবং অন্যান্য স্থান ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমরা আসতেই ঠাকুর ভ্রাতারা সাদরে গ্রহণ করে এই সব স্থান দেখাতে লাগলেন। অমন দুটি বিরাট পুরুষের সংগ লাভ ও স্নেহাদর পাওয়া সংগীতের জন্যই। সংগীতবোদ্ধা সম্রাটের কাছেও সংগীতচর্চারত ব্যক্তির মূল্য থাকে যদি পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। এই সৌভাগ্যই হল পাওয়া বস্তুর আসল। আগে এরূপ সৌভাগ্য ঘটার সুযোগ আসত সহজেই, এখন একান্তই দুর্লভ। এর কারণ বোধশক্তির অভাব না থাকলেও হৃদয়ের প্রসারতার অভাব এখন খুব বেশী এসে গেছে।

সন্ধ্যার পরই আমার গান আরম্ভ হল। ঋষির মত দুই ভ্রাতা শুনতে বসলেন। দু'খানি গান গাইবার পর জ্যেষ্ঠ মহোদয় বললেন—তুমি কেদারা-হাম্বীর এবং কামোদ-ছায়ানট শিখেছ? শিখেছি বলতেই—বললেন—আচ্ছা প্রথম দু'টির ও শেষের দু'টির মধ্যে পার্থক্য কিরূপ এবং ও গুলোর আরোহণ-অবরোহণ, ঠাট্‌, বাদী-সংবাদী কি তা যদি জেনেছ

তাহলে বুঝিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটির গান গাও তো দেখি!

আমি শিক্ষামত সমস্ত বলে ও দেখিয়ে তারপর প্রত্যেকটি রাগের খেয়াল গেয়ে তান-বাঁট করে শেষ করলাম। তখন নিজের থেকেও কিছু কিছু তান-বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। গান বন্ধ করতেই ঠাকুর ভ্রাতারা খুব আশ্চর্য্য হয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন এবং ঠাকুরদা'কে আমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেক আশার কথা জানালেন। একথাও বললেন,—শিক্ষার এই রকম পদ্ধতিই শিক্ষার্থীকে গুণী করে তুলে। শিক্ষাদানে এইরূপ দক্ষতা ও নীতিজ্ঞান বিষ্ণুপুর ঘরাণার এক অদ্ভুত পরিচয়। কতকগুলো গান শিখলেই রাগ-সংগীত শেখা হয় না···।"

বলাই বাহুল্য—শাস্ত্রীয় সংগীতে এঁদের জ্ঞান ও বোধশক্তি ছিল খুব উচ্চস্তরের। সেদিন ঋষির মত এই দুই মহানব্যক্তির আশীর্বাদ আমার কাছে ভগবৎ প্রদত্ত বলে মনে হয়েছিল এবং জীবন ধন্য হয়ে গেছল। এইসব মহাত্মা ব্যক্তিদের অভাব এখন খুবই অনুভূত হয়।

সেদিন ঠাকুরদা'রও দু' তিনটি গান হয়েছিল। তাঁর শাবলীল তান-বৈচিত্র্যযুক্ত ভাব সমৃদ্ধ বাংলা গান উক্ত দুই ভ্রাতাকে মুগ্ধ করেছিল। আসরে শুধু আমারই গান হত না—ঠাকুরদা'ও দু' একটা গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তুলতেন।

রাঁচীতে দিন ষোল থেকে বাড়ীতে ফিরে এলাম অনেক কিছু সঞ্চয় করে। মায়ের কাছে থাকার বেশী দিন সময় আর রইল না। কাকার ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল,—দু' চারদিন পরেই আমরা বর্দ্ধমানে চলে এলাম।

(১৬)

গন্তব্যপথে অগ্রসর—

গরমের ছুটীর পর বর্দ্ধানে এসে ৺দুর্গাপূজার কাছাকাছি তারিখে পৌছা পর্য্যন্ত অনেকগুলি রাগের বেশ কিছু ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, তেলানা ইত্যাদি আয়ত্তে আনতে পারলাম। দু'বার আসা-যাওয়ার এ সবের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। যেদিনই শিখতে পেতাম—সেদিনই

একটা সম্পূর্ণ ধ্রুপদ গান কিংবা খেয়াল গান ও তেলানা মিলে দুটো শেখা হয়ে যেত।

কাকা ছিলেন শিক্ষাদানে এক উদার ও অকৃপণ আদর্শ গুরু। সংগ্রহে ছিল তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁর বহুসংখ্যক হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি রচনার মধ্যে সুরের উপর যেরূপ স্বরসংস্থাপনা ও বন্দেজ আছে তা খুবই উচ্চস্তরের। এইসব গানের মধ্যে প্রথম সময়ের অনেকগুলি ধ্রুপদ গানে তিনি প্রাচীন বিখ্যাত গায়কদের নাম দিয়েছিলেন গানের ভনিতায়। তাঁর ধারণা ছিল নিজের নাম থাকলে লোকের কাছে সমাদৃত হবে না। এ ধারণা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ আমি সেই সময়েই এক আসরে পেয়েছিলাম। ইমন-কল্যাণ রাগের উপর আড়াচৌতাল তালে একটি ধ্রুপদ রচনা করে আমাকে শিখিয়ে দেন এবং ওই গানটি স্বরলিপি করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সম্পাদিত 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামক মাসিক পত্রে পাঠিয়েছেন অন্যের নাম দিয়ে। যথাসময়ে গানটি প্রকাশিত হয়। সেই ওই আসরে একজন বিখ্যাত গায়ক ওই গানটি পরিবেশন করেন। আসর শেষে মেজকাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—এই গানটি আপনি কোথেকে সংগ্রহ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন—শিবনারায়ণ মিশ্রজীর কাছে শিখেছি। শিবনারায়ণজী ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক—কাশীঘরাণার। আমি মেজকাকাকে বলেছিলাম—আপনি কেন গানটির সত্য পরিচয় দিলেন না? ওরকম মিথ্যাতে তখন আমার খুব রাগ হয়েছিল সেই গায়কের উপর। মেজকাকা আমাকে যে সুন্দর জবাব দিলেন তা আমার মনে বেশ একটি শিক্ষনীয় বস্তু হয়েছিল। মেজকাকা বললেন—অতবড় গায়ককে কি অপদস্থ করতে পারি? আমার স্বরচিত সংবাদ না থাকায় কত উপকার হয়েছে বল দেখি! আমার রচনার সার্থকতা উনি এনেদিয়েছেন স্বরলিপি দৃষ্টে ওই গানটি তুলে এত বড় আসরে গাওয়ার জন্য। রচনাসৃষ্টির প্রচেষ্টায় অজান্তিকের উপর এই প্রমাণ আমাকে উৎসাহিত করবে।" আমি দু'শর মত যে সব হিন্দী খেয়াল এবং তার সংগে ঠুম্‌রী, ভজন রচনা করে এসেছি এবং শিখিয়ে এসেছি তাতেও অনেকক্ষেত্রে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। শিক্ষার্থী বয়স্কদের কাছে গানগুলির সৃষ্টি পরিচয়ে প্রাচীন উল্লেখ রাখাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছি। তাঁরা বলেছেন খুব উন্নত বন্দেজের গান। নিজের রচনা বললে হয়ত কেন সত্যই এই স্বীকৃতি আসত না—

উন্নাসিকতাই আসত। অবশ্য আমার গানে অন্যের ভনিতা নেই। মেজকাকার বেনামে রচিত গানগুলি কোন্ কোন্ তা আমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ তেমন জানেন না। আমার বর্দ্ধমানে থাকার সময়ই বেনামে রচিত গানগুলি বেশী প্রচার করেছিলেন। অন্যের নামে ভনিতা থাকলে স্বনামে আনার আর উপায় থাকে না। আমার মনে হয় প্রাচীন গানের মধ্যেও এরকম অবস্থা হয়ত ঘটে এসেছে। আমাদের সীমাবদ্ধ ভক্তি-প্রীতিই এই অবস্থাকে নিয়ে এসেছে।

পূজা এসে গেল, কাকাদের সঙ্গে সেই রকম বিপুল আনন্দ নিয়ে দেশে এলাম।

কাকাদের ৺কালীপূজার বৃহৎ আসরে আমারও গান হল। গান শুনে সকলের আনন্দ দেখে ও উৎসাহসূচক বাক্য শুনে মেজকাকা তখন আনন্দের সহিত বললেন—সত্যকিঙ্কর যে এত শীগ্‌গীর এমন গাইতে সক্ষম হয়েছে তার কয়েকটি প্রধান কারণ—সাধনায় অদম্য নিষ্ঠা—অধ্যবসায় এবং আমার প্রতি তার অদ্ভুত ভক্তি ...।" গোঁসাইজীর অগ্রজ বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদ্যবিদ্ কীর্ত্তিচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালেন- হবে না কেন—কেমন ঘরের ছেলে, ওদের ঘরই তো গায়কী ঢং-এর উত্তম ঘর—তাই এইসব গুণ পেয়েছে।" মেজকাকাও একথা স্বীকার করতেন। কাশিমবাজারের ঘটনার কথাও মেজকাকা সবিস্তারে সেই আসরে সকলকে বললেন।

এই ছুটীতে দাদামহাশয়দের কাছে গিয়ে দিন কয়েক থেকে এসেছিলাম। সেখানের বহু সংগীত অনুরাগী ব্যক্তি দু'বেলাই আমার গান শুনবার জন্য আসর করতেন।

এবারে কাকীমার আসন্ন প্রসব সময় হয়ে আসায় তাঁকে বিষ্ণুপুরে থাকতে হল। মেজকাকার সংগে শুধু রমেশ ও আমি বর্দ্ধমানে এলাম।

বাসাতে ঠিকে ঝি সব কাজ করে দিত। রান্না কাকীমাই করতেন। রান্নার ভার মেজকাকাকে নিতে দেখে,—আমি তাঁকে একাজ কোনমতেই করতে দিলাম না,—নিজে সেই দায়িত্ব নিলাম। সংসারের অনেকগুলি কাজ করে যাওয়ার সংগে রান্নার কাজ যুক্ত হল।

রমেশ স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে—ন'টার মধ্যে তাকে খেতে দিতে হবে। সুতরাং সেই সময়ের সাধনার ব্যবস্থা আমাকে রান্না করার মধ্যেই করে নিতে হল। রান্নার আগে থাকতে তানপুরাটা সেখানে এনে রাখতাম।

এক একটা জিনিসের রান্নার জন্য আগে থাকতে সমস্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে একটাকে উনুনে চাপিয়ে দিয়ে সিদ্ধ হতে যতটা সময় লাগত সেই সময়টায় কোন একটা গান সেধে নিতাম। এই রকমভাবে ভাত ও ডাল রান্নায় প্রায় এক ঘণ্টা সময় পেয়ে যেতাম গলা সাধবার জন্য। সব মিলিয়ে রান্না করতে করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা রেওয়াজ হয়ে যেত। সময়কে ফাঁকি দেওয়া আমার পক্ষে খুব অন্যায় মনে হত। সর্বদা মনে এই সঙ্কল্পটাই জেগে থাকত যে, আমাকে যেভাবে এবং যত কষ্ট করেই হোক ভাল করে শিখে ও তৈরি করে নিয়ে পাঁচজনের কাছে পরিচয় যোগ্য হতেই হবে।

শেখা জিনিস ভুলেগেছি বা গলায় ভাল আনতে পারিনি—এ অভিযোগ যেন গুরুর কাছ থেকে না আসে, সেজন্য আমি খুব নিষ্ঠা রাখতাম। পাছে গুরুর বিরাগভাজন হই সেজন্য ভয় খুবই থাকত। আমার মনে হয় এই ভয় থাকাটা খুবই দরকার। এই ভয় ও নিষ্ঠা গুরুগৃহে থেকে যেমন আসে এবং তার সংগে দায়িত্ববোধ—সে রকম বাড়ীর আরামে ও সুখের মধ্যে এবং গুরুকে শেখার মূল্য দিয়ে আসে না। এজন্য দেখেছি অনেক ছাত্র-ছাত্রীর এ বিষয়ে গুরুর প্রতি ধর্মবোধ, প্রগাঢ় ভক্তি ও কর্ত্তব্যের অভাব থেকে যায়। ওই গুণগুলির কিছুমাত্রও অভাব থাকলে বিচারবোধ এবং স্থিরচিত্তের অভাব আসবেই এবং প্রকৃত উন্নতির পথে ভীষণ ক্ষতি হয়।

আর একটা কথা,—শুধু গাইতে-বাজাতে জানলেই প্রকৃত সংগীতকে জানা হয় না, জানা হয় শুধু রাগরূপকেই। প্রকৃত সংগীত কি তা জানতে হলে উক্ত গুণগুলিকে অন্তরে বিশেষভাবে ধারণ করে মনকে তাঁর উদ্দেশ্যে ধ্যানগত রেখে সাধনা করে যেতে হয়। এই বিদ্যার প্রকৃত শিক্ষার চঞ্চলতা, গর্ব ও তরলতার স্থান নেই। সাধনার মাধ্যমে যত ঊর্দ্ধে উঠা যাবে ততই মনে হবে কতটুকুই বা উঠেছি। এজন্য যাঁরা প্রকৃত সাধক তাঁদের অন্তরে কোন গর্ব ও অহঙ্কার আসে না। কিন্তু আশ্চর্য্য! আজকালকার অনেক মানুষ ওই ত্রুটো থাকার উপরও শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণ করেন এবং ভক্তি আগ্রহের প্রেরণা তাতেই তাঁদের অনেকটা নির্ভর করে। এটা আমি বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি।

এজন্য অনেক শিল্পী এই আবরণ বাহ্যিক ভাবেও রাখতে বাধ্য হন। পছন্দমত সঙ্গীতজ্ঞদের পরিচয় প্রদানকালে এমনভাবে উচ্ছ্বাস কতকগুলি ব্যক্তিদের মধ্যে দিয়ে বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যে, তাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝতে অসুবিধে হয় না—ওই সব ব্যক্তিদের সংযম ও

বিচারবোধের অভাব কত এবং কেমনভাবে তাঁরা বহু যোগ্যস্থানে দৃষ্টিহীন। এই দায়িত্বের ভার যখন প্রকৃত শিল্পী এবং নিরপেক্ষবোধজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে থাকে তখন ওরকমভাবে বাস্তববোধ নষ্ট হয় না। কিন্তু এই রকম উপযুক্ত ব্যক্তিদের যথাস্থানে খুব কম খুঁজে পাওয়া যায়।

আগের মূল প্রসঙ্গে—

কাটোয়ার (বর্দ্ধমান জেলা) এক জমিদারের কাছ থেকে ভাগবত পাঠের জন্য আহ্বান লিপি পেয়ে মাঘ মাসে দাদু সেখানে যাবার পথে বর্দ্ধমানে কাকার বাসায় এলেন,—বিশেষ উদ্দেশ্য আমার সংগে দেখা করে যাওয়া।

বর্দ্ধমানে আসার এক বছর আগে দাদুর সংগে কাটোয়ার ওই জমিদার বাড়ীতে গিয়ে গান শুনিয়েছিলাম।

এই জমিদার ভ্রাতারা সকলেই শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বড় ভাই শিখতেন আমার এক কাকার কাছে। ইনি আমার পিতামহের বৈমাত্রেয় মধ্যম ভ্রাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। এঁর পরিচয় আগেই দিয়েছি।

আমার ন' বছর বয়সে তানপুরা নিয়ে গাওয়া গান উক্ত জমিদার ভ্রাতারা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। তানপুরার সংগে পাঁচ বছর বয়স থেকেই গাইতে পারতাম এবং সুরও বেঁধে নিতাম নিজেই।

সেই প্রথম বারে কাটোয়া হতে আমাদের ফেরার সময় দেশে যাবার জন্য ওই কাকাও সংগে এসেছিলেন। তখন কাটোয়ায় যেতে বর্দ্ধমান হয়ে উটের গাড়ীই ছিল একমাত্র যানবাহন।

আমরা কাটোয়া হতে তাতে চড়ে বর্দ্ধমানে পৌঁছে মেজকাকার বাসায় এসেছিলাম। রাত্রে গানের আসর হল মহারাজাধিরাজ মহাতাব্ বাহাদুরের ভ্রাতষ্পুত্রদের প্রাসাদে। মেজকাকার, দাদুর, আমার এবং ওই কাকার সেই আসরে গান হয়েছিল। সেখানে রাত্রের আহারে এমন দু'চারটে উপাদেয় নূতন জিনিষ ছিল যা আজ পর্যান্ত কোথাও পাইনি।

তারপর সেই মাঘ মাসে দাদু আসাতে আনন্দে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। খুব যত্ন করে দুপুরে আমার রান্না থালায় সাজিয়ে ধরে দিতেই দেখি দাদুর মুখ মোটেই প্রসন্ন নয়,— মমতায়ভরা করুণ চোখ তখন ছল্ ছল্ করছে। মনে মনে করলাম সকাল থেকে নানান কাজের উপর এই রান্নার কাজ তাঁকে খুব ব্যথাকাতর করে দিয়েছে। কিন্তু দাদুই তো

আমাকে কত রকমভাবে উপদেশ দিয়ে উপমন্যু, একলব্য এবং পরশুরামের কাছে কর্ণের অস্ত্রবিদ্যা লাভের জন্য সহনশীলতার চরমপরাকাষ্ঠার ঘটনাবলী শুনিয়ে গুরুর প্রতি কিরূপ কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয় সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে মনকে বলিষ্ঠ করে পাঠিয়েছেন,—তবে আজ কেন তাঁর মনকে আমার জন্য দুঃখে এত কাতর করল ?

তখন একথাটা বুঝতে পারিনি—মানুষ করে গড়ে তুলবার জন্য আমার উপর বলিষ্ঠ ও কঠোর মন নিয়ে তাঁকে কর্তব্য পালন করতে হয়েছে এবং আমার মনে শক্তি-নিষ্ঠা আনবার জন্য সবকিছুই করে এসেছেন, কিন্তু হৃদয়ের সহজাত স্নেহ-মায়া-মমতা ও বিচ্ছেদকাতরতার বস্তুগুলোর যে গভীর আকর্ষণ ও প্রভাব আছে সেগুলো যাবে কোথায় ? তাই চাক্ষুষ দৃশ্য তাঁর মত ব্যক্তিরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল। দাদু কোন রকমে ভাতগুলো নেড়ে চেড়ে উঠে গেলেন।

সেই সময়কার দাদুর বেদনাকাতর মূর্ত্তি আমাকে খুব কাহিল করে দিয়েছিল। আমার সেই বয়সের ক্ষুধার জ্বালা-যন্ত্রণা খুব বেশী লাগত বলে খাদ্যবস্তুগুলো তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে দাদুর কাছে গেলাম বৈঠকখানায়। সেদিন মেজকাকার উদরাময়ের মত হয়েছিল বলে আহারাদি গ্রহণ করেননি।

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি দাদু চুপ্‌টি করে কি যেন ভাবছেন। আমাকে কাছে বসিয়ে একথা সেকথার পর আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দরদভরা কণ্ঠে বললেন—ত্যাখ! তোর এখন এখানে গান শেখা বন্ধ থাক, বয়স বাড়ার পর বরং পাঠিয়ে দেবো। আমি গোপেশ্বরকে ভাল কথায় বুঝিয়ে তোকে সংগে করে নিয়ে যাব। এর মধ্যেই তোর অনেক কিছু শেখা হয়েছে—রেওয়াজ করলেই এখন চলবে, এবং এতেই তুই বড় হতেও পারবি—ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোর উপর আছে,—না হলে এইটুকু বয়সে এ রকম কেউ পারত না, কিন্তু আমি কি করে এ রকম দেখে সহ্য করে থাকতে পারি ? দাদুর এই সব কথা শুনে বুঝতে পারলাম চাক্ষুষ দৃশ্য তাঁকে খুব ব্যথা কাতর করে দিয়েছে। সেদিন দাদুর মত শক্তিশালী-বিরাট কর্ত্তব্যপরায়ণ-উৎসাহদাতার হৃদয়কেও টলিয়ে দিয়েছিল।

তাঁর এই মনভাবের কথাশুনে আমি ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। তাঁকে তখন বলেছিলাম—আপনি আমাকে নিয়ে যাবার কথা কদাচ মেজ-কাকাকে বলবেন না, শুনলে তিনি খুব দুঃখ পাবেন এবং লজ্জিতও হবেন।

আমার কিছুই তেমন শেখা হয় নি। কাকা বলেছেন—"তোমাকে আমাদের ঘরাণার সব কিছু শিখতে হবে,—আমার সম্পূর্ণ আশা আছে তুমিই তা পারবে··· ।"

তিনি আমাকে অতি যত্নসহকারে ও গভীর আগ্রহ নিয়ে শেখান। আমি তাঁর কৃপা নির্দেশে রমেশকেও একটু একটু শেখাচ্ছি। তিনি বলেন শেখার সময় থেকেই একটু একটু করে শেখানর কাজও করে যেতে পারলে খুব ভাল হয়, এর মধ্যে যে ধৈর্য্য ও সংযমের দরকার তা প্রথম থেকে অভ্যাস না রাখলে বড়তে তখন বিরক্তি এসে যেতে পারে। সুতরাং অভ্যাস প্রথম থেকেই সব কিছুর করতে হয়।" বলুন তো! এই সব সুযোগ ও সৌভাগ্য এঁর কাছে ছাড়া আর কোথাও পাব ?

তাছাড়া বাবার আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সর্বদা আমি স্মরণ করি। মনের দিক দিয়েও আপনার তালিম পাওয়া শিষ্য আমি। আমি এখানের যে সব কাজকর্ম করি তা মাকে বলে ফেলবেন না যেন! বলবেন আমি খুব সুখে ও আনন্দে আছি।

আমার কথাগুলো শুনে দাদু আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, মনে হল তিনি তাঁর শীর্ণদেহের পাঁজরার ভেতর পুরে নিতে চান, মাথা আমার ভিজে গেল তাঁর চোখের জলে।

কিছুক্ষণ পরে খুব খুসী হয়ে বললেন—"তুই আমাকে হারিয়ে দিয়ে অসম্ভব জিতে গেলি। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই বয়সে তুই এমন করে এই সব কথা গুছিয়ে কি করে বলতে পারলি!"

আমি বলেছিলাম—আপনাদের বংশে জন্মানর গুণে।

দাদু বললেন—বাঃ এতো আরো উত্তম পরিচয় দিলি তোর বুদ্ধির!

মেজকাকার অনুরোধে দাদু চার-পাঁচদিন থেকে গেলেন। সে ক'দিন একটি পাচক রান্না করে দিয়ে গেল। দাদুর কাছে মেজকাকা কয়েকটি খেয়াল ও ঠুমরী গান শিখেনিলেন। একদিন শেখানর পর দাদু বললেন—রামপ্রসন্নকে (মেজকাকার অগ্রজ) আমার কাছে সংগৃহীত প্রায় একশ'টি প্রাচীনকালের বিভিন্ন ছন্দের উপর বন্দেজী আসল গৎ সেতারে শিখিয়েছিলাম এবং আমি যতগুলো খেয়াল, ঠুমরী জানি সেগুলোও শিখিয়েছিলাম, প্রায় একশ' হবে; যখন অযোধ্যার জমিদার বাড়ীতে তিনমাস ধরে আমার ভাগবত পাঠ হয়েছিল তখন আমার কাছে রেখে।"

দাদু একথাও বললেন, —আমাদের ঘরাণার যত সংখ্যক খেয়াল, টপ্পা

এবং ঠুম্‌রী গান আছে তার অধিকাংশই আমি শিখে রেখেছিলাম, দাদা অনন্তলালের কাছে ধ্রুপদ গানই খুব বেশী ছিল।"

বিষ্ণুপুরের যত গায়কদের আমি গান শুনেছি তার মধ্যে দাদুর কণ্ঠ ছিল খুবই উচ্চস্তরের। তিনি স্বাভাবিক 'সা' সুরের মধ্যমকে 'সা' করে গাইতেন এবং খেয়ালে তান তুলতেন সেই 'সা' সুরের তারার 'সা' এর উপরের 'নি' পর্য্যন্ত। দ্রুত তানে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। তান যে কত দ্রুত হয় তা তখন একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই শুনেছিলাম এবং ধারণা করতে পারিনি গলায় সেধে এ রকম তান আসবে কি-না। দাদুর আর একটা চমকপ্রদ সাধনা ছিল, -তিনি দু'হাতের ফুৎকারে রাগের আলাপ ও গৎ বাজাতে পারতেন। এক সময় এই রকমভাবে দরবারীকানাড়ার আলাপ শুনিয়ে মহারাজা স্যর জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ করেছিলেন। এই কৃতিত্বের জন্য মহারাজা দাদুকে বেশ কিছু অর্থ প্রদান করেন। উক্ত মহারাজ ছিলেন শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রকৃত গুণগ্রাহী এবং উৎসাহদাতা ও সে যুগের অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক। এঁর দরবারে বহু গুণী গায়ক এবং যন্ত্রী ছিলেন। যথা—বিখ্যাত ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র—কাশীনাথ মিশ্র, বিখ্যাত খেয়ালগায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র (এঁরা ছিলেন—কাশীর ঘরাণা), বিখ্যাত খেয়াল গায়ক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(নুলোগোপাল), টপ্পাবিশারদ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গোন্দল পাড়া), নীলমাধব চক্রবর্ত্তী (বিষ্ণুপুর), গুণীযন্ত্রী—সুরবাহার ও সেতার বাদক—সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ ও ইম্‌দাদ খাঁ, ঠুম্‌রী গায়ক পিয়ারা সাহেব। পরে ছিলেন আমার কাকা অম্বিকাচরণ এবং সুরেন্দ্রনাথ। এঁদের কিছুদিন থাকার পরই মহারাজার মৃত্যু ঘটে।

এক সময় দাদুর পরিচয় প্রসঙ্গে বড়কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি ঘরওয়া বিষয় ও নিজের উন্নতি সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"খুড়ো মহাশয় আমাদের যে কত উপকার করেছেন সে বিষয় আমি যেমন জানি তেমনভাবে ভাইএরা কেউ জানে না। আমি তাঁকে সর্ব্বদাই গভীর কৃতজ্ঞতা নিয়ে সভক্তি স্মরণ করি।

খুড়োমশায়ই আমার সমস্ত বিষয়ে উন্নতির কামনা নিয়ে দেশের কাছে পরিচিত করেন। বাবার অনেক বয়সে আমি জন্মেছিলাম বলে অত্যন্ত মায়াবশতঃ আমাকে কাছছাড়া করবেন না—এই ছিল তাঁর একান্ত অভিপ্রায়। খুড়োমহাশয় বাবাকে নানারকম ভাবে বুঝিয়েও সম্মতি

আদায় করতে না পেরে শেষে এক রকম জোর করেই বিষ্ণুপুরের গণ্ডি পার করিয়ে নানান স্থানে নিয়ে গিয়ে আমার নাম করিয়ে দেন এবং পরে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় কোলকাতায় যাওয়া ঘটে। সেখানে বহুগুণীর সংস্পর্শে এসে আমার খুবই উপকার হয় এবং শিক্ষা-সাধনার পরিচয় প্রদান করতে পারায় চতুর্দিকে বেশ নাম হয়ে পড়ে। এক জমিদার বাড়ীর আসরে আমার সেতার শুনে গোবরডাঙ্গার জমিদার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরবাহার-বাদক জ্ঞানেন্দ্রবাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর দেশের বাড়ীতে কিছুদিন রেখেদেন। তাঁর সঙ্গীতগুরু বিখ্যাত 'সুরবাহার ও সেতারবাদক মহম্মদ খাঁ সাহেবের (ইনি সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ এর পিতা) বাজনা শুনে তাঁর অপূর্ব পদ্ধতির বাদন-প্রণালী আমাকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। দেশে এসে সেই বীণবাদনের মত বাদন পদ্ধতিকে অনুসরণ করি। এই পদ্ধতিকে আয়ত্তে আনতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছিল—কারণ আমার পদ্ধতিকে ঢেলে সাজতে হয়েছিল বলে। কুঁচিয়াকোল জমিদার বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা, সেখান হতে ত্রিপুরার মহারাজকে শুনাবার সুযোগ পাওয়া এবং যোগাযোগের মাধ্যমে নাড়াজোলরাজ নরেন্দ্রলাল খাঁন এর সঙ্গীত-শিক্ষকের পদ পাওয়া এবং স্থায়ীভাবে সেখানে থাকা এসব সুযোগের মুলেই ছিলেন খুড়োমহাশয়। তিনি যদি এই দায়িত্ব না নিতেন তাহলে সঙ্গীতজগতে আমার স্থানই শুধু নয় ভাইদেরও কি হত তা বলা যায় না।

আমার বাল্যকালের সময় থেকে দেখে এসেছি—খুড়োমহাশয়ের নিজ ব্যবসায়ে কিরূপ প্রতিপত্তি ও অর্থসমাগমের প্রাচুর্য্য ছিল। জমিদারদের মত সুসজ্জিত পাল্কীতে চড়ে যেতেন ভাগবত (কথকতা) পাঠ ও গান করতে। আমাদের সংসারের অবস্থা তখন খুবই কষ্টের ছিল। কাউকে না জানতে দিয়ে খুড়োমহাশয় আমার মাকে সবকিছু সাহায্য করে যেতেন। তাঁর নিষেধ ছিল এই সাহায্যের কথা আমার বাবা যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারেন কারণ তিনি বড় আত্মঅভিমানী ও স্বাবলম্বী ছিলেন। খুড়োমহাশয়ের হৃদয় ছিল বিরাট-বিস্ময়কর। অর্থকে তিনি কোন দিনই বড় করে দেখেননি। অত যে উপার্জন করতেন—তার সবই প্রায় দানে-ধ্যানে, অতিথি অভ্যাগতদের সেবায় এবং ছাত্র প্রতিপালনে ব্যয় হয়ে যেত।"

বিষ্ণুপুর ঘরাণার ইতিহাস যিনি প্রথম লিখলেন—তিনি তথ্য সংগ্রহে

শৈথিল্য বশতঃ বা সংগ্রহের অভাব দরুণ আমাদের বংশধারার প্রাচীন পরিচয় কিছুই দিতে পারেননি। এমন কি বৃদ্ধপ্রপিতামহ শ্রীধরচন্দ্রের সময় থেকে যে পরিচয় দেওয়া সহজতর ছিল তাও যথাযথ সন্নিবেশিত হয়নি। প্রকৃত তথ্য বহুস্থলেই বাদ পড়ে গেছে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় আমি আমার প্রণীত 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 'বিষ্ণুপুর সংগীতের ইতিহাস' লেখার স্থানে জানিয়েছি।

বড় কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগীত বিদ্যার উপর দখল এবং তার পরিচয়ে ছিল প্রধান হয়ে দুর্দ্ধর্ষ গায়কীর উপর ধ্রুপদে দখল এবং সুরবাহার, সেতার বাদ্যে চরম দক্ষতা। তাছাড়া বীণা, এসরাজ, জলতরঙ্গ, গ্লাসতরঙ্গ, নৌকাতরঙ্গ, পাখোওয়াজ, তব্‌লা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেও ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনাতে তাঁর অবদান যথেষ্ট। 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থে বহুসংখ্যক রাগের উপর বহু সংখ্যক প্রাচীন ধ্রুপদে রাগরূপের আদি অকৃত্রিম রূপকে জানার সুযোগ দিয়ে গেছেন। এই গ্রন্থটিকে রাগরূপের প্রামাণিক দলিল স্বরূপ বলতে পারা যায়। বড়-কাকার সুরবাহার শুনে সে যুগের বরোদার মহারাজা তাঁর দরবারের প্রধান যন্ত্রীরূপে আটশ' টাকা মাসিক বেতনে রাখবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন—কিন্তু মেদনীপুর জেলা অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খানবাহাদুরের সংগীতগুরু থাকায় এবং তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বরোদারাজের আগ্রহ পূরণ করতে পারেন নি। শিষ্যের প্রতি এরূপ কর্তব্য রেখে অত বড় মান্যের পদ ত্যাগ করা সত্যই শিক্ষণীয় আদর্শ। এক সময় মাননীয়া সরোজিনী নাইডু বড় কাকার সুরবাহার শুনে বলেছিলেন—'শুনে আশ মিটল না—মনে হচ্ছিল সমস্ত রাত ধরে শুনি'। ইটালীর (কোলকাতা) জমিদার দেববাবুদের বাড়ীতে একবার ইনায়েত খাঁ সাহেব ও বড়কাকার সুরবাহার বাদনের জন্য বড় রকমের আসর হয়েছিল। বড়কাকার বাদনের পর খাঁ সাহেব বলেছিলেন—'উনকে উপর ম্যায় ক্যা বজাউঙ্গা' অর্থাৎ এঁর এই রকম বাজনার পর আমি আর কি বাজাব?"

বড়কাকা যেমনি ছিলেন নির্লোভ তেমনি ছিলেন নাম-ডাকে স্পৃহা শূন্য। আবার রাশভারিও ভীষণ ছিলেন। কৌলিণ্যগুণও তাঁর কম ছিল না। আমাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন এবং গভীর আস্থা রাখতেন।

আমার সংগীতে দখল সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি লোকের কাছে

বলতেন। একবারের একটা ঘটনা—তখন আমার বয়স চৌদ্দর মত।

কোলকাতায় সুরিলেনের এক বাসাবাড়ীতে বড়কাকার সেজ ভাই বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় থাকতেন—সে সময় এসেছিলেন বড়কাকা, আমিও তখন কি কারণে এসেছিলাম। বড়কাকা বিকেলে সুরবাহার বাজাচ্ছিলেন সে সময় জল খাবারের ডাক দিতে সুরবাহার নামিয়ে উপরে গেলেন। আমার খুব আগ্রহ এল দেখি বাজাতে পারি কি-না। বিপুল আকারের যন্ত্রটিকে তুলে নিয়ে পুরিয়া রাগের উপর টান দিতে লাগলাম। বড় কাকার জল খেয়ে আসতে বিলম্ব হতে থাকায় আমার উদ্যম বেড়ে উঠল। একটু পরে সেজকাকা এসে বললেন,—বড়দা' তোমার বাজনায় হাতের টান দেখে অবাক হয়ে শুনছেন…।" আমি লজ্জা পেয়ে তৎক্ষণাৎ সুরবাহার নামিয়ে পালিয়ে গেলাম। রাত্রে বড়কাকা খুব আশীর্ব্বাদ করলেন। এই সব গুণী মহাত্মাদের আশীর্ব্বাদই আমাকে বাল্যজীবন হতে সংগীতের সঠিক পথে নিয়ে যাবার সহায়তা করেছে।

বড়কাকা মৃত্যু শয্যায় আমাকেই খবর দিতে বলেছিলেন। খবর পাওয়া মাত্র রওনা হয়ে রাত্রের ট্রেণে বাঙ্কের উপর শুয়ে আছি, একটু তন্দ্রা এসেছিল,—দারুণ চমকে উঠে বসে পড়ি,—যেন মনে হল ঠিক বড়কাকাই জ্যোতির মত অস্পষ্ট শরীরে আমাকে বললেন—'বড় দেরি করলে। রাত তখন ১২টা হবে এবং সেই সময়ই তিনি বিষ্ণুপুরের নিজগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজও আমি ভেবে পাই না—সত্যই কি গভীর টান থাকলে আত্মার ক্রিয়া এম্‌নি হয়?

বড়কাকা আমাদের দেশে ওস্তাদজী নামে পরিচিত ছিলেন। এই ডাক নাম অন্য কোন সঙ্গীতজ্ঞ পাননি। বিষ্ণুপুরে ওস্তাদজীর বাড়ী বলতে তখন তাঁকে উদ্দেশ করেই বুঝাত। সঙ্গীতজ্ঞের যথার্থ মর্য্যাদা ও প্রভূত সম্মান লাভ করে আত্মনির্ভরতায় বলিষ্ঠ মন নিয়ে কাটিয়ে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। শেষের দিকে তাঁর দৈহিক অবয়ব মুণি ঋষিদের মত দেখাত এবং সংগীতকে ধরে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনকে সর্বদা ঈশ্বরমুখী করে রাখতেন। বরোদার মহারাজের কাছে অতবড় পদ প্রাপ্তির সংবাদ তিনি কারো কাছেই তেমন প্রকাশ করেন নি।

নাড়াজোলের রাজা সংগে ছিলেন, তিনিই এই সংবাদ আমাদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সহিত বলতেন।

এত বড় গৌরবের সংবাদ তখন সংবাদপত্রেও প্রচারিত হয়নি। কারণ

সে চেষ্টা ওই গুণী শিল্পীকেই করতে হত বলে তাই।

তখনকার প্রকৃত সংগীত সাধকরা নামের ঢকা নিনাদকে বড় করে দেখতেন না, এবং তার প্রয়াসীও ছিলেন না। বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষাকারী ব্যক্তিমাত্রেই মনে করেন গুণের দেবতাকে মানুষ যদি চেনার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা না রাখে তাহলে ঢাক বাজিয়ে লোকের মনাকর্ষণ করার কোন অর্থ হয় না এবং তার মত বিড়ম্বনা আর নেই। কিন্তু বর্ত্তমানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তদ্বিরই এখন শক্তি প্রকাশের দেবতা। অবশ্য এই দেবতার উপরে প্রধান হয়ে আছেন ভাগ্যদেবতা। তবে আগেরটিতে মনে হয় ভাগ্যদেবতাই ছদ্মবেশে বিচরণ করেন।

এবার দাদুর বর্দ্ধমানে আসার সেই সূত্রের সংযোগে আসি।

কাটোয়া থেকে সেখানের জমীদারের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদ আসায় আর যাওয়া হল না, অগত্যা তাঁকে দেশেই ফিরে যেতে হল।

রওনা হবার দিনে আমিও সংগে গেলাম ট্রেণে তুলে দিতে।

ট্রেণ আসতেই উঠে পড়ে জানালার ধারে বসে অনেক কিছু উপদেশ দিতে লাগলেন, আমি নীচে দাঁড়িয়ে সেগুলি মনের মধ্যে পুরে নিতে লাগলাম। ট্রেণ ছেড়ে দিল,—তাকিয়ে রইলাম দাদুর দিকে—তিনিও রইলেন তদবস্থায়। ক্রমশঃ তাঁর মুখ যতই বিলীন হতে লাগল—আমার চোখ হতে লাগল ততই জলে ঝাপসা। আর দেখতে পেলাম না, ছুটলাম—কিন্তু গাড়ীর পুচ্ছ আমাকে পেছনে রেখে চলে গেল।

দাদু যাচ্ছেন বলে সেদিন সেই ট্রেণটাকে কত যেন নিজের বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু পরক্ষণেই চোখ মুছতে মুছতে মনে হল ট্রেণগুলো মোটেই ভাল নয়, বড় নিষ্ঠুর, ওরাই দেশের মানুষকে ঘরছাড়া করে দিচ্ছে। এখন মনে হয় তখন ধৈর্য্যহারা হয়ে খুব বালকভাব এসে গেছল।

তারপর গরীবের পাওয়া নূতন কাপড়ের পুট্‌লীতে বেঁধে রাখা সামান্য কিছু সঞ্চিত দ্রব্য সমেত চুরি হয়ে গেলে তার যেমন মনের অবস্থা হয় তেমনি আমারও সেরূপ অবস্থা হয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরবার সময় পথের চারদিকে তাকিয়ে সেই অমূল্য সম্পদ পুট্‌লীটিকেই খুঁজতে খুঁজতে হতাশ মনে ফিরে এলাম গভীর এক নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

(১৭)

চলতি পথে আহরণ—

বর্দ্ধমানে আসার দেড় বছর পরে সেতার শিক্ষা ও সাধনার সূত্রপাত হল। মেজকাকা আমাকে সেতারের উপর আঙ্গুল চালানর নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন।

উনি সুরবাহার, সেতারেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া জলতরঙ্গ, এসরাজ, পাখোওয়াজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর সমধিক দখল ছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের গ্রন্থ-রচনায় তাঁর দক্ষতা যে কত উচ্চে ছিল তা তাঁর গ্রন্থসমূহতেই প্রমাণিত হয়ে আছে। স্বরলিপি সহকারে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতির এত উচ্চ স্তরের বহু সংখ্যক গ্রন্থ অদ্যপি কারোর দ্বারা প্রকাশিত হয় নি। মেজকাকা প্রথম জীবনে বহু আসরে সেতার, সুর-বাহারও বহুকাল ধরে বাজিয়ে এসেছিলেন। এর উপর নামও তাঁর তখন যথেষ্ট ছিল।

আমাদের বংশে সংগীত সাধনার পরিচয়কে ধরে বহু বিশিষ্ট গুণগ্রাহী ব্যক্তি বলে এসেছেন এবং এখনও দু' চারজন যাঁরা ওই রকম উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন তাঁরাও বলেন—ধ্রুপদাদি গানে এবং যন্ত্রে, সঙ্গীতশাস্ত্রাদি বিষয়ের দখলে এত বড় ঘরাণার নজীর ভারতে দুষ্প্রাপ্য, শুধু তাই নয় রাগ রূপের শাশ্বত নীতি-ধারার প্রমাণ পরিচয়ও এই বংশে বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে, তাছাড়া এত সংখ্যক রাগ ও তার গান এবং বহুবিধ আকারে শাস্ত্রীয় সংগীতের যে সমস্ত শ্রেণীবস্তু সৃষ্টি হয়েছিল সেই সমস্ত সম্পদ একত্রিত হয়ে থাকা এখানে ছাড়া এখন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না···।" কিন্তু এখন প্রকৃত গুণী হবার জন্য এই সব সম্পদ আহরণের আর আবশ্যক করছে না। কাকাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পরমায়ু কীটদষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন গ্রন্থমধ্যেই অমূল্য বস্তুসমূহ রক্ষণীয় সীমায় থেকে গেল।

শাস্ত্রীয়সংগীতের এই যুগকে এখন অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন একে শুধু শিল্পযুগই বলা যায়, দিক নির্ণয়ের এবং গুণী গড়ার যুগ নয়।

তারপর সেতারে হাতেখড়ির দিন থেকে রাত্রে ও দুপুরে বহুক্ষণ ধরে প্রত্যেক দিন প্রায় ছ'মাস শুধু হাত তৈরির বস্তু সেধে ছিলাম। দিনে

বেশী সময় পেতাম না বলে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সমানে দু' ঘণ্টা সেধে যেতাম। তিন সপ্তকের উপর শুধু সা, রে, গা, মা,···বাজিয়ে যেতাম দম্‌কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রায় এক হাজার বার। ঘড়িতে দেখে নিতাম একশ'বার বাজাতে কত সময় লাগছে—সেই আন্দাজে সংখ্যা নির্ণয় করতাম। উক্ত সংখ্যা বাজাতে প্রত্যেক দিন সময় কমাতাম। তারপর বিভিন্ন সাধনপ্রণালী বাজাতাম একশ' সংখ্যার মধ্যে রেখে। এই রকম-ভাবে সাধতে সাধতে মাস ছ'য়ের মধ্যেই হাতের টিপ্ অনেকখানি বসে গেল এবং শ্রুতিমধুরও মনে হতে লাগল।

আমার সেতার বাজানর ব্যাপার নিয়ে কাকার ছাত্র হৃষিকেশের খুব নিরাশবৈরাগ্য এসে গেল। তিনি তখন কাকার কাছে বছর পাঁচ-ছয় ধরে সেতার শিখে যাচ্ছিলেন। হাতও মোটামুটি তৈরি হয়ে এসেছিল। শেখান জিনিষগুলি শুনতে ভালই লাগত। মুস্কিল হল তাঁর আমার বাজনা শুনে। আমি যেদিন একটা রাগের আলাপ ও গৎ নিজের বুদ্ধি শক্তিতে অঙ্কিত করে তাঁকে শুনিয়ে দিলাম সেদিন তিনি হতভম্ব হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। পরে উঠে গিয়ে মেজকাকাকে বললেন—আমি সেতার আর শিখব না, আমার দ্বারা যে হবে না তা বেশ এখন বুঝতে পারলাম। সুতরাং দেশে গিয়ে চাষ-আবাদের কাজ করব।"
মেজকাকা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—হঠাৎ তোমার মাথায় এ-কি খেয়াল এল ?

ঋষিদা বললেন,—সত্যকিঙ্কর ছ'মাস সেধে সেতার বাজিয়ে যা শুনাল তাতে আমি বুঝলাম এ বিদ্যা আমার জন্য নয়।

মেজকাকা বললেন,—তোমাদের কি ওর মত অদম্য নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও কঠোর সাধনা আছে ? দেখছ তো কত কম বয়েসে এখানে এসে অবধি কেমনভাবে সাধনা করে চলেছে ! সত্যই অবাক লাগে,—এইটুকু বয়সে এ রকম শিক্ষা-সাধনায় ঐকান্তিকতা দেখা যায় না। দেখেছ ? ওর কোন দিন গৎ শেখবার ইচ্ছে হয়েছে ? হবে কেন ! ভগবান ওকে জানিয়ে দিয়েছেন কোন্ কোন্ জিনিস আগে আয়ত্তে আনতে হয়। আর তোমাদের চাই খাতা ভর্ত্তি গৎ, শিক্ষার্থীদের চাই খাতা ভর্ত্তি গান। ছাত্ররা কেবল চায় নূতন নূতন ও শক্ত শক্ত জিনিস। আমারও দুর্বলতা আছে না বলতে পারি না। গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করলে কোন বিদ্যাই হয় না, ফরমাস্ করে শিখলে কি সত্যকারের শেখা হয় ?

যাইহোক্ ছেড়ে দিয়ো না, ওর দেখে আরো উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করে যাও।" ঋষিদা বললেন,—আপনার উপদেশ সবই সত্য কিন্তু সত্যকিঙ্করের মত প্রতিভা-শক্তি তো থাকতে হবে, ও ভগবানের আশীর্বাদ পেয়ে এসেছে।" কাকা বললেন—ভগবানের আশীর্ব্বাদ কেউ হয়ত পেয়ে আসে—কেউ আবার পাবার জন্য সর্বদা প্রার্থনা রেখে শিক্ষা-সাধনার ব্রতী হয় একলব্যের মত। আমার মনে হয় শেষেরটিতে ভগবান বেশী সন্তুষ্ট হয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেন।"

কাকার এত উপদেশেও ঋষিদার মনে কোন পরিবর্ত্তন এল না, গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সেতারে উয়াড় পরিয়ে বগলদাবা করে চিরতরের জন্য চলে গেলেন। যাবার সময় আমার মাথায় হাত রেখে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। তিনিও চোখ মুছতে লাগলেন। মানুষটি সত্যই খুব সরল-সুন্দর ছিল, আমাকে খুবই ভালবাসতেন। চলে যাওয়াতে খুব একটা অভাব অনুভূত হয়েছিল।

সেই বয়েস থেকেই অনেক ছাত্রদের নানান ধরণের নানান ধারণার উপর মতী-গতি দেখে আসছি। সে সময় কাকার কাছে পূর্ণচন্দ্র নামে এক রাজকর্মচারী ধ্রুপদ শিখতেন। আমি যাবার কিছুদিন পরে তিনি একদিন আমার কাছে আলাপ ধ্রুপদ শুনে শেখা ছেড়ে দিলেন। গুরুর সামনেই মন্তব্য করে গেলেন—শিক্ষাদানে নিশ্চয়ই মন্ত্রগুপ্তির মত একটি সুনির্দিষ্ট হদিস্ আছে, সেটি ভাইপোকে এনেই দেওয়া হয়েছে—তা নাহলে এত অল্পদিনে এমন গাইতে পারে? বুঝেচি এই গুপ্ত মন্ত্রের হদিস আমরা কোন দিনই পাবনা, আগে কথার মধ্যে দিয়েই শুনেছিলাম এখন প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি চলে যাবার সময় গুরুকে প্রণাম পর্যান্ত করে গেলেন না। কাকা কেবল হাসলেন।

ওই ভদ্রলোকের যেমনি রসহীন গলা,-তেমনি বুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল। কাকা খুব ধৈর্য্যশীল ছিলেন বলেই কতকগুলো ধ্রুপদ তার গলায় ঢুকিয়ে ছিলেন।

অনেকেই শিখতে এসে সুস্বভাবের অভাব বশতঃ মতিভ্রম নিয়ে চলে যায়। কেউ বা সমুদ্র ছেড়ে ফোয়ারায় আকর্ষিত হয়, কেউবা কোথায় নামের ঢাক বাজবার সহজ সুযোগ আসবে,—স্বার্থসিদ্ধ হবে এই ফিকিরে ছুটাছুটি করে। এরা বুঝে না এতে প্রকৃত কিছুই লাভ হয় না বরং

লোক্‌সানই হয় বেশী। সস্তায় কিস্তি মাৎ হয় না।

এখন আবার উপাধি, ডিগ্রি ইত্যাদির প্রচলন হওয়ায় প্রকৃত শিল্পী ও জ্ঞানী-গুণী হবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

সত্যকারের শিল্পী গড়ে উঠতে পারে যদি শুধু শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার জন্য অন্ততঃ আট বছর সময় ধার্য্য থাকে এবং শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে মানুষ হয় তবেই। এতবড় বিদ্যাকে রক্ষাকল্পে এবং দেশের গৌরব রক্ষায় উপযুক্ত শিল্পী তৈরির ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সরকারের তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষায় একমাত্র যদি ডিগ্রি, উপাধিই বড় হয়ে থাকে তাহলে শুধু ওই দুটির সাইনবোর্ডই থাকবে অন্তঃসারশূন্য হয়ে অধিক ব্যক্তির কাছে।

এরপর নিজের কথায় আসি,—সেতারে হাত বেশ ভাল করে তৈরি করে নিয়ে কাকার কাছে আমাদের ঘরাণায় আগত প্রাচীনকালের শতাধিক খান্দানী বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ বিভিন্ন ছন্দের শিখে নিলাম। কণ্ঠসংগীতে রাগরূপের উপর অনেকখানি দখল শক্তি এসে যাওয়ায় এবং তার সংগে তালেতেও অধিকার আসায় গৎএর উপর তান-বিস্তার ইত্যাদি শিখবার প্রয়োজন হল না। কাকা বললেন,—পাখোয়াজ ও তবলার সব রকমের ঠেকা এবং বোল-পরণ শিখে নাও তাহলে ওই সমস্ত ছন্দের ক্রিয়া সেতারে প্রয়োগ করে নিজস্ব বাদনপদ্ধতি আনতে পারবে,—তবে সর্বদা মনে রাখতে হবে ওগুলোই বড় নয়, রাগরূপের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে তার রসসৃষ্টিই সবচেয়ে বড়, বিপুল বৈচিত্র্যক্রিয়া যেন সুঠাম মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়।" তাঁর কথায় বুঝেছিলাম সব রকম বস্তুই সংগ্রহে ও আয়ত্তের উপর প্রকাশ ক্ষমতায় আসা আবশ্যক।

পাখোওয়াজ ও তবলাবাদ্যের নিয়ম প্রণালী কাকার কাছে দেখে নিয়ে ঠেকা, বোল সাধতে লাগলাম সময় করে নিয়ে। বিশ্রামের অবকাশ আমার ছিল না,—এতেই যেন আমার নেশা চেপে গেছল।

আমার মতে প্রত্যেক শিল্পসাধকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাদন ও গায়কী ক্রিয়া থাকা আবশ্যক। নিছক কারো অনুসরণ ও অনুকরণ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না। অবশ্য গুরুর সাধন বস্তুগুলিকে সংরক্ষিত করে রাখার চেষ্টা করা এবং তাঁর উত্তম গায়কীর ছাপ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

থাকার এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুরের

উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন বিরাট আকারে জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হল। মহারাজা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন স্যর পি, সি, রায়, স্যর জগদীশ বসু, ডক্টর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ বিশিষ্ট গণ্যমান্য মনীষীগণ। সভাপতি হয়েছিলেন—স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। মহারাজার ইচ্ছেক্রমে ওই সম্মেলনে আমার গান শুনানর ব্যবস্থা হয়েছিল। গান শুনে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে উৎসাহ প্রদান করেন। মহারাজ প্রদত্ত স্বর্ণপদক সভাপতি মহাশয় সস্নেহআশীর্বাদ করে আমার গলায় পরিয়ে দেন। এ-ও আমার এক পরম সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

এর কিছুদিন পরে স্যর আশুতোষ চৌধুরীর সহধর্ম্মিনী লেডি প্রতিভা চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সঙ্গীত-সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসবে মেজকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন কোলকাতায়। উনি বর্দ্ধমান হতে সপ্তাহে দু'দিন করে ওই সঙ্ঘে গিয়ে উচ্চ ক্লাসে ধ্রুপদ খেয়াল শেখাতেন। ওই উৎসবে আমার গানের ব্যবস্থা করে রাখাছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন,—তার মধ্যে যাঁদের নাম শুনেছিলাম তাঁরা হলেন. মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, বর্দ্ধমান, ত্রিপুরা, কুচবিহার, ময়ুরভঞ্জ, নাটোর, কৃষ্ণনগর, সন্তোষ প্রভৃতির মহারাজগণ, গোবরডাঙ্গার জমীদার-বিশিষ্টসঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসন্ন চৌধুরী.—এছাড়া হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ ও আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

প্রথমতঃ সঙ্ঘের ছাত্র-ছাত্রীদের গান-বাজনা হল। পরে সভাপতির ভাষণ সমাধার পরই লেডি চৌধুরাণী আমার সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় দিয়ে ধ্রুপদ গাইবার কথা জানালেন। দেখলাম সকলেই আমার বয়সের দিকে তাকিয়ে বেশ কৌতূহলী ও উৎসুক হয়ে উঠলেন। ইমন্-কল্যাণ রাগের আলাপ, চৌতাল ও ধামার গেয়ে থামতেই সকলে খুব উল্লসিত হলেন এবং অনেকে কাছে এসে স্নেহাদরে উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। হাইকোর্টের সাহেব জজেরা পর্য্যন্ত চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে আমার হাত ধরে স্মিতহাস্তে আনন্দ প্রকাশ করে গেলেন। বিশিষ্ট সংগীত-গুণগ্রাহী নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গান শুনে খুব বিস্মিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন—মনে হচ্ছে যেন যদুভট্ট আবার জন্মগ্রহণ করেছেন।" একথা শুনামাত্র মেজকাকা চমকিত হয়ে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

মহারাজার এই মন্তব্যে আমি অতিশয় সঙ্কোচে মাথা নীচু করে সেই মহাগায়কের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে গুরুর পায়ের ধুলো মাথায় রাখি। সভাভঙ্গ হয়ে যাবার পরও সকলে আমাকে আবার আশীর্বাদ করে মেজকাকাকে আমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে বলে গেলেন অনেক কথা। অবশেষে নাটোর মহারাজ মেজকাকাকে বললেন—আমার ওখানে এক্ষণি আমার সংগে চলুন—ভাল করে গান শুনব, বড়কুমার গান-বাজনা খুব ভালবাসেন এবং বেশ ভাল বুঝবার শক্তিও হয়েছে,—তাকে আপনার ভাইপোর গান শুনাতেই হবে··· ।"

মহারাজার প্রাসাদে যখন পৌঁছলাম তখন রাত ৮টার মত।

সুসজ্জিত কক্ষে মহারাজা সমাদরে আমাদের বসালেন। একটু পরেই বেশ বড় রকমের পাত্রে বড় বড় সন্দেশাদিতে ভর্ত্তি হয়ে এল জল খাবার। খাওয়ার মাত্রা ভীষণ পরিমিত ছিল কাকার, আমার ছিল ভীষণ অপরিমিত।

গান আরম্ভ হল রাত ৯টায়। প্রথমে মেজকাকা গাইলেন। তারপর আমার ঘণ্টা দুই ধরে আলাপ ও ধ্রুপদ হল। রাগরূপ ছিল—বাগেশ্রী, (চৌতাল) কানড়ার চৌতাল আড়ানার ধামার এবং বেহগের চৌতাল ও ধামার। পাখোওয়াজে সঙ্গত করলেন, মহারাজা ও মহারাজকুমারের মৃদঙ্গ শিক্ষাগুরু বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মৃদঙ্গাচার্য্য গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। রাত ১টায়—গানের আসর শেষ হল।

তখন আমাদের গান গাওয়ার সুরের ওজন থাকত হার্ম্মোনীয়মের কোমল গান্ধারকে 'সা' করে। এই ওজন আমার অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। এখন নেমে 'সা' সুরে এসেছে।

তারপর মহারাজা আমাদের যত্ন সহকারে খাবার স্থানে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। খাবার খান্দানী আয়োজনের কথা বলাই বাহুল্য। মহারাজা দাঁড়িয়ে থেকে তত্ত্বধান করতে লাগলেন।

স্বাধীনতার পর আমাদের অনেক জিনিসের সংগে এই দুটি জিনিসও অন্তর্হিত হয়ে গেছে। মার্গসংগীতের প্রতি যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল ঐতিহ্যবাহী হয়ে তাঁদের সেই আদর্শগোষ্ঠি লোপ পেয়ে গেল এবং তার সংগে অভিজ্ঞ হয়ে নিরপেক্ষ স্বীকৃতি। কথোপকথনের মধ্যে খাওয়া সারা হতে রাত দুটো বেজে গেল। তারপর গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে মহারাজা নীচে নেমে এসে কাকাকে বললেন—আপনার ভাইপোটিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আমার কাছে রাখবার সম্মতি চাচ্ছি, আপনি বললেন সেতারও

ভাল বাজাতে পারছে তাই আমার ইচ্ছে কুমার সেতার শিখুক আর আমি রাত্রে গান-বাজনা শুনব।"

মেজকাকা খুসী হয়ে সম্মতি দিলেন। তারপর বিদায় অভিনন্দনের পর গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। অত ভাল মোটর গাড়ীতে তখন্ত পর্য্যন্ত চড়িনি—খুব আরাম লাগছিল। আমরা এসে উঠলাম বৌবাজার নিকটস্থ সুরিলেনে সেজকাকা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায়। এই কাকাও ছিলেন বিশিষ্ট গুণীসঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরবাহার ও সেতারে পারদর্শী। তাছাড়া কণ্ঠসংগীতে এবং গ্লাসতরঙ্গ, ব্যাঞ্জ ও এসরাজ বাদ্যেও যথেষ্ট অধিকার ছিল। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের শিক্ষায় প্রাথমিক পাঠের উপযোগী কয়েকটি পুস্তক রচনা করে প্রথম শিক্ষার নিয়মসঙ্গত পথ সুগম করে দেওয়ার প্রয়াস রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর বাড়ীর সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু বছরধরে আদিব্রহ্মসমাজের প্রধান গায়ক ছিলেন। আগে প্রত্যেক বুধবারে এই ব্রহ্ম-সমাজে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীগণ উপাসনায় পাঠ করতেন। এই উপাসনায় দু'একবার গান গাইবার আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গীতলিপি নামক প্রথম স্বরলিপির পুস্তকটির গানসমূহ উক্ত কাকার দ্বারাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সুর যথাযথভাবে এই কাকার কাছেই বিশেষ করে সংরক্ষিত হয়ে প্রমাণ দলিল স্বরূপ ছিল। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রায় দু'শত ঐ গান কাকার কণ্ঠের টেপ করা আছে।

সে সময় এই কাকার দ্বারাই কোলকাতার আভিজাত মহলে সঙ্গীত-শিক্ষা ও প্রচার বিস্তৃতি ঘটে বিশেষরূপে। অবশ্য এর মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষা প্রচারে উৎসাহ ও প্রচেষ্টার প্রভাব। সেজকাকার যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম, যথা—লেডি বসু (আচার্য্য স্যর জগদীশ বসুর সহধর্ম্মিনী), লেডি চৌধুরাণী (স্যর আশুতোষের সহধর্ম্মিনী), সরলা দেবী, মিসেস কে, সি, দে, মিসেস বি, এল, চৌধুরাণী, মিসেস আর্কুহার্ট (এঁর স্বামী ছিলেন স্কটিস্‌চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল), ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর মাতা, প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই, উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন বিদুষী ও প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি উড্‌রুফ্‌ সাহেব প্রায়ই রাত্রে সেজকাকার সুরবাহার শুনতেন এবং রবীন্দ্রনাথের গৃহে যে সমস্ত

খ্যাতনামা বিদেশীরা আসতেন তাঁদের ওই ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সুরবাহার যন্ত্র শুনাবার জন্য সেজকাকাকে আহ্বান করা হত। এই কাকার দীর্ঘকাল ধরে কোলকাতার আভিজাত্য মহলে একচেটিয়া নাম ও প্রতিপত্তি ছিল। ইনি আমাদের সকলকেই কোলকাতায় বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার সহায়তা করেন।

তারপর সেদিন নাটোররাজবাড়ী হতে ফিরে সেজকাকার বৈঠকখানায় শুয়ে পড়বার উপক্রম করছি তখন কাণে এল উপর তালার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে মেজকাকাকে সেজকাকা জিজ্ঞেস করছেন—সত্যকিঙ্করের গান কেমন হল ?

মেজকাকা বললেন,—দু' জায়গাতেই খুব ভাল গেয়েছে,—নাটোর রাজবাড়ীতে ওর গান এমন জমে গেছল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত হল ঘরটা সুরে ঝুলছে—গান থেমে দেবার পরও।" নাটোর মহারাজের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যটাও শুনালেন। গুরুর মুখে এরকম মন্তব্য শুনা খুবই ভাগ্যের বিষয়। তাঁর কাছ থেকে আমার প্রশংসাসূচক যে সব মন্তব্য কাণে আসত সেগুলি মনে পড়ে গেলেই তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত হয়ে চোখে জল ঝরতে থাকে।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে আমার মেজছেলেকে চিঠিতে লিখেছিলেন আমার সম্বন্ধে নানান কথার মাধ্যমে—"তোমার পিতার মত ব্যক্তিকে ভাইপোরূপে পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি···।" এরূপ অভাবনীয় ও কল্পনাতীত মন্তব্য পড়ে আমার মনের ভেতরটায় কি ভীষণ যে তোলপাড় করে তুলেছিল তা বলে জানান যায় না,—অনেকক্ষণ ধরে কেবল চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। এরূপ মন্তব্য মনে হয় কোন গুরু শিষ্যের উদ্দেশ্যে আজ পর্য্যন্ত করেন নি এবং করতে চাইবেন না, উচিতও বোধ হয় নয়। এরূপ মন্তব্যকে শিষ্যের প্রকাশ করাও অপরাধতুল্য, কিন্তু তাঁর মত সঙ্গীতে অতবড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির হৃদয়টি কি রকম উন্মুক্ত ও প্রশস্ত ছিল আদর্শের প্রতীক হয়ে তা না জানিয়ে পারলাম না।

পরের দিন মেজকাকা আমাকে ল্যান্সডাউনরোডস্থ নাটোর রাজবাটীতে পৌছে দিয়ে বর্দ্ধমানে চলে গেলেন। দু'দিন পরে সেখান হতে আমার সেতার, তানপুরা, বাক্স প্রভৃতি আমার কাছে এসে গেল।

রাজবাড়ীর অভ্যন্তরস্থ উত্তর পার্শ্বে আমলাদের অফিস গৃহের নীচের তালার একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে আমার থাকার স্থান হল।

প্রথম দিন এসেই আমার মন ভীষণ চিন্তা নিয়ে ভারসাম্যহীন তৌল-দণ্ডের ন্যায় লঘু ও গুরুভারে এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে উঠানামা করতে লাগল। অর্থাৎ রাজগায়ক এবং কুমারের শিক্ষক হতে পারার কথা যখন মনে হতে লাগল তখন গৌরববোধ আসায় ভাবসাম্য কিছুটা ডান-দিকে হেলে যেতে লাগল, আবার তৎক্ষণাৎ চিন্তা এসে এই কথা যখন মনে হতে লাগল—শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতি দারুণ হবে এবং এইখানে এই রকমভাবে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে, তখন সেই ভাবনার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার গুরুভারে বামদিকেই বেশী করে ওজন নেমে যেতে লাগল, কিন্তু উপায় নেই, গুরু স্বয়ং রেখে দিয়ে গেছেন।

মহারাজার কাছে প্রত্যহ রাত্রে গান-বাজনা শুনিয়ে আসা এবং কুমার যোগেন্দ্রনাথকে সেতার শেখান চলতে লাগল। তাঁর বয়স আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল, তাই সমীহ করেই চলতে হত। আমার ওই বয়সে শিক্ষাগুরুর মর্য্যাদা পাওয়ার আশা করাই চলে না, ভালবাসা পাওয়াই ভাগ্যের কথা।

বাল্যকাল হতে কুমার বাহাদুরের বড় বড় গায়ক-বাদকের সঙ্গীত শুনার অভ্যাস এবং নিজের যথেষ্ট প্রতিভা থাকায় সংগীতের বিবিধ বিষয়ের উপর বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা এসে গেছল। কুট প্রশ্নাদির বেশ একটু প্রিয় ছিলেন। তার থেকে আমার উপর বর্ষণ করতে কসুর করতেন না।

আমি যাওয়ার দ্বিতীয় দিনেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে বললেন—আচ্ছা, ধামারের তাল সাতমাত্রার মধ্যে মুখে সমান গতিতে এক, দুই, তিন, এ রকম করে সাত পর্য্যন্ত বলে এক হাতে তাল এবং আর এক হাতে ওই সাতটি মাত্রার আঘাত দিয়ে দেখাও তো দেখি এবং ঝাঁপতালের ওইরূপভাবে পাঁচ মাত্রার মধ্যে?

প্রশ্নটা হঠাৎ এসে পড়ায় আমাকে একটু ভাবতে সময় নিতে হল। ওই দুটো তালের উপর যথেষ্ট আমার দখল থাকায় বুঝে নিতে বেশী বিলম্ব হল না, প্রশ্নমত দেখিয়ে দিতেই খুব খুসী হয়ে বললেন বাঃ তোমার তাল-মাত্রার উপরও খুব বোধ-জ্ঞান হয়েছে। প্রশ্নটা মোটেই সহজ নয়, আমি এত অভ্যাস করেছি তবুও দুটো হাতে সঠিক তালমাত্রা দিতে বেসামাল হয়ে পড়ি।"

বলেছিলাম, আমি কিন্তু এ নিয়মে কোন দিনই অভ্যাস করিনি। কুমারবাহাদুর যে যে শক্ত প্রশ্নগুলো বুদ্ধির পেঁটরায় রেখেছিলেন সেগুলি

প্রায়ই বের করে নিক্ষেপ করতেন আমার উপর, কিন্তু কোন দিনই আমাকে ঠকাতে পারেন নি। তাঁর কাছে গেলেই কিংবা আমার কাছে এলেই জানতাম কূট প্রশ্নের বাণ নিক্ষেপ হবে তাই আমি সতর্ক হয়ে আমার শিক্ষা-সাধনার জ্ঞান লব্ধ ক্ষুদ্র ঢালটিকে সম্মুখে উঠিয়ে রাখতাম।

সেতার শিখবেন, কিন্তু গৎ নয়, একেবারেই আলাপ। সেতারের উপর অঙ্গুলি চালনায় রপ্ত আগেই একটু করে রেখেছিলেন। শিখতে এসে প্রথম দিনেই বিপদে ফেলার মত ফর্‌মাস্‌ করলেন—সুরদাসীমল্লারের আলাপ শিখব।

ওই রাগের স্বরগতির নিয়ম প্রণালী এবং বাদী, সংবাদী ইত্যাদিই জানতাম এবং আমার সংগ্রহ খাতায় লিখে রেখেছিলাম। ওই রাগের রূপ অঙ্কনের নিয়ম পরিচয়টুকু জানার উপরই নির্ভর করে খুব মনঃসংযোগ দিয়ে তাঁকে আরম্ভ করলাম শেখাতে। কুমার সন্তুষ্ট হয়ে বললেন বাঃ সুন্দর রাগরূপ প্রকাশ পেয়েছে। নিজে ওই রাগের একটি খেয়ালের অংশও গলায় দেখালেন। তখন যে রাগগুলো বেশী রপ্ত ছিল না সে গুলোই তাঁর শিখবার ফরমাসে আসত যেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই। এতে আমাকে খুবই বিব্রত হতে হত। আমার একটি খাতায় না শেখা বহু রাগের গঠন প্রণালী ইত্যাদি লিখে রাখাছিল বলে হার স্বীকার করতে হয়নি।

মাস তিনেক থাকার পর একদিন কুমার বাহাদুর আমার কাছে এসে বললেন, বাবার কাছে আমলাবর্গরা তোমার উপর নালিশ করেছিল। তারা বলে, তোমার সর্বদা গান, সেতার সাধার জন্য তাদের কাণ ঝালা-পালা হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্মে খুব বিঘ্ন হচ্ছে।" বাবা তাদের কি বললেন জান! বললেন—এই রকম অত্যাশ্চর্য্য অধ্যবসায় নিয়ে ওই অত কম বয়েসে যে ছেলে এমনভাবে সাধনা করতে পারে সেই সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি আমি কোরব? তোমাদের যদি কাজকর্মের অসুবিধে হচ্ছে তাহলে এখানের অফিস তোমাদের আমলা বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম কর।" কর্মচারীরা হেট মুখে চলে গেল। বাবা আমাকে বলতে বললেন—তুমি সত্যকিঙ্করকে বলবে খুব সাধতে-নির্ভাবনায়, কর্মচারীদের এই অভিযোগ শুনে শুধু আনন্দই নয় ওর উপর বরং বলতে পারি শ্রদ্ধাই আসছে, এ ছেলে যেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মত সংগীত তপস্যায় ব্রতী হয়েছে এবং বিস্মিত করেছে।"

মহারাজার উপর শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মন আমার বিগলিত হয়ে উঠেছিল।

কুমার বাহাদুর অর্থাৎ স্বর্গত মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় উক্ত বিষয়ের কথা কয়েক বছর আগে মেজকাকা ও রমেশকে বলেছিলেন—সংগীত সাধনার প্রতি আমার কিরূপ গভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল সেই কথার সূত্র ধরে।

মহারাজার কাছে আমলাবর্গের নালিশ প্রত্যাখ্যাতই শুধু নয় প্রত্যাঘাত হওয়ায় আমার উপর তাঁদের কোপ আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই রকম কাণ্ডতে আমার সাধনায় একাগ্রতা বিঘ্নকর হয়ে উঠল নানান অশান্তিতে। সেদিন থেকে আসল বিষয়ের যে চিন্তা খুব বেশী করে দেখা দিল তা শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়ে। কেবলি মনে হতে লাগল এখন থেকে শিক্ষা বন্ধ থাকা খুবই ক্ষতিকর। এ ছাড়া আর একটা দিকে যে অসুবিধা হচ্ছিল তা রাত্রের খাওয়া নিয়ে। আমলাবাড়ীতে আমলাদের সঙ্গে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। যেতে হত অনেকখানি পথ। রাত্রে গান-বাজনা সেরে ১২টার পর তখনকার জনমানবশূন্য রাস্তায় সেখানে খেতে যাওয়া ও খেয়ে ফিরে আসা খুব ভয়ও আতঙ্ক থাকত। যাইহোক্,—গুরুর ব্যবস্থাপনার উপর কর্ত্তব্যকে দৃঢ় করে ধরে দিনগুলি নিয়মের উপর রেখে যেতে লাগলাম কিন্তু অনেককিছু অসুবিধা বেশী করে দেখা দিতে থাকায় শেষ পর্যান্ত ধৈর্য্যের বাঁধকে টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। দুপুরে খাওয়া সেরে গেলাম সুরি.লনে সোজা হেঁটে সেজকাকার বাড়ীতে। তখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য ব্যবস্থার জন্য কোন সামর্থ্য ছিল না। সেখানে পৌঁছে সেজকাকীমাকে সব কথা বলে আর সামলে থাকতে না পেরে কষ্টের বেদনায় চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

কাকীমা খুব কাতর হ'য়ে সেজকাকার কাছে গিয়ে অভিযোগের তীক্ষ্ণ বাক্যে বলতে লাগলেন,— তোমরা যে কি রকম কে জানে, ছেলেবেলায় বাপ হারিয়ে মায়ের কাছ ছেড়ে মেজ ভাসুরের কাছে এল শিখতে আর তোমরা তাকে এই এত কোমল বয়েসে আপন জন ছাড়া করে কারাগারের বন্দীর মত রাজবাড়ীর পাঁচিরের ঘেরার মধ্যে পুরে দিয়ে এলে! ওকে বলে দাও কাল এখানে চলে আসুক, তারপর বর্দ্ধমানে মেজভাসুর নিয়ে যান ভালই নচেৎ শীগ্‌গীর দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিবে, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে গিয়ে বাঁচুক ...। সেজকাকা আমাকে কাছে ডেকে বললেন,—তুমি কালই সকালে তোমার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসবে। মহারাজকে সবিনয়ে বলবে—

আমার শিক্ষার খুব ক্ষতি হচ্ছে এজন্য এখনকার মত বিদায় চাচ্ছি।” কাকার বাসা থেকে রাজবাড়ীতে ফিরে এলাম। রাত্রে গান-বাজনার পর ওই কথা জানাতে মহারাজা বললেন,—তোমার শিক্ষার ক্ষতি হোক এ আমি চাইনা, তবে আমি তোমার শিক্ষা, অদম্য সাধনা ও কর্ত্তব্যবোধ দেখে বুঝতে পারছি এখন থেকেই তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং তোমার দক্ষতা সম্বন্ধে আমার যা ধারণা এসেছে তাতে তুমি নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করতে পারবে। তুমি আবার আসবে এ প্রত্যাশা রইল···।”

পরের দিন সকালে মহারাজ ও মহারাজকুমারের কাছে বিদায় নিলাম। মহারাজ তাঁরই গাড়ীতে করে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করেদিলেন। সেজকাকার বাসায় উঠলাম।

এখানে একাদিক্রমে মাস ছয় থাকায় আমার লাভ বড় কম হয়নি। কয়েদীমনকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য প্রায় সর্বদাই সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন থাকতাম। নিষ্ঠা, একাগ্রতা বন্দীজীবনের মত জীবনে খুবই বাড়িয়ে দিয়েছিল। এক একটা বড় রাগকে নিয়ে তার বিশাল রূপকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করতাম অন্তর্দিষ্টির উপর ধ্যান-চিন্তা রেখে। গানের সংখ্যাবৃদ্ধির ভক্ত আমি কোনদিনই ছিলাম না, মেজকাকাই স্বইচ্ছায় সংখ্যা বাড়িয়ে যেতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ঘরাণা বস্তুগুলো সকলের মধ্যে যত বেশী থেকে যায় ততই ভাল। সত্যই প্রচার কামনায় উপর এত বেশী উদার ও কর্ত্তব্যপরায়ণ তাঁরমত মানুষ খুবই কম। শিক্ষা-সাধনার মধ্যে আমার বিশেষ করে আকাঙ্ক্ষা ছিল কি করে বড় গায়কদের মত ওই রকম মেজাজী গলা তৈরি করতে পারব এবং বড় বাদকদের মত ওই রকম তৈরি হাত হয়ে উঠবে।

নাটোর রাজবাটীতে থাকার সময় কুমার বাহাদুর যে সব কঠিন প্রশ্ন ও রাগাদির ফরমাস্ করতেন তাতে আমার বোধ-শক্তির পরীক্ষা এবং শিক্ষাও হত। ছোট থেকে কড়া কড়া প্রশ্নগুলো উদ্ভাবনের চেষ্টা রাখতাম বলে তাই কুমারবাহাদুরের শক্ত প্রশ্নগুলো ধরে নিতে বেশী অসুবিধে হত না।

একটু বেশী বয়সে বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলাম যথার্থভাবে সংগীত-বিদ্যাকে আয়ত্তে আনতে হলে নানান রকমের জটীল প্রশ্নোত্তর সৃষ্টি করা ও জানার বিশেষ আবশ্যক আছে। আজকাল এ সবের আলোচনা ও তর্কাদির দ্বারা বিদ্যার অধিকারের পরিচয় দান এক রকম উঠেই গেছে। তৈরি গাইতে ও বাজাতে পারলেই এবং মাথামুণ্ডহীন কবন্ধ রাগগুলো

শুনিয়েই যখন নাম-যশ ও অর্থ এসে যাচ্ছে তখন বিদ্যার উপর প্রকৃত দখল রাখবার জন্য জ্ঞান অর্জনের কি আবশ্যক আছে? কেইবা যাচাই করছে কার কতদূর বিদ্যার দৌড়?

তখন গুণী, আচার্য্য, পণ্ডিত, ওস্তাদ প্রভৃতি নামের সম্মান লাভ করতে হলে সংগীত সাধকদের যে উচ্চস্থানে পৌঁছতে হত, এখন তার প্রয়োজন হয় না, সমতলে দাঁড়িয়েই ওগুলো পাওয়া যায়, না পাওয়া গেলে নিজেই নেওয়া চলে।

তারপর সেজকাকার বাসায় দিন দুই থাকার পর মেজকাকা এলেন সংগীত-সঙ্ঘে শেখাতে। সেজকাকা আমার বিষয়ের সব কথা তাঁকে বললেন। পরের দিন তাঁর সংগে বর্দ্ধমানে চলে এলাম॥

(১৮)

দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ীতে—

কোলকাতার সুকীয়াষ্ট্রীটের সন্নিকট ৺দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ীর বংশধর একজন সে সময় বর্দ্ধমানের সাবজজ্ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত খুব ভালবাসতেন। মেজকাকার বাসায় প্রায়ই আসতেন গান শুনতে। যেদিন তিনি আসতেন্ সেদিন আমাকেও গাইতে হত এবং নিয়ে গিয়ে তাঁর বাসগৃহে প্রায়ই আমার গান শুনতেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ভাইপোর বিবাহ উপলক্ষ্যে মেজকাকার অনুমতি নিয়ে আমাকে তাঁদের সংগে কোলকাতায় নিয়ে গেলেন। বিয়ের দিন বরযাত্রী হয়ে গেলাম শোভাবাজার রাজবাটীতে। বৌ-ভাত উপলক্ষ্যে গান-বাজনার বিরাট আসর হয়েছিল। সেই আসরে তিন চার ঘণ্টা ধরে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আগাগোড়া বসে সংগীত উপভোগ করেছিলেন। তখন সকলস্তরের মানুষদের মধ্যে ধ্রুপদ গানের প্রতি অনুরাগ বেশী ছিল বলে গানের আসরে এই গানেরই প্রাধান্য ছিল খুব বেশী। শ্রোতারা নিরপেক্ষভাবে সংগীত সাধকদের যথোচিত সম্মান দিতে পারতেন বড় জিনিসের উপর বোধ শক্তি থাকায়।

সেদিন সেই আসরে উক্ত সাবজজ্ মহাশয় সভাস্থ সকলের কাছে সাহিত্য সম্মেলনে পদক প্রাপ্তি থেকে নাটোর মহারাজার মন্তব্য প্রভৃতি

নিয়ে আমার পরিচয় দেওয়ায় সকলের মধ্যেই বেশ একটা আলোড়ন ও আগ্রহ এল আমার গান শুনবার জন্ত। বালক দেখে বাজাতে অনিচ্ছা-সত্বেও সকলের বিশেষ অনুরোধে বিখ্যাত মৃদঙ্গাচার্য্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃদঙ্গ কোলে তুলে নিলেন। তাঁর ছাত্র বাদকরা উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁর মনভাব ছিল তাদের সঙ্গতের সংগেই আমার গান হওয়া সমীচীন। যাই হোক্—আমার গানের সংগে একটু বাজাবার পরই ভালভাবে বাজাতে তাঁর আগ্রহ বিশেষভাবে এসে গেল। শ্রোতাদের এবং তাঁর নিজের মধ্যে দিয়ে মুহুর্মুহু উল্লাস ধ্বনি হতে থাকায় আমার গাওয়ার উদ্দীপনা যথেষ্ট এসে গেছল। ফরমাসের উপর ছ' সাতটা ধ্রুপদ গান চার প্রকার রাগে গাওয়া হয়েছিল। ধামার গানে বাঁটের দুরূহ ক্রিয়া দেখে দুর্লভবাবু বিরাট একটা মন্তব্য করে ফেলেছিলেন। সেই বয়সেই দু' তিন ঘণ্টা ধ্রুপদ আমি অনায়াসেই গেয়ে দিতে পারতাম। গানের শেষে সভাস্থ সকলে আমাকে নিয়ে এত বেশী উল্লসিত হয়েছিলেন যে তাতে করে আমাকে বেশ লজ্জিত করে তুলেছিল।

তখনকার শ্রোতাদের প্রাণখোলা মনের প্রকাশে কৃপণতা বা দুর্ব্বলতা ছিল না, সর্ব্বদাই তাঁরা মনের সুস্থ পরিচয় রেখে যেতেন। তাছাড়া দলগত মনভাব ছিল না বলে একতরফা বিচার নিয়ে তাঁরা থাকতেন না। যথাযথ স্বীকৃতি দেবার মত মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। আর একটা বড় জিনিস ছিল দিগ্‌গজ্‌ সাজবার আকাঙ্ক্ষায় এখনকার অনেকের মত তখন কেউ সমালোচনায় কলম ধরতেন না নিজে বিশেষ কিছু না জেনেই।

ওই রাত্রের আসরের পরের দিন সকালে ভট্টচাইমশায় নিজেই এসে গৃহস্বামীদের বললেন, কুমার গন্ধর্বটি আছে? আছে জানতে পেরে বললেন তাহলে গানের একটু আসর হোক্—ছেলেটির মুখে সকালের রাগ শুনা যাক।" গৃহস্বামীরা খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন,—আপনাকে দেখামাত্র আমাদেরও এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। হলঘরের ফরাস পাতার উপর সকলে বসে পড়লেন। দু'একটি ছেলে পাড়ার বিশিষ্ট শ্রোতাদের খবর দিতে গেল।

সুর বাঁধার মধ্যেই হলঘরে এবং বারাণ্ডায় লোকে ভর্ত্তি হয়ে পড়ল। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও ছুটে এসে বোস্‌ল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি ভট্টচাইমশায় পাখোওয়াজের দুই পাশে দুই হাতের পাঁয়তারায় অতিক্রত গুরুগম্ভীর ধ্বনি তুলে দিয়ে সঙ্গীতের আবাহন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে

দিলেন। প্রথমে আরম্ভ করলাম ভৈরবরাগের আলাপ, পরে চৌতাল ও ধামার তালে ধ্রুপদ গাইলাম। আগের দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতে হওয়ায় শরীরে ক্লান্তি আসছিল— গাইবার আর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কারো কাছেই ছাড়ান পেলাম না, ফরমাস মত, আশাবরী, তোড়ী, এবং আলাইয়া রাগের উপর চৌতাল-ধামার তালের গান প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গাইতে হল। উৎসাহ পেলে শরীরের দিকে আমার লক্ষ্য থাকে না। প্রত্যেক আসরে সর্বোচ্চ মূল্যরূপে আমার লাভ হত সকলের কাছে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

খুব আনন্দ উপভোগ করে পরের দিন সাব্‌জজ মহাশয়ের পরিবার-বর্গের সংগে বর্দ্ধমানে চলে এলাম।

(১৮)

দেশ ভ্রমণ—

এই ঘটনার মাস দুই পরে পিতামহ ভাগলপুর হতে মেজকাকাকে পত্রে জানালেন আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য। উদ্দেশ্য সেখানের অনেক সঙ্গীতজ্ঞের সংগে পরিচিত হওয়া এবং গান শুনিয়ে কিছু যদি উপার্জন হয়।

বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য্য বংশের একজন ভাগলপুর ষ্টেশনের টিকিট কলেক্‌টর ছিলেন। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় রেলওয়ের কোয়ার্টারে ভাগবত পাঠের আহ্বান পেয়ে দাদু এখানে এসেছিলেন।

মেজকাকা দাদুকে আমার যাওয়ার সঠিক দিন ও ট্রেণের সময় পত্রে জানিয়ে দিয়ে আমাকে সেইদিন ট্রেণে তুলে দিয়ে গেলেন। আমার দূর পথে একা যাওয়ার সেই প্রথম সূত্রপাত। বয়স তখন বোধ হয় তেরর মত। রাত ৯টায় ভাগলপুর ষ্টেশনে নেমেই দেখি দাদু আমার খোঁজে ব্যস্ত। আমি কাছে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। দেখে খুব খুসী হ'লেন। সেই টিকিট কলেক্‌টরের বাসাতেই দাদু থাকতেন। সেখানেই নিয়ে গেলেন। উক্ত ব্যক্তির সংসারটি বেশ বড় ছিল। ওর মধ্যেই দাদুকে যত্নসহকারে রেখেছিলেন। আমি যেতে আরো সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কেমন যেন সঙ্কোচ আসতে লাগল। এটা দাদুও বেশ অনুভব

করলেন। তাঁর ভাগবত পাঠের ধার্য্য দিন শেষ হয়ে এসেছিল। দাদু আমাকে বললেন—অন্যত্রে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আসরে তোমার গান হ'লেই, ৺গোপীনাথ নিশ্চয়ই এই সঙ্কোচ কাটিয়ে দেবেন। টিকিট কলেক্টারটি অতিশয় অমায়িক ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। আমাদের প্রতি তাঁর ব্যবহারে কোনই ত্রুটি ছিল না।

পরের দিন দাদুর সঙ্গে সকালে গঙ্গাস্নানে গেলাম। বাসা হ'তে দূরত্ব প্রায় দু' মাইল হ'বে। দাদু প্রত্যহ এখানে গঙ্গাস্নান করতেন। সেদিন স্নানাদির পর গঙ্গাতীরে ওখানকার সহরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠাবান উকিলের সংগে পরিচয় ঘটে গেল। উকিল মহাশয় যে একজন ধর্মপরায়ণ ও সাত্ত্বিক ব্যক্তি তা তাঁর আচার ব্যবহারে বুঝতে আমাদের বিলম্ব হল না। দাদুর সংগে শাস্ত্রাদি আলোচনায় খুব সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর বাড়ীতে থাকবার প্রস্তাব করলেন। দাদু সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে সাদরে আমাকে জড়িয়ে ধরে দাদুকে বললেন—আমার বাড়ীর সকলেই শাস্ত্রীয়-সংগীতের প্রতি খুব অনুরক্ত, আমি নিজেও বাগচী মহাশয়ের কাছে কিছু ধ্রুপদ শিখেছিলাম।” ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল উপেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মহাশয় একজন বিশিষ্ট ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন একথা আমি মেজকাকার কাছে শুনেছিলাম। এঁর দৌহিত্রীও খুব ভাল ধ্রুপদ গায়িকা হ'য়ে উঠেছিলেন একথাও শুনেছিলেম। মনে হয় তখনকার মেয়েদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ধ্রুপদ গানে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ইনি বিবাহ বয়সের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। বাগ্‌চী মহাশয়ও আমাদের যাওয়ার ওই সময়ের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্রেরা সঙ্গীতে খুব অনুরাগী ছিলেন। তারপর সেদিন উকিল মহোদয় আমাদের তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে গেলেন। মাঝপথে তাঁর সুবৃহৎ বাড়ীর গেটের কাছে নেমে বললেন—এই গাড়ীতে গিয়ে আপনাদের জিনিসপত্তর নিয়ে আসুন। ভগবানের কৃপায় আমরা সুন্দর পরিবেশে থাকতে পেলাম। সেইদিন রাত্রে উকিল মহোদয় ও তাঁর বাড়ীর সকলে আমার গান শুনে খুব খুসী হলেন, ঠাকুরদার গানেও তাঁরা বেশ আনন্দ পেলেন।

উকিল মহোদয় পরের দিন বার লাইব্রেরীতে আমার বিষয় প্রচার করে এলেন। সে সময় ভাগলপুরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু অনুরাগী শ্রোতা ও চর্চারত ব্যক্তি ছিলেন। বার লাইব্রেরীতে প্রচার হবার পর থেকেই

সহরের নানান স্থানে গানের আসর হতে লাগল। উকিলদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বেশ উচুদরের শ্রোতা ছিলেন এবং ধ্রুপদের প্রতিই তাঁদের অনুরাগ সমধিক ছিল।

সে সময় ভারত শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ বাদনবিদ্ শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র এসে পড়েছিলেন এক ধনী ব্যক্তির আহ্বানে।

পুরণচাঁদ মাড়োয়ারী ছিলেন ওখানের খুব বড় ব্যবসায়ী। তিনি উচ্চাঙ্গসংগীতের খুব ভক্ত ছিলেন। এক আসরে আমার গান শুনে সকালের রাগ শুনবার ইচ্ছায় এক রোববার তাঁর সহর মধ্যস্থ বিরাট বাগান বাড়ীতে আসরের আয়োজন করে সমস্ত গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের আহ্বান জানান। এবং সঙ্গতের জন্য শম্ভুজীকে নিযুক্ত করেন।

সেই দিনে যথা সময়ে আমাদের গৃহস্বামীর সহিত তাঁর গাড়ীতে করে সেই বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। শ্রোতাদের উপস্থিতিতে তখনই বিরাট হলঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেছল।

অতবড় ধুরন্ধর পাখোওয়াজীর সংগে ওইটুকু বয়সের ছেলে কেমন ভাবে ও কি রকম সাহসের সহিত গাইতে পারবে—তাই বিশেষ করে সেদিনের আসরের আকর্ষণ ছিল কৌতুহলের উপর। আমার কিন্তু খুব উদ্দীপনা ও আনন্দ এসেছিল অতবড় বাদকের সংগে গাওয়ার সুযোগ পাওয়ায়।

শম্ভুজী তানপুরার সুরের সংগে সুর মিলিয়ে পাখোওয়াজের বাঁদিকের ছাদনে আটা চড়িয়ে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে নিয়ে যখন গুরু গম্ভীর ধ্বনি উৎপন্ন করে দু' হাতে বোল তুলে হাতের পাঁয়তারাটা কসে নিলেন তখন মনে হল যেন সেই শব্দ ঝড়ের গতিতে মেঘের মত গর্জন করে ছুটে চলে গেল। ওইটুকুতেই বেশ বুঝালেন কত সাঁধনা তিনি করেছেন।

আমি প্রথমতঃ তোড়ীরাগের আলাপ সমাধা করে চৌতাল তালের উপর ধ্রুপদে করণীয় কাজসমূহ সমাধা করে ধামার ধরলাম। নিজের গড়া একটা খুব পেঁচাল ছন্দের উপর ঘোরাল তেহাইযুক্ত বাঁটের কাজ দেখিয়ে যেমনি 'সম'এ ফেলেছি ওমনি মিশিরজী সেখানে 'ধা' না রাখতে পেরে একমাত্রা পরে 'ধা' ফেলে দিলেন। তারপর অতীত অনাঘাতের উপর দু'বারই ধা—চুকে গেলেন, অর্থাৎ ওর নিয়ম অনুযায়ী হাত 'তুলার স্থানে তিনি 'ধা' রাখতে পারলেন না। সভাস্থ সকলের মধ্যে যেন কি এক কাণ্ড ঘটে গেল।

মিশিরজী ভীষণ রেগে গিয়ে আমাকে বললেন—"বাচ্চে! হুঁসিয়ারী সে গানা গাও—বহুত বেতাল হো জাতা···।" কি বলছেন তা বুঝতে না পেরে আমি উকিলসত্যবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি অর্থটা বলা মাত্র আমি বললাম—আমার তাল ঠিক ছিল—উনিই ভুল করে সমে 'ধা' রাখতে পারেন নি। সত্যবাবু এবং আরো দু'চারজন গাইয়ে মিশিরজীকে বুঝিয়ে দিলেন—আমরা বরাবর হাতে তাল এবং লয়কারীর সময় মাত্রাও দিয়ে যাচ্ছি, তালে একটুও এদিক ওদিক হয় নি—বিশুদ্ধ তালে গান চলছিল।" শম্ভুজী আরো উত্তেজিত হয়ে বললেন - আমি এতকাল ধরে ভারতের বড় বড় গায়কদের সংগে বাজিয়ে আসছি কেউই আমাকে ঠকাতে পারেনি—আর আজ একটা শিশুর কাছে 'ধা' চুকে ভুল করব—এ কথা আপনারা বলতে চান?

তখন তাঁরা আমাকে বললেন—তুমি আবার ওই কাজগুলো দেখাও আমরা ওঁর সামনেই তাল মাত্রা হাতে গুণতে থাকব।

ঠাকুরদা ভীষ্মের মত চুপ দিয়ে বসে যুদ্ধ উপভোগ করতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম শম্ভুজী যদি তখন অন্যমনস্ক হয়ে বাজাবার দরুণই ভুল করে থাকেন তাহলে এখন সতর্ক হয়ে ঠিক বাজিয়ে দেবেন এবং আমিই ভুল করেছিলাম এ কথাই বলবেন, কারণ তিনি বয়স্ক ও মস্ত বড় নামিবাদক আর আমি ছেলে মানুষ গায়ক। কাউকেই সেরূপ বলার সুযোগ দেওয়া চলবে না এই সঙ্কল্প নিয়ে আর একটা দুরূহ ছন্দের ঠাঁট করে খুব আস্তে 'সম'র উপর ছেড়ে দিতেই মিশিরজী একমাত্রা পরে 'ধা' দিয়ে ফেললেন, আমি সংগে সংগে অনাঘাতের ক্রিয়া ধরে আস্থায়ীর শেষের পর মহড়ার 'সম'এ হাত তুললাম। মিশিরজী এবারও তদ্রুপ। মিশিরজী মুখ শুকন করে গম্ হয়ে বসে রইলেন। সভাস্থ সকলের মুখে নিঃশব্দ হাসির রূপ ফুটে উঠল।

দাদু আমাকে বললেন—মিশিরজীকে নমস্কার করে ক্ষমা চেয়ে নাও। আমি তৎক্ষণাৎ তাই করলাম। সংগে সংগে তিনি নরম হয়ে গেলেন এবং খুব খুসী হয়ে আমার পীঠে হাত রেখে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করে বললেন—মুঝ কো তাজ্জুব কর দিয়া ···।

সকলের অনুরোধে শম্ভুজী কোলে পাখোওয়াজ তুলে নিলেন, চার পাঁচটা গান গাইলাম, তখন আর কড়াপাকের ছন্দ না করে।

পুরণজী সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে

গান হবে,— রাত্রের রাগ শুনব, আপনারা দয়া করে সকলে উপস্থিত হবেন, মিশিরজীকেও নিয়ে যাব।

আসর ভেঙ্গে যাবার পর শ্রোতারা আমার উন্নতি ও শুভ-কামনা জানালেন। আমাদের থাকার স্থানের গৃহস্বামী খুব হর্ষসহকারে বাড়ীর সকলের কাছে সমস্ত ঘটনা জানাতে তাঁদের খুব আনন্দ এল—ঘরের ছেলের মত সকলে মনে করতেন বলে তাই।

পরের দিন বহু শ্রোতার উপস্থিতিতে পুরাণচাঁদজীর বাড়ীতে রাত্রি-বেলায় আমার খেয়াল গানেরই আসর হল—কারণ শম্ভুজী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে আগের দিনই এই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। দু'দিনের গানে পুরণজী দিয়েছিলেন একটি মহুর ও পঞ্চাশটি টাকা। অনেক বেশী পেয়েছি মনে হয়েছিল।

ভাগলপুরে দিন পনর আমাদের থাকা হয়েছিল। এখানের ক্ষিতীশবাবু নামে এক ভদ্রলোক আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর ঘড়ির দোকান ছিল। আমাকে একটি পকেট ও একটি হাতঘড়ি দিয়েছিলেন উপহার ও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। এক সংগে দু'টি ঘড়ি পাওয়ায় আমার খুব আনন্দ এসেছিল। কারণ মাত্র একটি পেলে দাতার স্নেহ চিহ্ন ধারণ করে রাখা সম্ভব হত না আমার অগ্রজকেই দিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য হত।

যেদিন ভাগলপুর হ'তে আমাদের চলে আসা হ'বে সেদিন উকিল মহোদয়ের বাড়ীর মহিলারা আমাকে ছাড়তেই চান না। আমি যেন সত্যই তাঁদের কাছে কারো নিজের ছেলের মত, দেওরের মত এবং ভাই এর মত হ'য়ে গেছলাম। তাঁদের আকর্ষণে অধিকাংশ সময় বাড়ীর ভেতরেই আমাকে থাকতে হত।

যাবার সময় বিদায় নিয়ে প্রণাম করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখি সকলেরই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

এখনও তাঁদের কথা মনে হলে মায়ার ও সংগ কামনার আকর্ষণ জেগে উঠে। বাল্যকাল হ'তে বড় হওয়া পর্য্যন্ত যত জায়গায় গেছি তার অধিকাংশ স্থানেই পেয়েছি কুলললনাদের কাছে অপরিমাপ্ত স্নেহ, আদর ও ভালবাসা। মনের এই একান্ত কামনার ক্ষুধাটি এই রকম করেই ভগবান পূরণ করে দিয়ে এসেছেন।

আমাদের চলে যাবার সংবাদ পেয়ে ষ্টেশনে বহু লোক এসেছিলেন বিদায় সম্ভাষণ ও স্নেহাশীষ জানাতে।

পরমাত্মীয়ের মত সকলে ভালবাসা জানিয়ে আবার আসবার জন্য বার বার বলতে লাগলেন। ট্রেণ আসার মুখে দাদুকে সকলে প্রণাম করলেন। আমি সকলকে বিনীত নমস্কার জানালাম। ট্রেণ চলতে আরম্ভ করতেই সকলে সেই সঙ্গে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্ত পর্যান্ত হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে লাগলেন। আমি জানালার বাইরে মুখ রেখে তাঁদের দেখতে পাওয়া পর্যান্ত তাকিয়ে রইলাম। অদৃশ্য হয়ে যেতেই মন চলে গেল চোখকে ছলছলিয়ে উকিলবাবুর বাড়ীর গেটের কাছে,—যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন আমার প্রতি স্নেহ যত্ন কারিণীরা এবং আমার বয়সী একটি খেলার সাথির মত মেয়ের সম্মুখে, সে সর্বদা আমার যত্নাদির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। সবচেয়ে সে বেশী ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে ছিল আমার হাত ধরে। মনে পড়ে গেলেই ভাবি সে এখন কোথায়, কোন্ সংসারের গৃহিণী, এখনও আমার স্মৃতি তারও মনে আছে কি-না!

নানান জায়গায় নানান গৃহে এই যে এত প্রীতি, ভালবাসা, তৃপ্তি, আনন্দ ও আন্তরিক টানের উপর আদর যত্ন পাওয়া এতে করে আমার মনে হয় এক জনমের মধ্যেই যেন কতবার জন্ম-জন্মান্তর ঘটে যায়, থাকে শুধু ফিলিম্ প্রিন্টের মত পরের পর সাজান হয়ে অপূর্ব চিত্রময় স্মৃতি সকল...।

ওখান হতে আমরা মুঙ্গেরে এলাম ॥

(১৯)

মুঙ্গেরে ও গয়ায়—

ভাগলপুরের উপেন বাগ্‌চি মহাশয়ের বড়ছেলের শ্বশুরবাড়ী মুঙ্গেরে। তিনি আগে থাকতেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁদের ওখানেই আমরা উঠব। তাঁরা সেখানের বিরাট ঔষধ ব্যবসায়ী ও বড়লোক। গৃহস্বামী প্রভৃতি সকলেই আমাদের অতিসমাদরে গ্রহণ করলেন। এঁদের প্রাসাদোপম বাড়ীর নাম 'লালকুঠি'।

ভাগলপুর হতে আমার সম্বন্ধে এখানে বহু কিছু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় আমাদের আসার খবর পেয়ে সংগীতানুরাগী ব্যক্তিসকল এসে দেখা করতে লাগলেন। কয়েকদিন ধরে বিশেষ বিশেষ জায়গায় গানের আসর হল। উৎসাহ ও অর্থপ্রাপ্তি মন্দ হল না।

লালকুঠির কর্ত্তা তাঁদের গাড়িতে করে নবাব মীরকাশীমের কেল্লা ইত্যাদি এবং সীতাকুণ্ড দেখিয়ে আনলেন।

এঁদের অন্দরমহলেও আমার যথেষ্ট আদর যত্ন লাভ হয়েছিল। আমার বয়েসের অনেকগুলির যিনি ঠাকুমা ছিলেন তিনি আমাকে নিজের নাতিদের মতই ভালবাসতেন। চলে আসবার দিন এঁকে যখন প্রণাম করতে গেলাম তখন অনুভব করলাম তাঁর মুখ বেশ বিচ্ছেদ কাতর। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—দু' একটি গান শুনিয়ে দাও ভাই! তোমার কণ্ঠস্বর যেন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাণে রাখতে পারি।

"আমি গাইলাম গোয়ারীর টপ্পার সুরের অনুকরণে রচিত—ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ রাগে—"হরি তোমায় ভালবাসি কৈ ......।" দ্বিতীয়টি ভৈরবীসুরে অনুরূপ গায়কীর উপর—"হৃদয় রাশ মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে......" গান ধরতেই পুরমহিলারা এবং অন্যান্য সকলে এসে পড়লেন। ঠাকুমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার দৃশ্য দেখে সকলের মন যেন পুলকে ভরে উঠল। গানের ভাবে সকলের চক্ষেই এসে গেল অশ্রু। আমার চলে যাওয়ার ব্যথাও যেন সেই সংগে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই রকম মহিলামহলে গানের সময় দেখেছি তরুণ তরুণীদেরও ভক্তিমূলক গানে মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। জীবন ধর্ম্মভিত্তিক হয়ে গঠন হত বলে ভাবের প্রভাবে সুরের বৈচিত্র্য প্রভাব তাদের মনে প্রবেশ করে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলত।

কোলকাতায় আসার প্রথম সময় থেকে চার পাঁচটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে থাকায় প্রথম কয়েক বছর দেখেছি ছাত্রীরা ধ্রুপদ, খেয়াল এবং ধর্মসঙ্গীত খুব আগ্রহ সহকারে শিখ্‌ত এবং সর্বত্রই এই ভাবধারা ছিল।

আগের সূত্রে,—তারপর সেদিন সেই 'আবার আসবে...আবার আসবে' কথা শুনতে শুনতে তাঁদের গাড়ীতে করে মুঙ্গের ষ্টেশনে এসে ৺গয়াধামে রওনা হলাম। গয়া ষ্টেশনে নেমে মুঙ্গেরের সেই তাঁদের বাড়ীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ধরে তাঁদের পত্র নিয়ে উঠলাম 'শঙ্করলজে'। এই 'শঙ্করলজের' গৃহস্বামীরা গয়ার বহুদিনের বাঙালী জমিদাররূপে প্রসিদ্ধ।

তাঁরা আমাদের পরম আগ্রহে গ্রহণ করে সর্ব্ববিধ যত্নে রাখলেন। এঁরা পাঁচ ভাই—একান্নবর্ত্তী এবং বেশ সুখী পরিবাররূপে দেখেছিলাম। পরস্পরের মধ্যে এমন নিবিড় একাত্মবোধ প্রায় দেখা যায় না। গার্হস্থ্য-

ধর্মের উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ। এঁদের বাড়ীর কুলবধূ প্রভৃতি এবং সন্তানগণ যেন এক সূতোয় গাঁথা পারিজাত মালার মত। ভাইএরা প্রত্যেকেই শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এমন কী ছেলেমেয়েরা পর্যান্ত ভাল গানের প্রিয় ছিল বলে আমাকে পেয়ে তারা মেতে উঠেছিল।

এঁদের বৈঠকখানাতেই শুধু আমার গানের আসর হত না—পাঁচ বধূর পাঁচ মহলেও চলত আমার গান এবং কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ মেলাতেও। এখানের মত এমন সুন্দর তৃপ্তি খুব কম স্থানে পেয়েছি।

এখানে আসার তিন চার দিন পরে দাদুর একান্ত ইচ্ছায় এঁদেরই বাঙালী পুরোহিতের দ্বারা ফল্গুনদীতে পিতৃশ্রাদ্ধ এবং ৺গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করলাম। এখানেও দাদু মন্ত্রসকল বিশুদ্ধিকরণে যত্ন নিচ্ছিলেন পুরোহিতের ভুল দেখে। কোন কিছুতেই তিনি ত্রুটী সহ্য করতেন না।

পিণ্ডদান ইত্যাদি কার্য্য সমাধার পর পুরোহিত ঠাকুর নিয়ে গেলেন গয়ালীগুরুর চরণপূজা করতে হয় বলে মাধবলাল কাঠারীর কাছে। ইনি জবরদস্ত গয়ালীগুরু। দেখলাম, দু'টি পায়ের মহিমায় বিরাট ধনীর মত তোফা আরামে বিরাজ করছেন। পুরুতঠাকুর মশায় বিশেষভাবে আমাদের পরিচয় দেওয়া মাত্র খুব উল্লসিত হয়ে বললেন—তাহলে আজ রাত্রেই আমার এখানে গান শুনার ব্যবস্থা করব। এখানের বিশিষ্ট শ্রোতা ও সঙ্গীতজ্ঞদের খবর দেবো শুনতে আসবার জন্য এবং এঁদের ওখানে সন্ধ্যার পর গাড়ী পাঠাব।

মাধবলালজী তাঁর প্রাপ্য প্রণামীতো নিলেনই না—উপরন্তু ভালভাবে জলযোগ করিয়ে তাঁর গাড়ীতে করে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন 'শঙ্করলজে'।

ফেরার পথে পুরুতঠাকুর বললেন,—মাধবলালজী এখানের বিরাট মাননীয় ব্যক্তি এবং অত্যন্ত সংগীতপ্রেমিক ও বড়দরের হার্ম্মোনীয়ম বাদক। প্রায়ই ওঁর বাড়ীতে মজলিস হয়। যেমনই ব্যক্তি হোন্ তিনি এঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

সেদিন যথা সময়ে গাড়ী এসে গেল। জমীদার ভ্রাতারাও তাঁদের গাড়ীতে করে আমাদের সংগে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম একটি বৃহৎ হল ঘরে শ্রোতাতে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। মাধবলালজী অতি যত্ন সহকারে আমাদের সকলের সম্মুখ ভাগে বসালেন এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণার

সবিশেষ পরিচয় দিলেন। এ বিষয়ে প্রথম সাক্ষাতে দাদুর কাছে সংক্ষেপে সমস্ত সংবাদ জেনে নিয়েছিলেন। তারপর উপস্থিত সঙ্গীতজ্ঞদের পরিচয় দিয়ে বলতে লাগলেন—ইনি ভারত বিখ্যাত গায়ক হনুমান দাসজী, ইনি ওঁর পুত্র প্রসিদ্ধ ঠুংরী গায়ক এবং হার্মোনীয়ম বাদক—নাম ছোনীমহারাজ, আর ইনি হলেন স্বনামধন্য এসরাজ বাদক—কাঁনাই ঢেড়িজীর প্রধান ছাত্র ফেলুবাবু।" আরো দু' একজনের নাম ও সাধনার পরিচয় দিলেন কিন্তু ঠিক মনে রাখতে না পারায় নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না। আমি সকলকে হাতজোড় করে নমস্কার করলাম।

তারপর গৃহস্বামী মাধবজী বললেন—কুমার গায়ক তুমি মাঝখানে তানপুরা নিয়ে বোসো, আমি এবং ছোনীজী তোমার দু' পাশে হার্মোনীয়ম নিয়ে সুরের সহযোগীতা করব, তুমি খানিকক্ষণ গেয়ে 'সম'এ ফেলে দিলেই ছোনীজী তালের সংগে সেই রাগের রূপ প্রকাশ করবেন, তারপর 'সম'এ ছেড়ে দিলেই তুমি আবার ধরবে এবং আবার 'সম'এ এলেই আমি হার্মোনীয়মে সেই রাগ প্রকাশ করব। এই ভাবে গান চলবে।"

ইমন, ছায়ানট ও কেদার—এই তিনটি রাগের খেয়াল ওই রকম নিয়মে তিন ঘণ্টার উপর চলল। সকলেই খুব তারিফ্ ও উৎসাহ প্রদান করলেন। হনুমান দাসজীর কাছেও খুব উৎসাহ ও আশীর্বাদ লাভ করে ছিলাম। ঠাকুরদা' শুধু তানপুরা বাজিয়ে দরবারী কানড়ার খেয়াল গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন,—তাঁর তিন সপ্তকের দ্রুত তান সকলকে উল্লসিত ও বিস্মিত করেছিল।

শঙ্করলালের ভ্রাতারা বাড়ীর উৎসুক পরিজনের নিকট আনন্দ সহকারে আসরের সবিশেষ বিবরণ দিতেই আমাকে ঘিরে সকলে খুব হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। মনে হয়েছিল যেন এই প্রত্যাশায় তাঁরা উন্মুখ হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে সংগীতের সেই যুগ যেন সত্যযুগের মত ছিল। তারপর এখানের নানা স্থানে আসরের জন্য বেশ কয়েক দিন থাকা হয়ে গেল। গৃহস্বামীরা কেবল অনুরোধ করতে থাকেন থাকার দিন বাড়াবার জন্য। আমারও এত ভাল লেগেছিল যে বাড়ীর কথা এক রকম ভুলেই গেছলাম। ইত্যবসরে এঁদের ছেলে মেয়েদের সংগে বুদ্ধগয়া, রামশীতা ও ব্রহ্মযোণী পাহাড় দেখে এসেছিলাম।

একদিন এঁদের এখানে রাত্রের আসরে ফেলুবাবুর এসরাজ বাদন শুনার সুযোগ হ'ল। অপূর্ব লেগেছিল তাঁর বাদন ক্রিয়া, যেমনি তৈরি

তেমনি রাগের উপর কৃতিত্বপূর্ণ অঙ্কনের ক্ষমতা। এসরাজের মত এমন একটি সর্বাঙ্গীন শক্তিসম্পন্ন বাদ্যযন্ত্র শিখতে এখন আর তেমন কারোরি আগ্রহ নেই, আগে এই যন্ত্রেরই চর্চা ছিল সর্ব্বাধিক হয়ে এবং আমাদের দেশেও। সারঙ্গী ও সেতারের বাদন ক্রিয়া একত্রে এই যন্ত্রেই প্রকাশিত হয়। এমন কি ছড়ের ডোগায় তারের উপর আঘাত করে যখন বাজান যায় তখন শরদ বাদ্যের আওয়াজ ও তার বাদন ক্রিয়ারমত অনেকটা শুনায়।

ওখান হতে চলে আসার দিনে 'শঙ্করলজের' গৃহপরিজনদের কাছে বিদায় নেবার সময় আগের দু'জায়গার মতই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, বরং এখানে আরো বেশী করে বিয়োগ ব্যথার দৃশ্য অনুভব হয়েছিল,—যার স্মৃতি জীবনে কখনও ভুলা যাবে না। বাড়ীর গৃহমালিকরা এবং ছেলে-মেয়েরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসেছিলেন।

এখান হতে ৺কাশীধাম, এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত স্থানে গিয়ে সেখানের সঙ্গীতগুণীদের সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে এবং নিজে শুনিয়ে সেবারের মত ভ্রমণ শেষ করে দীর্ঘ দিনের পর দেশে ফিরলাম। ওই সব স্থানেও প্রচুর আনন্দ, উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছিল। বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আর মনে করলাম না॥

(২০)

পুরুলিয়ায় সঙ্গীত ঘরাণার সন্ধান—

বাড়ীতে আসার পর আমার আপন কাকা দাদুর কাছে এসে বললেন,—বামাচরণ তার ভাগ্‌নীটির রামসত্যর (আমার অগ্রজ) সংগে বিবাহের কামনা জানিয়ে অনেক অনুনয় করে আমাকে পত্রে জানিয়েছে এই দেখুন। সম্মতি পেলে এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই শুভকাজ সমাধার জন্যও প্রার্থনা করেছে। তার ভগিনীপতি প্রায় বছরখানেক হল মারা গেছেন, বড় ভাগ্‌নেটির বয়স মাত্র পনর। দেওয়া থুয়ার কিছুই সামর্থ্য নেই তাও জানিয়েছে। এখন কি উত্তর দেবো বলুন?"

উক্ত বামাচরণবাবুর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার শেষ পূর্ব্বসীমার কোলাঘাট ষ্টেশনের কিছু দূরবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামে। ইনি আমাদের

বাড়ীতে পাঁচ বছর থেকে আমার কাকার কাছে সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষা করে কাব্যে এবং ব্যাকরণে তীর্থ উপাধি লাভ করেছিলেন। সন্ধান নিয়ে জেনেছিলেন আমাদের গৃহে বিদ্যাদিশিক্ষার টোল আছে এবং ছাত্ররা গুরুগৃহে খেয়ে, থাকতে ও অধ্যয়ন করবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। বামাচরণবাবু অতিশয় নির্মলচরিত্রের এবং সাত্বিক প্রকৃতির আদর্শ মানুষ ছিলেন। দেখলে সকলেরই শ্রদ্ধা আসত। ঠাকুরদা চিঠিটা আর না পড়ে—সমস্ত শুনেই বললেন - তোর শিষ্য যখন এই কামনা জানিয়েছে তখন কোনমতেই অমত করা উচিত হবে না। প্রকৃত শিষ্যরাই গুরুর সাধনালব্ধ বিদ্যার সংরক্ষক ও সার্থক প্রতিভূ,—তাদের মধ্যে দিয়েই গুরু অমর হয়ে থাকেন। সুতরাং সাধ্যমত তাদের ভাবনা-চিন্তা ও দায়দায়িত্ব লাঘব করা গুরুরও বিশেষ কর্তব্য আছে। তুই লিখে দে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ দিন বাদ দিয়ে বিবাহ হ'তে পারবে। আর জানিয়ে দিস দেনা-পাওনার জন্য কোন চিন্তা নেই। নগদ টাকার তো প্রশ্নই নেই—এমন কি গহনা ইত্যাদির দাবিও ন্যায় ধর্মের মধ্যে পড়ে না।

সহজসাধ্যমত কন্যাপক্ষ যেটুকু পারবেন তার উপর পাত্রপক্ষের কোন কিছুর জন্য ইচ্ছা প্রকাশকে আমি মানুষের মত কাজ বলে মনে করি না। ন্যায় ধর্মের দিকে তাকিয়ে বিচার করে দেখলে কন্যার বিবাহের দায়িত্বের চেয়ে পাত্রের বিবাহের দায়িত্ব আরো বেশী। কারণ ছেলেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এজন্য ভাল ভদ্রবংশের ধর্মপরায়ণা মেয়ে পেলে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করতে হবে এবং তাকে অতি সমম্মানে ও কৃতজ্ঞতার সহিত সমাদরে নিয়ে আসতে হ'বে। ভাবতে হবে আমাদের বাড়ীতে একটি লক্ষ্মীর আগমন হল। এই নিয়মনীতি পালন আমাদের বংশে বরাবর চলে আসছে।"

কাকা বললেন আপনার এই মন্তব্য মানুষ মাত্রেরই সর্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে—মেয়েটিকে দেখতে কে যাবে? কারণ কালই আমাকে মাস দুই এর জন্য গান-বাজনা ও ভাগবত পাঠের ডাকে যেতে হবে বিদেশে এবং আপনাকেও ১লা বৈশাখের আগের দিন গুরুলিয়ায় পারায়ণ ও ভাগবত পাঠের জন্য যেতে হবে - সে কথা আপনাকে আগেই পত্রদ্বারা জানিয়েছি। সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ কি করে হ'তে পারবে তাই ভাবছি।

দাদু বললেন - মেয়ে দেখতে যাবার আবশ্যক আছে বলে আমি মনে

করতে পারছি না। পাত্রী কানা, খোঁড়া বোবা বা ব্যাধিগ্রস্থ নিশ্চয়ই নয়, কারণ তাহলে ছাত্র কখনও বিবাহের প্রস্তাব করত না। পছন্দ, অপছন্দ অত সব আমি বুঝি না, যার যা পতি-পত্নী তা ঠিক হয়েই আছে -কারো সাধ্য নেই তাকে রোধ করবার।"

দাদু দেনা-পাওনা, দেখাশুনা ইত্যাদির যে সব কথা বললেন—তা আমিও সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধার সংগে মেনে চলি। কারণ এই বিষয়ের উপর মনুষ্যত্বের পরিচয় বিশেষ রূপে জড়িত।

ওই সময় বর্দ্ধমানে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলে দাদু আমাকে সংগে করে নিয়ে গেলেন পুরুলিয়ায়। সেখানে এক জমিদারের বিধবা স্ত্রী একমাস ধরে পারায়ণ ও ভাগবত পাঠের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এক প্রতিনিধি এসে কাকার কাছে কথাবার্ত্তা সব ঠিক করে গেছলেন।

পুরুলিয়া জেলার এক অঞ্চলে ঘোঙ্গা নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে শাস্ত্রীয়-সংগীতের এক বিখ্যাত ঘরাণার সৃষ্টি হয়ে কথক বংশ নামে পরিচিত হয়। আমার সেই বয়সের সময়ে তার প্রাচীনত্বের পরিচয়ে প্রায় চারশ' বছরের মত ছিল। এই ঘরাণা বংশের এখন আর কোন গায়ক-বাদক আছেন কি-না জানি না। ৺কাশীর মিশ্র ঘরাণার মত এই ঘরাণাতেও গীত-বাদ্য ও নৃত্যাদির চর্চা ছিল।

পুরুলিয়াতে কয়েক দিন থাকার পর ওই কথক ঘরাণার এক মধ্যবয়সী ছাত্র-পশুপতিবাবুর সহিত এক সাক্ষাৎকারে আলাপ-পরিচয়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। ইনি খুব দাপটের সহিত ধ্রুপদ গাইতেন এবং গানের মধ্যে তালাঙ্কশাস্ত্রের তর্জমাক্রিয়ায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর গানের সময় মনে হত যেন সুর-তালের লাঠিখেলা চলছে। কথক বংশের গায়কদের ওই জিনিস নিয়ে আনন্দ এবং কূটতর্কের উপর আগ্রহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত।

পশুপতিবাবুর আমাদের কাছে আসা এবং তাঁর বাড়ীতে আমার যাতায়াত খুবই বেশী হত এবং সব সময়েই সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা চলত। চৌতাল ছাড়া অন্য তালেও যে অতীত-অনাঘাতের ক্রিয়া দেখান যায় তা তাঁর জানা ছিল না,—গানের মাধ্যমে তার ব্যবহার আমার কাছে শিখে নিয়েছিলেন। তখনকার দিনে বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বংশের এক বিখ্যাত ঘরাণার ধ্রুপদী বিশ্বনাথ রাও কোলকাতাতেই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিলেন। তিনি ধামার গানে বাঁটওয়ারার দুরূহ ক্রিয়া দেখানর অদ্বিতীয় ব্যক্তি

ছিলেন। যেজকাকাও বাঁট-ছন্দের ক্রিয়ায় খুব পারদর্শী ছিলেন। আমি বিশ্বনাথজীর ওই সব ক্রিয়া কলাপও শুনে শুনে নিজে রচনার দ্বারা গানের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবহার করতে পারতাম। পশুপতিবাবু এই জিনিসও কিছু শিখে নিয়েছিলেন।

বিদ্যার প্রতি যাঁরা প্রকৃত অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু তাঁদের সর্ব্বদা সৃষ্টি চিন্তা ছাড়াও সংগ্রহের কামনাও বড় হয়ে থাকে সাধনার মাধ্যমে। পুরুলিয়ায় তখন পশুপতিবাবুরই সঙ্গীতে একাধিপত্য ছিল। কোন গায়ক গেলে কথার দাপটে ও কূটতর্কে তাকে পরাস্ত করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু আমার জন্য তিনি তাঁর স্বভাবের বিপরীত পথেই চলতেন অর্থাৎ নিজেই উদ্যোগী হয়ে বড় বড় জায়গায় আমার গানের ব্যবস্থা করতেন। ইনি পাখোওয়াজও বেশ ভাল বাজাতে পারতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—'আমি যে ঘরাণার শিষ্য সেই ঘরাণার প্রশস্ত ভিত্তির মূলবস্তুকে মজবুত করবার জন্য যে বস্তু সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল তা বিষ্ণুপুর ঘরাণা হতে। একথার একদিন বাস্তব প্রমাণ পেলাম ওঁর বাড়ীতে ওই ঘরাণার এক অশিতীপর বৃদ্ধ গুণীর উপস্থিতীতে। তিনিও ঠিক ওই মন্তব্যেরই স্বীকৃতি দিলেন।

সেই গুণী বহুক্ষণ ধরে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যে সব তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করেছিলেন তা যদি লিখে রাখার প্রেরণা পেতাম তাহলে অনেক কিছু মূল্যবান ইতিহাস জানাতে পারতাম। এই রকমভাবে কম বয়সের সময় থেকে আমার ভাগ্যগুণে বহু স্থানে বহু রকমভাবে সত্যের ভিত্তির উপর সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তথ্যাতিহাস ও রাগরূপের সৃষ্টি ও তার মূলতত্ত্ব সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এইসব বিষয়ে আমার গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকায় সেই তিনিই যেন কৃপাকরে সুযোগ এনে দিয়েছিলেন সুগম ও বহু দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করিয়ে।

সেই বৃদ্ধ গুণীকে তাঁদের ঘরাণা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি আগ্রহের সহিত জানালেন—আমাদের বংশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার প্রথম উৎপত্তি হয়, এক পরিব্রাজক সঙ্গীতসাধকের কৃপায়, তার বর্ষকাল—চারশ' বছরের বেশীই হবে। তারপর শ্রেণীগত গান ও বাদ্য এবং নৃত্যাদি শিক্ষা করে আসেন আমাদেরই এক পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুপুরে গিয়ে। তিনিই বিশেষ ভাবে চর্চার দ্বারা এবং শিক্ষা দিয়ে ঘরাণার সৃষ্টি করে যান। সেও প্রায় সাড়ে তিনশ' বছরের উপর।

আমাদের আদি সঙ্গীত গুরুর নাম ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শুনেছি তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীর মতই ছিলেন। ওই গুরু তাঁর ধ্রুপদ গানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে গেছলেন। তখন খেয়াল গানের সৃষ্টি বা প্রচার হয়নি, তাই এই গান সংগ্রহ অনেক পরে হয়েছিল বিষ্ণুপুর থেকেই। এই ঘরাণা-বংশে বরাবর ধ্রুপদের চর্চাই প্রধানতম হয়ে এসেছে। আমার পিতামহ বলতেন সেই পরিব্রাজক সংগীতগুরু বৃন্দাবনের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীক্ষেত্র যাবার পথে, ঈশ্বরের কৃপায় এখানে সংগীতচর্চার প্রতিষ্ঠা হবে বলেই বোধ হয় তিনি আমাদের গৃহে এসে পড়েছিলেন—তখনকার আমাদের পরম ধার্ম্মিক এক পূর্ব্বপুরুষের আকর্ষণে। শুনা যায় সেই পূর্ব্বপুরুষের সুর-তালের উপর জন্মগত প্রতিভা ছিল। তাই তাঁর একান্ত কামনায় ও প্রার্থনায় ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী বৎসরাধিক আমাদের গৃহে অবস্থান করে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে যান। শ্রীক্ষেত্রধাম হতে ফেরবার পথেও কিছুদিন ছিলেন।"

ওই বৃদ্ধ গুণীর কাছে এই আকর্ষণীয় মূল্যবান ইতিহাসটি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছিলাম বলে মানসপটে এঁকে গেছল। এই ঘরাণা ইতিহাসের পরিচয় পেয়ে এদিক দিয়েও বেশ প্রমাণিত হয়েছিল বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপর ধ্রুপদাদি গানের প্রাচীন চর্চার বর্ষকাল পশ্চাতের কত দূরত্বে অবস্থিত।

এই সমস্ত আলোচনার পর সেই গুণীকে একখানি গান শুনাতে সবিনয়ে অনুরোধ করায় তিনি তৎক্ষণাৎ খুসী হ'য়ে তানপুরা সহযোগে গৌড়সারঙ্গ রাগের চৌতাল তালের একটি গান শুনালেন। সেই গানটি আমাদের ঘরাণাতেও আছে। বয়সের দরুণ তাঁর গলা যদিও পড়েগেছল তথাপি বুঝতে অসুবিধা হয়নি তিনি সত্যই একজন বড় গায়ক বলে। সুরের উপর ঢেউযুক্ত গমক এবং লম্বা লম্বা আশ-মীড়গুলি এখনও আমার কাণে লেগে আছে। আমার সাধনায় সেই বস্তুকে আয়ত্তে আনতে তখন থেকে চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলাম খুব মূল্যবান মনে করে।

তিনি আমার গানও শুনেছিলেন এবং কয়েকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর শুনে অভিমতে জানিয়েছিলেন সাধনা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে এত কম বয়স বলে মনে হয় না।

বিষ্ণুপুরের অনেক গুণীরই শ্রদ্ধা সহকারে নাম করলেন। তার মধ্যে আমার আপন কাকা অম্বিকাচরণের নাম করে বললেন—কিছুকাল আগে

আমাদের দেশে গিয়ে গানে সকলকে মুগ্ধকরে এসেছিলেন। সত্যই সঙ্গীতের তিনি প্রকৃত সাধক।"

(২১)

বিবাহ যাত্রায় যাত্রীরূপে—

পুরুলিয়া হতে ফিরে এসে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষের দিকে অগ্রজের বিয়ে দিতে গেলাম আমরা জনা পনের বরযাত্রী হয়ে পাত্রীর মাতুলালয় গোপাল-নগর গ্রামে। পাত্র-পাত্রীর বয়স তখন পনের, বার।

কোলাঘাট ষ্টেশনে যখন নামলাম তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমের অনেকখানি নীচে নেমে গেছেন। বর্দ্ধমান হতে মেজকাকার আসার সম্ভাবনায় আমরা প্লাটফর্ম্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হাওড়া থেকে একটা ট্রেণে এসে পড়ল,—সেই ট্রেণ হতে তিনি এবং তাঁর সংগে গৃহকার্য্যে সাহায্যকারী নিধুমামা নেমে পড়লেন। আমাদের খুব আনন্দ হল।

এই নিধুমামা হলেন আমাদের পাড়ার সম্পর্কে কাকাদের মামা। এঁর আসল নাম আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। এঁর গলাতে প্রায় সর্বদাই টপ্পা গান লেগে থাকত বলে কাকারা নিধুবাবু বা নিধুমামা নামে ডাকতেন। সেই থেকে ডাক নামে আমাদের পাড়ার তিন পুরুষের তিনি নিধুমামা হয়ে গেছলেন।

তারপর প্লাটফর্ম হতে অনেকখানি নীচে নেমে সমতল ভূমিতে এসে সকলে জলযোগ সেরে ষ্টিমারের কাছে গিয়ে টিকিট করে উঠে পড়া গেল। একটু পরেই রূপনারায়ণ নদের বিরাট দেহের উপর পশ্চিমাংশ ধরে উত্তর মুখে ষ্টিমার চলতে লাগল। আমি সেই প্রথম জলযানে চড়লাম, খুব ভাল লেগেছিল। চারদিকের নানান দৃশ্য দেখে দেখে যাব বলে ষ্টিমারের শেষপ্রান্তে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম দূরে ও অল্প দূরে পালতুলা নৌকোগুলোর ভেসে যাওয়া দৃশ্য। মনে পড়ে গেল ছেলে বেলায় বর্ষার সময় উঠানে জলজমে থাকার উপর কাগজের নৌকো ছেড়ে আনন্দ পাওয়ার কথা।

তারপর জলের গভীরতার প্রয়োজন হেতু পশ্চিমতীর ঘেসে ষ্টিমার যখন

চলতে লাগল তখন পরিষ্কার ভাবে দৃষ্টিতে এল ঘাসে ঢাকা মাঠের শ্যামল শোভা, আম, কাঁঠালের ও নারকেল গাছের বাগান,—ছোট ছোট মাটির দেয়ালের উপর খড় দিয়ে ছাউনীর বাড়ী —তার একদিকে বাঁশঝোপ এবং বাকী তিন দিকে ফসলযুক্ত ক্ষেত ইত্যাদি। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের এইসব দৃশ্য আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে। বিকেল যখন শেষ হয়ে এল তখন দেখলাম বকের সারি খানিকটা চক্রাকারে আকাশের উপর উড়ে যাচ্ছে। সেই দৃশ্যরূপ দেখে মনে হয়েছিল ওরা যেন ক্রৌঞ্চ নয়—অনেকগুলো বড় বড় সাদা চন্দ্রমল্লিকা মালার আকারে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে, যেন কেউ পাঠিয়েছে কারো উদ্দেশ্যে। একটু পরেই সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন আকাশকে অলক্ত রাগে রঞ্জিত করে। তার আভা ছড়িয়ে পড়ল রূপনারায়ণ নদের সারা দেহে। ষ্টিমার তখন আরো কিনারা ঘেসে চলেছে। দেখলাম একটি ঘাট হ'তে উঠে যাচ্ছে গ্রাম্য বধূরা জলভর্ত্তি কলসী কাঁখে নিয়ে। যেতে যেতে ঘোমটার ভেতর থেকে কাজল পরা বড় বড় চোখে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে কৌতূহল মাখান মুখে। কলসীর ভারে তাদের একটু হেলিয়ে পড়া গতিভঙ্গী যেন নৃত্যের এক সুন্দর ভাবরূপ মনে এনে দিয়েছিল। এক জায়গায় দেখতে পেলাম ঘাটের এক পাশে মেছুড়ি ছিপ হাতে ফতনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে,—তার পাশে একটি শিশুও তদবস্থায়। দুটো সাদা ঘুঘু জল খাচ্ছিল, ষ্টিমারের শব্দে তারা ঘুঁঘুরের মত ডানার আওয়াজ তুলে উড়ে গিয়ে বসল একটা শিমুল গাছের ঝরাপাতা ডালে।

সবচেয়ে অদ্ভুত ভাল লেগেছিল যে দৃশ্য দেখে তা হল—একটি বৃদ্ধা তার গাভিটিকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার কাপড়ের আঁচলটা একটা কাঁটা গাছে আটকে যাওয়ায় ধরে থাকা দড়ির টানের উপর টাল সামলাতে না পেরে হাস্যকর দৃশ্য নিয়ে পড়ে যায়,—অল্প দূরে একটি বার তের বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে তাই না দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। অসামাল বস্ত্রকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধা ধড়্‌পড়্ করে উঠেই সেই বালিকাকে গালি দিতে আরম্ভ করতেই সে দু'হাতে তালি দিয়ে হেসে বুড়ো আঙ্গুলটাতে কদলী প্রদর্শন করে জিভ্ দেখিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ভারি সুন্দর লেগেছিল মেয়েটির সেই সময়কার উচ্ছল রূপ ও দ্রুত গমন ভঙ্গীর নাচন ছন্দ। আরো কত কি স্বভাবসুন্দর দৃশ্য নজরে আসতে লাগল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

গ্রামীণ জীবন আগে যেরূপ সহজ, অনাড়ম্বর, সুস্থ ও সন্তুষ্টতার উপর আনন্দ নিয়েছিল এখন হয়ত সে রকম আর নেই, তবুও যতখানি আছে মনের খোরাক নিয়ে, সহরে তা মোটেই পাওয়া যায় না। যেন এক যান্ত্রীক জীবন। বাল্যজীবনে বহু গ্রামে যাতায়াত করে দেখেছি ও পরিচয়ে পেয়েছি সেখানের নানান পরিবেশের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুস্থ ও সুন্দর এক আকর্ষণীয় রূপ। ব্রাহ্মণপাড়ায় দোলমঞ্চ, ৺দুর্গার দালান, তার ধারে ৺শিবমন্দির, মধ্যস্থলে আটচালা বা নাটমন্দির, মধ্যাহ্নে তার মধ্যে বসে বৃদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের দাবা, পাশা প্রভৃতির ক্রিড়ানুষ্ঠান, সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তন, রাত্রে যাত্রার আখড়া বা বৈঠকী-গানের আসর, কোন কোন গ্রামে সমষ্টিগত বা সঙ্ঘগতরূপে কুমারপাড়া, তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বার মাসে তের পার্ব্বণ, তাতে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা, প্রায় প্রত্যেক গৃহে গোলায় ধান, গোওয়ালে দুগ্ধবতী গাভী ও বলদ, খিড়্কীপুকুর, শাক-সব্জির ক্ষেত ও আরো কত কি, মানুষের বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহানুভূতি, শিক্ষায় ছিল সর্বোৎকৃষ্টরূপে রামায়ণ, মহাভারত, সাধু-মহাত্মাদের জীবনাদর্শের বাণী, অন্তরকে সুর-ছন্দের বিশুদ্ধ বস্তু দিয়ে গড়ে তুলবার জন্য কীর্ত্তন, বৈষ্ণবগীতি, বাউল ও গ্রাম্যকবিদের প্রেম-ভক্তিমূলক গানের প্রচার এবং তার সঙ্গে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের উপর অনুরাগ ও চর্চার আগ্রহ। এইসব ছিল আদর্শের মত এবং সৃষ্টি হয়ে এসেছিল বাস্তব সত্যকে ধরে। আমার বিশ্বাস এইরূপাকৃতিকেই আরো সুন্দর, সুস্থ ও বৃহৎ করে গড়ে তুলবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে যদি মনে করা হত তাহলে বোধহয় আমরা সত্যকারের গড়ে উঠতাম।

এখনও অনেক গ্রামে এই সব বর্ণনার অনেক কিছুই আছে কিন্তু আগের মত সে প্রাণ নেই। একদিকে অর্থের অভাবে দারিদ্রতা এসেগেছে, আর দিকে এসে গেছে খুব বেশী করে মনের দারিদ্রতা। এই শেষেরটিতে এখন ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

তারপর সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই আমাদের নামবার নির্দিষ্ট স্থানের ঘাটে ষ্টিমার এসে থামল তীরের কিছুটা দূরে। ষ্টিমার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নৌকোর উপরে বসে ঘাটের কিনারায় আসা গেল। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কন্যাপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অপেক্ষা করছিলেন।

বেহারারা পাল্কীতে বরকে উঠিয়ে কাঁধে তুলে চলতে লাগল,— আমরা

পেছনে পেছনে লণ্ঠনের আলোতে রাস্তা নিরিক্ষণ করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম সকলের বসবার স্থানের একদিকে তানপুরা ইত্যাদি যন্ত্র। বুঝলাম উদ্দেশ্য।

পাত্রীর মাতুল বামাচরণবাবু বললেন—বিষ্ণুপুরের সংগীত ঘরাণা বংশের বর এবং বরযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সংগীত চর্চারত গুণীব্যক্তি আসছেন শুনে পাশাপাশি গ্রামের এত লোক এসেছেন সংগীত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায়,—তার উপর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের গায়ক আসছেন বলেও তারা জেনেছে।

একটু পরেই দু'জন প্রৌঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন,—বর্দ্ধমানের মহারাজবাহাদুরের ওস্তাদ আসবেন শুনে আমরা বহুদুর হতে গো-গাড়ীতে করে এসেছি—তিনি কখন এসে উপস্থিত হবেন?

আমার পিতামহ মেজকাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন—হাঁ—তিনি এসেছেন, এই যে ইনি।

সেই দু'জন একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে এক সংগে বলে উঠলেন—ধিরাজ বাহাদুরের ইনি খাস গায়ক হবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়,—হয়ত আম্‌লা কাম্‌লাদের হবেন। অত বড় মহারাজার গায়কের কি এই এত সাধারণ চেহারা ও বেশভুষা হতে পারে! তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ ও বেশভুষা এবং পাগড়ী সে এক দেখবার মত হবেই।" তাঁদের এই রকম কথা শুনে অনেকে হেসেই অস্থির। হাসির তরঙ্গের ঢেউ সহ্য করতে না পেরে তাঁরা খুব বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন আমাদের কেবল অতদুর থেকে আসাই বৃথা হয়ে গেল,—এ রকমভাবে আমলাদের গাইয়েকে মহারাজার গাইয়ে আসছেন বলে খবর রটান অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।"

কন্যাপক্ষের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের বুঝিয়ে বলতে লাগলেন,—একমাত্র দাড়ি-পাগড়ীই কি সঙ্গীতকে ধরে রেখেছে? এ রকম মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয়, বিশেষ করে বাঙালী হয়ে বাঙালী গায়ক গুণীর প্রতি এত দুর্বল ধারণা সত্যই লজ্জার বিষয়। যাই হোক—যাঁরা এসেছেন তাঁদেরই একটু শুনে যান না, যদি সমঝদার হ'ন তাহলে হয়ত প্রমাণ পেয়ে যাবেন বর্দ্ধমানের মহারাজার উনি যোগ্যই গায়ক। এবং মহারাজাধিরাজ বাহাদুর গুণের মর্য্যাদা দিয়েই এঁকে রেখেছেন। দেশের গুণীদের ও

দেশের সম্পদকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা না করার এই নিন্দনীয় মনোভাব আমাদের আত্মঘাতীরই সমতুল্য…।"

এঁর এই সব জোরাল যুক্তির ধাক্কায় সেই ভদ্রলোক দু'জন ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়লেন, মনে হল যেন তাঁদের নিজস্ব মতবাদ অনেকের কাছে ধার করা।

আমরা পৌঁছবার পরই বেশ ভাল রকমভাবে জলযোগ সমাধা হল। একটু পরে কন্যাপক্ষ অনুমতি নিয়ে বরকে তুলে নিয়ে গেলেন।

গান আরম্ভ হল। প্রথমতঃ মেজকাকা অনেকক্ষণ ধরে গাইলেন, তারপর পিতামহ এবং সব শেষে আমি।

সেই তাঁরা দু'জন গান বুঝেন বলেই অনেকটা মনে হল,—তবে মেজকাকা যে মহারাজাধিরাজেরই খাস গায়ক সে ধারণা নিয়ে যেতে পারলেন কিনা বুঝা গেল না। এই রকম স্বজাতির প্রতি মানসীক বিচার বোধের অভাব এখনও যথেষ্ট আছে। একটি উদাহরণ,—একশ্রেণীর গায়ক-বাদকদের ওস্তাদ এবং আর শ্রেণীর জন্য তাঁদের পণ্ডিত বলে পরিচয়ে এবং সম্বোধনে থাকে কিন্তু এই দুই শ্রেণীর চেয়ে যে সব বাঙালী গায়ক-বাদক অনেক বেশী কৃতিত্বের অধিকারী তাঁদের নাম পরিচয় প্রদানের সময় শুধু নামটাই ঘোষিত হয়। ঘোষকদের এই অন্যায় ব্যবহারের কেউই প্রতিবাদ করেন না, আমাদের স্বজাতির এটাও এক বৈশিষ্ট্য। তা না হলে বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাইতে দেবো না বেতার কর্তৃপক্ষের এত বড় অন্যায় হুকুম কি কেউ সহ্য করতে পারত? বর্তমানের বাংলাদেশ একথা শুনলে নিশ্চয়ই বিস্মিত ও লজ্জিত হবে॥

(২২)

দারুণ অবস্থায় পতিত এবং নির্মম ও অদ্ভুত দৃশ্য—

বিবাহ অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর আমি বর্দ্ধমানে চলে এলাম। বেশ কিছু গান আয়ত্ত করতে করতে দিনগুলি পেরিয়ে এসে গেল আশ্বিনমাস। এবারের ৺দুর্গাপূজার সময় আমার বাড়ী যাওয়া ঘটে উঠল না। মেজকাকার এক ছাত্র ছিলেন নাম করা তৈল চিত্র অঙ্কন শিল্পী,—

নাম শরৎচন্দ্র দাস। ইনি আমাকে নিজের বাড়ীর আপনজনের মত দেখতেন স্নেহ-আদর সব কিছু দিয়ে। তিনি মেজকাকাকে বললেন—৺পূজার আমাকে তাঁদের দেশে যাবার জন্য—সেই সংগে এ কথাও জানালেন—সেখানে ওই উপলক্ষ্যে কয়েক জায়গায় গানের আসর করিয়ে দিয়ে ভাল রকম টাকা পাইয়ে দেবেন।"

মেজকাকা আমায় যেতে বললেন। টাকা পাবার আশায় বাড়ী যাওয়ার বিপুল আগ্রহ ও আনন্দকে চেপে রেখে মেজকাকার আজ্ঞা পালন ও কর্ত্তব্যকে শিরোধার্য্য করলাম। সংসারের জন্য টাকা উপার্জনের গুরুত্বের কথা সর্বদাই মনে আসত—ঠাকুরদার অধিক বয়েসের দরুণ তাঁর সামর্থ্যের কথা ভেবে।

শরৎবাবু বলে গেলেন—আমরা ৺পূজার দু'চার দিন আগে দেশে যাব, সত্যকিঙ্কর যাবে ৺দুর্গাষষ্ঠীর দিন বিকেলের ট্রেনে,—খানা জংশনে নামবে। সেখানে গোরুর গাড়ী রাখা হবে।"

যেতে হবে আমাকে বনপাশ-কামারপাড়া গ্রামে। ওই ষ্টেশন হতে উক্ত গ্রামের দূরত্ব মাইল পাঁচ-ছয়ের মতই হবে। বোধন ষষ্ঠীর দিন সকালে সপরিবারে মেজকাকা বিষ্ণুপুরে যাত্রা করলেন। আমি একা বাসায় রইলাম। তারপর ট্রেণের সময় বুঝে বাড়ীটিতে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ষ্টেশনাভিমুখে পদব্রজে। ষ্টেশনে পৌঁছেই অল্পক্ষণের মধ্যে ট্রেণ পেয়ে গেলাম। প্রথম ষ্টেশন 'পালিত' তারপরই খানা জংশন। সেখানে ট্রেণ থামতেই নেমে পড়লাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ওভারব্রীজ পেরিয়েই নজরে পড়ল একটা ছোই দেওয়া গোগাড়ী, মনে হল আমার জন্যই এই রথ দাঁড়িয়ে আছে। সারথি বোধ হয় ট্রেণের দিকে তাকিয়ে ছিল—আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল তুমি কি বনপাশ কামার পাড়ার শরৎবাবুদের বাড়ী যাবে? যাব বলতেই গাড়ীতে উঠতে বলল। গাড়ী ষ্টেশন সীমার গণ্ডী ছাড়াতেই সারথিকে বললাম—এখানে যদি মিষ্টির দোকান থাকে তাহলে সেখানে নিয়ে চল—আমি কিছু খেয়ে জল খাব। খুব খিদে পেয়েছিল—কারণ বেলা ১০টায় ভাত খেয়েছিলাম কাকাদের সংগে।

মিষ্টির দোকানের কাছে গাড়ী দাঁড়াতেই নেমে পড়লাম। দোকানের মালিক বেশ বৃদ্ধ। বললাম—ভাল কি মিষ্টি আছে এক আনার দাও। সে ইতস্তত করে ভদ্রচেহারার দুটো সাদা মত বড় আকারের মেঠাই দিলে

পলাশ পাতায় করে।

খুব আগ্রহ ও আহ্লাদের সহিত কামড় দিতেই মুখের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে গেল—তার দারুণ তিক্ত রসে। চোখ মেলে দেখি ভিতরে খুব ক্ষুদ্র ও শুভ্র রংএর অসংখ্য প্রাণীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়ে গেছে। স্বাদটা কি রকম লেগেছিল যাঁরা চিনির প্রলেপ দেওয়া কুইনাইনের পিলএ কামড় দিয়ে ফেলেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন। এই মেঠাইএর তৈরি তত্ত্বের সময় নিরূপণে মনে হয়েছিল বোধ হয় বর্ষাকালের কোন পর্বাদিতে অর্থাৎ দু'তিন মাসের আগে নয়। ক্রেতার অভাবে অনেক প্রাণীকে ধারণ করে তারা স্বমূর্ত্তিতে পাত্রের উপর বিরাজ করেছিল।

তখন ঘি'এর জিনিস খাঁটি ঘি' দিয়েই তৈরি হত বলে তার ভাল গন্ধটা তখনও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি।

যাইহোক্, পয়সা নষ্টর আফ্‌সোস্‌কে ত্যাগ করে নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা লোভাতুর সারমেয়কে দিলাম মেঠাই দু'টো। তার আমার দিকে আকুতি নিয়ে মুখ তুলে রাখা সেই দিনই বোধহয় বিশেষ করে সফল হয়েছিল। তাই আমার পয়সাটা বৃথা নষ্ট হল না মনে করে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। দোকানীকে বোললাম মিষ্টি খুব খাওয়া হয়েছে এরপর জল দাও তো খেয়ে দেখি। ময়রাবুড়ো এমন একটি ঘটিতে করে আমার হাতে জল ঢালতে লাগল যে, তার স্বরূপকে ধরতেপারা গেল না সত্যই সেটা ধাতুনির্মিত কি না, যদি তা হয় তাহলে তার ক্রয় সময় থেকে পাত্র-মার্জিত যে হয়নি তাতে কোনই সন্দেহ রইল না। তার উপর আবার তার পাত্রের চতুর্দিকে ছিদ্র নিবারণের জন্য কৃষ্ণবর্ণ মোম্ স্থাপিত হওয়ায় রূপটি আরো রুচিকর ছিল। পানীয় বারি পান করে তার স্বাদে মনে হয়েছিল যেন হরিতকী বহড়া ও আমলকী এই ত্রিফলের রস জলের মধ্যে নিষ্কাসিত হয়েছে।

ময়রাবুড়ো আমাকে জিজ্ঞেস কোরল,—খোকা কোথায় যাবে গো? গ্রামের নাম করতে সে বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে বোল্‌ল—তোমার সংগে আর কেউ আছে এবং ভাল জিনিস পত্তর?

বললাম—সংগে কেউ নেই, আর জিনিস পত্তর মধ্যে একটি কাপড় ও গেঞ্জি গামছায় বাঁধা আছে। আমি শঙ্কা যুক্ত হয়ে তাকে বল্‌লাম—তুমি অমন মুখের ভাব নিয়ে এরকম কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? উত্তরে জানাল—ওই গেরামে যাবার রাস্তায় খড়িনদী নামে যে ছোট নদীটা আছে

সেখানে বেশী করে এই ৺পূজার মুরসুমে তার গড্যে (গর্ভে) ঠেঙ্গাড়িরা মার-ধোর, এমনকী খুন করেও সব জিনিসপত্তর কেড়ে নিচ্ছে। তবে তোমার কাছে যখন কিছুই নাই তখন ভয় পেতে হবেক নাই,—যদি লাঠি তুলে আসে তাহলে তোমাকে ছেলে মানুষ দেখে কিছু করবেক নাই সরে যাবেক। তুমি সে সময় মা দুর্গাকে ডাকবে। তাঁকে ডাকলে কোন ভয় ভাবনা থাকে না।”

বুড়োর মুখে এই সব কথা শুনে তখন মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা বলে বুঝান যাবে না। সে সময় পাতকুয়োর সুপানীর বারি পেটের ভেতর ভীষণ নাড়া দিয়ে ঘূর্ণীচক্রের সৃষ্টি করে তুলেছিল। এদিকে সারথি তখন তাগাদা লাগিয়ে দিয়েছে গাড়ীতে উঠে বসবার জন্য।

যা হয় হবে—এই মনে করে নিয়ে গাড়ীর ভেতর গিয়ে বসলাম। অদৃষ্টের নির্দেশে—দুঃখ, কষ্ট ও নানানরকম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ছবকে ধরে যার জীবনের যাত্রাপথ অতিক্রান্ত হয়ে আসছে তার সেই ভাবেই শক্ত মন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, ব্যতিক্রমের আশা করলে চলবে না।

গাড়ী চলতে সুরু করল ঢিমেতালে। ষ্টেশন সংলগ্ন গ্রামটা ছাড়িয়ে একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ধরে গাড়ী চলতে থাকার সময় কুমড়োফালির মত ষষ্ঠী তিথির চাঁদ থেকে তার আবছায়াজ্যোৎস্না গাছের ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা আকারে যে যে জায়গায় এসে পড়ছিল তখন সেগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন লাঠি নিয়ে লেঠালরা দাঁড়িয়ে আছে। মনের মধ্যে তখন এই রকম একটা আতঙ্ক এসে গেছল। বাগানটা এতক্ষণ গ্রামের কাছাকাছিই ছিল, সেটা শেষ হতেই পড়ল তেপান্তরের মাঠে। অনেকটা এগিয়ে যাবার পর মনে হল খড়ি নদীর কাছ বরাবর এসেগেছি। কারণ, গাড়োয়ান সে সময় ভয় পেয়ে বলদ জোড়াকে দৌড়াবার জন্য দারুণ বলপ্রয়োগ করতে লাগল। সে বেচারীরা প্রহারের কঠোর স্বাদ পেয়ে ছোট বাইরে, বড় বাইরে (স্কুলের ছোট ছোট মেয়েদের বাথরুমে যাবার সভ্য ভাষা) করতে করতে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। লোকজন সংগে আছে এই প্রমাণ দেখানর জন্য সারথিপ্রভু চিৎকার করে ডাকতে লাগল –ওরে তোদের গাড়ীগুলা জোরে চালিয়ে লিবার—পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবেক, আমরা এগুয়াচ্ছি, লদীটা পেরায়েঁ অপেক্ষা করব…।”

এ রকম বল-ভরসা দেখানর চিৎকার আমাকে আরো বেশী করে কাহিল করে দিতে লাগল। তখন মনে হল—এবার তাহলে কি সত্যই

৺মহাষ্টমীর সন্ধীক্ষণ আমার অদৃষ্টে উপস্থিত হল! গাড়োয়ান নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে— তাহলে বলির বস্তু হ'তে আর দেরি নেই। শুনেছি যারা খুন করে তারা হাতের অস্ত্র ব্যবহার করতে খুব উল্লসিত হয়, তখন তারা লাভ-লোকসান কিছুই বিচার করে না,—মায়া-দয়ার বস্তু কিছুই থাকে না। সুতরাং আমার উপর আঘাত চালিয়ে সেই সুখটাই বা কেন তারা ছাড়বে।

আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা তখন চৌদুনে এত জোরে ঝালার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল এক্ষণি 'তার' ছিঁড়ল বলে। সেই মুহূর্তেই দু'পাশে শর ও কাশ গাছে পরিপূর্ণ খড়ি নদীর গর্ভে গাড়ীটা খুব দ্রুতবেগে গড়্ গড়্ করে নেমে পড়ল অগভীর জলে। চোখ দুটো সে সময় একবার জোর করে খুলতেই বেশ মনে হল কয়েকটা লোক মুখে কাপড় জড়িয়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শিউরে উঠলাম,- মুখের কাছে যত শিরা-উপশিরা আছে সেগুলো তখন আতঙ্কের ধাক্কায় চোখ দুটোর কাছে এসে জড় হয়ে গেছল,—এই রকম তখন মুখের অবস্থা। হাঁটুর মধ্যে মুখটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে লাঠির আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাথার উপর হাত দুটো রেখে মা দুর্গাকে সকাতরে ডাকতে লাগলাম।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানি না,—গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনে হতে লাগল জল না পেলে এক্ষুণি দমবন্ধ হয়ে যাবে। যাইহোক একটু পরেই গাড়োয়ান যখন বল্‌ল -খোকাবাবু! গেরামে এসে গেছি আর ভয় নাই; খুব বেঁচে যাওয়া গেছে। এই কথা শুনামাত্র মনে হয়েছিল শুনার মত এতবড় সুখের কথা আর নেই। অল্প করে চোখ খুলে মিটমিটু করে তাকিয়ে দেখলাম—সত্যই এখানে সেখানে বাসগৃহের আলো জ্বলছে—এবং ঢাকের আওয়াজ আসছে বেশী দূর থেকে নয়। যাক্ বাবা খুব বেঁচে যাওয়া গেল—এই বলে সোজা হয়ে বসলাম। শরীরের ঘামগুলো তখন শুকোতে আরম্ভ করল। গ্রামের মুখে গাড়ী ঢুক্‌তেই গাড়োয়ানকে জল খাবার কথা বলতে,— সে পাশেই এক বাড়ীতে গিয়ে এক ঘটি জল এনে যেমনি আমার হাতে দিতে এল অমনি কেড়ে নেওয়ার মত করে ঘটিটা ধরে ঢক্‌ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা খেয়ে নিলাম। শরীরে একটু বল পেলাম এবং মনে এল আনন্দ। জীবনে এরকম অবস্থায় আর কখনও পড়িনি। এরকম বিপদ শঙ্কুল পথে আমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা শরৎবাবু কি করে করতে পেরেছিলেন সেকথা তখন সর্বদা মনে

এসেছিল। রাত বোধ হয় ৯টার সময় শরৎবাবুদের বাড়ীর সদর দরজার সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। সংবাদ পেয়ে শরৎবাবু তাড়াতাড়ি কাছে এসে অতি সমাদরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন। আমার মন তখন খুবই অপ্রসন্ন ছিল। যাই হোক্ একটু পরে তাঁর স্ত্রী যত্নসহকারে কাছে বসে থেকে আহারাদি করালেন। নির্দিষ্ট ঘরে বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দু' তিন বার ঘড়ি নদীর সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখা দেওয়ার আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে গেছল। পরের দিন অর্থাৎ ৺মহাসপ্তমীর রাত্রে দু' তিন জায়গায় গান শুনাতে হল, সেই সেই স্থানের প্রতিমার সামনে ৺নবমীর উৎসব রাত্রের বিশেষ ব্যবস্থায় যে আসর হয় তাতে আমার গান শুনবার উপযোগী হবে কিনা তারই নমুনার পরীক্ষা দিতে হল। সেই জায়গাগুলিতে গানের আকর্ষণে লোকের সংখ্যা বড় কম হয়নি প্রত্যেক জায়গায় অন্ততঃ দু'ঘন্টা করে গাইতে হয়েছিল নানান ফরমাসের উপর। ভরসা পেলাম নবমীর রাত্রে আমার গান মূল্য দিয়ে শুনা চলবে।

এখানে ৺মহানবমীর উৎসব যা দেখেছি তা এখনও আমার মনে অদ্ভুত বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক রূপে জেগে আছে। তার দৃশ্যরূপের চেহারার নানান পার্থক্য নিয়ে আদিকালের আদি জাতির চরিত্রের বিভৎসতারই এক সংস্করণের মত মনে হয়েছিল।

ঘটনার বিবরণ—এখানে বহু প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত ৺সর্বমঙ্গলা দেবীর খুব ঘটা করে নবমীর দিন প্রাতঃকালে পূজাদি হয় শুনে শরৎবাবুদের চাকরকে সংগে নিয়ে গেলাম দেখতে।

সেখানে পৌছে দেখি মন্দির প্রাঙ্গনে বহু শত লোক জমায়েত হয়েছে। পুরুষ-নারীর মধ্যে কোন সমীহ-সম্ভ্রমবোধ ও লজ্জা বলে তখন কিছু নেই, যে যাকে পাচ্ছে ধাক্কা ধাক্কি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে,—বাক সংযত করে রাখারও কোন আবশ্যক থাকছে না। মনে হয়েছিল—কাণে তুলো গুঁজে এলে ভাল হত। ধাক্কার প্লাবনে আমাকে আপনা থেকেই তার ঢেউ এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। অর্থাৎ পা চালাবার অবকাশই পাইনি। যাইহোক্ আমার গান শুনে থাকা দু'তিন জন সেখানের মাতব্বর ব্যক্তি আমাকে দেখতে পেয়ে তাঁরা তাড়াতাড়ি এসে এগোবার রাস্তা করে দিয়ে সংগে করে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে ভাল জায়গায় বসিয়ে দিলেন। মনে মনে হয়েছিল দেব-দেবীর প্রভাবের চেয়ে সঙ্গীতের প্রভাবও কম নয়।

মন্দিরটি পাথরে তৈরি এবং নাতীবৃহৎ। তারমধ্যে দেবীর দশভূজা

শীলামূর্ত্তি। শুনলাম এই দেবীমাতা এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রভাব মাহাত্ম্যে পরিচিত হয়ে বিরাজ করছেন বহুকাল থেকে। দেবীর সম্মুখে দৈর্ঘ প্রস্থ নিয়ে বিরাট এক নৈবিদ্য, তার চতুর্দিকে মিষ্টান্নের বৃহৎ বৃহৎ পাত্র ইত্যাদি।

মন্দির প্রাঙ্গণ সম্মুখে দেখলাম পাঁচ-ছ'টি যূপকাষ্ঠ প্রথিত হয়ে আছে এবং তার পশ্চাতে সারিবদ্ধ হয়ে নরহস্তধৃত প্রায় শ' দুই ছাগজীব কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান এক একটি যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আসুরিক মূর্ত্তিতে হত্যার-কর্‌া খড়্গধারণ করে প্রস্তুত হয়ে আছে পুরোহিতের হুকুমের অপেক্ষায়। পশ্চাতে প্রায় জনা পঞ্চাশ ঢাকী দাঁড়িয়ে আছে ঢাক কাঁধে করে।

ছাগগুলোর দিকে সকরুণ দৃষ্টি দিয়ে মনে হল যেন তারা বলছে—মাগো! তোমার মানুষ সন্তানরা কিরূপ মানুষের কাজ করছে—দ্যাখো! ওদের বীরত্ব কি সবই দুর্বল ও সহায়হীন নিরিহদের উপরই? এই জন্যই কি তাদের অনেক কিছু বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছ? হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি জানোয়ারগুলোকে ধরে এনে তোমার সামনে বলি দিয়ে মাতৃভক্তি দেখাতে বল দেখি! আর যদি আমাদের মাংস খাবারই এত ইচ্ছে তাহলে তোমাকে খাওয়াচ্ছি এই এত বড় প্রতারনার কাজ না করে এবং এই নির্মম অমানুষিকতা না দেখিয়ে তোমার সৃষ্ট এই নেহাত নিঃসহায় সন্তান বেচারীদের তোমার সামনে বধ করা কেন?

মা হয়ে কি এতবড় নিষ্ঠুর কাজ তুমি সমর্থন কর? ওদের এই শার্দ্দুলবৃত্তি দেখে আমাদের যে বড় লজ্জা করে মা?"

কে শুনছে বাস্তব অনুভবে আসা তাদের এই আকুতি? মায়ের সেখানে তো শুধু পাষাণ বা মৃত্তিকার ছবি মাত্র। ছলনা দেখিয়ে সুস্বাদু মাংস রূপে খাবার বাটিতে তাদের আনাই হল আসল উদ্দেশ্য।

পুরোহিতের হুকুম পাওয়া মাত্র এক সংগে তুমুলরবে বহু ঢাক গর্জে উঠল, আর সংগে সংগে সমবেত পাষণ্ডদলের মা-মা-রবে বিভৎস চিৎকার এবং হত্যারকদের খড়্গ উত্তলিত হয়ে যূপকাষ্ঠের মধ্যে পড়তে লাগল এক একটি ছাগ জীবের স্কন্ধে। ক্ষণিকের জন্য পূর্বক্ষণে তাদের যন্ত্রনাপূর্ণ ডাক ব্যা-ব্যা—হয়ে থেমে যেতে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে মনটা আমার কি রকম করে দিয়ে বুকটা দুর্ দুর্ করে কাঁপতে লাগল। ছাগমুণ্ডের দিকে তাকিয়ে এবং তাদের অর্দ্ধাংশের তখনও ভীষণ স্পন্দন দেখে চোখ দুটো থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেখানে এক মুহুর্ত্তও আর না দাঁড়িয়ে

দ্রুতপদে চলে এলাম। কেবল মনে হতে লাগল পূজার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা অনার্য্যযুগের পাশবিক নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়।

যে কোন কারণেই হোক হত্যা একমাত্র পশু প্রবৃত্তি দ্বারাতেই আসে। এই যে প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে থাকে তাতে করে আমার মনে এই বিশ্বাসই আসে, পূর্বজন্মে আমরা শার্দুল জীব থেকেই এ জন্মে মানুষরূপে এসেছি। মানব হৃদয়ের মধ্যে দয়া-মায়া বলে যে শ্রেষ্ঠ বস্তু দুটি আছে—সেই দু'টিকেই ভগবান প্রধানতম করে মানুষের মধ্যে দিয়েছেন এবং তাকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তায় আরো যে বস্তুগুলি দিয়েছেন সেগুলি হল, বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম। এইগুলির মধ্যে দিয়েই প্রেম, ভক্তি ও কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

উক্ত কামারপাড়া গ্রামে ৺মহানবমীর সকালে যে দৃশ্য দর্শন করে ফিরেছিলাম তার চেয়ে রাত্রের দৃশ্য সহস্রগুণে বিস্মিত করেছিল। তার পরিচয় তুলনাহীন বলে মনে হবে। বিবরণ—সন্ধ্যার একটু পরে যখন নির্দ্ধারিত প্রথম আসরে গাইতে যাচ্ছি তখন প্রত্যেক গলির পার্শ্বে দেখা যেতে লাগল দু'চারজন করে মূর্ত্তিমান প্রভুরা দাঁড়িয়ে আছেন হাতে বোতল ও গেলাস ধরা অবস্থায়। কাছেই তাদের রোয়াকের উপর রাখা আছে মাংসের পাত্র। তখন তাদের পায়ের তলায় ভূকম্পনের লক্ষণও দেখা দিয়েছে এবং কথার ভেতর দিয়ে অল্প অল্প করে আশ-মীড়ের টানও এসে গেছে। এই সব ভীতিজনক চিত্ররূপ দেখে আমার চলার গতি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

শরৎবাবু বললেন— ভয় নেই, এগিয়ে চল! এখন কিইবা দেখছ— এই তো সবে সুরু—পরে যখন এদের তাণ্ডবক্রিয়া সুরু হবে তখন দেখবে কি রকম কাণ্ড চলে এখানে। বললেন, আমাদের দেশে এই পূজার এই দিনটিই বিশেষভাবে বিশেষত্ব নিয়ে আছে। এই জন্যই প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে ছাগবলির মানত থাকে চাটের ব্যবস্থার জন্য। পূজায় আনন্দের জন্য অপরিহার্য্য বস্তুরূপে গণ্য করে পানবস্তুটাও অনেকে বাড়ীতেই তৈরি করে নেয়—তাতে দোষের কিছু মনে করে না। অবশ্য এ গ্রামে যে কয়েক ঘর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার আছেন তাঁরা এই সব জঘন্য কাণ্ডে থাকেন না। তাঁরা বেশীর ভাগ বিদেশেই থাকেন এবং দেশে আসেন পর্বপালে। এখানে বৃত্তিজীবি মানুষের সংখ্যা পনর আনারও বেশী।"

তারপর—প্রথম আসরে গান শেষ করে দ্বিতীয় আসরের স্থানে যখন যাচ্ছি তখন রাত বোধ হয় দশটা হবে। সেখান হতে বরাবর সদর পথে যেতে যেতে দেখলাম সেই মহাত্মারা চলেছেন সুরাদেবীর প্রভাব কৃপায় বিভিন্ন ভাব মূর্ত্তিতে চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করে। তখন কারো প্রাণে এসে গেছে সঞ্চিত বিরহের বিলাপ সুর, কারো বিশ্ব বিজয়ের শক্তি, কারো ব্যবহারে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, ইত্যাদি। সুরাদেবী মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে আসন জাঁকিয়ে কত অপরূপ রূপ যে ধারণ করতে পারেন তার বিস্ময়কর প্রমাণ সেদিন একই রঙ্গমঞ্চে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সে সময় রাস্তায় ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি মিলে বহুলোকের ভীড়, নির্ভয়ে তারা চলছে প্রতিমা দর্শনে। এই বৃহৎ গ্রামটিতে অনেক প্রতিমা হয়—তাই ধারে পাশের বহুগ্রাম থেকে সকলে আসে ৺মহানবমীর উৎসব দেখতে,—মনে হয়েছিল, পূর্ব বর্ণিত দৃশ্য দেখবারও বোধহয় আকর্ষণ থাকে। সত্যাই দেখবার মতই বটে।

তারপর দ্বিতীয় স্থানের নিকটেই তৃতীয়স্থানে গেয়ে যখন ফিরছি তখন নবমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশের কোলে। রাস্তাসমূহ প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। কেবল স্থানে স্থানে তখন উৎসবের সেই সকল চিত্রতারকাদের মধ্যে অনেকেই নানান অপরূপ ভঙ্গীতে শায়িত। গাত্রাবাস তখন আর কারোরই নেই। কীর্ত্তিমানদের কারো কারো উদরের দেশীমদ্য মিশ্রিত ভক্ষ্যবস্তু বদনের দিকে বহির্গত হয়ে প্রাণঘাতী সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে। মনে হয়েছিল যত রকম দুর্গন্ধ আছে তারমধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। সেই সেই প্রভুদের মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া সেই বস্তু পরম আগ্রহের সহিত সারমেয়রা জিহ্বার দ্বারা লেহন সুরু করে দিয়েছে। দেখতে লাগলাম কারো কারো হস্ত ও পদযুগল চতুর্দিকে মির্গিরোগীর মত সঞ্চালিত হচ্ছে। কেউ বা মিনতি ভরা কণ্ঠে জল যাচ্ঞা করছে, কারো কণ্ঠে তরল গানের একটা টুকরো বার বার বিলাপের বিভৎসভঙ্গীতে নির্গত হচ্ছে। গানের একটা অক্ষরকে ধরে এমনভাবে নিক্ষেপিত হচ্ছিল যেন কোন দৈত্য অতি রুগ্ন ব্যক্তির দেহটাকে টান মেরে দেয়ালে তার মাথাটা ঠুকে দিচ্ছে। আরো কতকি অনির্ব্বচনীয় ও কল্পনাতীত দৃশ্য দেখতে দেখতে শরৎবাবুর বাড়ীতে পৌছে হাফ ছেড়ে বেঁচে ছিলাম।

বহু জায়গায় পূজা দেখেছি,—সে সব স্থানের কোন কোনটাতে ৺নবমীর রাত্রে আনন্দ করার নামে কিছু কিছু বেল্লিকপনা দৃষ্টি গোচর

হয়েছে বটে কিন্তু এমনভাবে আনন্দ করার চরম দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি,—ভাগ্য বলতে হবে।

এই সব মানুষ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখনও তাদের মনে গ্লানি ও পরিতাপ আসে না। মনে হয় তা যদি আসত তাহলে তারা আর সুরাদেবীর খপ্পরে যেত না। এ কথাও তারা যে না জানে তা নয়—এর দারুণ প্রভাবে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে এবং দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে। কিন্তু মানুষের মতিচ্ছন্ন যখন আসে তখন কোন বিচার বোধেরই ধার ধারে না। মাদক নেশা মতিচ্ছন্নের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এখানে ৺বিজয়ার পরদিন সকাল বেলায় হেঁটে বনপাশ ষ্টেশনে এসে ট্রেন ধরে বার তিনেক ট্রেন বদল করে দেশে এলাম। ৺নবমীর রাত্রে তিন জায়গায় ৯ ঘণ্টা গেয়ে পাঁচ হিসেবে পনের টাকা পেয়েছিলাম। অবশ্য তখনকার পনের টাকা এখনকার দেড়শ' টাকারও বেশী। বার-তের বছর বয়সের এখন কেউ এইভাবে গাইলে দেড়—দু'শ টাকা কেউই দেবে না। কিন্তু তখন দেওয়ার প্রথাটা সর্বত্রই ছিল। অর্থাৎ পারিশ্রমিক দিয়ে উৎসাহ দান মানুষের কাছে পরম কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হত॥

(২৩)

দারুণ দুর্ঘটনা ও আর একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা—

সে বছর সেই পূজার পর বাড়ীতে এসে ৺কালীপূজার দু' চারদিন পরেই মেজকাকার জীবনে ঘোরতর বিপদ ঘটে গেল,—অর্থাৎ মেজকাকীমা একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করে তারপর কি এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সকলকেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার পিতামহ সে সময় পাটনায় ছিলেন। এ সব সংবাদ তিনি কিছুই অবগত না হয়ে আমাকে পাটনায় শীগ্‌গীর্ যেতে আহ্বান করলেন। চিঠিতে লেখা ছিল পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দাদুর কাছে আমার পরিচয় পেয়ে আমার গান শুনবার জন্য আগ্রহী হয়েছেন গেলে অর্থপ্রাপ্তি হবে। পাটনায় তখন শাস্ত্রীয়সংগীতের বেশ চর্চা ও গুণগ্রাহী শ্রোতা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। দাদুর চিঠি আসার পর দু' চার দিন অপেক্ষা করে বেশ ইতস্তত ভাব নিয়ে আমাদের সেই বুড়োদিদি

মেজকাকার কাছে গিয়ে একথা সেকথার পর দাদুর চিঠিটি তাঁর হাতে দিলেন। চিঠিটি পড়ে আমাকে ডেকে বললেন,—খুড়োমহাশয়ের আহ্বানে তোমার যাওয়ার বিলম্ব হয়ে গেছে। পরিচয়, উৎসাহ ও অর্থ এ সকলের সুযোগ কোন মতেই ত্যাগ করা চলে না, তুমি শীঘ্র মধ্যে যাওয়ার দিন স্থির করে খুড়োমহাশয়কে আজই লিখে দাও।"

এই বিপদের সময় আমার পাটনায় যেতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না, মেজকাকার মাতৃহারা ছোট সন্তান দু'টিকে আমিই তখন বেশীর ভাগ সময় ভুলিয়ে রাখছিলাম। বড় ছেলে রমেশের বয়স তখন আট। ঠাকুরদা'র আহ্বান এবং গুরুর নির্দেশ—সুতরাং বাধ্য হয়ে পাটনায় যেতেই হল।

সেখানে পৌঁছে দু' তিন দিন বাদে বিশেষ বিশেষ স্থানে গানের আসর হতে লাগল। শ্রোতারা গান শুনে আমার বয়সের কথা ভুলে যেতেন,—তাঁরা বলতেন এ গানের বয়স পূর্বজন্ম ধরে অনেক। এখানে শেষের আসরে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট সুগায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় উপস্থিত হয়ে আসরের খুব গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে প্রথমে আমারই গান হল।

রাত্রের তিনটি রাগের উপর আলাপ, খেয়াল ও তেলানা গেয়ে সমাপ্ত করার পর মজুমদার মহাশয় খুব খুশী হয়ে সহর্ষে দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন—নাতিটির শিক্ষা কার কাছে? গুরুর নাম বলতেই তিনি বললেন, —কথার সবটা বিশ্বাস করতে পারলাম না—কারণ এর গানে আঁসটে গন্ধ নেই—খাঁটি হিন্দুস্থানী কয়দা রয়েছে, মনে হচ্ছিল যেন ভারত শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক বড় মহম্মদ খাঁর তালিম পাওয়া শিষ্য,—আশ, মীড় ও তানের উপর দাপটের নমুনা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিল।"

গুরুর উপর আঁস্‌টে মন্তব্য খুব অসহ্য ও আপত্তিকর মনে হয়েছিল। দাদু তাঁকে বললেন—প্রথমে ওর পিতার কাছে কিছু শিক্ষা পেয়ে তারপর আমার ভাইপো গোপেশ্বরের কাছেই প্রকৃত তালিম পেয়ে আসছে,— তাছাড়া আর কারো কাছেই শিখে নাই। দু' তিন বছর ধরে আমার এবং ওর গুরুর সংগে ভারতের বহু স্থানে গিয়ে বহু গুণী গায়কদের গান শুনার ও পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। অন্যের সাধনা লব্ধ ভাল ভাল জিনিস শুনার মাধ্যমে গ্রহণ করে নেওয়ার শক্তি ওর অনেকখানি আছে। ওর গুরু বলেন—দারুণ শ্রুতিধর।"

মজুমদার মহাশয় এই পরিচয় শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন,

ছেলেটির এই বয়সে ভাল জিনিস বেছে নেওয়ার আগ্রহ ও বিচার বোধ দেখে বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছি।" ঠাকুরদা' বললেন—আশীর্ব্বাদ করুন যেন ওর উদ্দেশ্য সফল হয়।" তিনি বললেন—যার এই এত কম বয়সে এরূপ পরিচয় থাকে তার উদ্দেশ্য সফলে কোনরূপ বাধা আসতেই পারে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ওর উপর বর্ষিত হয়েই যাবে, দীর্ঘজীবি হয়ে বেঁচে থাকুক, নিজের স্থান নিজে করে নেবেই সকলকে বিস্মিত করে।"

তাঁর কথায় অভিভূত হয়ে গেছলাম,—মাথানুইয়ে প্রণাম করতেই তিনি কোলের কাছে আমাকে টেনে নিলেন।

সকলের অনুরোধে মজুমদার মহাশয় সহস্তে হর্ম্মোনীয়ম বাজিয়ে ইমনরাগের খেয়াল গাইলেন। খুব সুন্দর লেগেছিল, যেমন সুমিষ্ট কণ্ঠ তেমনি সাবলীল গায়কীভঙ্গী ও রসাল অলংকরণ। পরিশেষে কবি-রজনীকান্ত সেনের "যদি মরমে লুকায়ে রবে···" গানটি গেয়ে শ্রোতাদের অন্তরে অপূর্ব এক ভাবের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

তখনকার সময় থেকে আরো বেশ কয়েক বছর পর্য্যন্ত দেখেছি রাজা, জমিদার ছাড়াও বড় বড় উচ্চপদস্থ, বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকের শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং শিক্ষা-সাধনায় নিযুক্ত থাকতে। তাঁরা শুধু শাস্ত্রীয় সংগীতকেই ভালবাসতেন না—তার সাধকদের মূল্যমান নির্দ্ধারণেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন এবং দিয়ে এসেছেন সর্ববিধভাবে যথাযোগ্য সম্মান ও উৎসাহ। এখন সারা তল্লাট খুঁজলেও উচ্চপর্য্যায়ের বড় বড় পদস্থ ও কর্ণধার ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ এই বিদ্যার যথার্থ মর্মগ্রাহী এবং বিচারবোধজ্ঞ আছেন কি-না তার সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ হবে। এজন্য যেখানে গুণীদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দানের ব্যবস্থা আছে সেখানের মালিকদের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ঘটা এবং স্বপক্ষ তদ্‌বির্ আসার উপর নির্ভর করে চলতে হয়। যাঁরা সম্মান ইত্যাদি পান তাঁরা ভাগ্য গুণেই পান এবং ভাগ্য ভাল না থাকলে আরো অনেক উচ্চস্তরের উপযুক্ত ব্যক্তিরা পেতে পারবেন না। অর্থাৎ সব ব্যবস্থাই আছে কিন্তু ভাগ্যের লটারিরই খেলা সেখানে। সাধকদের সংগে গভীরভাবে সংস্পর্শে না এলে এবং ক্রিয়াঙ্গে ও তত্বাঙ্গে গভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে শাস্ত্রীয়সংগীতের মত বিদ্যার অধিকারীদের সম্মান ও সুবিচার পাওয়ার প্রত্যাশা করাই চলে না। সুতরাং এজন্য কোন ক্ষোভের কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া বহু ব্যবধানে থাকা এবং ভিন্ন পথে থাকা ব্যক্তিদের যদি সমস্তরে স্থান দিয়ে

সংগীতচর্চার উপর উপাধি প্রদত্ত হয় তাহলে সেই ব্যবধানের বহু দূরত্বে অবস্থিত ব্যক্তিদের ওই বস্তুটি গ্রহণ করে কি লাভ বা মূল্য আছে ?

তারপর পাটনাতে বেশীদিন থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না—মেজকাকার কথা ভেবে। বাড়ীতে এসেই দেখলাম মেজকাকা তাঁর সন্তানগুলিকে সংগে করে বর্দ্ধমানে চলে গেছেন এবং বড় কাকার প্রথম পক্ষের স্ত্রীকেও যেতে হয়েছে। আমি দু'চার দিন বাড়ীতে থেকে বর্দ্ধমানে রওনা হয়ে গেলাম কিন্তু অদৃষ্ট আমাকে ফিরিয়ে আনল। কারণ আমার সমস্ত শরীরে চাকা চাকা দাগের মত কি এক রকম বেরিয়ে পড়ায় তাই থাকা সম্ভব হল না। বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বাড়ীতে যখন পৌঁছে মা'কে ডাকছি তখন রাত প্রায় ১১টা। আমার গলার আওয়াজ পেয়ে নূতন কাকীমা তাড়াতাড়ি এসে বললেন, উনি ডাকছেন, তোমার গলার আওয়াজ পেয়ে অত শীগ্‌গীর্ চলে আসায় খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তুমি তাঁর কাছে চল। মা-ও সংগে গেলেন।

বড়কাকা খাবার জায়গায় আসনে বসেছিলেন—গিয়ে দাঁড়াতেই খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—চলে এলে কেন? আসার কারণ বলতেই গম্ ধরে রইলেন,—পরে বললেন—বর্দ্ধমানে বুঝি চিকৎসকরা কেউ নেই ?

আমি বললাম—তাঁর এই ভীষণ মনের অবস্থায় আবার আমার চিকিৎসার ব্যাপারে বিব্রত না হতে হয়ে পাঠিয়ে দিয়ে অতি সঙ্গত কাজই তিনি করেছেন, থাকতে হলে আমাকে খুবই লজ্জায় কাতর হয়ে পড়তে হত। একথা শুনে একটুকু হেসে নূতন কাকীমাকে বললেন—সত্যকিঙ্করকে এখানেই খেতে দাও, বড়বৌ (আমার মা) এত রাত্রে মুড়ি ছাড়া তো আর কিছু খেতে দিতে পারবেন না। আমাকে বললেন যাও বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে এস। এ রকম গভীর স্নেহ খুব কম পেয়েছি।

আমি যে ফিরে এসেছি সেই রাত্রে ঠাকুরদা জানতে পারেন নি। খুব ভোরে মা'এর মুখে সব শুনে আমাদের পাড়ার নিকটেই শাঁখারীদের একজন ভাল হাতুড়ে চিকিৎসককে ডেকে নিয়ে এলেন। আমি তখন গলা সাধতে প্রস্তুত হয়েছি। দাদু বললেন—কাল সমস্ত দিন ট্রেনে এসে এই এত সকালে সাধতে বসেছ! বহুৎ আচ্ছা, এই তো চাই।

চিকিৎসক আমার গায়ের গুলো দেখে বল্‌ল—ও এমন কিছু নয়, খাওয়ার সংগে কোন রকমে মাকড়সার বিষ পেটে যাওয়ায় এগুলো

বেরিয়েছে, একটা তেল করে দেবো—লাগালেই দু'দিনে শুকিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।" হলও তাই—তার করে দেওয়া তেল দিন দুই ব্যবহার করতেই গা'এ আর কিছুই দেখা গেল না। ডাক্তারি ব্যবস্থায় হয়ত অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে যেত, এই চিকিৎসায় তেলের জন্য মাত্র চার আনা দিয়েই কাজ সমাধা হয়ে গেছল। আগে দেখেছি হাতুড়ে চিকিৎসকদের এমন সব অব্যর্থ ওষুধ ছিল যে, যে সব রোগকে ডাক্তাররা বলতেন দুরারোগ্য তাদেরও তারা সারিয়ে দিত। আমাদের পাড়ার মহেশ মালাকারের পীঠে কার্বাঙ্কল হয়েছিল। অপারেশনের জন্য কোলকাতার মেডিকেল্ কলেজে ভর্ত্তি হয়—কিন্তু সেখান থেকে তাকে ফিরে আসতে হয়—ভীষণ ডায়বেটিস্ ছিল বলে। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না,—কি দারুণ যন্ত্রণা তার,—চোখে দেখা যেত না। পাড়ার বিখ্যাত হাতুড়ে চিকিৎসক চন্দ্র শাঁখারীকে অবশেষে ডেকে আনল। চন্দ্রদা' একটা মলম্ তৈরি করে পীঠের সেই কার্বাঙ্কলের উপর চাপিয়ে বলে গেল—এটা তিনদিন কামড়ে ধরে থাকবে—তারপর বোলতার চাকের মধ্যে ডিম থাকার মত এর বিষাক্ত পুঁজকে তার শিকড় থেকে সমস্ত টেনে বের করে মলম্টা খুলে পড়ে যাবে,—তারপর আর একটা মলম্ লাগালেই সমস্ত শুকিয়ে যাবে। প্রথম মলম্টা লাগাবার পর থেকে রোগীর যন্ত্রণারও লাঘব হ'তে থাকে। হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাতেই মহেশ মালাকার বেঁচে গেল এবং বহুকাল বেঁচেছিল। এই সব ওষুধ আমার মা'ও কিছু কিছু জানতেন এবং এ রকম ধরণের অনেক মারাত্মক রোগ তাঁর ওষুধে সেরেও গেছে। আমরা তাঁর কাছে যদি শিখে রাখতাম তাহলেও আমরা তার উপর নির্ভর করতে পারতাম না কারণ টাইটেলধারী চিকিৎসক ছাড়া অন্য কোনতে আর বিশ্বাস আসে না। এখন ষ্টেথিস্কোপ্ গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার না এলে রোগী এবং রোগের মর্য্যাদাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে বাড়ীরও।

শেষেরটি বাদে আমার যতগুলি সন্তান জন্মেছে—তাদের প্রসব করিয়ে গেছে ধাইমা'রা। যেন তারা নিজের কন্যার প্রসব করাচ্ছে—এই রকম তাদের সুন্দর ব্যবহার ও যত্ন দেখেছি এবং দেখেছি অদ্ভুত নিপুনতা। ধারাবাহিক বংশগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই ছিল এই দক্ষতার মূলে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এবং ডুসের যন্ত্রও তারা সংগে নিয়ে আসত। তখন প্রসবপদ্ধতিতে বিজ্ঞান চিকিৎসার পথও তারা বেশ খানিকটা রপ্ত করে নিয়েছিল। এদের এই জাতিগত ব্যবসা এখন লোপই পেয়ে গেল—বিশেষতঃ

সহরে। সকলেই এখন হাসপাতালে কিংবা নার্সিং হোমে যায়।

যাক্ এ সব কথা,—তারপর প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও বর্দ্ধমানে যাবার সুযোগ হল না। বিশেষ করে আমাকে আকর্ষণ করছিল মেজকাকার মা হারা সন্তানগুলির জন্য। কারণ ছোট থেকেই তারা আমার আদর যত্নে আকৃষ্ট ছিল।

অদৃষ্টের নিয়মে আমার তো মা'এর কাছে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয় তাই সৌভাগ্য চিন্তা করতে লাগল কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। দেরি হল না তাকে ভাবতে,—দাদুর কাণে কাণে জানাল পশ্চিমের অনেক জায়গায় তো ঘুরিয়ে এনেছ এবার নাতিকে নিয়ে বাংলার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের কতকটা অংশে ঘুরিয়ে নিয়ে এস। দাদুর যেন সম্বিত ফিরে এল,—পাঁজি দেখে দিন ক্ষণ ঠিক করে নিলেন।

যথা দিনে যাত্রা করা হল কোলকাতাগামী বেলা ১০৷৷টার ট্রেনে। খড়্গাপুরের পর চারটে ষ্টেশন বাদ দিয়ে পরের ষ্টেশন রাধামোহনপুর ষ্টেশনে নেমে সেখান থেকে মনে হচ্ছে প্রায় মাইল চার দূরে এক জমিদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হলাম। কুলির মাথার বাক্স বিছানাদি চাপিয়ে দেওয়া হল। তানপুরাটা আমার হাতে রইল। মাসের সে সময়টা অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। বেলা তখন পড়ে এসেছে।

এই জমিদার বাড়ীতে দাদু একবার গানের ও ভাগবতপাঠের জন্য এসেছিলেন। ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যার সীমা পেরিয়ে এসেছে। জমিদার বাড়ীর গৃহাদি দেখে বেশ পরিপাটি ও জমকাল লেগেছিল। তার নির্মাণ কাজ ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী।

নাটমন্দিরে জিনিসপত্র নামিয়ে কুলিকে বিদায় দিয়ে দাদু ম্যানেজারের ঘরে চলে গেলেন। একটি লোক দাদুর সংগে এসে আমাদের থাকার যেখানে ব্যবস্থা করে দিলে সেটা একটা পরিত্যক্ত মাটির খোড়ো বাড়ী। সাধারণ আগন্তুকদের থাকতে দেবার মত তেমন কোন গৃহাদি ছিল না। অতি সাধারণ ব্যক্তিরা এলে তাদের নাট মন্দিরে ধর্মশালার যাত্রীদের মত থাকতে হয়। দাদু যখন এসেছিলেন তখন তাঁকে এক ব্যক্তির বৈঠকখানা গৃহে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিতের মধ্যে পার্থক্য থাকেই। সুতরাং যেখানে আমরা থাকতে পেলাম সেখানে থাকা অনাহূতদের পক্ষে কোন অসুবিধার কথা মনে আনা চলে না।

সেই গৃহাভ্যন্তরে জিনিসপত্র রেখে—দূরে নিক্ষেপিত একটা ক্ষয়িষ্ণু

সমার্জনীকে তুলে নিয়ে ঘরের ভেতর জলের ছিটে দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর সংগের সতরঞ্চ পেতে বিছানা করে গেলাম সামনের পুকুরে। যেখানেই যাওয়া হত হ্যারিকেন ও গাড়ু এই দুটি বিশেষ বস্তু দাদু সংগে রাখতেন। আমরা উভয়ে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে সেখানেই ঘাটের উপর পাথরে বসে সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে নিলাম।

পৈতে হবার পর থেকে ব্রাহ্মণের এই কর্ত্তব্য কাজ তিন বেলা সমানে করে এসেছিলাম। তারপর কোলকাতায় এসে ক্রমশঃ শিক্ষকতার অত্যধিক চাপে পড়ে আর সম্ভবপর হয়ে উঠল না, কারণ সন্ধ্যা আহ্নিকে বসেই মন্ত্রগুলো ঝড়ের মত আওড়ে যেতে হত সময়ের সংক্ষেপ হেতু। এই অবস্থায়—মনে হতে লাগল যেখানে অন্ততঃ এক ঘণ্টা প্রয়োজন সেখানে দশমিনিটে যদি সেরে নিতে হয় তাহলে তাকে আর ধরে রাখার কোন অর্থ হয় না। পরিবর্ত্তে সেই সেই সময়ে দশবার গায়ত্রী জপ করে কাজ সারা হত।

ছেলেবেলায় বামুনদের মাথায় টিকি দেখে টিকি রাখবার জন্য কি কাঁদাকাটাই না করেছি। পৈতের আগে টিকি রাখতেনেই এবং ঠাকুর দেবতার পূজা করা চলে না এজন্য পৈতে কতদিনে হবে তার আগ্রহের চিন্তায় মনকে অস্থির করে তুলত। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদর্শ ভাব-ধারাই দৃষ্টিগোচর হত বলে বাল্যকাল থেকেই তাতে মন আকৃষ্ট করে রাখত। পৈতের পর দেশে থাকার সময় প্রত্যহ ৺কুলদেবতা গোপীনাথজীউ এর পূজাদি করে পরম তৃপ্তি পেতাম। দেব-দেবীদের মন্ত্রগুলি সকালের নানান রাগে উচ্চারিত করে যখন সচন্দন পুষ্প তাঁদের চরণে অর্পণ করতাম তখন মনে হত এই রকমই চিরকাল যেন করতে পারি। সে-যে কি আনন্দ কি তৃপ্তি তা বলে বুঝান যায় না। পৈতার আগে বাবা আমাকে সমস্ত মন্ত্র শিখিয়ে রেখেছিলেন। পরে আমি চণ্ডীপাঠ এবং ৺দুর্গাপূজার পূজা-পদ্ধতির পুঁথিও আয়ত্তে এনেছিলাম।

এখন পূর্বসূত্রে ফিরে যাই,—সেদিন সেখানে সন্ধ্যাবন্দনা সেরে দাদু গেলেন জমিদার বাড়ীর দিকে। একটু পরে তাঁর সংগে ঠাকুর বাড়ীর বামুন নিয়ে এল পিতলের রেকাবী করে কিছু মুড়কী, গোটাকতক বাতাসা এবং দুটো মণ্ডা। বুঝলাম ঠাকুরদা আমার জন্যই ছুটেছিলেন কিছু জলযোগের ব্যবস্থার জন্য। দাদুকে সেগুলোর থেকে বেশী দিলাম কিন্তু তিনি মাত্র দু'টো বাতাসা তুলে নিয়ে বললেন—'সবগুলি খেয়ে নে'। দাদুর

শুধু ওইটুকু নেওয়াতে মনটায় খুব কষ্ট হল, –মনে হতে লাগল কখন সেই সকালে ৯টায় সময় এক সংগেই ভাত খেয়েছিলাম – তাঁরও তো আমার মতই খিদে পাওয়া সম্ভব—কিন্তু আমার জন্য তাঁর কিছুই খাওয়া হল না। আমার মনের কাতর ভাব লক্ষ্য করে দাদু বললেন –ওরে ভাই ! আমার এক আধ দিন কিছু না খেলেও কষ্ট হবে না। ক্রিয়া কর্মে দীর্ঘ সময় উপোস করে থাকতে হয়। খিদে পেলে এবং পেট না ভরলে তার কষ্টসহ্য করা আমারও তখনকার বয়সেই ধাতস্থ হয়ে গেছল।

তারপর ঘরের ভিতর বসে গান সাধব বলে তানপুরাটা নিয়ে বসতেই হ্যারিকেনের আলোতে নজর পড়ল দেয়ালের গোড়ায় গোড়ায় গোল গোল গর্ত্ত,—মাটি উঠে নেই দেখে বুঝতে পারলাম ইঁদুরের বংশ লোপ করে দিয়ে সেই সাংঘাতিক জীবেরা তাদের গৃহ দখল করে নিয়েছে। তারা কতজন আছে কে জানে,—তবে সময়টা শীতকাল বলে ভয় হল না,—জানি—এ সময় তারা গর্তেই থাকে— বেরোয় না। তাছাড়া অন্য সময় হলেও তারা ইচ্ছে করে ছোবল মারতে আসে না। সত্যই, তারা যদি হিংস্র হত তাহলে বনে, জংগলে, গাছ তলায় এবং সর্পসঙ্কুল গৃহে যে সব মানুষ থাকে এবং রাত্রে নিদ্রা দেয় তাদের কেউই বেঁচে থাকত না। কামড় দেয় চরম ভয় পেয়ে কিংবা শরীরে আঘাত লাগলে। গর্তের ভেতর থেকে এবং ফাঁশের দ্বারা ওদের ধরা দেওয়া দেখে মনে হয় ওরা আসলে অতি নিরীহ ও ভীতু এবং হিংসাভাব থাকে না বলে তারা এ-ও মনে করে মানুষ আমাদের কিছু করবে না। অথচ মানুষরা কিন্তু ওদের নিস্তার দেয় না. দেখলেই দারুণ ভয় এসে গিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। ওদের সত্যকারের যা স্বভাব তা দেখে মনে হয় ওরা ভয় পেয়ে যখন ছোবল মারে— তখন যদি ওরা বুঝতে পারত আমাদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক বিষ আছে – সেই বিষ ছোবলের মধ্যে দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলবে তাহলে হয়ত নিজের প্রাণ দিয়েও ছোবল্ মারত না। কিন্তু ভগবানের মনুষ্যরূপী শ্রেষ্ঠ জীবের স্বার্থপরতায় ও হিংস্রতায় অসাধ্য কাজ কিছু নেই— মুহূর্তে প্রাণও নিয়ে নিতে পারে এবং কৃতঘ্নতার চরম পরাকাষ্ঠাও দেখাতে পারে।

বিষধর সর্পদের প্রকৃত স্বভাবের বহু পরিচয়ের মধ্যে আমার বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার কথা জানাই। আমার বয়স তখন দু'বছরের মত, একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে আমি রান্নাঘরের রোওয়াকে খেলা করছিলাম—মা' বাতি দিতে মন্দিরে গেছেন। হঠাৎ দেখতে পেলাম খিড়কী

দরজার দিক থেকে একটা লম্বা মত কি যেন সর্‌ সর্‌ করে আসছে,—আমি তার কাছে যেতেই ফণা তুলে দাঁড়াল এবং দুলতে লাগল—আমিও তার সেই ফণা দুলানর তালে তালে তার সামনে একটা পা 'তুলে দুলাতে লাগলাম। কতকক্ষণ এ রকম চলল্‌ জানি না,—মা এই ব্যাপার দেখতে পেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠেন কিন্তু বিমূঢ় হয়ে যান নি—পেছন দিয়ে গুড়ি মেরে এসে একেবারে ঝট্‌কাটানে আমাকে তুলে নিয়ে দৌড় দেন। সাপটা খেলার সাথিকে হারিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে তার গন্তব্য পথে চলে যায়। আমার কিন্তু এখনও তার প্রতি মায়া থেকে গেছে। এই ঘটনার বিষয়ও মা লোকের কাছে বলতেন এবং আমারও বেশ মনে আছে।

তারপর সেইদিন রাত ৯টার সময় ঠাকুর বাড়ী হতে প্রসাদ এল লুচি, চিনি এবং এক বাটি ঘন দুধ। খেয়ে নিয়ে আমরা নিদ্রা দিলাম। খুব ভোরে উঠে অনেকক্ষণ গান সেধে নিয়ে তারপর একটু বেলায় পুকুরে স্নান সেরে সেখানেই আহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করা হল। বেলা এক প্রহরের পর সেই রকম জলযোগের বস্তুর সংগে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য এল দু'জনার মত চাল, ডাল, তরকারী, একটি ছোট পনামাছ এবং কাঠ, পাত্র ইত্যাদি রান্নার সমস্ত উপকরণ।

বাইরের দাওয়ার এক কোণে একটা ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় উনুন ছিল সেটাকে কাজের উপযোগী করে তার মুখ গহ্বরে অগ্নি প্রদান পূর্বক রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে গেলাম। বেলা মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যাবার সময়ে ভাত ডাল, একটা তরকারী ও মাছ ভাজা তৈরি হয়ে গেল। ঘরের ভেতর জল ছিটিয়ে তারপর ঝাটা দিয়ে পরিষ্কার করে কম্বলটা ভাঁজ করে পেতে কলাপাতার উপর খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে নিলাম। দাদুর পাতে বেশী বেশী করে সব কিছু জিনিস দিয়ে দুজনে বসে পড়লাম আহারে। এই রকম অবস্থায় দাদু আমার পাতের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু নিজের পাতে রেখে দিয়ে বলতেন খুব পেট ভরে গেছে আর পারছি না, রান্না কিন্তু খুব ভাল হয়েছে। বাড়তিগুলো তাঁর পাত থেকে তুলে নিয়ে পরম তৃপ্তি করে খেয়ে নিতাম। অবশ্য আমি জানতাম তিনি পরিমাপ মতই খেয়েছেন; কারণ তিনি জানতেন কম খেয়ে আমার জন্য রেখে দিলে আমি ভীষণ কষ্ট পাব। একবার ওই রকম মনে হয়েছিল বলে কেঁদে ফেলেছিলাম। দাদু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

দাদুর সংগে গিয়ে কোন কোন জায়গায় যখন আমাকে রান্না করতে

হয়েছে তখন তিনি কিরূপ নিরুপায় ব্যথা যে অনুভব করতেন তা আমি গভীর ভাবে বুঝতে পারতাম। থাকতে না পেরে এক এক সময় সাহায্য করতে ছুটে আসতেন—গুরুর কাছে করুণার পাত্র নূতন শিষ্যটির মত ভয়ে ভয়ে। তাঁর অপটু হস্ত স্নেহ মমতা নিয়ে যতটুকু এগিয়ে আসত তা যথাযথ সাহায্যের মত না হয়ে বেশ একটা মজার আলোড়ন সৃষ্টি করত। যেমন, ভাত হয়ে এসেছে—আমি সে সময় তরকারী কুটছি, দাদু এসে দেখলেন আমি অন্য কাজে নিযুক্ত—তাই ভাতের পাত্রে জল কম দেখে এক ঘটি জল নিয়ে তাতে ঢেলে দিলেন,—আমি হাসতে হাসতে বাটিতে করে জলটা ফেলে দিয়ে ভাতের পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে ফেন গড়াতে বসে যেতাম। দাদুর তখন অপ্রস্তুতের মত মুখের ভাব আমাকে খুব ব্যথা কাতর করে তুলত। আমাকে ওই বয়সে রান্না করতে হচ্ছে দেখে তাঁর মনে যে কি কষ্ট হত তা আমি অতি সহজেই বুঝতে পারতাম। তখন বিশেষভাবে অনুভব করতাম, যেন একটি পরম স্নেহময় মূর্ত্তি নিবিড়ভাবে আমার চতুর্দিক বেষ্টন করে প্রীতির অমৃতধারা মনের উপর অন্তরের উপর এবং দেহের উপর সিঞ্চন করছে।

সেই আমার শ্রেষ্ঠ দেবতার মত মানুষটি বহুকাল গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত স্মৃতিই অন্তরে ধ্যানের বস্তু ও আদর্শের প্রতীক হয়ে আছে।

জমিদার মহাশয়ের কাছে ওই দিন রাত্রে আমাদের গান হল বহুক্ষণ ধরে। তবে সঙ্গতকার অন্য কেউ ছিল না। আমরাই পরস্পরের সঙ্গতকার হয়েছিলাম এবং অনেক জায়গায় হতেও হয়েছে। আমার গানে দাদু বেশ সুন্দরভাবে সঙ্গত চালিয়ে দিতেন। নিজে ভাল গায়ক ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গত করা ঠিক সঙ্গতই হত, শিল্পধ্যানের উপর প্রহার পড়ত না।

দাদুর গান জমিদার মহাশয়ের আগেই যথেষ্ট শুনা ছিল। আমার গান শুনে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। রাত প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় গান সমাধা হতে আগের দিনের মত সেইরূপ প্রসাদ পেয়ে আমাদের গেষ্ট হাউসে চলে এলাম। পরের দিন খুব সকালে অন্য সব কাজ সেরে বিছানাপত্তর বেঁধে সেখান হতে আর এক জমিদার বাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল।

জমিদারের নির্দ্দেশ মত দাদু গেলেন খাজাঞ্চির কাছে। তিনি তাঁর মনিবের বলে দেওয়া মত টাকা দিয়ে তার ব্যাখ্যায় জানালেন—মাসের

মধ্যে নানান ধরণের অনুষ্ঠান প্রায় লেগেই থাকে—তাই জমিদারবাবু স্তর হিসেবে কৃতিত্বের গুণাগুণের উপর টাকার অর্দ্ধেক থেকে সর্ব্বোচ্চসীমা পাঁচের মধ্যে রেখেছেন, আপনাদের শেষ অংকের টাকা দিতে বলেছেন, এবং ছেলেটিকে মিষ্টি খাবার জন্য আলাদা দু'টাকা। দাদু টাকা সাতটি হাতে নিয়ে একটা মুটের কথা বলামাত্র সংগে সংগে তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমরা রওনা হলাম ওখান থেকে মাইল পাঁচ দূরবর্ত্তী ঘোষপুরের জমিদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ওই জমিদারকে মেজকাকার পিতা অনন্তলাল মাঝে মাঝে এসে ধ্রুপদাদিগান শিক্ষা দিয়ে যেতেন এবং দাদুও দু'একবার এসেছিলেন।

গন্তব্যপথের মাঝখানে একটা বড়রকমের ক্যানেলের মত ছিল। একটি করে পয়সা দিয়ে তালের ডিঙ্গিতে চড়ে পার হতে হত। ওই রকম ডিঙ্গিতে চড়ে যাওয়া অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে দারুণ ভয় থাকে। তৌল-দণ্ডের মত ভারসাম্য রেখে ভেতরে বসতে হয়, ওজনের এদিক ওদিক তারতম্য হলে এমন জোরে দুলতে থাকে যে, টাল সামলাতে না পারলে অবশ্যম্ভাবী পতন। সাঁতার না জানলে শিশার বলের মত কুপ্ করে ডুবে গিয়ে তলদেশে বিশ্রাম এবং পরে উপরে ভাসমান।

যাইহোক্—সরু সুতোয় বাঁধা নিক্তির বাটি হাওয়ার জোরে যেমন দুলতে থাকে তেমনি তালের ডোঙ্গাটা এদিক ওদিক উল্টা-পাল্টা করতে করতে তীরে এসে লাগল। খুব সাবধানে নেমে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। বেলা আন্দাজ ৯টার সময় জমিদার বাড়ীর সদর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। দাদু ভিতরে গিয়ে একটি লোককে আমাদের পরিচয় দিয়ে জমিদার মহাশয়কে জানাতে বললেন। একটু পরে তিনি স্বয়ং এসে পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে দেখে তিনিই যে জমিদার তা মোটেই ধরতে পারিনি। মনে হয়েছিল কোন মঠের কোন বাবাজী। গলায় তাঁর তুলসীবৃক্ষের মোটা মালা হাতে হরিনামের ঝুলি—তার মধ্যে দিয়ে রেফ্ফলাফার মত হয়ে তর্জনী অঙ্গুষ্ঠটি বহির্গত হয়ে আছে, মুণ্ডিতমস্তকের পশ্চাতে দীর্ঘশিখা শোভা পাচ্ছে, মুখে ও গাত্রের চতুর্দিকে পরমযুগলচরণ ও হরেকৃষ্ণ'র শুভ্র রং-এ অঙ্কিত নাম, পরিধানে আজানুলম্বিত সূত্রবাস এবং মনিপুরী দৈর্ঘতা বিশিষ্ট দেহ ও তদ্রূপ সুনাসিকা ও চক্ষু। বিনয়,

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্যবহার প্রভৃতিতেও, তেমনি শুচীশুভ্র। এই সব জমিদার জমির ধানের বিপুল আয় থাকায় তার থেকেই মূলত এঁদের জমিদার নাম অর্থগত হয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দুজনকেই পরমভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করেদিলেন এবং মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হল এক ব্রাহ্মণ বাটীতে। একটি লোক মেঝেতে জল ছিটিয়ে বেশ পরিষ্কার করে দু'টি আসন পেতে দিয়ে নিয়ে এল দুটি রেকাবীতে ভর্ত্তি হয়ে থাকা গৃহের তৈরি মিষ্টান্নাদি। বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। জমিদার মশায় সামনে মেঝের উপর শূন্যাসনে বসে রইলেন। বড় লোকদের মধ্যে এ রকম আদর্শ মানুষ হতে পারে এ ধারণা তখন মোটেই ছিল না। পরেও আমার জীবনে ওই এক মাত্রই দেখার সুযোগ হয়েছে।

তারপর ফরাসে বসিয়ে বিষ্ণুপুরের গায়ক-বাদকদের খবর ও কুশল সমাচার জেনে নিয়ে আমার শিক্ষার পরিচয় পেয়ে গান শুনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিছুক্ষণ গাইলাম, শুনে খুব আশ্চর্য্য বোধ করলেন বলে মনে হয়েছিল। আলাইয়া ও সর্ফর্দা এই দুটি রাগের ধ্রুপদ শুনতে চাওয়ায় রাগবোধ আছে বলে মনে হয়েছিল। গান শুনে বলেছিলেন,—পূর্ব জন্মের শিখে আসা, নচেৎ এ জন্মে এই এত কম বয়সে এরকম ভাবে গাইতে পারা অসম্ভব। গাওয়ার পরিচয় দিলে কেউই বিশ্বাস করবে না। জমিদার মহাশয় স্থানীয় অনেকগুলি গুণগ্রাহী শ্রোতাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন রাত্রের আসরে উপস্থিত হবার জন্য।

রাত্রে বহুক্ষণ ধরে আমার গান হল এবং পরে দাদুর। জমিদার মহাশয় ধ্রুপদ, খেয়াল বহু দিন ধরে শিখেছিলেন বলে তাই সত্যকারের শ্রোতা মনে হয়েছিল। অন্যান্যেরাও যাবার সময় তাঁদের মন্তব্যের মধ্যে প্রকৃত শ্রোতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পরের দিন আমরা বিদায় নেব জেনে জমিদার মহাশয় দাদুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁর পায়ের তলায় দশটি রৌপ্যমুদ্রা অর্পণ করে বলেছিলেন—আপনার নাতির গান শুনে বড়ই মুগ্ধ হয়েছি,—আবার আপনাদের আগমনের প্রত্যাশায় থাকব।

তারপর সেদিন দুপুরে আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করে—জমিদারের দেওয়া লোকের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে—চার মাইল পথ হেঁটে হাউর ষ্টেশনে এলাম এবং কোলকাতাগামী ট্রেন ধরে হাওড়ায় নেমে

সিয়ালদার নিকট সুরিলেন নামক স্থানে—সেজকাকার বাসায় পৌঁছলাম রাত ৮টায়॥

(২৪)

ঠাকুরদা লোকপরম্পরা শুনেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী স্থানের লালগোলার মহারাজা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। তাই সেখানে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে পরের দিন রাত্রের ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হতে রাত ১০টায় চড়ে ভোরের সময় আমরা লালগোলা ষ্টেশনে নামলাম। সূর্য্যোদয় হবার কিছুক্ষণ পরে কুলির মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে পৌছানর পর দাদু বহু চেষ্টা—তদ্‌বির করলেন মহারাজার সাক্ষাৎ লাভের জন্য কিন্তু তা সম্ভব হল না। অবশেষে একটি চাকর অঙ্গুলি নির্দেশে জানিয়ে দিল ওই ঘরে প্রাইভেট সেক্রেটারী আছেন তাঁর কাছে গেলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সেখানে গিয়ে আমরা তাঁর দর্শন পেয়ে গেলাম। তিনি উপেক্ষার ভঙ্গীতে দাদুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—কিজন্যে এসেছেন? দাদু আসার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করতেই তিনি বললেন—মহারাজার এখন গান-বাজনা শুনার মত মনের অবস্থা বা আগ্রহ নেই— কারণ সবে মাত্র তাঁর নাতির বিবাহে বহু রকম অনুষ্ঠান হয়ে গেছে—তিনি এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছেন,—এখন তাঁকে কিছু বলতে পারব না।"

অতদূর থেকে আমরা এসেছি জেনেও এবং আমাদের বয়সের দিকে তাকিয়েও যখন তিনি কিছু করতে পারবেন না বললেন তখন কি আর করা যাবে। এক বেলার মতও আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েও। সেক্রেটারী মহাশয়ের চেহারাটি যেরূপ মুনি-ঋষির মত করে তৈরি করেছিলেন সেরূপ অন্তরটিকে কেন গড়ে তুলতে পারেন নি—সে কথা জিজ্ঞেস করলে হত। কি আর করা যাবে—বেশ ক্ষুণ্ণ মনে আমরা ষ্টেশনের দিকে পা' বাড়ালাম। তখন মনে হচ্ছিল—গ্রাম্য জমিদার এবং বড় রাজা মহারাজাদের মধ্যে বোধ হয় এই রকমই তফাৎ থাকে, কিংবা এমনও হতে পারে মালিকরা ঠিকই আছেন, তাঁদের অধিনস্থ

বেতনভোগীরা অধীনস্থই শুধু নন—দয়া-ধর্ম-বিবেক বুদ্ধিতেও মনিবদের অধীন। ষ্টেশনে ফিরে এলাম। দ্রব্যবাহী সেই হিন্দুস্থানী কুলিটি আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করে পয়সা কোন রকমেই নিতে চাচ্ছিল না। দাদু তার মমতাজ্ঞানে বিস্মিত হয়ে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে জোর করে পয়সাগুলি তার হাতে গুঁজে দিলেন। ঠিক সেই সময় ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এলেন—এবং সমস্ত কথা শুনে পরম সমাদরে তাঁর কোয়ার্টার্সে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং অনতিবিলম্বে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মনে হয়েছিল এঁরাই সত্যকারের নরনারায়ণ গোষ্ঠীর মানুষ। তিনি গান বাজনা খুব ভাল-বাসেন এবং এককালে কিছু শিখেছিলেন সে কথা সবিস্তারে জানালেন।

সেদিন সেই নিরাশ অবস্থার মধ্যে পড়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল ভগবৎ প্রেরিত এই মানুষটিই আমাদের রক্ষা করলেন। তখন বেলা হয়ে গেছে—সকালের কোন কাজই তখন পর্য্যন্ত সামাধা হয়নি, তার উপর অন্যস্থানে যেতে ট্রেনের সময় ছিল বেলা ৩টায় এবং খিদেও বেশ বেড়ে চলেছিল। যাই হোক্—ভগবানের কৃপায় তখনকার মত বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় বললেন—আপনারা স্নানাদির পর জলযোগ করে বিশ্রাম করুন—আমি রাজগুরুদেবের বাড়ীতে যাচ্ছি, এখন গুরুপুত্রই মালিক, তাঁর সঙ্গীত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা খুব; দেখি যদি তিনি গান শুনতে ইচ্ছুক হন এবং শুনে সন্তুষ্ট হন তাহলে মহারাজাকে বলতে পারবেন।

ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এসে বললেন—গুরুপুত্র (বেশ বয়স্ক তখন) আগ্রহ প্রকাশ করেছেন—রাত্রে তাঁর ওখানে আসরের ব্যবস্থা হবে।

ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় সুন্দর আয়োজনের উপর মধ্যাহ্নে আহার করালেন। গান-বাজনা সম্বন্ধে নানান কথা চলতে লাগল। তারপর বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যার পরই তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন গুরুর প্রাসাদে। আমাদের পৌছানর পরই অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত হলেন। গান আরম্ভ হল ৭টায় শেষ হল ১১টায়। গান শুনে সকলের বেশ ভাল লাগল বলেই মনে হল। গৃহমালিক অর্থাৎ গুরুপুত্র আমাদের তিন জনকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন আহার করাবার জন্য। রুটি, ডাল, তরকারী পেট ভরে খেলাম। কপাটের ফাঁকে পরিবেশক ছোট রেকাবীতে করে দু'টো মিষ্টি নিয়ে ইতস্ততঃ করছিল। সেদিকে আমার নজর পড়ে গেছল।

গুরুপুত্র ইঙ্গিতে নিষেধ করে দিলেন—ষ্টেশনমাষ্টার বাড়তি হয়ে পড়ায়। ভালই হল ও দুটো গুরুদেবেরই সদ্‌ব্যবহারে লাগবে। মিষ্টি দুটোর খুব পুণ্য সঞ্চয় ছিল।

আসবার সময় গুরুপুত্রদেব খুব আশ্বাস দিলেন, যাতে মহারাজার কাছে গান হয় তার ব্যবস্থা করবেনই। একথাও জানালেন—বিদায় ভালভাবেই হ'বে।

গুরুপুত্রদেবের বিপুল অভয়বাণীতে দাদু আকৃষ্ট হয়ে আমাকে বললেন— আসা তাহলে নিষ্ফল হবে না—গুরুপুত্রটি সত্যই খুব ভাল। আমি দাদুর কথায় সায় দিতে পারলাম না,— চার ঘণ্টা পরিশ্রম করে শরীর খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল,— তার উপর চাপ পড়েছিল ভুরি-ভোজনের। সুতরাং মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না,—ষ্টেশনের বিশ্রাম আলয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ খাওয়ানর প্রাচুর্য্যের কথাই মনে হতে লাগল। এবং এ-ও মনে হতে লাগল যাঁদের পা-ধুয়া জল পান করে রাজা-মহারাজারাও জীবন ধন্য হল বলে মনে করেন তাঁদের সান্নিধ্য লাভও বড় কম কথা নয়। পা'য়ের মহিমা এত বড় যখন তখন তাঁদের মনের প্রকোষ্ঠে আর অন্য মুল্যবান বস্তু সঞ্চয় করে রাখবার আবশ্যক থাকবে কেন।

পরের দিন একটু বেলায় গুরুপুত্রদেবের কাছ থেকে খবর এল— মহারাজার এখন সময় হবে না গান শুনার।" দাদু এই কথা শুনে বিস্মিত হলেন, আমি হলাম না, কারণ বেশ বুঝতে পেরেছিলাম মহারাজার কাণে আমাদের সংবাদ পৌঁছবে না। এই বুঝতে পারা যে সঠিক তার প্রমাণ আমি পরে পেয়েছিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার মশায় খুব মুখ শুকনো করে মাথা চুলকাতে লাগলেন,—মনে হয়েছিল তাঁরই বেশী করে এই সংবাদ দুঃখিত করেছে। তাঁর বাসায় মধ্যাহ্নের আহার সমাধা করে বেলা ৩টার ট্রেনে ফিরে যাবার সময় সেই সরল প্রকৃতি—সত্যকারের মানুষটির উপর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রেখে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। আমরা জিয়াগঞ্জে যাব জেনে দুটি টিকিট কেটে দিলেন নিজের পয়সায়। ট্রেন ছাড়া এবং অদৃশ্য হওয়ার শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ বিষণ্ণই থেকে গেল।

মনের ফিল্মএ এই রকম সব মানুষের মহত্ব চিরতরের জন্য আদর্শরূপে অঙ্কিত হয়ে যায়,—কখনও ভুলবার নয়।

(২৫)

জিয়াগঞ্জ, নসীপুর ও বহরমপুরের পরিচয়—

আমরা সেদিন জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে সেই সহরের দাদুর এক পরিচিত গৃহে উঠলাম। এক সময় এই গৃহস্বামীদের আহ্বানে দাদু এসে বেশ কয়েকদিন ভাগবত পাঠ ও সঙ্গীতাদি শুনিয়েছিলেন। এই গৃহ-মালিকভ্রাতারা বেশ বনেদী ও কৃষ্টিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের বলে বিশেষ খ্যাতি ছিল। আহ্বান পেয়ে বাংলাদেশেই শুধু নয় অন্তদেশেও দাদুর যাওয়া ঘটেছিল। তাছাড়া তিনি সর্বদা ভগবানেরই স্মরণাপন্ন ছিলেন বলে অনাহূতভাবেও যেখানে যেতেন সেখানেও সমানভাবে সমাদর পেতেন। আমি তাঁর সঙ্গে যত জায়গায় গেছি কোথাও খাওয়া-দাওয়া ও সমাদরের অভাব ঘটেনি।

আমরা পৌঁছতেই সেই গৃহের ভ্রাতারা পরম সমাদরে গ্রহণ করে নেন। এখানে একত্রে সহোদর ভাইগুলিকে পরম আনন্দে থাকতে দেখেছিলাম। একান্নবর্ত্তী হয়ে থাকার আদর্শ টীকে থাকে যদি প্রত্যেকেরই মনের প্রসারতা—একাত্মবোধ এবং স্বার্থশূন্য হৃদয় হয় তবেই।

এখানে সেদিন সন্ধ্যার পর আমার গান হ'ল। সকলেই খুব মনযোগ দিয়ে শুনলেন। দু' এক দিন পরে এঁদের চেষ্টায় কয়েকটি জমিদার বাড়ীতে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে গান হওয়ায় অর্থপ্রাপ্তি মোটামুটি মন্দ হয়নি। নেহালীয়া ষ্টেটে যেদিন গান হল সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের গুণী কাননবাদন আসিফ্ আলি খাঁ সাহেব। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না এবং বয়েসও অনেক হয়েছিল। আমার গানের পর তিনি যখন কানন যন্ত্রটি বাজালেন তখন প্রথমতঃ তারে ঘর্ষণ করে পুরিয়ার আলাপ এবং পরে কাটি দিয়ে গৎ বাজিয়ে শুনালেন। দুই বস্তুই খুব ভাল লেগেছিল। গৎ এর উপর নানান ছন্দের ও তালের ক্রিয়া খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। আমার গান শুনে তিনি খুব উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।

একদিন নসীপুরের মহারাজার ওখানে আমার গান হয়েছিল। মহারাজা কয়েকটি রাগ ফরমাস করে শুনে তারিফ্ করেছিলেন। তাঁর

দেওয়া মুদ্রা কয়টি ভালভাবেই আমাদের অঙ্কবৃদ্ধি করেছিল।

জিয়াগঞ্জে এঁদের বাড়ীতে থাকার সময় একটা বিষয়ে আমার খুবই উপকার হয়েছিল। এঁদের এক ভাগনের কাগজের দোকান ছিল। আমি ইংরাজী অক্ষরাদি লিখতে পারতাম না, পারবার জন্য আমার খুব ইচ্ছে আছে জেনে ইনি দু' তিন দিস্তে কাগজ এনে অক্ষরগুলোর ছোট বড় সব ভাল করে লিখে বললেন দেখে দেখে খুব মনযোগ দিয়ে লিখতে থাক। আমি তাঁর উপদেশ মত ধৈর্য্য সহকারে প্রত্যহ কুড়ি পাতা করে তাঁর লিখে দেওয়া অক্ষরের গঠনকে অনুসরণ করে লিখতে লাগলাম। আমার একাগ্রতা দেখে সকলে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। দিন সাতের মধ্যেই অক্ষরগুলো লেখার উপযোগী আয়ত্তে এসে গেল এবং ইংরেজীর সহজ কথাগুলোকেও লেখায় আনতে পারলাম। বর্দ্ধমানে থাকার প্রথম সময়েই রাজভাষা, ফার্ষ্ট বুক ও সেকেণ্ডবুক এই তিনটি বই পড়ে শেষ করেছিলাম, আর এগোতে পারার সুযোগ আসেনি।

এখানে দিন পনর থাকার পর আমরা গেলাম খাগড়া-বহরমপুরে। সেখানে সে সময়ের এক বিখ্যাত উকিল ব্রজভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। ইনি অতি মহৎব্যক্তি ও অন্নদাতা বলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অনেকগুলি গরীব বিদ্যার্থীদের আহার অবস্থান দিয়ে তাদের শিক্ষায় সাহায্য করতেন। এমন কি স্কুল-কলেজের বেতনও তিনি দিয়ে যেতেন।

সেদিন ব্রজভূষণবাবুর বাড়ীতে যখন উপস্থিত হলাম তখন তিনি নীচের বৈঠকখানাতেই ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে নিকটে এসে পরিচয় নিয়ে অতি সম্বর্দ্ধনা সহকারে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং আমাদের জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে দিলেন। আহারাদিরও সুবন্দবস্ত হয়ে গেল।

ইনি সংগীতেরও বিশেষ অনুরাগী বলে আগেই শুনেছিলাম। তাই আমার প্রতি তাঁর আদর বেশী করে অনুভূত হয়েছিল।

এখানে তখন দেশ বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের পরিচালিত সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কি এক গণ্ডগোল বেধে গিয়ে দলভাঙ্গা হয়ে গেছল। শুনতে পেলাম—ওই বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর সংগেই মনকসাকসির দরুণ অনেক ছাত্র শিক্ষা ছেড়ে চলে আসে। আমি যেতে—আমার পরিচয় পেয়ে এবং গান শুনে তাঁদের ওই ব্যাপারের প্রতিশোধ গ্রহণের একটা প্রবল আগ্রহ জেগে উঠে।

তাঁরা আমার গানের জন্ত খুব আড়ম্বরের সহিত বিপক্ষের সন্নিকটে আসর করতে লাগলেন এবং তাতে বহু শ্রোতা উপস্থিত হতেন।

এখানের দু' তিন জায়গায় আমি জ্বর অবস্থাতেও আসর চালিয়েছিলাম। তখন মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ার জ্বর হত। সেই সেই দিনে দুপুর হতে প্রবল কম্প দিয়ে জ্বর আসত, সে জ্বর ১০৩।৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠত। দাদু খুব চিন্তিত হয়ে বলতেন আজ আসর কর্ত্তৃপক্ষদের ভীষণ মুস্কিল হল, খুব অসুবিধায় তাঁদের পড়তে হবে। আমি বলতাম আসর পণ্ড হতে দেবো না, তাঁদের নিতে আসবার সময়ে আমি ঠিক উঠে পড়ব। ভগবানকে ডাকতাম জ্বরটা ছেড়ে যাবার জন্ত। সন্ধ্যার পর তাঁরা এসেছেন জানতে পেরে গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। জ্বর তখনও থাকত। এই রকম অবস্থায় আমাকে গাইতে যেতে হচ্ছে দেখে দাদুর মনে খুবই চিন্তা ও উদ্বেগ আসত। আমার কিন্তু জ্বর হয়েছে বলে গাইতে পারব না—এ মনেই হত না।

বেশ বড় বাটির একবাটি দুধ-সাগু খেয়ে নিয়ে বলতাম— চলুন। আহ্বায়করা আমার অবস্থা ঠিক ধরতে পারতেন না। আসরে গাইতে বসে প্রথমেই একটা তেলানা খুব দুনে গেয়ে নেবার পর বেশ ঘাম দিতো, তাতে শরীরটা অনেকখানি সুস্থ বোধ করতাম। তারপর খেয়াল ইত্যাদি গান ঘণ্টা দুই গেয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে দুধে খৈ মিশিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়তাম। তখনও শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক থাকত না।

ওখানে তখনকার বিখ্যাত উকিল ও জমিদার রায় বৈকুণ্ঠনাথ বাহাদুরের বাড়ীতে একদিন গান হয়েছিল। সেদিন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীও উপস্থিত ছিলেন। আমার গানের পর রায় বাহাদুরকে গিরিজাবাবু বলেছিলেন—"আমরা যখন চার বছর শিখে প্রথম পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন গোপেশ্বরবাবুর সংগে আজ প্রায় তিন বছর আগে এই ছেলে এসে অত বড় বড় গুণীদের সমক্ষে বিরাট আসরে আলাপ ধ্রুপদ গেয়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল—আমাদের মনে হয়েছিল এই ছেলেটির চেয়ে আমরা অনেক নীচে পড়ে আছি।" গিরিজাবাবুর মুখে এই মন্তব্য আর একবার শুনেছিলাম বালিগঞ্জের এক আসরে। সেখানে এ কথাও বলেছিলেন—বয়সে আমি সিনিয়র হলেও গানে সত্যকিঙ্করবাবু আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র।"

একদিন বৈকুণ্ঠবাবুর বড়ছেলে তাঁদের বজরায় করে আমাকে গঙ্গার

বেড়াতে নিয়ে গেছলেন। বজরার মধ্যে গানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বড়পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দীও তাঁদের বজরায় করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমাদের বজরার কাছে তাঁর বজরা নিকটবর্ত্তী হ'তেই শুনতে পাওয়া গেল গিরিজাবাবুর গান। আমারও তখন গান চলছে। তাঁদের কাছে আমার গানের সুর যেতেই, তাঁদের বজরা আমাদের বজরার সংগে লাগিয়ে সকলে উঠে এসে ভেতরে গানের আসরে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে আমার গান চলেছিল। মহারাজকুমারের এরকম ভাবে আগ্রহ করে গান শুনতে আসায় আমার খুবই ভাগ্য বলে মনে হয়েছিল।

খাগড়া-বহরমপুরে সে সময় গোঁসাইজীও ছিলেন। আমরা তাঁর সংগে দেখা করতে প্রায়ই যেতাম। একদিন বহরমপুরের কলেজ অধ্যাপকরা গানের আসর করেছিলেন—সেদিন গোঁসাইজীকেও (রাধিকাপ্রসাদ) তাঁরা সসম্মানে আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁরও গান হয়েছিল।

এখান হতে যেদিন আমরা দেশের দিকে যাত্রা করি সেদিন অনেকেই ষ্টেশনে এসেছিলেন, ব্রজভূষণবাবুও॥

(২৬)

ভ্রমণের আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা,—

দু'চার দিন বাড়ীতে থাকার পর মেজকাকার আহ্বান লিপি পেয়ে খুবই উৎফুল্ল মনে বর্দ্ধমানে এলাম। এবার গ্রীষ্মকালে ছুটী নিয়ে কাকা দেশে এলেন না। কয়েক মাস একাদিক্রমে আমার শিক্ষা চলতে লাগল। দাদুর চিঠিতে জরুরি আহ্বান পেয়ে ভাদ্রমাসের শেষাশেষি দেশে এলাম। ঠাকুরদা' জানালেন—এবার তুই তোর দাদাকে সংগে নিয়ে খুব দূর দেশে নয়—পঞ্চকোট, ঝরিয়া, কাতরাশ, গিধৌড়—এইসব রাজাদের ওখানে এবং কোলিয়ারীর কয়েক স্থানে ঘুরে আয়। সামনে ৺পূজা আসছে—অনেকগুলি টাকার দরকার; শরীর ভাল থাকলে আমিই যেতাম। তাছাড়া একক শক্তির পরীক্ষা করার আবশ্যক আছে, তাতে অনেক

অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং সাহস বাড়ে। আমি সংগে না থাকার দরুণ হয়ত অনেক অসুবিধায় কষ্ট আসতে পারে। তবে আমি জানি দুঃখ-কষ্ট এলে তার সম্মুখীন হয়ে মনের জোর কি রকম রাখতে হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তোর যথেষ্ট আছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমার ভরসা আছে বিদেশে পাঠাবার। এ কথা সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে—তাঁকে ধরে থাকলে কোন কষ্টই কষ্ট বলে মনে হবে না।"

দাদু আমাদের গমন যাত্রার শুভদিন দেখে দিলেন। যথাদিনে তানপুরা, পাখোওয়াজ (অগ্রজ বাজাতে পারতেন) এবং বাক্স বিছানাদি সংগে নিয়ে আঠার ও তের বছরের কিছু ঊর্দ্ধ বয়সের দুটি মানুষ বেরিয়ে পড়ল আশা-আকাজ্ক্ষা পুরণের কামনা নিয়ে কুলদেবতা ৺গোপীনাথকে ডেকে এবং গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে।

ঠাকুরদা'র করে দেওয়া ভ্রমণসূচী মত প্রথমে আমরা পঞ্চকোট (কাশীপুর) রাজধানীতে যাবার উদ্দেশ্যে ভোরের বেলায় আদ্রা ষ্টেশনে নামলাম—বিষ্ণুপুর হতে রাত ৩টার ট্রেনে চড়ে।

ওই ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গোগাড়ী করে আমরা উক্ত রাজধানীর দিকে যাত্রা করলাম। দুরত্ব ছ' সাত মাইলের মত। সেখানের ক্ষুদ্র শহরে বেলা ৮টা আন্দাজ পৌঁছে এক কলুর ছোট একখানি ঘর সদর রাস্তার উপরেই দিন চার আনা হিসেবে ভাড়া পেলাম। ঘরখানার মধ্যে দড়ির খাটিয়ায় বিছানা পেতে নিয়ে তার উপর বাক্স ও যন্ত্র দুটো রেখে তালা লাগিয়ে আমরা গেলাম পুকুরের সন্ধানে। স্নানাদি কাজ সেরে একটা দোকানে দু'পয়সার করে মিষ্টি খেয়ে পেটে একঘটি করে জল ঢেলে নেওয়া গেল। তারপর রাজবাড়ী অভিমুখে আমরা চললাম। সেখানে পৌঁছে রাজদর্শনের উপায় নিরাকরণের জন্য আমরা দিশাহারা হয়ে গেলাম। বেলা ১টা পর্য্যন্ত ঘুরাঘুরি করার পর একটি লোক দয়া করে বাতলে দিলে—ওইখানে ওই ঘরে যাও—রাজসেক্রেটারী বিভূতিবাবুর সংগে দেখা কর তাহলেই কাজ হবে। সেই ঘরের দরজার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় অপেক্ষা করার পর আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ দান করে জানালেন কি চাও? আমার অগ্রজ আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করাতে দয়া করে বিভূতিবাবু বললেন—আচ্ছা আমি মহারাজকে বোলবার চেষ্টা করব—তোমরা কাল এই সময় এসে খবর নিয়ে যাবে।" সেখান থেকে ফিরে আমাদের ডেরায় যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায়

দুটো। খিদের তখন পেটের নাড়ি-ভুড়িগুলো শুকোতে আরম্ভ করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এখানে ভাত বিক্রির কোন হোটেল নেই। গৃহমালিক বোলল— ঠাকুর বাড়ীতে এই সময় কাঙালীদের খাওয়ান হয়— তোমাদের কি করে বোলব সেখানে যেতে,—ময়রার দোকানে বোলেদি একুণি লুচি ভেজে দেবে।"

তাকে বোল্‌লাম রাত্রে লুচিই খেতে হবে—সুতরাং দু'বেলা লুচি খাবার মত পয়সায় কুলিয়ে উঠতে পারা যাবে না,—আমরা ঠাকুর বাড়ীতেই যাব, তুমি বাত্‌লে দাও কোন্ রাস্তা ধরে সেখানে পৌছব।

তখন খাঁটি ঘি' এর তৈরি লুচির সের ছিল চার আনা। আমাদের দু'জনের পেট ভরে খেতে গেলে আট আনা খরচ হয়ে যেত—এবং তার সংগে অন্ততঃ চার পয়সার আলুর তরকারী। হোটেলে পেট ভরে ভাত খাওয়ার তখন দাম ছিল প্রত্যেকের জন্য ছ' পয়সা করে,—তাতে থাকত ডাল, তরকারী ও মাছ।

আমরা যখন ঠাকুর বাড়ীতে পৌছলাম তখন কাঙালীরা মন্দির প্রাঙ্গণে খেতে বসে গেছে। রোয়াকের উপর কতকগুলো পলাশ পাতার তৈরি পাত্র ছিল তার থেকে দুটো তুলে নিয়ে আমরা কাঙালীদের এক পাশে বসে পড়লাম। পরিবেশকরা একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল মাত্র। তারপর পিণ্ড সদৃশ অন্ন পাতের উপর দিয়ে গেল। একটু পরে ডাল নামধারী হলুদ জল সদৃশ যে বস্তুটি ছিটিয়ে দিয়ে গেল তা তৎক্ষণাৎ পিচ্ছল অন্নের উপর পড়ে দ্রুতবেগে মৃত্তিকায় পতিত হল। আমরা তার আগেই খেতে আরম্ভ করে দিয়েছি--পাতের ধারে নুন দিয়ে খাওয়ার তাই দিয়ে। পরক্ষণে সেই ঘর্মাক্ত কলেবর বিপুল উদর বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি পাতের এক পাশে ছিটিয়ে দিয়ে গেল নানান আবর্জনা দিয়ে প্রস্তুত কুমড়োর ঘ্যাট। এখন সেই খাদ্যের বর্ণনা করছি বটে—তখন কিন্তু কোন সমালোচনা মনেই আসেনি—গোগ্রাসে তখন গিলে চলেছিলাম। ক্ষুধা যখন নিদারুণভাবে সর্বগ্রাসী রূপ ধরে আসে তখন খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচারই আসে না। সামনে যা কিছু খাদ্যরূপে আসে তাকেই গ্রাস করে নেয় তৃপ্তির সহিত।

যাই হোক্—সেদিন সেই অবস্থায় পড়ে যে এক অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তারও মুল্য যথেষ্ট আছে। কারণ কাঙালীদের সমপর্য্যায়ে এসে তাদের সংগে এক হয়ে একই পংক্তির মানুষ যে হতে পেরেছিলাম তাকে আমি ভগবানের অশেষ কৃপা বলেই মনে করি। তিনিই যেন দয়া করে

শিক্ষা দিয়েছিলেন দুখী মানুষদের অবস্থা উপলব্ধি করতে হলে এবং করার একান্ত প্রয়োজনীয়তায় তাদের সংগে একাত্ম হয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা পাওয়া চাই। তাছাড়া সেদিন আর একটা বড় জিনিস পেয়েছিলাম—তা হল স্বতন্ত্রবোধ নিয়ে অহমিকা থাকা যে কোন রকমেই উচিত নয় তার শিক্ষা।

তারপর সেদিন ভোজন সমাধা করে পাতাগুলো তুলে নিয়ে যথাস্থানে ফেলে দিয়ে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে ডেরায় এসে দরজা খুলতেই নজরে পড়্ল স্থানে স্থানে কয়েকটা বোলতার চাক্—তার উপর বোলতায় ভরে আছে এবং কয়েকটা উড়ছেও ঘরের মধ্যে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম—যদি সমবেতভাবে আক্রমণ করে তাহলে আর রক্ষা নেই, অনেকগুলো গর্ত্তও নজরে পড়ল, উপর দিকে তাকিয়ে দেখি খোড়োচালের বাতায় লেগে একটা গোখরো সাপের খোলোস সমস্ত অবয়বটা নিয়ে ঝুলছে। অন্য কোন জায়গায় থাকবার স্থান ছিল না যে সেখানে চলে যাব। তাছাড়া মাটির ঘরে এ রকম থাকেই,—বিশেষ করে অব্যবহার্য্য ঘরে। কি আর করা যাবে, ভগবানের উপর নির্ভর করে ওই ঘরেই আমরা দু'তিন দিন কাটালাম। অবশ্য ভয় সর্বদা হতই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ওরা কিছুমাত্র অনিষ্ট কোর্ল না। তাই মনে হয়েছিল আমাদের চেয়ে ওদের মায়া-মমতা বোধ হয় বেশী সত্য। স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও ভাল সুযোগ থাকলে এই সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ আসত না। অহিংস মানুষের উপরও মানুষ হিংস্র হয় আর এরা হিংস্র মানুষের উপরও হিংসা করে না। সেদিন সন্ধান পেয়ে সন্ধ্যার পর গেলাম মহারাজার গুণীযন্ত্রী বৃদ্ধ মহম্মদ খাঁ সাহেবের সুরবাহার শুনতে। অতি যত্ন সহকারে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ শুনালেন। ব্যবহারে আমাদের প্রতি অতি মধুরভাব প্রকাশ করেছিলেন।

রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী বিভূতীবাবুর ইচ্ছাকৃত কিনা জানি না রাজাবাহাদুরকে বলতে ভুলে যাওয়ার দরুণ তাঁর কাছ থেকে আরো দু'দিন ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। তৃতীয় দিনে অবশ্য বিশেষভাবেই আশা দিয়ে বললেন—কাল তোমাদের গানের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দিতে পারব বলে আশা রাখি।"

এই তিনদিনই অপরাহ্নে আহার করেছিলাম সেই ঠাকুর বাড়ীতে দরিদ্র-নারায়ণদের সংগে এক পংক্তিতে বসে। এ ছাড়া আর কোন

উপায় ছিল না। যে ছোট কুঠরীতে আমাদের থাকতে হয়েছিল—তারমধ্যে উনুন পেতে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। কাঙালীদের সংগে যুক্ত হয়ে ভোজনে বসতে মনের মধ্যে কোনরূপ মর্য্যাদা ও অশুচীভাবের প্রশ্নই উদয় হয়নি। বরং আকর্ষণই আসত। কারণ মন এ কথাই বলে আসছে—ওরাও মানুষ এবং আমরাও মানুষ, কোনদিক দিয়েই তফাৎ ভাবা উচিত নয়—তাছাড়া ওই রকম খাদ্যবস্তু ওরা যদি খেতে পারে—তাহলে আমরাই বা পারব না কেন? সময় ও অবস্থা বিশেষে খাদ্যের বিচারে যোগ্য অযোগ্য নিয়ে সমালোচনা চলে না, তখন, সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ মনে মানবতাকে ধরে বিচারে রাখতে হবে। সর্বদা এই কথাই মনে রাখি শ্রীবৎস রাজার, হরিশ্চন্দ্রের, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি মহান আদর্শ ব্যক্তিদের অবস্থা কি হয়েছিল!

চতুর্থদিনে বেলা ৮টার সময় অগ্রজ গেলেন বিভূতিবাবুর কাছে। আমি দরজা বন্ধ করে সাধতে লাগলাম। বেলা প্রায় ১২টার সময় অগ্রজ ফিরে এসে বোললেন—কিছুই হল না, বিভূতিবাবু নির্দ্ধারণ মত দান হিসেবে পাঁচটা টাকা দিতে চেয়েছিলেন—আমি নিইনি, তাঁকে জানিয়ে এলাম—রাজাবাহাদুরকে যখন গান শুনাবার সুযোগ পাওয়া গেল না তখন শুধু শুধু কাঙালী বিদায়ের মত এ দান গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করি। আপনি বরং আমাদের সাক্ষর নিজে করে রেখে দেবেন।"

আমি বোললাম—যা হোক্ দুটো মুড়িটুড়ি খেয়ে এক্ষণি এ জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়া যাক। গৃহমালিককে সমস্ত কথা জানাতে খুব কম ভাড়ায় তার নিজেরই গোগাড়ীতে যাবার ব্যবস্থা করে দিলে। আমরা বেলা ২টার সময় ওখান হতে দশ-এগার মাইল দূরে আদ্রা ষ্টেশনের উত্তরে রঘুনাথপুর নামক মহকুমা সহরের উদ্দেশে রওনা হলাম। চার দিনের ঘর ভাড়া দিতে যাওয়ায় গৃহমালিক কোন মতেই নিলে না—আমাদের আসা বৃথাই হল বলে—তাই অশিক্ষিত নিম্নজাতের মানুষটির দয়া-মায়া-ভর্ত্তি বিবেকে বাধ্‌ল॥

(২৭)

ওই ভ্রমণের পথে,—

ঠাকুরদার করে দেওয়া ভ্রমণ সূচী অনুযায়ী রঘুনাথপুরে যখন পৌছলাম

তখন প্রায় সন্ধ্যা হব হব। দাদুর নির্দেশ মত সেখানের এক অন্নদাতা উকিলের গৃহদ্বারে আমাদের গাড়ী পৌঁছতেই যিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোথা থেকে আসছ—? সেই তিনিই গৃহস্বামী উকিল মহাশয় বলে বুঝতে পারলাম—কাছের এক ব্যক্তির বলে দেওয়ায়। উকিল মহাশয়কে আমাদের পরিচয় ও আসার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা মাত্র তিনি খুসী মনে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর চাকরকে বলে দিলেন আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে জিনিসপত্রগুলো হাতে করে নিয়ে চাকরের দেখিয়ে দেওয়া ঘরে প্রবেশ করলাম।

অতিথিদের জন্য মাটির দেওয়ালে খড়ের ছাউনীযুক্ত সারি সারি তিন চারটে চালা ঘরের মত তার একটাতে আশ্রয় পেলাম। সংগের হেরিকেনটা জ্বেলে নিয়ে পড়ে থাকা একটা মুড়ো ঝাটাকে তুলে নিয়ে বেশ করে ঘরটা ঝেটিয়ে নিলাম। তারপর তাঁদের রাখা চাটাইএর উপর আমাদের শতরঞ্চি ও বিছানা পেতে পুকুরে গেলাম হাত মুখ ধুয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক সারতে। খিদের তখন মুখটুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল শরীরের কোথাও যেন রস নেই। ক্ষুধার যে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। এর অসহ্য যন্ত্রণায় দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খাদ্য পাওয়ার আকুল আশায় মাতা নিজের সন্তানকেও দেয় বিক্রি করে, নারীরা পারে দেহ পর্য্যন্ত দিতে,—(খাওয়ার কষ্টের সুযোগ নিয়ে অনেক নরপিশাচ তাদের এই পথে সহজে নিয়ে আসে) এর চরম অবস্থায় অভক্ষ বস্তু বলে কিছু থাকে না—অর্থাৎ এর দুঃসহ তাড়নায় ও আক্রমণে এমন কোন গর্হিত ও অন্যায় কাজ নেই—যা মানুষের তখন না পারা হয় না,—সবই সম্ভব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে প্রত্যেক দিন এই রকম নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কত মানুষ যে দিন কাটাচ্ছে তার খোঁজ কে রাখে? অথচ আমরা কত দিকে অপব্যয় ও অপচয় করে যাচ্ছি! আমি এই কথাই ভাবি আমরা যদি নিতান্ত প্রয়োজন মত সাধাসিধে ভাবে জীবনযাত্রা চালিয়ে অভাব গ্রস্তদের অভাব দূর করবার জন্য আগ্রহ রাখতাম তাহলে দারিদ্রতা কারোরি থাকত না।

তারপর সেদিন ক্ষুধার আক্রমণে নির্জীবের মত পড়ে থাকা অবস্থায় রাত যখন প্রায় এক প্রহর তখন সেই চাকরটি এসে জানাল খেতে যাবার জন্য। কথাটা শুনেই তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালাম—যেন মনে হল গায়ে জোর এসে গেছে। রান্নাঘরের রকে বসতেই পাতের উপর এসে পড়ল

বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট অন্ন পাতভর্ত্তি হয়ে। অন্নরাও যে আত্মকেন্দ্রিক হয় তার পরিচয় সেদিন বিশেষ করে পেয়েছিলাম। কারণ অন্নগুলির কারোর সংগেই কারোর মেলামেশার সম্ভাব ছিল না—প্রত্যেকেরই বলিষ্ঠ মেজাজ দেখেছিলাম। তাদের উপর তখন ডাল নামের যে বস্তুটি পড়েছিল সে অন্নগুলিকে চান করিয়ে দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ঠাকুরের নিক্ষিপ্ত কুমড়ো ও জোলোডাঁটার যুগলমোহনরূপ অন্নের পার্শ্বে চিতিয়ে পড়ল—হাত পা ছুড়ে। তারা যেন সদ্য লবণ সরোবরে জলকেলী করে এল।

এসব বাস্তব বর্ণনা পরে মনে উদয় হয়েছিল। এখন তার বর্ণনা দেওয়া শুধুমাত্র অবস্থার পরিচয় জানানর জন্যই।

পাতে ভাত পড়া মাত্র পরম তৃপ্তিকরে খেতে আরম্ভ করেছিলাম। বাল্যকাল হ'তে এই রকম সব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আসায় কেবল মনে হয় শিল্পীজীবনে আমার জন্যই প্রয়োজন ছিল তাই ভগবান দিয়ে এসেছেন।

যাইহোক্—এস্থলে একথা বোল্ব—যে সব দয়ালু-অতিথি বৎসল আদর্শ ব্যক্তিরা এরূপ অন্নদানরূপ মহাউপকারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তাঁরা যদি স্বচক্ষে একটু তত্ত্বাবধান করার আবশ্যক রাখতেন তাহলে পাচক ঠাকুরের হাত দিয়ে খাদ্যের চেহারা ও স্বাদ নিশ্চয়ই অনেকখানি ভাল হত। কারণ জানি বরাদ্দবস্তুর উপর তাদের হাত সাফাই যথেষ্ট থাকে এবং তার সংগে থাকে রান্নায় মমতাহীন অবজ্ঞা।

এই উকিল মহোদয় সেখানের যথেষ্ট উপার্জ্জনশীল আইন ব্যবসায়ী ছিলেন না, তত্রাচ আগন্তুকদের জন্য এরকমভাবে আহার বাসস্থান দিয়ে উপকার করা কি কম মহত্ব ও মানবপ্রীতি? এরকম মানবদরদী মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

সেদিন সেই রাত্রে খাওয়ার চাপটা খালিপেটে বেশী হয়ে যাওয়ায় রাত্রে ঘুম ভালই হয়েছিল। পরের দিন একটু বেলাতে সেই চাকরটি সালপাতায় করে মুড়ি-ছোলাভিজে, নুন-লঙ্কা ও গুড় দিয়ে গেল সকালের প্রাতঃরাশ জন্য। সেগুলি খেয়ে নিয়ে একটু পরে কাছারী বসবার সময় বুঝে গেলাম সেখানে। বার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করে আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানাতে একজন আইন-ব্যবসায়ী বেশ আগ্রহের সহিত আমাদের সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়ে বললেন—'সংগীত অনুরাগীদের আহ্বান করে আজ আমার ওখানে সন্ধ্যার পর তোমাদের গান শুনার আসর করব,—

যথাসময়ে লোক গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবে। অবশেষে তিনি বললেন—আমি এক সময় খোজার কথক বংশের এক গায়কের কাছে কিছুদিন ধ্রুপদ শিখেছিলাম।"

আমরা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসে সেইরূপ আহার সেরে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

যথাসময়ে দু'টি লোক এল আমাদের নিয়ে যেতে। তাঁরা গৃহমালিককে জানিয়ে দিলেন আমাদের আহারাদি সেখানে হবে। সংগের লোক দু'জন পাখোওয়াজ ও তানপুরাটা নিলেন। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে যখন পৌঁছলাম তখন বৈঠকখানার লোকে ভরে গেছে। প্রথমতঃ অগ্রজের পাখোওয়াজ সংগতের সংগে আমার ধ্রুপদ গাওয়া হ'ল। তারপর হল খেয়াল, টপ্পা ও ভজন গান। পশ্চাতে রাখা একটি পাত্রের উপর শ্রোতারা কিছু কিছু করে দিয়ে গেলেন। উকিল মহাশয় বেশ যত্নসহকারে খাইয়ে—পাত্রেরগুলি তুলে নিয়ে গুণে দেখে নিজ হ'তে দশ টাকা দিয়ে কুড়ি টাকা—ক' আনা অগ্রজের হাতে দিলেন। এখনকার টাকার মূল্যে দু'শর উপর। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে খুব খুসী মনে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথাস্থানে চলে এলাম।

পরের দিন সকালে একটা মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে গৃহমালিক উকিল মহোদয়ের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিনীত নমস্কার জানিয়ে সেখান হতে রওনা হলাম চার মাইল দূরবর্ত্তী আদ্রা ষ্টেশনের দিকে। পাখোওয়াজটা আমি নিলাম কাঁধে করে, তানপুরাটা নিলেন অগ্রজ॥

(২৮)

ভ্রমণের তৃতীয় পর্য্যায়-

আদ্রা হতে ভাগা ষ্টেশন যাবার ট্রেন ধরে আমরা সেখানে নেমে লয়াবাদ কলিয়ারীতে গেলাম। কোলিয়ারীর ম্যানেজারকে দাদুর পত্রখানি দিতে তিনি আমাদের থাকা ইত্যাদির সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে এবং আরো দু' একটি কোলিয়ারীতে গান হ'ল তবে অর্থের দিকটা না হওয়ার মতই। ওখান হতে আমরা এলাম ঝরিয়ার এক কোলিয়ারীর

মালিকের গৃহে। ইনি এক সময় বাঁকুড়ায় আমার গান শুনে খুব আনন্দিত হয়ে তাঁর ওখানে আসবার জন্ম বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন গেলে আমি ভালভাবে অর্থ পাইয়ে দেবো।

ভদ্রলোক আমাদের চিনতে পেরে আগ্রহভরেই গ্রহণ করলেন। তাঁর আগের প্রতিশ্রুতি, আহ্বানজ্ঞাপন এবং উপস্থিত হওয়ার পর আগ্রহের সহিত গ্রহণ—এ সবই যে নকল ও অভিনয় তা বুঝতে দেরি হল না। দেখে আসছি এমন সব মানুষ আছে যারা বাহ্যিক ব্যবহারে মানুষকে মুগ্ধ করে ফেলে। এদের বাক্যে যে মাধুর্য্য ও ছদ্ম অভিনয় থাকে তা খাঁটি সত্যকেও হার মানিয়ে দেয়। জগতে সবচেয়ে শক্ত বলে যদি কোন বস্তু থাকে তা'হল মুখোসপরা মানুষকে চিনতে পারা। বিশেষ করে সরল-উদার ও বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব, অভিনয়কারী এই সব জীবদের কাছে তাদের বার বার ঠকেই যেতে হয়।

তারপর আমাদের সেই তিনি থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন কর্মচারীদের থাকার খোলার ঘরের একপ্রান্তে মেঝের উপর। এই প্রভুর এখানে খাওয়া-দাওয়ার নিয়মে বিশেষ ব্যক্তিদের এবং সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবধান রেখে যে তারতম্যের উপর নিয়ম ধার্য্য ছিল তার দ্বিতীয়টির নির্ঘণ্টের উপর আমাদের জন্ম খাওয়ানর মর্য্যাদা নিরূপিত হয়েছিল। চার পাঁচ দিন আমাদের এমনিভাবেই কেটে গেল। মালিক প্রভু আমাদের উপর নির্বিকল্প সমাধির মত হয়ে রইলেন। তবে প্রত্যেক দিন রাত ন'টার সময় ডেকে পাঠিয়ে ১১টা পর্য্যন্ত গান শুনতেন কৃপা করে দু'বেলা খেতে দেওয়ার জন্মই। গান শেষ হলে পর রাত ১১টায় ঠাণ্ডা ভাতগুলো গলধঃকরণ করে তারপর নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় পেতাম।

মালিকপ্রভুর অনেকগুলো বৃহদাকারের মহিষ ছিল। তারা দিত কম বেশী ধরে প্রত্যহ প্রায় মণখানেক করে দুধ। এক পুংক্তিতে খেতে বসে দেখতাম উপর স্তরের পাঁচ-ছ'জন ভদ্রদের জন্ম ঠাকুররা তাঁদের থালার পাশে রেখে দিয়ে যেত খুব বড় বাটিতে সরভর্ত্তি দুধ আর আমাদের সকলকে দিত ভাতের উপরে ঘোল। আমার তখন মনে হত বিবেকসম্পন্ন মালিকের মাথায় ঢেলে দিয়ে আসি। সাধারণ কর্মচারীরা যখন নির্বিবাদে এরকম অসম্মান মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তখন আমাদের মত অনাহূত ও আশাপ্রার্থীদের কোন ক্ষোভ তো আনাই চলে না।

এক সাথে খাবার ব্যবস্থা রেখে পরিবেশনের তারতম্য রাখা শুধু

নির্মমতাই নয়—চরম অমানুষিকতাও। যারা এক সাথে খেতে বসে মাছের বড় চাকা মুড়ো এবং সরভর্ত্তি দুধ মুখে চালাতে পারে তারাও মানুষের পর্য্যায়ে আসে না।

এখানে চার-পাঁচ দিন ধরে দু'বেলা স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের কাছে যাতায়াত করে গান শুনানর কোন সম্ভাবনা না পেয়ে মনটা মুসড়ে গেছল এবং সবচে' বেশী কষ্ট লাগত যাচ্ঞার বিড়ম্বনার বেদনা। পঞ্চম দিনে এই-ভাবে চেষ্টায় ঘুরে এসে বেলা ১১টার সময় যখন থাকার স্থানে ফিরে এলাম তখন দেখি একটি ভদ্রলোক আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জমিয়ে বললেন,—ধানবাদের মাইল পাঁচ-ছয় উত্তরে এক জমিদার আছেন, তিনি প্রায়ই গায়ক-বাদকদের আনিয়ে গান-বাজনা শুনেন এবং যথাযথভাবে তাঁদের সম্মান রাখেন অর্থাদি দিয়ে। এমনিভাবে কোন গাইয়ে-বাজিয়ে গেলেও তিনি আগ্রহের সহিত সংগীত শ্রবণ করে' অর্থ প্রদান করেন। টাকার অংক বেশ ভাল রকম থাকে,— তোমরা যদি যেতে চাও তাহলে আমি সংগে করে নিয়ে যেতে পারি।"

আমরা খুব উল্লসিত হয়ে বললাম—নিশ্চয়ই যাব।

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে তোমরা প্রস্তুত থেকো আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব।

তিনি চলে যেতে মনে মনে করলাম ভদ্রলোকটি সত্যই খুব উপকারী ও মানব দরদী।

তিনি যথাসময়ে এলেন। আমরা গামছায় বেঁধে দুখানা কাপড় ও তানপুরাটা হাতে নিয়ে তাঁর সংগে বেরিয়ে পড়লাম।

ঝরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছতেই ভদ্রলোক বললেন—ট্রেণ ছাড়তে আর দেরি নেই পয়সা দাও টিকিট কেটে আনি।

ভাঙ্গান ছিল না—তাই দশ টাকার নোটটি তাঁকে দেওয়া হল। কয়েকদিন আগে বাড়ীতে দশ টাকা মণিঅর্ডারে পাঠান হয়েছিল। ভদ্রলোক তিনখানা টিকিটের ছ' পয়সা করে মূল্য দিয়ে বাকী টাকা ও পয়সা নিজের কাছেই রেখে দিয়ে বললেন আমার কাছে নিরাপদে থাকবে। আমরাও নিরাপদ মনে করলাম। ধানবাদ ষ্টেশনে নেমে উত্তর দিকে অনেকখানি হাঁটার পর সংগের তিনি বললেন,—তোমরা এই গাছতলায় একটু অপেক্ষা কর—সামনের এই গ্রামে গরুরগাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়— এক্ষণি একটা গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে আসছি। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে

অল্প রাত হয়েছে। আমরা বসে আছি তো আছিই,—ভদ্রলোকের পাত্তাই নেই। তখন তাঁর চরিত্রের স্বরূপ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ক্রমশঃ রাত গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, লোকজনের যাতায়াত নেই, মেঘ ডাকার সংগে বৃষ্টিও তখন ফোঁটা ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। আমরা কোথায় কোন দিকে গেলে ষ্টেশন পাব তার রাস্তা কিছুই জানা নেই, সন্ধ্যার আবছায়া আলোকে মাঠের রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম। ক্রমশই ঘোর অন্ধকারে, ঝিঁঝিঁপোকা ও ব্যাঙ এর ডাকে চতুর্দিক ভরে গেল। ভীষণ ভয় হ'তে লাগল। ভূত ও সাপের ভয় তখন আতঙ্কের সৃষ্টি করতে লাগল। মনে হচ্ছিল গাছের উপর থেকে যদি সেই তিনি ঠাণ্ডা হাড়ের হাত দিয়ে গলা চেপে ধরেন তাহলে কি করব! এই রকম সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে পড়ে রাত বেড়েই চলতে লাগল। আমাদের কোন আর উপায় ছিল না গাছতলাতেই রাত কাটান ছাড়া। মনে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে করতে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। রাত বোধ হয় অর্ধেকটার সময়—কানে এল কে যেন গান গেয়ে এদিকেই আসছে। তখন পরিত্রাণের খানিকটা উপায় হবে বলে মনে এল। যখন সেই লোকটি আমাদের প্রায় কাছাকাছি এসে গেল তখন আমি আন্দাজে ছুটে তার কাছে গেলাম। সে আমাকে বিদ্যুতের আলোতে দেখে বয়েস বুঝতে পেরে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—কে তুমি! এত ছেলেমানুষ এত রাত্তে এখানে একা কেন? আমি সমস্ত কথা তাকে বললাম, অগ্রজও তখন তার কাছে এসে গেছেন।

লোকটি গভীর এক বেদনার নিঃশ্বাস ফেলে কাপড়ের খুঁটে অশ্রুসজল চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলল—আমি জাতে অতি নিকিষ্ট-বাউরী, কুটুম বাড়ী হতে ফিরছি, বাড়ী আমার এঁখান থেকে অনেক দুর। যাই হোক তোমাদের ফেলে আমি যাব না, তোমাদের ভদ্দ মানুষদের এ-কি কাণ্ড! দু'টা ছেল্যামানুষকে কি করে এ রকম বিপদে ফেল্ল? ভগবান আছেন এ কথা কি জানেক নাই? যাক্‌গে তোমরা এক কাজ কর—আমার সংগে চল,—নিকটেই বাঙালীবাবুদের পাড়া আছে—দেখি কোন বাড়ীতে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায় কি-না।" তার দয়ার কথা শুনে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাছ তলার কাছে গিয়ে তানপুরাটা তুলে নিলাম। লোকটি বল্ল—ওটা নামিয়ে দাও—তুমাকে ছুঁব নাই—আমি ওটা কাঁধে করে নিয়ে যাই।" আমি অতি শ্রদ্ধার সহিত তার হাত দুটি

স্পর্শ করে তানপুরাটি তুলে দিলাম। তখন মনে হয়েছিল আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য সেই বিপদভঞ্জনই বোধ হয় একে পাঠিয়েছেন। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে ধরেই আমাদের হাঁটতে হচ্ছিল অতি সন্তর্পণে। কতকটা হাঁটার পর ভাল রাস্তা পেলাম এবং দু'পাশে বাড়ী দেখে মনে হল এটাই তাহলে বাঙালী পাড়া। লোকটি অনেকগুলি দরজায় করাঘাত করল কিন্তু কোন সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না,—দুর্য্যোগ-পূর্ণ রাত্রি বলেই বোধ হয়। শেষে হরিজন লোকটি বলল—আর ডাকা-ডাকি করে কাজ নাই—চল শেষের একটা বাড়ী অনেক দিন ধরে পড়ে আছে—লোক জন কেউ নাই—সেই বাড়ীর বারাণ্ডায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিবে।" সেই বাড়ীতে পৌঁছে ভাঙ্গা গেট দিয়ে ঢুকে আমরা বারাণ্ডার উপরে উঠলাম। কাপড় জামা আগেই ভিজে গেছল। লোকটিকে বল্লাম— কি করে এই রকম ফাঁকা বাড়ীতে অন্ধকারে আমরা থাকব? সে বলল— যতক্ষণ না সকাল হচ্ছে ততক্ষণ তোমাদের ফেল্যে কি করে যেতে পারি— অধর্ম্ম ও পাপ হবে না? তোমরা একটু অপেক্ষা কর চেষ্টা করে দেখি পাতবার কিছু পাই কি-না। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিয়ে এল আটি কতক খড়। বল্ল তোমাদের একা রেখে তাড়াতাড়িতে পাতবার মত কিছু জোগাড় করেতে লাল্লম, নিকটের এক গোওয়াল ঘর থেকে এইগুলো লিয়ে এলাম। তারপর লোকটি একটা খড়ের আটি নিয়ে স্থানটা বেশ করে ঝেটিয়ে খড়গুলো বেশ করে বিছিয়ে দিয়ে বল্ল—এতে কাপড় পেতে শুয়ে পড়বে। সেই নরদেবতাটি খড়গুলো আনবার সময় পাশের ক্ষেত থেকে কয়েকটা ভুট্টা তুলে এনেছিল। সেগুলো একটা খড়ের আটিতে তার কাছের দিয়েসেলাই জেলে ঝল্‌সিয়ে আমাদের খেতে দিলে। খিদেরও যে আক্রমণ খুব চলেছিল তা মনের ভাবনা দূর হতে বেশ উপলব্ধি হচ্ছিল। আমরা পরম উপাদেয় বস্তুরূপে সেগুলির সদ্ব্যবহার করলাম কিন্তু পিপাসা তখন খুবই বেড়ে গেছল কিন্তু জল পাবার উপায় কিছুই ছিল না। বৃষ্টিও তখন থেমে গেছে,—মনে হচ্ছিল যদি খুব ঘাম ঝরত তাহলে জিভ্ আপনা হতেই প্রবল আকর্ষণে লেহন করত। কত সময় পিপাসায় নোংরা জল লোককে খেতে দেখে গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠত, —সেদিন ভাল করে বুঝেছিলাম কেন তারা খায়।

সেই পরম লোকটি সটান শুয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ নাক ডাকতে সুরু করে দিলে। চিন্তাহীন কর্মক্লান্ত মানুষদের নিদ্রাদেবী অতি শীঘ্রই কোলে

ধারণ করেন। আমাদের একটুও ঘুম এল না। মনে হচ্ছিল কখন ভোর হয়। রাত যেন আর শেষ হতে চায় না। ওঠা, বসা ও শোওয়া এই করতে করতে পূর্বাকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। লোকটি তখন উঠে বসেছে। কি রকম সুন্দর নিয়মের উপর ওদের অভ্যাস। এখন দেখছি সভ্য সমাজের ছেলে-ছোকরাদের এমনিতেই বেলায় ঘুম ভাঙ্গে তার উপর যদি বেশী রাতে শোওয়া হয় তাহলে তো কথাই নেই। সময়ের অপব্যয় যেন স্বচ্ছন্দে করতে পারলেই হ'চ্ছে।

আমরা ষ্টেশনের দিকে যাবার জন্ম অগ্রসর হলাম। বিপদের বন্ধুটি বল্‌ল—চল তোমাদের ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার কাছে আনা দুই পয়সা আছে রেখে দাও কিছু কিনে খাবে।" এই কথা শুনে চোখে জল ধরে রাখতে পারিনি, খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে পেলাম যেন স্নেহ-মায়া-মমতার এক প্রতিমূর্ত্তি। এত যে দুঃখকষ্ট তা মুহূর্তে যেন ভুলিয়ে দিলে। তার হাত দুটি ধরে বলেছিলাম,—তোমার এই অপূর্ব স্নেহের দান গ্রহণ করে আমি তোমাকেই অর্পণ করছি। আর আশীর্ব্বাদ চাই যেন এই রকম হৃদয় গড়ে উঠে। একথা শুনে সে গড় হয়ে প্রণাম করে বলেছিল—অমন কথা মুখে আনবেন না—ভীষণ অপরাধ হবেক, আপনারা ব্রাহ্মণ—আমাদের দেবতা আর আমরা অতি অধম—নীচজাত—আপনাদের পায়ের তলারও যোগ্য লই।" এদের কে বুঝাবে তাদের উত্তম, অধমের বিচার হয় জাত নিয়ে নয়, হয় দয়া-মায়া ও মনুষ্যত্বের উপরই।

বাবুপাড়ার রাস্তা ধরে চলতে চলতে দেখতে পেলাম দরজার সামনে এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে একদৃষ্টে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। নিকটবর্ত্তী হতেই তিনি দ্রুতপদে নেমে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের কাছে অবস্থার সমস্ত বর্ণনা শুনে অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে দুই বাহুর দ্বারা আমাদের জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন—এবেলা এখানে স্নান ও আহারাদি করে তবে তোমরা যেতে পাবে।" সংগের সেই নরদেবতাটি বলল—খোকাবাবুরা তাহলে আমি যাই,—তোমরা যা কষ্ট পেয়েছ তারজন্ম চিরকাল আমার বুকে বাজবে, আর কি বল্‌ব—ভগবান সর্ব্বদা যেন তোমাদের ভাল করেন।" এই কথাগুলি বলে ছল্‌ ছল্‌ নেত্রে আর একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেল। যতক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম ততক্ষণ সাশ্রুনয়নে তার

দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন একটি দেবদূত চলে গেল চিরতরের জন্য—তার মহৎ অন্তঃকরণের ছবি অন্তরে এঁকে দিয়ে। বহুকে ভুলা যাবে কিন্তু তাকে কোনদিনই ভুলতে পারব না। সেদিন বিশেষ করে মনে হয়েছিল—হৃদয়ে যাদের দয়া-ধর্ম ও কর্তব্যবোধ থাকে সেখানেই ভগবান বিরাজ করেন। লোভ, স্বার্থচিন্তা ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে যারা ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তাদের মত পাষণ্ড আর কেউ নেই।

আমরা সকালের কাজ সেরে স্নান করে বৈঠকখানায় বসা মাত্র ঠাকুর দুটো হাতে থালাভর্ত্তি লুচি, হালুয়া এবং আলুর দম্ এনে সামনে ধরে দিয়ে বল্‌ল আপনারা একটু জলযোগ করুন,— বাবু বাজারে গেছেন এক্ষণি আসবেন। অনেক দিনের পর এ রকম খাদ্য পেয়ে মনে হতে লাগল যেন হঠাৎ খুব একটা উন্নত পরিবর্ত্তন ঘটে গেল।

একটু পরে গৃহস্বামী এসে জিজ্ঞেস করলেন জল খাওয়ার কথা। কাছে বসে এ কথা সে কথার পর একটু ইতস্ততঃ করে বললেন – তোমাদের কাল থেকে অসম্ভব কষ্ট গেছে এবং শরীরও নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত—তা নাহলে একটু গান শুনবার ইচ্ছে ছিল।"

আমরা বল্‌লাম—আপনার স্নেহাদরে ও প্রচুর পরিমাণে জলযোগ করে আমাদের শরীর মন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে,—আপনাকে গান এক্ষণি শুনাচ্ছি। তানপুরাটায় সুর বেঁধে শুনালাম একটি ভজন ও দু'টি শ্যামা-সংগীত। শুনে বললেন—এখানে আসর করতে পারলে খুব ভাল হত—সকলে শুনে খুব তারিফ্ করতেন কিন্তু আমাদের পাড়ার একজন অতি প্রিয়জন হঠাৎ মারা যাওয়ায় সকলেই খুব মর্মাহত।

দুপুরে নানাবিধ ব্যাঞ্জন ও মাছের কালিয়া দিয়ে অন্ন আহার করলাম পরম তৃপ্তির সহিত, এক বাটি করে শরভর্ত্তি দুধও ছিল। এ রকম খাদ্যের কথা যেন ভুলেই গেছলাম।

বিকেলে গৃহস্বামী মহোদয় আমাদের সংগে ষ্টেশনে গিয়ে নিজে টিকিট কেটে, তার সংগে পাঁচটি টাকা অগ্রজের হাতে দিয়ে বললেন - খুব সাবধানে থাকবে—বিশেষতঃ টাকা পয়সার ব্যাপারে। তাঁকে আমরা মাথা নুইয়ে নমস্কার করে গাড়িতে উঠলাম। ট্রেন চলতে আরম্ভ করতেই তাঁর দিকে সজলচোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম— যতক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন পরমাত্মীয়ের মত এক ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

এই বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তা খুবই মূল্যবান, শিক্ষিত-সভ্য-ভদ্র এবং অশিক্ষিত অবহেলিত ও নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে যাদের দয়া-মায়া কর্তব্য ও ধর্মবোধ আছে সেখানে উচ্চ ও নিম্নের কোন তফাৎ নেই, সত্যের ও মানবতার মহিমায় উভয়ই সমুজ্জল ও শ্রেষ্ঠ।

(২৯)

অবশেষে সুযোগের সন্ধান,—

ঝরিয়ায় সেই কোলিয়ারীর মালিকের ওখানে থাকার আস্তাবলে আমরা যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের অর্থের সম্বল তখন রইল সেই মহৎ ব্যক্তির দেওয়া পাঁচটি টাকা এবং গোটা-কয়েক পয়সা। আশ্রয়দাতা সেই মালিকপ্রভু আমাদের ডেকে এনে বললেন—কাল কোথায় গেছলে? জানালাম ধানবাদে। বল্লেন—রাত্রে গান শুনাবে। আচ্ছা বলে চলে এলাম।

পরের দিন সকালে বাজারের দিকে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হয়ে যাওয়ায়—তিনি জানালেন—ওমুক কোলিয়ারীর মালিক দেশ থেকে কাল ফিরেছেন,—ভদ্রলোকের শাস্ত্রীয় গান-বাজনা শুনার খুব আগ্রহ আছে,—একটু গাইতেও পারেন. তোমরা যদি তাঁর সংগে দেখা কর তাহলে মনে হয় তোমাদের নিরাশ হতে হবে না। আমরা সেই স্থানের সঠিক নিদর্শন জেনে নিয়ে গেলাম সেখানে। সৌভাগ্যবশতঃ সেই মালিকের সংগে খুব সহজেই সাক্ষাৎ হল। তিনি সমস্ত পরিচয় নিয়ে বললেন—আজ রাত্রে তোমাদের গানের আসর করব—তোমরা সন্ধ্যার পর এসো। আমরা হৃষ্ট মনে ফিরে এলাম। সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হলাম। সেই কোলিয়ারীর মালিক বললেন—আমি ধারে পাশের সমস্ত কোলিয়ারীর মালিকদের নিমন্ত্রণ করেছি তাঁরা এলেই গান আরম্ভ হবে। একটু পরেই আগন্তুকে হল ঘর ভরে গেল। দু' ঘণ্টা ধরে আমার গান চল্‌ল। গান শুনে সকলেই খুব উৎসাহ প্রদান করলেন। রাত্রে ওখানেই বেশ যত্নের সহিত কর্মচারীরা খাওয়ালেন। এঁরাও গান শুনে বেশ আনন্দ পেয়েছেন সে কথা জানালেন। মালিকের কথামত খাওয়া সেরে তাঁর

সংগে দেখা করলাম। তিনি জানালেন—গান শুনে আমরা সকলেই খুব খুসী হয়েছি। যাঁরা এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের ওখানে এক একদিন করে তোমাদের গানের আসর হবে। এখানের যে কোন কোলিয়ারীতে কোন কিছু অনুষ্ঠান হলে অন্য কোলিয়ারীর মালিকরাও তাঁদের প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা রক্ষায় সেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন তবে টাকার অংক একই থাকে সমভাব রাখবার জন্য।" এই বলে অগ্রজের হাতে দশটি টাকা দিলেন। এবং শেষে জানালেন—তোমরা যেখানে আছ সেখানের মালিকটি কি রকম ধরণের তা আমার বেশ জানা আছে, জানি না তোমরা কি রকম ব্যবহার পাচ্ছ—যদি সমাদর না পেয়ে থাক বা মানসিক দুঃখ থাকে তাহলে আমার এখানে চলে আসবে—থাকা খাওয়ার অসুবিধে হবে না মনে করি।" আমরা জানালাম কালই সকালে এখানে চলে আসব।

তারপর থেকে কয়েকদিন ধরে নানান কোলিয়ারীতে গান হল। গোটা পঞ্চাশ টাকা দাদুর নামে মণিঅর্ডার করে পাঠান হল।

এই মালিকেরই প্রচেষ্টায় ঝরিয়ার রাজাকে গান শুনানর সুযোগ ঘটে গেছল। রাজদরবারে গানের দিনে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তারিফ পেয়েছিলাম প্রচুর কিন্তু আসলের সময় তারিফের তুলনায় অতি অল্প।

সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের শুধুমাত্র তারিফ লাভ হলে মনের অবস্থা কিরূপ হয় তার একটি ঘটনার কথা বলছি—এক সময় দু'জন মুসলমান ধ্রুপদী-গায়ক আসেন বর্দ্ধমানে। সে সময় মহারাজাধিরাজ ছিলেন না। স্থানীয় দু'একজনের প্রচেষ্টায় তাঁদের গানের আসর হয় চকের মধ্যস্থলে। শ্রোতারা কিছু কিছু করে দেবেন এই আশায় খাঁ সাহেবদের সামনে একটি পাত্র রাখা ছিল। তাঁরা গেয়েই চলেছেন,—মুহুর্মুহু বাহাবা বহুৎ আচ্ছা ধ্বনি উদ্গিরণ হচ্ছে— অথচ পাত্রে কিছুই পড়ছে না। শেষকালে খাঁ সাহেবরা বড় আকারের রুমাল খুলে তাতে গেঁট বেঁধে উঠে পড়েন। তখন সকলে বলেন—এটার অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। খাঁ সাহেবরা বোললেন—পাত্রে কিছু পড়ার আশাতে এত দীর্ঘ সময় গেয়েও যখন বুঝলাম বাহাবা ছাড়া আর কিছু পড়বে না তখন ওই গুলোই রুমালে বেঁধে নিয়ে চললাম—খুলে খুলে অনেক দিন খেয়ে বাঁচব। শুধু 'বাহবা' ইত্যাদি প্রসংশার বাক্য নিয়ে যে পেট ভরে না সেই অতি সত্য কথাই তাঁরা

জানিয়েছিলেন।

যাইহোক্—সেদিন ঝরিয়ার রাজাকে গান শুনানর পর রাজ-সেক্রেটারী জানালেন—পরের দিন খাজাঞ্চিবাবুর কাছে যেতে। আমরা নির্দিষ্ট নিদর্শন মত তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। তিনি যা দিলেন তা না নিলেই ভাল হত কিন্তু ভেতরের ব্যাপার অন্যের কাছ থেকে যতটুকু শুনেছিলাম তাতে টাকা না নেওয়ার কথা রাজার কাণে যাবে না—নকল সই হয়ে নকলদাতার পকেটে চলে যাবে। সুতরাং সেই ব্যক্তির মহাপাতকের অপরাধ আমাদের দ্বারা হতে দিলাম না। সই করে যা পেলাম তাই নিয়ে চলে এলাম।

ঝরিয়া ত্যাগ করে আমরা গেলাম কাতরাশ রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে। ধানবাদ থেকে দূরত্ব বেশী কিছু নয়। রাজবাড়ীর ফটক পেরিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম রাজাসাহেবের দর্শন কি করে পাওয়া যাবে? লোকটি ছোট্ট করে আঙ্গুল দেখিয়ে জানিয়ে দিলো ওই বসে আছেন বারাণ্ডার চেয়ারে।

দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে তিনিই রাজা। বরং মনে হয়েছিল সাদা পাঞ্জাবী পরে একজন সাওতাল বসে আছে।

ঝরিয়ার রাজাকেও দেখেছিলাম ওই এক ধরণেরই চেহারার মত। এঁরা জাতিতে কোল বলে শুনেছিলাম-তাই এঁদের গোষ্ঠীর চেহারা সাওতালদেরই মত। কোল জাতিদেরই এঁদের পূর্ব পুরুষ রাজা বিশেষ ছিলেন। তারপর এঁদের এলাকাভুক্ত জায়গায় কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বাৎসরিক আয়ের অংক দারুণভাবে বেড়ে যায়। সেই থেকে বর্ত্তমানের সভ্যতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটতে থাকে। শুনেছিলাম সংগীতের উপর এই আগ্রহ এনে দিয়েছিল খোজার কথক ঘরাণা বংশ।

এই রাজাদের কথাবার্ত্তায় যে Tone থাকে তাতে সাওতালদের কথা বলার ধরণের মত চন্দ্র বিন্দুর আধিক্য নিয়ে। এই সব অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যেও তাদের নিজেদের মাতৃভাষার বাংলাতেও ওই রকম Tone থাকে।

আমরা রাজাসাহেবের কাছ বরাবর গিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়াতেই তিনি নিকটস্থ চেয়ারে বসতে বলে আমাদের সবিশেষ পরিচয় নিলেন। তারপর আমাদের আসার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে খুব খুসী হলেন। চাকরকে ডেকে বলে দিলেন— থাকার ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে এবং

জলখাবারের ব্যবস্থা ও ঠাকুর বাড়ীতে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার কথা। পরে আমাদের বললেন—আজ সন্ধ্যার পর গান শুনব। আমরা পুনরাভিবাদন জানিয়ে চাকরের সংগে চলে এলাম। রাজাসাহেবের সৌজন্য প্রকাশ আমাদের অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। যেমনি সাধাসিদে ধরণ তেমনি মনও ছিল তাঁর সাধাসিদে।

আমরা স্নানাদি সেরে বেশ বড় বড় চারটে মেঠাই ও গজা খেয়ে ভালভাবে জলযোগ করলাম। দুপুরে কুলদেবতার প্রসাদ সুন্দর আতপ চালের অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং এক বাটি করে পায়েস পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলাম।

আমরা আগে থাকতেই শুনেছিলাম খোজার কথক বংশের একজন গায়ক এই রাজার শিক্ষক ও গায়করূপে আছেন। ইনি কোন গায়ক-বাদক এলে তাকে কুটতর্কে ও প্রশ্নে অপদস্থ করার প্রয়াস নেন। অর্থাৎ তাঁর চেয়ে কেউ বড় আছে এটা না জানাবার জন্যই এই মতলব এঁটে থাকেন—রাজার কাছে নিজের প্রতিষ্ঠাকে উচ্চে রাখবার জন্য।

এই সব কথা শুনে, থাকলেও আমার মনে ভয়ভাব আসেনি। কারণ প্রশ্ন আমার কাছে খুব ভাল লাগে। রাত্রে গান শুনাতে বসলাম। ইমন রাগের আলাপ করে দু'খানি ধ্রুপদ শেষ করেছি তখন রাজাসাহেবের খুব ভাল লাগছে দেখে সেই রাজগায়ক বললেন,— আচ্ছা তুমি এইভাবে গাও তো দেখি! আমি তানপুরার 'সা' সুরটা একবার বাজিয়ে তুমি গান ধরলেই আমি বাজান বন্ধ করে দেবো—তারপর গান শেষ করে ছেড়ে দিলেই দেখব তানপুরার সুরের উপর তোমার গান ঠিক সেই সুরে আছে কি না, যদি দেখি সত্যই আছে তাহলে বুঝব তোমার গান গাওয়ার উপযোগী গলায় সুর বসেছে—নচেৎ বুঝতে হবে গান গাওয়ার এখনও অধিকার আসেনি।" আমি তখন বুঝতে পারিনি এই পরীক্ষা কত ভীষণ শক্ত। যাই হোক্—আমি সাহস করে ওইভাবে গাইতে প্রস্তুত হলাম।

শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই প্রত্যহ সাধনার সময় 'সা' সুরের উপর অনেকক্ষণ ধরে বার বার দম্ রেখে এসেছি এবং সাতটা স্বর প্রায় এক ঘণ্টা করে সেধে যেতাম। সুতরাং ওই পরীক্ষায় ভয় পাবার মত কিছু নেই বলেই মনে করেছিলাম। গান ধরতেই রাজগায়ক তানপুরাটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সকলেই খুব উৎসুক হয়ে শুনতে লাগলেন। আমি যখন গানের অন্তরা শেষ করে সঞ্চারী আরম্ভ করেছি অর্থাৎ অর্দ্ধেকটা গেয়েছি

তখন সেই গায়ক খুব আস্তে তানপুরার জুড়ির একটা তার বাজিয়ে দেখতে গেলেন আমার গানের সুর তানপুরার সুরের ঠিক ওজনে চলছে কি না, তখন আমার কাণে সেই সুর এসে যাওয়ায় বুঝতে পারলাম গান সেই সুরের ঠিক ওজনে চলছে। তখন খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠার জন্যই বোধ হয় আমার সংযম শিথিল হয়ে যাওয়ায় যখন গান ছেড়ে দিলাম তখন দেখা গেল আমি পরাস্ত হয়ে গেছি অর্থাৎ তানপুরার সুরের সংগে সমতা নষ্ট হয়ে গিয়ে বাঁধা সুর থেকে কণ্ঠের 'সা' সুরের তখনকার ওজন কিছুটা ঝুলে পড়েছে 'নি' এর কাছ বরাবর। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়ে চোখ দিয়ে জল এসে গেছল। রাজাসাহেব তা দেখে তাঁর গায়ককে একটু রুষ্ট হয়েই বলতে লাগলেন—ছেলে মানুষের প্রতি এত বড় শক্তির পরীক্ষা করতে যাওয়া আপনার উচিত হয়নি,—বহুকাল সাধনা করে বেশী বয়সের গায়করাই পারবে কিনা সন্দেহ আছে, তবুও গানের অর্দ্ধেকেরও বেশী ঠিক সুরের ওজনে যে রাখতে পেরেছে তারজন্য খুবই তারিফ্ করছি এবং কায়দাযুক্ত গান শুনেও আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। শুধু প্রতিভাই নয়—সাধনার উপর কত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা রাখলে তবে এই বয়সে এ রকম দক্ষতা আসে ; এমন সুন্দর ও তৈরিভাবে গাইতে পারা ছেলেকে আপনি উৎসাহ প্রদান না করে তার মন খারাপ করে দিলেন,—আমার খুব দুঃখ লাগছে।" রাজাসাহেবের এই রকম আন্তরিক কথায় আমার মনটা স্বাভাবিক হয়ে এল। রাজগায়কও তখন আমার উপর যথেষ্ট স্নেহ ও প্রশংসা দান করেন।

পরে একটু বেশী বয়সে মনে হয়েছিল কণ্ঠস্বরের ওই শক্তির পরীক্ষা তখন সেই রাজগায়ককে যদি দিতে বলতাম তাহলে তিনি রাজী হতেন কিনা জানা হত। আমার মনে হয় পরীক্ষার মাধ্যমে এত বড় শক্তিলাভের অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা কারো থাকে না এবং চিন্তাতে বোধ হয় আসে না।

সেদিন থেকে আমার মনে সঙ্কল্প রেখেছিলাম এই প্রশ্নে যাতে পরে সব সময় সফল হতে পারি তার পরীক্ষা প্রত্যহ রেখে যেতে হবে। ভিত্তি কত মজবুত ও বিরাট শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই প্রশ্নের মধ্যে নিহিত আছে।

পরের দিন রাজাসাহেব আমাদের বিদায়কালীন দেয় নিয়মকে ছাড়িয়ে কুড়ি টাকা দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল আশাতীত পেয়েছি।

রাজাসাহেব আমাদের আবার আসবার জন্য বারবার বলেছিলেন। তাঁর ব্যবহারে সত্যই খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি নিয়মিত শিক্ষা-সাধনা করেন বলে উচ্চস্তরের শ্রোতা হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের বলেছিলেন—আমি শুধু ধ্রুপদ ছাড়া আর কিছু গাই না। রাজগায়কের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। কারণ তাঁর কাছে পেয়েছিলাম সুর সাধনার শক্তি-পরীক্ষায় এক বিরাট সন্ধান। প্রকৃতভাবে সংগীত চর্চায় নিমগ্ন ব্যক্তিদের কাছে অনেক কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

খোঙ্গার কথক বংশের কয়েকজন গায়কের সংগে মিশে দেখেছিলাম এই বংশের সঙ্গীতজ্ঞরাও সঙ্গীত বিষয়ের নানান বস্তুর উপর বেশ অনুসন্ধিৎসুতা রাখেন পাণ্ডিত্য লাভের জন্য। বিবিধ বিষয় নিয়ে চর্চা ও তত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে যা কিছু করণীয় তা প্রাচীন ঘরাণাতে যথেষ্ট ছিল।

আমরা কাতরাশ রাজবাড়ী থেকে রওনা হলাম গিধৌড় রাজধানী উদ্দেশ্যে ॥

(৩০)

ওই ভ্রমণের শেষ অধ্যায়ে,—

গিধৌড় রাজপ্রাসাদের বহির্দৃশ্য ও অভ্যন্তর বেশ আকর্ষণীয় ছিল। সহরটি কিন্তু বিশেষ বড় নয় এবং শ্রীসৌন্দর্য্যও তেমন ছিল না। আমরা সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ১১টা হবে। একটা খড়োঘরের কুঠরী ভাড়া নিয়ে তাতে জিনিস পত্র রেখে তালা লাগিয়ে গেলাম পুকুরে স্নানাদি সারতে। তারপর ময়রা-দোকানে মেঠাই কিনে জলযোগ সমাধা করে বাজার থেকে বড় মালসা, চাল, ডাল, কাঠ ইত্যাদি কিনে এনে আমি রান্নার উদ্যোগে লাগলাম।

প্রায়ই মনে হয় আমার জন্যই বিশেষ করে যেন এই বিদ্যাটির প্রভাব বাল্যজীবন হতে সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে থেকে এসেছে। যাইহোক্—তৎপর হলাম অগ্নি, বারি, কাষ্ঠ, তণ্ডুলাদির সহযোগে তার বাস্তবরূপের বিভিন্ন মূর্ত্তি অঙ্কনে। এখানে তখন থোড়্ ছাড়া আর তেমন কোন সব্জী পাওয়া গেল না। সুতরাং তিনিই আমাদের কাছে সুখাদ্যরূপে অবতীর্ণ

হলেন ডাল'কে সাথী করে। গৃহস্বামী রান্নার পাত্র এবং শিল-নড়া, হাতা-খুন্তি, কড়া ইত্যাদি দিয়েছিল।

ইত্যবসরে অগ্রজ গেলেন উদ্দেশ্য সাধনের আশায় রাজবাড়ী অভিমুখে —পঞ্চকোট রাজবাড়ীর অভিজ্ঞতার আতঙ্ক নিয়ে। কারণ এখানের রাজাও বড়দরের। সুতরাং জাঁদ্রেল্ বড়র কাছে কৃপাপ্রার্থীদের আবেদন-নিবেদন পৌঁছান যে কি ভীষণ শক্ত ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমাদের দেশের পল্লী বাসিন্দায় ছিলেন মধু শাঁখারী, তিনি একদিন মেজকাকাকে (গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে) বলেছিলেন,—জান্ খঁন্ (খঁন্—অর্থে হে—বা, গো) আমার কাছে একটা জড়ি (শিকড়) আছে সেটা তুমি যদি লাও তাহলে বর্দ্ধমানের রাজাকে বশে এনে হাতের মুঠার মধ্যে লিয়ে আসতে পারবে।"

মেজকাকা একথা শুনে বলেছিলেন—তাহলে তো তুমি নিজে গিয়েই ওই রাজাকে জড়ির প্রভাবে বশে আন না কেন? এত দুঃখ-কষ্ট পাবার দরকার কি?

উত্তরে মধুদা' বলেছিল—জান্ খঁন্—ওই দরয়ান গুলাকে আমার বড় ভয় করে—ওদের কাছে আমার জড়ি মনে হয় খাটবে না, তা না হলে রাজাগুলাকে এতদিন হাত করে ফেলতাম।"

মধুদা'র এই কথার মধ্যে পরিষ্কারভাবে বাস্তব অবস্থার নিদারুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সত্যই যদি শিল্পীগুণীরা খোদকর্ত্তার কাছে উপস্থিত হতে পারেন তাহলে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য সম্ভাবনা অনেকখানি থাকে কিন্তু ওই দারওয়ানরূপী কতকগুলি কুটিল, অদরদী এবং শক্ত-অমসৃণ পাথরের সোপানের মত অন্তরকে অতিক্রম করে যথাস্থানে পৌঁছান সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। অর্থাৎ পদাধিকারী আমলাবর্গ ইত্যাদির লৌহদুর্গ ভেদ করে কাম্যদেবতার দর্শনলাভ অধিকাংশ স্থলেই তপস্যালব্ধ মহাপুণ্যের মত হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রতিভা-শিক্ষা ও সাধনারূপ জড়ির ক্রিয়া যথাস্থানে দেখাবার উপায় থাকে না। রাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যদি শাস্ত্রীয়সংগীতে অনুরাগী হতেন তাহলে মনে হয় এ রকম বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার সৃষ্টি হত না। এই অভাব এখন আসল জায়গাতেও খুব বেশী থাকায় সম্মানাদি বিষয়ে ভাগ্যই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাক এ সব কথা,—আমাদের একটা বড় রকমের সহায় সম্বল ছিল গিধৌড়ের মত বড় রাজার কাছে আবেদন সহজে পৌঁছে যাবার। আমার

আপন কাকা অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন গান ও ভাগবত পাঠ শুনাবার জন্য। কাকা যখন বৈদ্যনাথধামে যান তখন উক্ত মন্দিরে তাঁর গান ও পাঠ শুনে উক্ত রাজার কাকা রাজধানীতে পরম সমাদরে নিয়ে যান। মহারাজা তাঁর গান ও ভাগবতপাঠ শুনে খুব মুগ্ধ হন এবং টাকার মোটা অংক ধার্য্য করে স্থায়ী-ভাবে রাখতে আগ্রহ জানান কিন্তু তিনি এ রকমভাবে বশ্যতার মধ্যে থাকা পছন্দ করতেন না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কণ্ঠ ও সুরসমৃদ্ধগানে মুগ্ধ হয়ে বিশেষ আগ্রহের উপর তাঁর বাড়ীতে রেখেছিলেন এবং আদি ব্রহ্মসমাজের গায়নাচার্য্যের পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কবির সম্মান রক্ষায় মাত্র কয়েক মাস পর্য্যন্তই ছিলেন।

কেন চলে এলেন - একথার উত্তরে বলেছিলেন—মর্য্যাদায়, মানে ও ব্যবহারে যদি বিপুল পার্থক্য থাকে তাহলে সাধনায় ব্রতী আমাদের মত ব্যক্তিদের সেখানে থাকা যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এই পার্থক্য সাধক, পণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপাসকের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও অমর্য্যাদাকর। সুতরাং আমরা যখন এক বস্ত্র ও একমুষ্টি অন্নতেও অভাব অনুভব করিনা তখন এ বশ্যতা কেন? তাছাড়া এই ব্যবসা আমাদের স্বাধীন।”

কাকা এই রকম আদর্শের মানুষ ছিলেন বলে তাই অত বড় গায়ক হয়েও যোগ্য পরিচয় দেশ জুড়ে হয়নি। তাঁর যে রকম সুকণ্ঠ ও গানে দরদ ভাববস্তু ছিল এবং তানালংকারের উপর রসাল স্বরলহরী প্রকাশিত হত তাতে আমার মনে হয় তিনি যদি কণ্ঠ সংগীতের প্রচারেই ব্রতী থাকতেন তাহলে সে সময় হতে নামের ধারাবাহিকতায় তাঁর স্থানই সর্বাগ্রে থাকত। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনাকেই বড়করে নিয়েছিলেন। অর্থের উপর তাঁর লোভ শূন্যতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বাংলাদেশের এক মহারাজা লোক মুখে কাকার নাম শুনে তাঁর গান এবং কিছুদিন ভাগবত পাঠ শুনবার জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারী মারফত চিঠি লিখিয়েছিলেন আহার বাসস্থান ছাড়া মোটা রকম টাকা ধার্য্য করে এবং স্বীকৃত হবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে। কাকা এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ ছাড়া অন্য কারো অর্থ গ্রহণ করিনা। সুতরাং এই আহ্বানের সম্মান রাখতে অপারগ হলাম বলে বিশেষ দুঃখিত।”

কাকা মৃত্যুর শেষ কয়েক বছর কালী সাধনায় ব্রতী থেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের এক দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল বহুকাল আগের এক তন্ত্রসিদ্ধ সাধুর প্রতিষ্ঠিত। কাকা ওই আসনে বসতে যেতেন শনিবার ও অমাবস্যার দিন গভীর রাত্রে। নিজের জন্ত কোন কিছুর প্রয়োজনই তিনি মনে করতেন না। কেউ কিছু চাইলে তাঁর হাতের কাছে যা থাকত তাই দিয়ে দিতেন। একবার তাঁর পূজার গৃহে বসেছেন গামছাখানি পরে, একমাত্র বস্ত্রটি শুকোতে দিয়ে। সে সময় ছিন্নমলিন বস্ত্র পরিহিত এক ভিখারী এসে উপস্থিত। চাইল ভিক্ষা, নৈবিদ্যর জন্তই ছিল চারটি আতপ চাল, সেগুলি তুলে নিয়ে ভিখারীকে দিতে গিয়ে তার কাপড়ের অবস্থা দেখে তাঁর শুকোতে দেওয়া কাপড়টিও দিয়ে দেন। তারপর পূজায় যেমন বসতে যাবেন ওমনি এক সাধুবেশধারী সাধু এসে ভিক্ষা চাইল। দেবার মত আর কিছু ছিল না বলে নিজের কমণ্ডলুটি তাকে দিয়েদেন। পরে বিল্বপত্র ও জবাপুষ্প দিয়েই মায়ের ঘটের উপর পূজায় মগ্ন হন। সন্ধ্যা পর্যান্ত এভাবে যখন পূজা চলতে থাকে তখন এসে পড়ল কুলিয়াড়া গ্রাম থেকে তাঁর কয়েকজন শিষ্য। সেদিন শনিবার ছিল বলে মায়ের পূজা হবে সেই মানসে তাঁরা নিয়ে এসেছেন গো-গাড়ীতে করে নানাবিধ দ্রব্য এবং তার সংগে গুরুর জন্ত বস্ত্র।

তাদের আসা সম্বন্ধে কাকা কিছুই জানতেন না।

কাকার মৃত্যু—সেও এক অত্যাশ্চর্য্য। যাকে বলে তিরোধান, ঠিক সেই রকম। যেদিন চলে যাবেন সেদিন আমার বড় কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সকালে ডেকে আনিয়ে বলেন—বড়দা' আপনি আজ সন্ধ্যার পর আপনার কাছে দক্ষিণেশ্বর মায়ের যে ফটোটি আছে সেটি নিয়ে একবার আসবেন। বড়কাকা যথা সময়ে ফটোটি নিয়ে উপস্থিত হতেই কাকা বলেন—আমার মুখের সামনে ফটোটি ধরুন, আর "তাই শিবের নয়ন ভুলেছে…" গানটি আপনি গাইতে থাকুন এবং আমিও আপনার সংগে গেয়ে যাই। দু'জনে গাইতে গাইতে গান যখন শেষ হয়ে যায় তখন বড় কাকা—কাকাকে অম্বিকা অম্বিকা করে উচ্চস্বরে ডেকে দেখেন অম্বিকাচরণ নেই,—সেই চরণে লীন হয়ে গেছে।

মনকে ভাবাকুল করা এই অপূর্ব বৃত্তান্ত যখন বড় কাকার কাছে শুনেছিলাম তখন এই সব মহাপুরুষদের বংশে জন্মেছি বলে নিজেকে ধন্ত মনে করেছিলাম। কাকার প্রথম বয়সের গাওয়া গান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত

বিষয়টি কয়েকবারই মেজকাকা আমাকে বলেছিলেন,—"একদিন অম্বুদা' তোমাদের টোল্ বাড়ীর কুঠরীতে সকালে গান সাধছেন—সেই গান শুনে বাবা (অনন্তলাল) বলেন—রাধু (বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়) কখন এল ? আমি বললাম—কৈ তিনি তো আসেন নি। বাবা বললেন,—আসেনি কি রকম! গান করছে শুনতে পাচ্ছি,—কত ভাল গাচ্ছে শুন্ -।" আমি বললাম'—রাধুদা' নন, অম্বুদা গাচ্ছেন। বাবা এ কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে বলেন—অম্বিকা এত ভাল গাচ্ছে! কণ্ঠ এবং তৈরি একেবারে রাধুর অনুরূপ করে ফেলেছে! ও যদি গান নিয়েই থাকে তাহলে ওকে কেউ পারবে না।" কাকার বয়স তখন পনর-ষোল হবে, গোঁসাইজীর চেয়ে দশ বার বছরের ছোট ছিলেন।

কাকার বয়স যখন বার এবং মেজকাকার দশ তখন দাদুর বন্দোবস্ত মত কুচিয়াকোল জমিদার বংশের রজনীবাবু এঁদের নিয়ে কোলকাতায় আসেন। মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারীর সংগে ব্যবস্থা করে ওই নাট্যমঞ্চে কাকাদের গানের আয়োজন হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কাকাদের পরিচয় যাওয়ায় তাঁরা সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন গানের আসরে। এই সব শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন— মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। এই সব মহান শ্রোতারা বিশেষ করে কাকার (অম্বিকাচরণ) গানেই পরিতুষ্ট হন। অনেকে তাঁকে কাছে ডেকে এনে উৎসাহিত ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন এবং সেই সংগে অনেকে দশটি করে টাকা মিষ্টি খেতে দেন।'

অন্তরের প্রেরণাই এই সব পরিচয় প্রদানে টেনে আনে। এখন সেই সূত্র ধরে আরম্ভ করি,—

অগ্রজ রাজবাটী হতে হৃষ্ট মনে ফিরে এসে জানালেন—কাকার নাম করে আমাদের পরিচয় মহারাজার কাছে পৌঁছতেই তাঁর ভাই এসে বললেন মহারাজা খুব খুসী হয়ে জানিয়েছেন আজই রাত্রে গান শুনবেন, তোমরা গায়ক পণ্ডিতজীর ভাইপো শুনে মহারাজা খুব উৎফুল্ল। আমরা বিকেলে গেলাম তানসেন বংশধর বলে পরিচিত গুণী রবাবী মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করার বাসনা নিয়ে। ইনি বহুদিন ধরে এই রাজার দরবারে আছেন এ সংবাদ কাকার কাছে পেয়েছিলাম।

সদর রাস্তার ধারেই অতি সাধারণ একটি মাটকোঠার বাড়ীতে থাকতেন। আমরা জেনে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে রাস্তা থেকে

দেখলাম খাঁ সাহেব দড়ির খাটিয়ায় বসে ফরসিতে তামাক সেবন করছেন। বাসস্থানের দৃশ্য দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছল। এখন বহু অভিজ্ঞতায় বুঝেছি— উচ্চস্তরের গায়ক বাদকরা তাঁদের সাধনার উপযোগী যতটা স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন তদনুপাতে রাজা-মহারাজা প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তিদের কাছে ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা লাভ করতে পারেননি। এই দিকটায় যেন একটা অনুগৃহীতের মত ভাব থাকে। সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ যে বিদ্যা—সমস্ত সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা যাতে থাকে সেই সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ও গুণী শিল্পীরা বড়দরের কবি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির মতও সম্মান মর্য্যাদা কেন পান না এ কথা ভাবলে অন্যায়, অবিচারের কথাই মনে আসে।

তারপর সেদিন খাঁ সাহেবের গৃহের দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে কাকার নাম যুক্ত করে পরিচয় দিতেই খুব আদরের সহিত তিনি সামনের খাটিয়ায় আমাদের বসালেন। কাকার কথা নিয়ে বললেন—অম্বিকাবাবু বেশ গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি, গানেতে কণ্ঠে তাঁর যেমন সুমিষ্ট ও রসাল তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাগরূপকে জীবন্ত করে তুলবার সামর্থ্য রাখেন। তাঁর গান শুনে মনে হত যেন প্রকৃত সাধকের গান শুনছি। বিশেষ করে তিনি যখন মাতৃভাষায় রচিত খেয়াল ইত্যাদি গাইতেন। গান গাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা তিনি ভালভাবেই বুঝেন।” অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে তাঁর আন্তরিকতা দেখে মন আমাদের মুগ্ধ হয়ে গেছল। সঙ্গীতকে প্রকৃতভাবে বুঝতে পারলে হৃদয়-মন মহৎ হয় এবং অহংকার থাকে না এই অতি সত্য কথার প্রমাণ তাঁর কাছে পেয়েছিলাম। অনুরোধ করলাম একটু রবাব শুনাবার জন্য। তৎক্ষণাৎ খুসী মনে শুনালেন পূরবী রাগের আলাপ ধ্রুপদের নীতিধারার বিশুদ্ধ রূপের উপর আমাদের ঘরাণার মত শুদ্ধ অর্থাৎ প্রধান ধৈবত দিয়ে। তাঁর বাদন ক্রিয়া বেশ ভাল লেগেছিল। তারপর সেই অমায়িক গুণীকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

সন্ধ্যার পর রাজবাড়ীর লোক এসে আমাদের নিয়ে গেল। গিয়ে দেখলাম মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবও আসরে উপস্থিত হয়েছেন। মহারাজার শরীর সুস্থ ছিল না বলে পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশয়নে থেকে বহুক্ষণ ধরে ফরমাসের উপর গান শুনলেন। গানের মাঝে মাঝে আচ্ছা-আচ্ছা করে উঠছিলেন। খাঁ সাহেবও তারিফ্ দিচ্ছিলেন। সে সময়

৺দুর্গাপূজার সময় উপস্থিত হয়ে এসেছিল, তাই মহারাজা শেষে একটি আগমনী গান শুনাতে বললেন। আমি কবি তারাচাঁদ রচিত—

"করি অরি পরে আনিলে(ছ) কারে কৈ গিরি মম নন্দিনী

আমার অম্বিকা দ্বিভুজাবালিকা এয়ে দশভুজা ভুবনমোহিনী ‥।"

এই গানটির ওই দু' লাইন যাই গেয়েছিওমনি মহারাজা সাশ্রুনয়নে উঠে বসে ভাবে গদগদ হয়ে বললেন আহা কি অপূর্ব ভাব!

গান শেষ হতে দেখি মহারাজার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। সেই দৃশ্য মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ভাষাবোধজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে গানের ভাব ভাষার মূল্য কত বেশী এবং এর প্রচার উপযুক্ততায় কত শ্রেষ্ঠ ও গান গাওয়া ও শুনানর প্রকৃত উদ্দেশ্যের কত সহায়ক।

ইং ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে তিন মাসের জন্য সেখানের সঙ্গীত বিভাগের পরিদর্শক অধ্যাপকের পদ পেয়ে গেছলাম। সেখানে একদিন বড়রকমের আসরে ধ্রুপদ গান পরিবেশন করে আর দু' দিনের আসরে বাংলা খেয়াল ইত্যাদি গান গেয়েছিলাম। সেখানের প্রধান অধ্যাপক ধ্রুবতারা যোশীজী এবং অন্যান্য হিন্দুস্থানী অধ্যাপকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম বাংলা ভাষায় খেয়াল ও ভজন ইত্যাদি শুনে আপনাদের কাছে হিন্দীর চেয়ে কোন বিষয়ে ত্রুটি মনে হচ্ছে কি? তাঁরা বলেন মোটেই না। সমস্ত উপস্থাপনা আমাদের খুব উচ্চস্তরের মনে হয়েছে, বাংলার মত শ্রেষ্ঠ ভাষায় রাগ সংগীত প্রকাশে বাধা কোথায়? সব কিছু গাইতে পারার উপরই নির্ভর করে।" এখানের আসরের অন্য শ্রোতাদের হিন্দীর চেয়ে বেশী ভাল লাগবে সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে বাঙালী অধ্যাপকরা ওঁদের মত প্রশংসায় সোচ্চার ছিলেন না। আমাদের পরকীয়া প্রেমের এটা একটা বড় দৃষ্টান্ত। তারপর সে দিন মহারাজা গিধোড় আমাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে খুব উৎসাহ প্রদান করে মঙ্গল কামনা জানালেন। আমি যেন তাঁর আপনজন এই রকম মনে হয়েছিল।

এখানে ৺দুর্গাপূজা বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হয়। মহারাজা পূজা পর্য্যন্ত আমাদের থেকে যাবার জন্য আগ্রহ জানালেন। অগ্রজ অতি বিনয় সহকারে বললেন—অনেক দিন আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, মা খুব চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন, শীঘ্র যেন আমরা ফিরি তারজন্য বিশেষ করে লিখেছেন, একন্য আমাদের মন ঘরমুখী হয়ে পড়ছে।

এ কথা শুনে মহারাজ বললেন—তাহলে তোমাদের আটকাব না, তবে আবার আসবে।" মহারাজা কাকার বিষয় নিয়েও অনেক কথা বললেন এবং গভীর শ্রদ্ধা জানালেন. শেষে বললেন—গান এবং ভাগবত পাঠ অপূর্ব তো বটেই কিন্তু এমনমহৎ ও নির্লোভী মানুষ দেখা যায় না। গুরুর আদরে রাখতে চেয়েছিলাম—উত্তরে বলেছিলেন আমি যে কারো বশ্যতা মেনে চলতে পারি না, পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবেই থাকতে ভালবাসি—আমার অগ্রজ এবং পিতা, পিতামহদের মত।" মহারাজা তারপর তাঁর ভাই এর কানে কানে কি বলে দিলেন।

আমরা যথারীতি সকলকে বিনয় অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। রাজভ্রাতা আমাদের সংগে করে, খাজাঞ্চিবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন, পঞ্চাশটি টাকা পেলাম। অর্থাৎ এখনকার পাঁচশরও অধিক। অত টাকা সেই বয়সে আমি পেতে পারি এ যেন অভাবনীয় মনে হয়েছিল।

কাকার জন্যই মধুদা'র জড়ি অর্থাৎ শিক্ষা-সাধনার জড়ি ষোল আনা কার্যাকরী হয়েছিল।

পরের দিন সকালে তল্পি-তল্পা বেঁধে একটা এক্কা ডেকে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হলাম। টিকিট কাটা হল বৈদ্যনাথধামের। উদ্দেশ্য ৺বাবাকে দর্শন করা হবে এবং ওখানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে গান শুনিয়ে যদি কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয়।

বেলা ১০টা এই রকম সময়ে দেওঘর ষ্টেশনে পৌছলাম। জসিডি থেকেই পাণ্ডাপ্রভুরা আক্রমণ করেছিলেন এবং চৌদ্দ পুরুষের নাম-ধাম দেখাবার চেষ্টাও তাঁরা করলেন কিন্তু আমাদের যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেয়ে একে একে সব সরে পড়লেন,—বিশেষ করে যখন ধরে বসলাম গানের আসর করে টাকা পাইয়ে দিতে হবে। আমার এই কথা শুনে তাঁদের উত্তরের ভাষা আমাদের খুব হাসিয়েছিল। একজন যুবা বয়সের পাণ্ডা আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না। তিনি তানপুরা-পাখোওয়াজ দেখে জসিডির থেকেই আমাদের উপর খুব আগ্রহ নিয়ে অনুসরণ করছিলেন। দেওঘর ষ্টেশন পেরোতেই তিনি এসে আন্তরিকতার সহিত ঘনিষ্ঠভাব দেখালেন। আমাদের কাছে সব কিছু পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন—"আমিও ধ্রুপদ গানের চর্চা করি।" অতি যত্ন সহকারে আমাদের নিয়ে গেলেন ধর্মশালায়। সেখানে জিনিষপত্র রাখিয়ে বললেন এই নিকটেই পুকুর আছে স্নান সেরে এস তারপর ৺বাবার মন্দিরে নিয়ে

যাব পূজা দেবার জন্য। আমি নিজে কিছুই নেব না।" আমরা স্নান সেরে তাঁর সংগে গেলাম মন্দিরে। খুব ভালভাবে আমরা পূজা করলাম। মন্দিরের পরিচালক প্রধান পাণ্ডাদের কাছে সেই পাণ্ডাজী আমাদের ভালভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেই তাঁরা জানালেন—তাহলে আজই রাত্রে আরতির পর ৺বাবার সামনে আসর করা যাক।" আমরা খুব আগ্রহের সহিত সম্মতি জানালাম। সকলকে শ্রদ্ধা-নমস্কার জানিয়ে মন্দির হতে বহির্গত হলাম। আমাদের সেই পাণ্ডাজী জানালেন—সন্ধ্যার পর ধর্মশালায় গিয়ে আমাদের নিয়ে আসবেন মন্দিরে।

রাস্তার ধারে এক আতাওয়ালীর কাছে এক পয়সায় বেশ বড় চারটে আতা পেলাম। পরে একটা ভাল দোকান থেকে এক আনায় আধ সের চিঁড়ে, ছ' পয়সায় আধ সের ক্ষীরের মত দৈ, এবং এক আনায় চারটে বড় রকমের পেঁড়া কেনা গেল। ধর্মশালায় এসে খুব উৎকৃষ্ট ফলার করলাম।

সন্ধ্যায় পাণ্ডাজীর সংগে গেলাম মন্দিরে। আরতির পর যাত্রীরা প্রায় সব চলে যেতে গানের আসর বসল। তানপুরা নিয়ে বসে চোখের সামনেই ৺বৈদ্যনাথবাবাকে দর্শন করতে পেয়ে গাওয়ার আকুলতা বহুগুণ বেড়ে গেছল। যতক্ষণ গেয়েছিলাম ততক্ষণ মনে হয়েছিল ৺বাবাকে ছাড়া আর কাউকে শুনাচ্ছি না। সঙ্গীতের সাধনায় এই দিনটি বিশেষ করে আমার জীবনে সার্থক করে দিয়েছিল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে গান গেয়েছিলাম। শ্রোতাদের আকর্ষণ যুক্ত মন শাস্ত্রীয়-সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় ছিল। তাঁদের মধ্যে ওখানের বিখ্যাত সানাইবাদকেরা খুবই উল্লসিত হয়েছিলেন। পরিশেষে, খুবই সমাদরের সহিত ৺বাবার ভোগের পরম পবিত্র প্রসাদ গব্যঘৃতের লুচি, ক্ষীর ও পেঁড়া প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয়েছিল। ৺বাবাকে প্রণাম সেরে সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। নিদ্রার জন্যে শয়ন করতে হল যাত্রীদের সংগে একত্র। কারো কারো কাছ থেকে শুকাতাম্রকুটের মস্তকঘূর্ণীত উগ্র ধুম্র গন্ধ এবং গায়ের ব্যাঘ্র গন্ধের মত সৌরভ নিদ্রার জন্য যে কি সুখকর হয়েছিল তা নিদারুণভাবে এখনও মনে আছে।

পরের দিন সকালে সেই পাণ্ডাজী এসে তাঁর ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রায় প্রহর খানেক ধরে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনায় এবং আমাদের ঘরাণা সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিলেন এবং তাঁর সঙ্গীত গুরুর ৺কাশীর ঘরাণারও পরিচয় দিলেন। দু'চারটি ধ্রুপদ যা শুনালেন

তা আমাদের ঘরাণাতেও আছে। গাইবার কায়দা বেশ ভালই লেগেছিল। আমরা স্নান করে আসতেই সংগে করে তিনি মন্দিরে নিয়ে গেলেন। এদিন পাণ্ডাজীরা খুব যত্ন নিয়ে পূজার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর সেই পাণ্ডাজী নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। ভাত, ডাল, তরকারী এবং খরগোস মাংসের ঝোল খাওয়া গেল। বললেন—এই মাংস পাওয়া গেলে বিশেষ অতিথিদের জন্য ক্রয় করা হয়। সকলেই তা করেন। পাণ্ডাজী এ কথাও বললেন—এখানের পাণ্ডাদের মধ্যে অনেকেই এই মাংসের খুব ভক্ত এবং তার সংগে উগ্রপানীয় বস্তুরও। এই কথা শুনে বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে পরে ভেবেছিলাম ৺মা কালীকে আরাধনা করার জন্য একাগ্রতার উদ্দেশ্য নিয়ে যে বস্তুকে অনেকে গলধঃকরণ করে' ইচ্ছাকৃত মত্ততা আনয়ন করেন সেই বস্তুতে এঁরা ৺বাবার ভক্ত হয়ে কি করে লিপ্ত হলেন! তবে কি এঁরা বাবাও যেখানে মা-ও সেখানে এই ধরেই বাবার অজান্তিকে চুপ্ চুপ্ মাকে সন্তুষ্ট করার অছিলায় ধুঁয়ো টেনে ঝিমোতে না যেয়ে আনন্দের আসল পথে অবাধ উন্মত্ত সুখ আছে জেনেই এই বস্তুটি ধরেছেন? মনে হয় নিশ্চয়ই তাই হবে। কারণ এ বিষয়ের অভিজ্ঞতার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

তারপর ওই দিন অর্থাৎ খরগোস মাংস প্রাপ্তির পুণ্য দিনে বিকেল চারটের সময় পাণ্ডাজী আমাদের নিয়ে গেলেন মালঞ্চ নামে সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন বাঙালী পল্লীতে, যদি সেখানে কোথাও গানের আসর হয় এই আশায়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হেঁটে হেঁটে ফেরিওয়ালাদের মত চেষ্টা করা হল কিন্তু সুলভ মূল্যেও ক্রেতা জুটল না। একটা বাড়ীর বাঙালীবাবু আমাদের ভিখারী পর্য্যায়েরই একটু উন্নত ধারণা নিয়েই অভিমত প্রকাশ করলেন,—তোমাদের জন্য পাণ্ডাজী যখন উকালতী করছেন তখন দাম দিয়ে নয় শুধু শুনতে পারি। আমরা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে এলাম সেখান থেকে। ভদ্র-লোকের বলার ভঙ্গীটি যতই মনে পড়তে লাগল ততই হাসি আসতে লাগল। পাণ্ডাজীর কিন্তু মন খুব বিমর্ষ হয়ে গেল। বললেন—ভগবানের চিড়িয়াখানায় কোন কিছুরই অভাব নাই।

ধর্মশালার দিকে প্রত্যাগমনের সময় পাণ্ডাজী বললেন—এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে এক বাঙালী জমিদারের খুব বড় বাড়ী আছে, তিনি এখন ওই বাড়ীতেই আছেন, শুনেছি ওস্তাদি গানের খুব ভক্ত এবং সমঝ্দার। গাইয়ে বাজিয়ে পেলে ছাড়েন না, শুনে যে যেমন উপযুক্ত

তাকে সেরূপ টাকা দেন, তোমরা কাল পর্য্যন্ত থেকে যদি সেখানে যেতে ইচ্ছে কর তাহলে আমি ঠিকানা ও জায়গা বাতলে দেবো।" আমরা আগ্রহের সহিত থাকব বললাম।

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা এক্কা গাড়ীতে চড়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যথাস্থানে নেমে যন্ত্রগুলো হাতে নিয়ে খোলা ফটকে ঢুকলাম ঝম্‌ঝমানি মন নিয়ে। একটা চাকরকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম জমিদার মহাশয়ের দর্শন পাবার উপায় কি? সে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বল্‌ল্—হুজুর বেড়াতে গেছেন, কখন ফিরবেন জানি না, বাড়ীতে আর কেউ নেই। এই বলে আমাদের অগ্রাহ্য করে চলে গেল। তার এই ব্যবহারে মনে হল চাকরের কাজে বোধ হয় সে নূতন নিযুক্ত হয়েছে, তাই গাইয়ে বাজিয়ে আসার ধারণা তার নেই।

যাই হোক্—আমরা একেবারে নিরাশ না হয়ে ভাগ্যের ফলাফল দেখবার জন্ম গেটের দু' পাশের বেদীতে বসে জমিদারের প্রত্যাগমনের আশায় রইলাম। রাত বেড়ে চলে ভেতরের বড ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বেজে গেল। ক্ষিদের দুর্বলতায় আমার হাই উঠতে লাগল। আর বসে থাকতে না পেরে বেদীটার উপর জড়পুটলী হয়ে শুয়ে পড়লাম, ঘুমও এসে গেছল। অনেকক্ষণ পরেই বোধ হয় অগ্রজের ঠেলা পেয়ে ধড়্‌পড়্ করে উঠেই দেখি গেটের সামনে এক বৃহৎ আকারের মোটর দাঁড়িয়ে গেল। হর্ণ দিতেই চাকরটা দৌড়ে এসে গেট খুলে দিলে। জমিদারদেব গাড়ী থেকে কোন রকমে নীচে পা' রেখে ভীষণভাবে টল্‌তে টল্‌তে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন,—আমাদের দিকে একবার রক্ত নয়ন উন্মিলনও করলেন না। চাকরটা জোর গলায় জানিয়ে দিলে— চলে যাও, এখানে কিছু হ'বে না।

সংগে সংগে উঠে পড়লাম। অগ্রজ নিলেন পাখোওয়াজটা কাঁধে আর আমি নিলাম তানপুরাটা হাতে। সেদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম পাখোওয়াজ বাদ্যটি বাদকের দুর্গতিরও কারণ হয়।

নির্জন গভীর রাত্রে পথ চলতে বেশ ভয় হচ্ছিল। উপার্জনের টাকাগুলি সংগেই ছিল। সেই তারা আক্রমণ করে যদি একেবারে শেষ করে দেয় তাহলে ভালই হয় এইটাই আকাজ্ক্ষা নিয়ে তখন মনে হয়েছিল। তিন মাইল পথ হেঁটে সেই বিচিত্রালয়ে যখন পৌঁছলাম তখনই মন্দিরের ঘড়িতে ১২টা বাজল। দু' একটা দোকানের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে

যায়নি তাই কিছু কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারা গেছল।

শুয়ে শুয়ে মতলব এল— ফেরার মুখেই মধুপুর জায়গাটি যখন পড়ছে তখন সেখানে নেমেও পরীক্ষা করতে হবে কি রকম ফলাফল হয়, চেষ্টা ছাড়া হবে না।

পরের দিন সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে বেলা ৯টার সময় আমরা মধুপুর ষ্টেশনে নেমে কুলির মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে তার নির্দ্দেশমত ধর্ম্মশালার দিকে পদচালনা করলাম। ধর্ম্মশালার ভিতরে প্রবেশ করে দেখা গেল কোন লোকজন নেই। আছে কেবল গবাদিপশু এবং তাদের মলমূত্র বিস্তৃত হয়ে। ধর্ম্মশালার যাত্রীদের বোধহয় তারা নিজেদের সম-গোত্র ভেবেই নির্বিঘ্নে বিশ্রামাদির আরাম উপভোগ করে আসছে। এখানে দু'দিন ধরে অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না সঙ্গীত অনুরাগী ব্যক্তির। গোময়ের নিদারুণ সৌরভ সহ্য করে এবং দু'বেলা দৈ-চিড়ে খেয়ে শুধুই কেবল কষ্টভোগ হল। এখান থেকে সটান বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া গেল দীর্ঘদিন ধরে নানান অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(৩১)

শিক্ষকতা,—

ওই ভ্রমণের পর দেশে এসে ৺কালীপূজার কয়েকদিন পরেই মেজ-কাকার সংগে বদ্ধমানে এলাম। এখানে যখন প্রথম আসি সেই সময়ের কয়েকমাস পরে মেজকাকা আমাকে তাঁর ছাত্রদের শেখানর ভার মাঝে মাঝে দিতেন— যখন তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বা গানের আহ্বানে কোলকাতায় ও অন্যত্রে যেতেন। ছাত্ররা বয়েসে আমার চেয়ে অনেক বড় হলেও আমার কাছে শিখতে তাঁদের মোটেই অনিচ্ছা আসত না বরং আগ্রহই দেখাতেন। তাছাড়া তাঁরা মনে করতেন গুরুর নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা তাদের জন্য উপযুক্তই থাকবে। আমার সেই এগার বছর বয়স থেকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ আসায় তার অভিজ্ঞতার গোড়াপত্তন হয়ে ধৈর্য্য এবং দক্ষতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল।

এবারে গিয়ে মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা দীপ্তিপ্রকাশ নন্দের ইচ্ছাক্রমে তাঁকে গান শেখানর ভার পেলাম।

মহাতাবচাঁদ যদি বিজয়চাঁদকে পোষ্যপুত্র না নিতেন তাহলে উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্ররাই রাজত্বের অধিকারী হতেন।

তখন রাজা, জমিদারদের গমনাগমনের জন্য ঘোড়ার গাড়ীই ছিল প্রধানতম হয়ে, অবশ্য উপযুক্ত রাস্তায়। তাছাড়া তাঁরা যেতেন হাতীতে, ঘোড়াতে এবং পাল্কীতে চড়ে। সেই সব ঘোড়ার এবং তার বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট গাড়ীর চেহারা থাকত এমন সুন্দর গঠন-ভঙ্গীর উপর যে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে হত তার দৃশ্যরূপ। আরোহীদের মনে হত এই সব যান-বাহন এঁদের মত ব্যক্তিদের মর্য্যাদারই উপযুক্ত। এখনও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় এবং অন্যান্য ব্যাপারে এই যান-বাহন কৌলীন্যের প্রতীকরূপে বিদ্যমান আছে।

ওই দীপ্তিবাবুর জুড়ি গাড়ীর কালো রং এর ঘোড়াগুলি এমন সুন্দর দর্শনীয় ছিল যে মহারাজ বিজয়চাঁদের ঘোড়াগুলির চেয়েও আরো উৎকৃষ্ট মনে হত। গাড়ীর আরোহীকে নিয়ে ঘোড়াগুলি যখন মাটি কাঁপিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে চলত তখন তাদের সেই গতিভঙ্গীর গঠনরূপ দেখে রাস্তার লোক মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

দীপ্তিবাবু এক একদিন আমাকে ওই ঘোড়া গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। নিজে রাস ধরে চালানর মত তাঁর পৃথক একটি গাড়ী ছিল। চেহারা ছিল যেমন তাঁর বলিষ্ঠ ও আভিজাত্যের গৌরব নিদর্শনের মত তেমনি ছিল গাড়ী ও ঘোড়ার রূপ। এই তিন রূপের একত্র সমাবেশ যখন ঘটত তখন শিল্প সৌন্দর্য্যের এক বিরাট রূপ ও অভিভূত করার মত দৃশ্য হয়ে উঠত।

একদিন ওখানের কৃষ্ণসায়রের প্রশস্ত রাস্তায় যেতে যেতে দীপ্তিবাবু বললেন—দেখবেন! ঘোড়ার রাস একটু আলগা করে দেবো কি রকম দৌড়বে।" বলা মাত্র দিলেন আলগা করে—ওমনি মনে হল যেন গাড়ীটাকে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—চাকা দুটো বোধ হয় তখন মাটি ছেড়ে উপরে ঘুরছিল। ভীষণ ভয় পেয়ে বললাম—শীগ্‌গীর্ রাস টেনে ধরুণ—নচেৎ আমি পড়ে যাব—দম্ বন্ধ হয়ে আসছে। হাসতে হাসতে গাড়ীর গতি মন্থর করে দিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা দ্রুত গতিতে চলেছিল।

এ রকম বিরাট বলশালী ঘোটকদ্বয়ের বল্‌গা ধরে গাড়ী চালনা করা খুব শক্তিমান ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।

দীপ্তিবাবুকে আমি যখন গান শেখাই আমার বয়স তখন তের পেরিয়েছে। তাঁর বয়স তখন তিরিশের উপর হবে। বয়সের এত ব্যবধান সত্ত্বেও আমাকে প্রকৃত গুরুর মত সম্মান ও মর্য্যাদা দিতেন। আমি দেখেছি সঙ্গীতে গুণী জ্ঞানী বয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের তুমি সম্বোধন করতে। আবার এমনও দেখেছি কোন-কোন সমব্যবসায়ী ব্যক্তি তাঁদের অপেক্ষা সব বিষয়ে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বয়সে কম পেলে তুমি সম্বোধনের সুযোগ ছাড়েন না, মনে হয় তাঁরা বয়সের বড়ত্বটাকেই বড় করে আঁকড়ে রাখতে যত্ন নেন। সামর্থ্যের ও কৃতিত্বের স্বীকৃতির সংগে সম্বোধনাদির বিশেষ যে সম্পর্ক আছে তা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হয়। অবশ্য এ কথা ঠিক, যথার্থ পরিমাপমত গুণের স্বীকৃতি দেওয়া মনের উপরই নির্ভর করে।

দীপ্তিবাবু ছিলেন জমিদারবিশেষ কিন্তু শিক্ষাগুরুর প্রতি করণীয় কর্ত্তব্য পালনে খুবই যত্নশীল ছিলেন। বাড়ীর তৈরী উৎকৃষ্ট খাদ্য, বাগানের নানাবিধ ফল, তরি-তরকারী, পুকুরের মাছ ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন প্রাচীন রীতি ধারায়। এ সব ছাড়া ৺দোলে এবং ৺পূজাতে দিতেন বস্ত্রাদির সহিত অন্যান্য জিনিস।

এই দীপ্তিবাবুর বড় ভাই মুক্তিবাবু গান শিখতেন মেজকাকার কাছে। ইনি একবার ৺কালীপূজার সময় আমাদের ওখানে গেছলেন। তাছাড়া রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন, কুঁচিয়াকোলের বিরাট জমিদার যোগেন্দ্র সিংহ দেব বাহাদুর প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তিরা এসেছেন বিষ্ণুপুরের অতি সাধারণ বাড়ীতে সাধারণ শিষ্যের মত গুরুগৃহে আসার আকর্ষণ ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায়॥

(৩২)

স্বনির্ভর পথে যাত্রা,—

ওই সময়ের কয়েক মাস পরে গ্রীষ্মকালে এক মাসের ছুটি নিয়ে মেজকাকা আমাদের নিয়ে এলেন কোলকাতায় সেজকাকার বাসায়। সে সময় সেজকাকার প্রতিষ্ঠিত 'অনন্ত সংগীত বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে উৎসব আয়োজনের তোড়জোড় চলছিল। যথা দিনে ছাত্রদের

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এবং উপযুক্ত অর্থব্যয়ে উৎসব সমাধা হয়েছিল সংগীতের বিরাট আসর করে।

সন্ধ্যার পর আসর যখন বসল তখন প্রথমতঃ আমার গানের পর বড় বড় গায়কদের গান হতে লাগল, শেষে যন্ত্র সংগীত। কোলকাতার তখনকার নামকরা গাইয়ে, বাজিয়ে সকলেই আহ্বান পেয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সত্যিকারের শ্রোতাতে অত বড় আসর ভরে গেছল। এই আসর চলেছিল পরের দিন বেলা ৯টা পর্য্যন্ত। এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও শ্রোতারা কেউই ধৈর্য্য হারাননি।

সে সময় কোন এক বড়লোকের আহ্বানে পশ্চিমের এক রাজদরবারে থাকা বিখ্যাত খেয়াল গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় আহম্মদ খাঁ ও ফজল খাঁ এসেছিলেন। তাঁরাও বিশেষরূপে আহ্বান পেয়ে এই আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন কোন-রূপ অর্থের দাবি না রেখে। তখন রাজা-জমীদারদের কাছে ছাড়া অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানের আসরে বড় বড় গায়ক-বাদকরা টাকার কোন প্রশ্ন তুলতেন না, সাগ্রহে যোগদান করতেন।

সেই দিনের আসরে ওই যুগল ভ্রাতারা ধ্রুপদের পর গাইতে বসলেন সকলের অনুরোধে। দু'জনে দুটি তানপুরা কাঁধের কাছে তুলে শান্তিক-ভাবে আরম্ভ করলেন কামোদ-রাগের বিলম্বিত খেয়াল—রাগরূপের উপর ধ্রুপদী ধারায় কড়িমধ্যম বাদ দিয়ে। বিলম্বিতের তালছিল 'একতাল' কিন্তু সেই তালের ঠেকা তাঁরা যেভাবে চাইলেন তা তখনকার নামকরা তব্‌লা-বাদকেরা এমনকী ঢাকার বিখ্যাত তব্‌লা বাদক অবনীবাবুও পারলেন না তাঁদের পছন্দমত ঠেকা বাজাতে। তাঁরা বললেন, এই একতাল আটচল্লিশ মাত্রায় বাজবে। তখনকার বাদকরা তাঁদের হাতে তাল দিয়ে গাইতে বলায় খাঁ সাহেবরা জানালেন—এই বিলম্বিত একতাল শুধু ঠেকার উপরই গাওয়া হয়। শুনে সবাই আশ্চর্য্য হলেন। কেউ কেউ বললেন—হাতে তাল দিয়ে গাওয়া যায় না সে আবার তাল কি! ভুল হলে কি প্রমাণ থাকবে কে ভুল কোরল! খাঁ সাহেবরা ঠেকাটা মুখে বলে দেওয়া সত্বেও তার গতিভঙ্গীর নীতিধারা কি এবং ফাঁক-তালের নির্দ্দেশ কোথায় তার হদিস্ কেউ খুঁজে পেলেন না। আমি ছোটবেলা থেকেই সব কিছুতেই কাণ ও মনকে আগ্রহের উপর রেখে শুনার মত কথা এবং দেখার মত বস্তুকে যত্নসহকারে মনে রাখতে চেষ্টা করে এসেছি—তাই ভাল ভাল ঘটনাগুলো প্রায় সবই মনে আছে।

যাইহোক্—খাঁ সাহেবরা তাঁদের ঠেকায় বাজানর কোন ব্যক্তি নেই দেখে সেই গানকে বিলম্বিত তেতালে গাইলেন,—বাজালেন অবনীবাবু। তারপর দ্রুত একতালে খেয়াল গান চলল অনেকক্ষণ ধরে। তাঁদের গানে যেমন রসসৃষ্টি করেছিল তেমনি তানাদি বৈচিত্রে ভরা ছিল। অবনীবাবুর সংগতও তেমনি সঙ্গত প্রথায় অপূর্ব হয়েছিল। তিনি সেদিন বলেছিলেন—সঙ্গত এমন হবে না যাতে গায়ক বা বাদকের শিল্প রচনায় ধ্যানের ব্যাঘাত আসে। এখন কিন্তু বেশীর ভাগ বাদকদের বাদনে সঙ্গত থেকে সঙ্গত কথার অর্থ থাকে না। তাঁরা মনে করেন আমাদের তৈরি বাদন ক্রিয়াও শ্রোতারা বেশী করে শুনুক। এই অবস্থাটা যখন দ্রুতলয়ের গানে বা গৎ এর সময় আসে তখন রসজ্ঞ শ্রোতাদের মনে হয় যেন উভয়ের কসরতি যুদ্ধ চলছে। রাগরূপের দ্রুত সৃষ্টির চমকপ্রদ নৈপুণ্যের অলংকরণ সঙ্গতের বোল-পরণের চাপে তার উপভোগ্য বস্তুর একান্ত অভাব ঘটে যায়। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রোতাদের মন ওই পরিণতী সময়টির জন্যই উৎসুক হয়ে থাকে, দেখেছি বেশী দেরি হলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আসরে বসে লাভের অংকের দিকে তাকিয়ে এই শ্রেণীর শ্রোতাদেরই মনরঞ্জনে বাধ্য হতে হয়েছে গায়ক ও যন্ত্রীদের। কারণ ওই রকম বোধ নিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রোতাদের উপরই বেশী করে নির্ভর করতে হয় তাঁদের সব কিছুর জন্য। এখন ওই বিলম্বিত একতালটির প্রচার পরিচয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা একটু জানাই।

উক্ত আসরের আগে এবং তার পরেও বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ঘরাণা খেয়াল গায়কদের গাওয়া গান যে তালকে ধরে শুনেছি তাতে ওই বিলম্বিত 'একতাল' তালের সন্ধান পাইনি এবং ১৯১৯ সালে ৺কাশীতে যে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন হয়েছিল, তাছাড়া লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি কয়েক স্থানেও কোন খেয়াল গায়ক ওই তালে গেয়েছেন বলে মনে আনতে পারছি না। সুতরাং এ কথাই মনে হয় ওই তালটিতে গাওয়া যে ঘরাণায় উদ্ভব হয়েছিল তা হয়ত সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। তালটিতে ফাঁক, তাল এবং গতিভঙ্গীর সহজ নির্দেশ না থাকায় জন্যই মনে হয় গায়কদের গ্রহণযোগ্য হয়নি।

সেই খাঁ সাহেবদের ওই রকম বিলম্বিত তালে গাইতে দেখলাম ১৯৩৮ সালে মজঃফরপুর কনফারেন্সে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজীকে। ঠিক জানি না কিভাবে কোন সন্ধানের মাধ্যমে এই তাল ওঁর কাছে আয়ত্তে

এসেছিল। ওঙ্কারনাথজী পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের ছাত্র ছিলেন কিন্তু তাঁর গুরুর অনেকবার বিলম্বিত খেয়াল গান শুনেছি তাতে এই তালের পরিচয় পাইনি। যাইহোক্—মোটের উপর বেশ কয়েক বছর আগে থাকতে বিলম্বিত খেয়ালের জন্য এই তাল ক্রমশঃ প্রচারে এগিয়ে এখন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি ঘটেছে। যে তাল বিলম্বিতের জন্য ছিল সেই আড়াঠেকা মধ্যমান এখন একরকম লোপ পেয়েই গেছে। বিলম্বিত তেতাল এখন গৎই প্রধান হয়ে আছে, গানে খুব কম ব্যবহার হয়। অথচ বিলম্বিত তেতাল তালে নিবদ্ধ যে সব গান আছে তাতে বিলম্বিতের ক্রিয়া সুন্দরভাবে করা যায় এবং বাকী সবকিছু প্রকাশ করারও সহজ সুযোগ থাকে। শুধু তাই নয়, ইচ্ছে করলে ওই গতির একই গানের মধ্যে মধ্য ও দ্রুত লয়েও আনা যায়। মিশ্র ছন্দের মধ্যলয়ে গঠিত আড়া চৌতাল ও ঝুম্‌রা (তেওট) তালের স্বভাব সুন্দর সর্পিল গতিকে অজগরী রূপে এনে আজকাল বিলম্বিতে গাওয়া হচ্ছে। আমার মতে ভঙ্গীমাযুক্ত এই সব তালকে তাদের যথারূপে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

(৩৩)

স্বনির্ভরতার পথে,—

সেই সংগীত উৎসবের পর সেজকাকার বাসা থেকেই সুরকে ধরে আমার জীবন-পথ একবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। অর্থাৎ সেই চৌদ্দ বছর বয়সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সব কিছু দায়িত্ব এসে পড়ল এবং তার সংগে গুরুগৃহে শিক্ষারও সমাপ্তি ঘটে গেল।

সেজকাকার এক ছাত্র ছিলেন—তাঁর নাম শ্যামলাল দত্ত। বাড়ী ছিল বহুবাজার সংলগ্ন বাবুরামশীল লেনে। ইনি পাখোওয়াজ বাদ্যে বিশেষরূপে তালিম নিয়েছিলেন কোলকাতার বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক দীননাথ হাজরা মহাশয়ের নিকট। কণ্ঠসংগীত শিখতেন কাকাদের কাছে। এঁর পাড়া হতে খানিকটা দূরের এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি পাখোওয়াজ শিখতেন এঁর কাছে। সে সময় রাইচাঁদ বড়ালও এঁর কাছে তবলা শিখত।

রাই বড়ালদের আগে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা হত খুব জাঁকজমকে। তাদের সাদর আহ্বানে আমি ঐ পূজায় গিয়ে ওদের বাড়ীতেই খুব আদর-

যন্ত্রের সহিত থেকে আসরে দু'বেলা গান করেছিলাম। রাইচাঁদ আমাকে তখন এত বেশী বন্ধুত্বের নিগূঢ়ে আবদ্ধ করেছিল যে তাতে মনে হয়েছিল এ জিনিষ দীর্ঘস্থায়ী হবে। রাই তখন তব্‌লায় মাত্র দু' তিনটি তালের ঠেকা হাতে তুলেছিল। আমার কাছে তেহাইযুক্ত তেতালার একটি বোল তুলে নিয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিল।

শ্যামবাবুর ওই পাখোওয়াজের ছাত্রটির গানের সংগে সঙ্গতের খুব আবশ্যক হয়ে পড়ায় সেই কাজে আমাকে নিযুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার কথা মেজকাকাকে বিশেষভাবে বলেন। আবেদন শুনে মেজকাকা সংগে সংগে সম্মতি দেন। কাকাদের কম বয়সে স্বনির্ভর হতে হয়েছিল বলে সেইভাবে আমাকেও ওই পথে নিয়োগ করতে তাঁর মনে কোন সংশয় আসেনি। তাছাড়া তিনি হয়ত বুঝেছিলেন এবং বিশ্বাস রেখেছিলেন সাধনায় আত্ম-নিয়োগ আমার অব্যাহত থাকবে এবং উন্নতির পথে কোন বাধা আমাকে আটকে রাখবে না।

গুরুর নির্দেশ ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সেই দিনই বিকেলে শ্যামবাবুর সংগে চলে গেলাম—বাক্স, বিছানা ও যন্ত্রাদি নিয়ে।

প্রথমতঃ শ্যামবাবু তাঁর ঠাকুরবাড়ীর একটি কুঠরীতে আমার জিনিস-পত্তর রাখিয়ে সংগে করে নিয়ে গেলেন তাঁর সেই ছাত্র ভোলাবাবুর কাছে। কথাবার্তায় তিনি জানালেন—সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত আমার গানের সংগে সঙ্গতে তালিম নেবেন। তার বিনিময়ে তিনি আমাকে দেবেন রাত্রে খেতে এবং থাকতে তাঁদের এক মেস্‌বাড়ীর একটি ঘরে। আগে থেকে শ্যামবাবুর ব্যবস্থা মত একটি ছাত্র প্রত্যহ গান শিখবে তার পারিশ্রমিক বাবদ পাব মাসে দশটি করে টাকা। এই দশটি টাকাতে দুপুরের খাওয়া ইত্যাদি সবই চালিয়ে যেতে হবে। স্বনির্ভরতার এই পথ আমাকে সন্তুষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

তারপর সেদিন কিছুক্ষণ এখানে সেখানে ঘুরে সন্ধ্যার পর গেলাম সেই পাখোওয়াজ শিক্ষার্থী মুনিবের বাড়ীতে। দু' ঘণ্টা ধরে সঙ্গতের সংগে ধ্রুপদ গেয়ে শরীর খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ কাকাদের বাড়ীতে সেই বেলা ১১টার সময় ভাত খেয়ে তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি বলে। এখানে জানতে পারলাম রাত ১১টার আগে আহারাদি হয় না। তবে সেদিন তাড়াতাড়ির মধ্যে ১০টায় খাইয়ে মালিক আমাকে বিদায় করলেন একটা চাকরকে সংগে দিয়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ মেস্‌বাড়ীতে।

বিছানা বাবদ দিলেন একটা কম্বল, একটা চাদর ও একটা বালিস। গ্রীষ্মকালে কম্বল, সুতরাং সুখ-শয্যারই ব্যবস্থা হল। মেস্‌টা ছিল শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছাকাছি। বৃহৎ তিনতালা এক বহুকালের পুরাতন বাড়ী। তিনতালার শেষের রুমের কাছে চাকরটি নিয়ে গিয়ে চাবি খুলে দিয়ে বলল—পয়সা দাও একটা মোমবাতী ও দিয়েসেলাই এনেদি'। ওই দুটো জিনিষ এনে দিয়ে সে চলে গেল। তখন ইলেকট্রিক বাতি ছিল না। পাশের ঘরগুলোতে তখন কেউই না থাকায় তালাবন্ধ ছিল। আমি বাতি জালিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি ধূলোয় ভর্ত্তি হয়ে আছে। কিছু না পেয়ে কম্বলটাতে করেই তক্তপোষটার ধূলো পরিষ্কার করে তার উপর কম্বল ও চাদর পেতে নিলাম। ঘুমে তখন চোখ জড়িয়ে এসেছে। মোমবাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো জালা থাকলে আমার ঘুম নষ্ট হয়। শুয়ে পড়ার পর যেমনি ঘুম এসেছে ওমনি সমস্ত শরীর কামড়ের জ্বালায় পিড়্ পিড়্ করে উঠল। ভাবলাম মোটা লোমের কম্বলটারই লোম ফুটছে। উঠে বাতিটা জালতেই দেখি অসংখ্য ছারপোকা ছুটে বেড়াচ্ছে। দু'হাতে আক্রমণ চালালাম তাদের বধ করবার জন্য; রক্তে হাত ভরে গেল। উপবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আলো থাকা সত্ত্বেও কড়ি কাঠের গুপ্ত স্থান থেকে গায়ের উপর পড়তে লাগল। কত আর তাদের মারব,—নিজেই ক্লান্ত হয়ে আমাকেই রণে ভঙ্গ দিতে হল,—পালিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে বেশ ধারণা এল এই ঘরে যিনি বাস করতেন তিনি বোধ হয় হাড় ক'খানি নিয়ে চাকরীর মায়া কাটিয়ে দেশে গিয়ে দেহ রেখেছেন কিংবা অন্যস্থানে পালিয়ে রক্ত শূন্য শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চারের ব্যবস্থা নিয়েছেন কর্ম্মস্থান হতে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে। দেখলাম সেই ভদ্রলোক এদের হত্যা করতে চেষ্টার ত্রুটি যে করেননি তা দেয়ালের চুনকামের উপর তার দৃশ্য শোভা নিরীক্ষণ করা মাত্রই মনে হল।

যাই হোক্— ভাবলাম, যদি বারাণ্ডায় শয়ন করি তাহলেও ছারপোকারা ছুটে আসবে, সুতরাং বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে এবং পায়চারী করে রাতটা কাটিয়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত করতে হল। এদের কাছ থেকে দূরে অর্থাৎ বারাণ্ডার প্রথম দিকটায় পালিয়ে রেলিংএ ভর দিয়ে রাস্তার দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই সীমানার বাড়ীগুলো এবং প্রত্যেকটার জানালা-দরজা বার বার গুনতে লাগলাম কয়েক সহস্রবার ধরে। এই-ভাবে ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে যখন ভোরের আলো দেখা দিলো তখন

সেখান থেকে সটান পালিয়ে এসে শ্যামবাবুদের ঠাকুরবাড়ীর রাস্তার রকে শুয়ে পড়লাম কিন্তু নানান ভাবনায় ও দুঃখে ঘুম আর এল না। একটু বেলাতে শ্যামবাবু আসতেই তাঁকে সমস্ত কথা বললাম। তিনি আমাকে সংগে করে অল্প দিনেই সখ মেটা তাঁর এক ছাত্রর কাছে নিয়ে গিয়ে আমার অবস্থার কথা জানালেন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর দোতালার বৈঠকখানার পাশের ছোট ঘরটিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্যামবাবুর ঠাকুরবাড়ী হতে আমার যন্ত্রপাতি সব নিয়ে এলাম। আমার রান্না করে খেতে হবে, এজন্য তার স্থান নির্নীত হল এক স্বামীজীর আখড়ার রান্না ঘরের চালাতে। শ্যামবাবু সেই স্বামীজীর ভীষণ ভক্ত ছিলেন। অনেক ভক্তদের ভক্তিভাজন হওয়ার নানান কারণও থাকে। তার পরিচয় পরে আসবে। সেদিন নীচের কলে স্নান সেরে নিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে জল খেয়ে গান সাধবার চেষ্টায় বসলাম কিন্তু বেশীক্ষণ পারলাম না রাত জাগার জন্য।

দশটার পর ঠিকানা ধরে গেলাম সেই পূর্বকথিত স্বামীজীর আখড়ায় রেঁধে খাবার জন্য। রাস্তায় কিনলাম এক পয়সায় একটা মালসা, দু'পয়সার আতপ চাল, আধ পয়সার আলু, রাস্তার ধারে ভাগ করা চাঁপাকলা চারটে আধ পয়সায়। তখন মাত্র দশ টাকা আয়ের উপর মধ্যাহ্ন ভোজনে এই চার পয়সার বেশী খরচ করা সম্ভব ছিল না। মনে হত যদি দু'এক টাকা বাঁচে তাহলে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো। স্বামীজীর রান্না হয়ে গেলে আমি সেই উনুনের উপর মালসায় চাল-জল ও আলু চড়িয়ে দিতাম।

স্বামীজী প্রত্যহ এক টুকরো কলাপাত ও একটু নুন দিতেন। সেই রান্নার বস্তুতে খিদে না মিটলে একঘটি জল খেয়ে নিতাম। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে সন্তুষ্ট চিত্তে সবকিছু মেনে নেওয়াই কর্ত্তব্য, এই উপদেশের শিক্ষা দাদুর কাছে পেয়েছিলাম।

ওই স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছুদিন আগেই শ্যামবাবু বলেছিলেন—উনি খুব বড়দরের বৈদান্তিক, শঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় অদ্বিতীয়।

এক একদিন বিকেলে শ্যামবাবু আমাকে তাঁর আখড়ায় ধরে নিয়ে যেতেন স্বামীজীর বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনাতে। প্রথম দিনে বেদান্তের ব্যাখ্যা আরম্ভের পূর্বে সেখানের রকের উপর বেদান্তের আবাহন পূজার দৃশ্য দেখে ভীতি বিহ্বল চিত্তে এক পাশে বসে রইলাম। বেদান্ত-ভাষ্য কণ্ঠে অধিষ্ঠিত

করবার জন্য স্বামীজী শিষ্যদের নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কারণ (মদ্য) ও তার সংগে আনুসঙ্গিক খাদ্য চলল। তারপর কিছুক্ষণ আবাহনের জন্য অপেক্ষা করে কারণের ক্রিয়া মস্তিষ্কে এসে পৌঁছতেই দাপটে সুরু করলেন শঙ্করভাষ্য। ক্রমশঃ ক্রিয়ার চাপ যখন বর্দ্ধিত হল অর্থাৎ কারণ যখন অকারণের মূর্ত্তিতে এল তখন ঘোর বিজড়িত কণ্ঠে শঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যা-গুলো তুব্‌ড়ীর মত উড়তে ও ফাটতে লাগল। শিষ্যদের তখন বিহ্বলিত রক্তনেত্রে আদর্শ ভাবগ্রাহীর মত মস্তক আন্দোলিত হতে থাকত। মনে হত স্বামীজীর বেদান্ত ব্যাখ্যার অপূর্ব রস হজম করবার একমাত্র এঁদেরই সামর্থ্য আছে। তবে এ রকম গুণগ্রাহী ভক্ত আরো জুটে যেতে দেরি হয় না যদি তারা জানতে পারে বিনা পয়সায় ওই পরম তরল বস্তুটি এখানে সহজ লভ্য।

এই দৃশ্য দেখে আমার দারুণ ভয় ও উদ্বেগ আসত কিন্তু শ্যামবাবুর ভয়ে পালিয়ে আসতে পারতাম না।

স্বামীজী যখন উত্তেজনার উপর এক একবার শঙ্কর ভাষ্য নিদারুণভাবে শিষ্যদের লক্ষ্য করে উদ্গিরণ ও নিক্ষেপ করতেন তখন ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। এক এক সময় আবার স্বামীজী নিজেরভাবে নিজেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠতেন, তা দেখে শিষ্যরাও আরো উচ্চে ক্রন্দনের রোল তুলে দিত। আমার পক্ষে তখন হাসি চেপে রাখা ভীষণ মুস্কিল হয়ে পড়ত। যদি কোন রকমে তাঁরা বুঝতে পারতেন আমি হাসছি তাহলে আর রক্ষা থাকত না। তাই আমি মুখে কাপড় গুঁজে মাথাটা হাটু দুটোর ভেতর লুকিয়ে রেখে ভাবগ্রাহীর মত মাথা নেড়ে পরিত্রাণের চেষ্টা করতাম। মোঘলের হাতে পড়ার মত এই এক অবস্থা গেছে আমার সেই চৌদ্দ বছর বয়সের সময়।

ভক্তদের ও স্বামীজীর যে রকম মতিগতি দেখেছিলাম—তাতে শঙ্কর ভাষ্য উপলব্ধির জন্য আমার হাত জোড় করে অনুনয় বিনয়ের উপর রক্ষা করার প্রার্থনাকে গ্রাহ্য না করে যদি চিৎকরে ফেলে জোর করে মুখে ঢেলে দিতেন তাহলে আমি কিই বা করতে পারতাম কিন্তু তাঁরা এই অত্যাচারে বিরত থাকায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম।

উপদেশের ভাষায় ঠাকুরদা' একদিন বলেছিলেন—যে বিদ্যা শিখেছ তাতে নানান প্রকৃতির মানুষের সংগে মিশতেই হবে কিন্তু দেখো ভাই! সমুদ্রে চর্‌বে কিন্তু ডানা না ভেজে,—অর্থাৎ আমাদের গান-বাজনার

লাইনে অনেক প্রলোভন এসে পড়তে পারে, সে সমস্ত হতে খুব সাবধানে থাকতে হবে, তবে এর মধ্যেও একটা কথা মনে রাখবে সংসর্গে আসা বা এসে পড়া যে কোন ব্যক্তির মধ্যেই কম-বেশী গুণবস্তু আছেই, একেবারে কেউই মন্দ হয় না, সুতরাং শ্রদ্ধার সংগে দেখলে গুণের সন্ধান পাবেই এবং সেগুলি অন্তরে গ্রহণ করবে।" দাদুর এইসব উপদেশবাণী আমি সর্বদাই স্মরণে রাখি।

সেই সঙ্গতকার ভোলাবাবু ছ'ঘণ্টা সঙ্গত করে তারপর বন্ধুদের সংগে কেরম্ খেলতে বসতেন। আমি বসে খেলা দেখতে দেখতে তারপর এক-পাশে শুয়ে পড়লাম। রাত ১১টার সময় চাকর এসে উঠিয়ে নিয়ে যেত খাবারের জায়গায়। খাবার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। তিন চার রকমের ব্যঞ্জন দিয়ে পাঁচ-ছ' গণ্ডা লুচি অম্লান বদনে খেয়ে নিয়ে জনশূন্য রাস্তার খানিকটা হেঁটে সেই নূতন থাকার স্থানে পৌছে গেলেই গৃহ-মালিকদের বয়স্ক পুরাতন ভৃত্যটি সংগে সংগে দরজা খুলে দিত। সে প্রথম দিনেই আমাকে দেখে কি রকম এক মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে গেছল। আমি না আসা পর্য্যন্ত সে জানালার কাছে বসে রাস্তার দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকত। আমার ওই বয়সে এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখেই বোধ হয় সে আমাকে নিবিড় স্নেহে ঘিরে রাখতে চাইত।

এখনও তার হৃদয়ের মানবতার পরিচয় যখন মনে পড়ে যায় তখন চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠে। তার কাছে যে বস্তু পেয়েছিলাম সেই বস্তুর কামনাই এই সংসারে সর্বপ্রধান বলে মনে হয়।

ওই বাড়ীতে কোন গোলমাল বা ব্যাঘাত ছিল না বলে সাধনার খুব সুযোগ এসেছিল। প্রত্যহের নিয়মমত ভোর চারটায় উঠে প্রথমতঃ ঘণ্টা-দুই কণ্ঠ সাধনা করে তারপর দু' ঘণ্টা ধরে সমানে সেতার বাজিয়ে যেতাম। ৮টার সময় সেই ছাত্রটিকে গান শেখাতে যেতাম, ৯টায় ফিরে এসে স্নান সেরে সন্ধ্যা আহ্নিক সমাধা করে এক পয়সার মুড়ি কিনে জলযোগ সেরে গাইতে বসতাম এবং চলত ১১টা পর্য্যন্ত। তারপর রান্নার সেই সব দ্রব্যাদি কিনে স্বামীজীর উনুনে রান্নার পর খাদ্যের সেই উপাদেয় বস্তু গলধঃকরণ করে ফিরে এসে বসতাম স্বরলিপি দেখে গান তুলতে এবং জানা গান ও গৎগুলো স্বরলিপি করে রাখতে।

মেজকাকা প্রায়ই গান রচনা করতেন দেখে আমিও সেখানে যেয়ে প্রথম থেকেই একান্ত আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করতাম গান রচনা করতে।

অন্তে পারছে আমিই বা কেন পারব না—এই রকম একটা জিদ্ বরাবরই আমার আছে। এটা অবশ্য সঙ্গীত বিষয়ের উপরই বিশেষ করে। এগার বছর বয়সের সময় প্রথম প্রচেষ্টায় সোজা বাংলা ভাষায় খেয়ালের অনুকরণে দু' তিনটি গান রচনা করে অতি সঙ্কোচের সহিত মেজকাকাকে দেখাতে তিনি সবিস্ময়ে ও কৌতূহলের সহিত গানগুলো পড়ে নিয়ে আমাকে সেগুলো গাইতে বলেন। গেয়ে শুনাতে খুব উৎসাহ দান করায় আমার সাহস, আশা ও ভরসা এসে গেছল। আমি আশাই করতে পারিনি তিনি উৎসাহিত করবেন। এই হচ্ছে আদর্শ গুরুর লক্ষণ। অনেকের স্বভাব আছে নিজের গরিমায় আচ্ছন্ন থেকে অন্যের কোন উন্নতি ও সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত না করে দমিয়ে দেবার জন্য উন্নাসিকতা ও অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকেন।

কয়েক বছর আগে এই সব বিষয়ে বিশেষ উৎসাহদাতারূপে পেয়েছিলাম বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সঙ্গীতগুণগ্রাহী ৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে। আমার বহু লেখা গভীর মনযোগ দিয়ে পাঠ করে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এক সময় ভাগ্যকুলমেন্‌শনের (সার্কুলার রোডে) তিনতালার পাশাপাশি ফ্লেটে অনেকদিন উভয়ে সপরিবারে ছিলাম। তারপর তিনি যেখানে উঠে এলেন—সেই বাড়ীর পশ্চিমদিকের যে বাড়ীতে এখন আছি সেটি তাঁরই আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় পেয়েছিলাম। আমাকে কাছে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে আজ প্রায় তেত্রিশ বছর হয়ে গেল।

উপেনবাবু শাস্ত্রীয় সংগীতের বিরাট বোদ্ধা ছিলেন বলে আমার শিক্ষা, সাধনা ও জ্ঞানের প্রতি বিশেষরূপে স্বীকৃতি দান করতেন। আমার এখনকার বাসাবাড়ীর ছাতের আলিসার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সংগে মুখোমুখি হয়ে এক একদিন সংগীত অথবা সাহিত্য নিয়ে বহুক্ষণ ধরে আলোচনা হত। বয়সের অত তফাৎ ছিল কিন্তু তিনি আমাকে অতি আগ্রহের সহিত হৃদয়ের সংগে যুক্ত করে রেখেছিলেন।

তারপর যখন তিনি বালিগঞ্জে বাসা নেন তখনও প্রত্যেক সোমবার গানের আসরে আসতেন। তাঁর মত গুণগ্রাহী, মহৎ ও উদার ব্যক্তি আমি খুব কম দেখেছি। কথার মিষ্টি রসে ও কৌতুকবাক্যে মনকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তখন এমন একটা বিরাট সমাজ ছিল যাঁর মধ্যে দেখতে পেতাম আভিজাত্যের গুণাবলী নিয়ে রীতি-নীতি ও কর্ত্তব্যে সচেতন এবং বোধজ্ঞের সংখ্যাই বেশী।

এ সম্বন্ধে দু'চারটে শিক্ষণীয়ের মত উদাহরণ,—তুলসী গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামপুরের (হুগলী জেলা) বিখ্যাত জমীদার এবং ইংরেজ আমলের শেষ সময়ে বাংলার মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষায় খুব উঁচুদরের বক্তাও ছিলেন। ওঁর স্ত্রী আমার কাছে শিখতেন। একবার আমার তখনকার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিক্ষাশ্রমের বাৎসরিক উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র তুলসীবাবুকে দিতে তিনি বলেছিলেন—আপনার এই দয়ার আহ্বান খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করলাম কিন্তু উৎসবের ঐদিন ওই সময় গভর্ণর হাউসে মিটিং থাকায় আপনার ওখানে উপস্থিত হতে পারছি না বলে ক্ষমা চাচ্ছি—তবে আপনার ছাত্রী নিশ্চয়ই যাবেন—আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।" ছাত্রীর সংগে কথা বলে যখন নীচে নেমে গেটের কাছে এসেছি তখন দেখি তুলসীবাবু মোটরে উঠবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন,—এখন কোথায় যাবেন ?—মহারাজ টেগোরের বাড়ী যাব বলায় তিনি বললেন্—তাহলে আসুন আমার সংগে, আমি এসেম্ব্লি যাচ্ছি—আমাকে ড্রাইভার নামিয়ে দিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে—এই বলে তিনি নিজে দরজা খুলে আমাকে ডানদিকে বসিয়ে নিজে ঘুরে গিয়ে বাঁ দিকে বসলেন। এই নিয়ম-নীতি গৃহাগত খুব উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি পালন করতে হয়। আমি তাঁর স্ত্রীর সংগীতগুরু বলে তিনি নিজেও গুরুর মত ভেবে এই মর্য্যাদা আমাকে দিয়েছিলেন। অবশ্য শাস্ত্রীয়সংগীতে অধিকারী ব্যক্তির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তিও ছিল। দু'একবার গান শুনিয়ে সে পরিচয় পেয়েছিলাম।

তখন আমার সেই বয়সে অর্থাৎ তিরিশের মধ্যে হাইকোর্টের জজেদের বাড়ী, স্যার বি. এল, মিত্রের (স্বাধীন যুগের গভর্ণর) বাড়ী, নড়াইলের জমীদার ভবেন রায় মহাশয়ের বাড়ী, সন্তোষের মহারাজার বাড়ী, রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ী, ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ী এবং বড় বড় নামকরা ব্যক্তিদের বাড়ীতে শিক্ষকতা করে দেখেছি—ওইসব বিরাট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বয়েসের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষা-সাধনার উপরে কি সুন্দর-ভাবে খাতির-সম্মান ও যত্ন দেখাতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেক্চারার ও বিরাট মনীষী ছিলেন রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। ইনি উচ্চাঙ্গ কীর্তন গানেও সুদক্ষ ছিলেন এবং সে যুগের বিখ্যাত ধ্রুপদী বিশ্বনাথজীর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। খগেনবাবু আমাকে যেরূপ যোগ্য মর্য্যাদা দিতেন সে কথা নিজের মুখে বলা যায় না। এস্থলে

সংগীতে তাঁর অনুরাগ ও সে সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের দু' একটি পরিচয়—আমার সংগীত শিক্ষাশ্রমের বাৎসরিক উৎসবের এক সময়ে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য মৈমনসিং এর মহারাজার বাড়ীতে যাই। সেখানে পৌঁছে চাকর মারফত পরিচয় পত্র পাঠান মাত্র মহারাজা তৎক্ষণাৎ আমাকে আহ্বান করেন। সিঁড়ি বেয়ে আমার ওঠার শব্দ পেয়ে নিজে এগিয়ে এসে সমাদরে কাছে বসালেন। আমার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই তিনি বললেন,—জমীদারী সংক্রান্ত বিষয়ে আজই আমাকে দেশে যেতে হচ্ছে, আপনার উৎসবের আগে ফিরতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং এই সম্মানের পদ রক্ষা করতে পারছিনা বলে খুব লজ্জিত হচ্ছি, এবং সবচে' লজ্জিত হচ্ছি আপনার কষ্ট করে এতদুর আসার জন্য।"

মহারাজ চাকরকে বলে দিলেন—ড্রাইভারকে বলে দাও এঁকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। অভিবাদন জানিয়ে নীচে এসে মোটরে বসে ভাবলাম—সভাপতিত্ব করার অন্যতম উপযুক্ত ব্যক্তি খগেনবাবু, তাঁকে গিয়ে বলে দেখি সম্মত হন কি-না। তাঁর বাড়ীর গেটের কাছে গাড়ী হতে নেমে ড্রাইভারকে বললাম ফিরে যেতে। বেলা তখন ১২টা হবে। নীচেই দেখা পেলাম খগেনবাবুর এক ছেলের। তাঁকে বললাম আপনার বাবাকে বলুন আমার আসার কথা। তিনি উপরে গিয়েই সংগে সংগে নেমে এসে বললেন—বাবা ডাকছেন,—চলুন। আমাকে দেখেই খগেনবাবু বললেন,—খেতে বসছিলাম, এই অসময়ে কিজন্যে কষ্ট করে এলেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনও খাওয়া হয়নি—এখানেই দু'টো ডাল ভাত খেয়ে নিন!

আমি তাঁর এই আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে বললাম—এক্ষণি বাড়ীতে গিয়েই খাব, খিদে ছিল কিন্তু আপনার এই আদরের কথা শুনে আর খিদে নেই তৃপ্তিতে মন ভরে গেছে। খগেনবাবু বললেন—গার্হস্থ্য জীবনে এটা যে একটা বড় কর্ত্তব্য।" আসার উদ্দেশ্যের কথা নিবেদন করতে তিনি বললেন—ওই দিন বিকেলে এক জায়গায় আমাকে কীর্ত্তন গাইতে হবে, তাই ভাবছি,—যাই হোক্—আপনি যখন এত কষ্ট করে এসেছেন তখন আমাকে যেতেই হবে গান সংক্ষেপ করে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঠিক সময়েই উপস্থিত হব। আমি খুব খুসী মনে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। উৎসবের ধার্য সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই উপস্থিত হয়ে—শেষ 'পর্য্যন্ত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে বিষ্ণুপুর ঘরাণা সম্বন্ধে এবং আমার সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছিলেন তা নিজের থেকে লেখা চলে না।

আমার 'সংগীত-জ্ঞান-প্রবেশ' গ্রন্থটি ছাপা হতেই খগেনবাবুকে একখণ্ড পাঠিয়ে দিই, অতিসত্বর চিঠিতে জানিয়েছিলেন—রাত ১১টায় বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই আপনার গ্রন্থটি পড়তে আরম্ভ করেছিলাম মনযোগ সহকারে, আগাগোড়া পড়ে বুঝলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শ গ্রন্থ হয়েছে, গানগুলি শুনবার বাসনা রইল।"

'সঙ্গীত ও কাহিনী নামক উপন্যাস আকারে রচিত গ্রন্থটি খগেনবাবুকে পাঠিয়েছিলাম মধুপুরে। তিনি তখন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ওখানকার বাড়ীতে ছিলেন।

শরীরের ওই অবস্থাতেই যত্নসহকারে গ্রন্থটি পাঠ করে সাত দিনের মধ্যেই লেখা সম্বন্ধে বিরাট মন্তব্য পাঠিয়ে ছিলেন ডাক যোগে॥

মাননীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে আমার প্রত্যেকটি রচিত গ্রন্থ পাঠানর পর সুন্দর আলোচনার সহিত মন্তব্যলিপি সত্বর পাঠিয়ে দিতেন। 'সংগীত ও কাহিনী' নামক গ্রন্থটি পেয়ে লিখেছিলেন (তখন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য ছিলেন) অত্যধিক ব্যস্ততার মধ্যে আছি, তোমার প্রেরিত গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়তে কিছু সময় লাগবে, উপস্থিত প্রাপ্তি স্বীকার আনন্দের সহিত জানাচ্ছি। তোমার লেখা গ্রন্থাদি কারো মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না, উৎসর্গের লেখাটি বড় ভাল লাগল।"

সুসাহিত্যিক রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে ওই গ্রন্থটি পাঠিয়েছিলাম—তিনি নিজে এসে বিরাট মন্তব্যলিপি দিয়ে গেছলেন এবং বলেছিলেন এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে যে বহু স্থানে আমাকে আগ্রহ নিয়ে দু'বার করে পড়তে হয়েছে।"

মাননীয় সত্যরঞ্জন দাস মহাশয় যে সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য ছিলেন সে সময় সংগীতভবনের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায় দাস মহাশয় আমাকে সেই পদ গ্রহণ করবার জন্য তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে দেখা করতে অনুরোধ জানান। আমাকে এই পদ গ্রহণের জন্য কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ই সত্যরঞ্জন দাস মহাশয়কে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দাস মহাশয়ের সরল অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেট পেরিয়েও এসেছিলেন। এই রকম নীতি-নিয়ম ও ব্যবহারিক কর্তব্যবোধকে অনুসরণ করলে তবে বড় হওয়া যায়।

'সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় সঙ্গীত সম্বন্ধীয়

এবং রাগ বিশ্লেষণ ইত্যাদির নিবন্ধ নিয়মিত পাঠ করে গৌরীপুরের স্বর্গতঃ রাজা সঙ্গীতবেত্তা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় কলিকাতায় তাঁর স্কীয়াষ্ট্রীটস্থ বাটীতে লোক পাঠিয়ে আমাকে তাঁর কাছে যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। আমি নির্দ্ধারণ মত সময়ে উপস্থিত হতেই অতি সমাদরে কাছে বসিয়ে আমার সঙ্গীতে অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে প্রশংসা ও তার সংগে খুব উৎসাহ প্রদান করেন। উক্ত রাজার আমলে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এঁর পুত্র কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী যেমন সঙ্গীতে জ্ঞানী, তেমনি যোগ্য ব্যক্তিকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। আমাকে কিছুদিন আগে এক চিঠিতে বিবিধ বিষয়ের সংগে উল্লেখ করেছিলেন—আপনি বাংলার সঙ্গীত নায়ক'। এঁর সাহচর্য্যে যিনিই এসেছেন তিনিই বুঝতে পারবেন ইনি কত মহৎ অন্তঃকরণের মানুষ। পঁচিশ বছর বয়েসে খেয়াল হল লাইসেন্স পেয়ে একটা বন্দুক কিনতে হবে। স্যার বি, এল, মিত্রের কাছে তাঁর মেয়েকে (আমার ছাত্রী) দিয়ে লাইসেন্সের জন্য পরিচয় পত্র পাবার কথা জানাতে তিনি আমাদের ঘরাণা বংশের কৃষ্টি, ঐতিহ্যাদি ও প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিয়ে আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখে দিলেন যা পড়ে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন এ এক বিরাট প্রসংশাপত্র। অত বড় ব্যক্তির এ রকম লেখার যথেষ্ট মূল্য আছে।

দরখাস্ত করার দিনে পরিচয় পত্রগুলির মধ্যে স্যার মিত্রের লেখাটি পাঠ করে সহকারী পুলিশ কমিশনার ললিতবাবু বলেন এই পরিচয় পত্রের উপর আর আপনার এত সব হাইকোর্টের জজেদের, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের উচ্চ পরিচয় পত্রের প্রয়োজন ছিল না, স্যার মিত্রের চিঠিতেই যথেষ্ট। আমি তাঁকে বলি - এঁদের সব বাড়ীতে শেখাই,—সুতরাং আমাকে নিজে থেকে চাইতে হয়নি ছাত্রীরা শুনে তারাই এনে আমাকে দিয়েছে। তখন দারুণ বিপ্লবের অগ্নিযুগ;—বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ ছিল, তত্রাচ সহজেই পেয়েছিলাম 'অল ইণ্ডিয়ার' লাইসেন্স।

সংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই ক' বছর যা দেখছি তাতে আগে কোনদিনই ধারণায় আনতে পারিনি যে, এখানের সঙ্গীত সম্মেলনে বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতের পীঠস্থান ও প্রধান কেন্দ্রের ঘরাণা বংশের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের এবং তার প্রবীন প্রতিনিধিদের এই সব সম্মেলনে সাগ্রহ আহ্বান থাকবে না। কোন প্রদেশের কোন স্থানে যদি বিষ্ণুপুরের মত সংগীতের

পীঠস্থান ও ঘরাণা থাকত তাহলে সেই প্রদেশের সঙ্গীত রসিক ও কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তিরা সেই পীঠস্থানের ঘরাণার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠাবান সঙ্গীতজ্ঞদের সেখানের সম্মেলনে যদি দেখতেন তাঁদের আহ্বান করা হয়নি, তাহলে সমস্বরে প্রতিবাদ আসত এবং এ রকম বেয়াদপী তাঁরা সহ্য করতেন না। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তিন দশকের মাঝামাঝি থেকে চার দশকের প্রথমেই মনে হচ্ছে ৺কাশীধামে যথা নিয়মে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়েছিল। সেখানের সাধারণ গায়ক-বাদকদেরও অধিবেশন সূচীতে নাম থাকায় আমি কৌতূহলী হয়ে সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এখানের গায়ক-বাদকদের পরিচয় দেওয়া, উৎসাহিত করা, আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। এই যে এত শ্রোতার সমাগম হয়েছে সে তো তাঁদেরই শিক্ষার গুণে। সুতরাং তাঁদের সম্মান ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আমাদের সচেতন থাকতেই হবে। ওই সম্মেলনের সেক্রেটারী ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও খুব বড় অভিজাত বংশের সন্তান তাই মনে হয় তাঁর মুখ থেকে কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ কর্তব্যের কথা প্রকাশ পেয়েছিল।

এখন সেই মূলসূত্র থেকে আরম্ভ করি,—মেজকাকার কাছে উৎসাহ পেয়ে সেই বয়স থেকেই গান রচনার অভ্যাস বাড়াতে লাগলাম। এক সময় হিন্দী শিক্ষকের কাছে হিন্দী ভাষার কিছু দখল পেয়েছিলাম বলে চব্বিশ বছর বয়সের সময় থেকে হিন্দী গান রচনায় আগ্রহী হই। তাছাড়া হিন্দী গান গাইতে হলে তার ভাবার্থ বুঝা এবং শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের জন্য হিন্দী ভাষা শিক্ষার অন্ততঃ কিছুও আবশ্যক আছে। আমি সেই সময় হতে সঙ্গীত সাধনার মত রচনা ইত্যাদির সাধনাও রেখে এসেছি।

শিক্ষা দেওয়ার সময় এমন অবস্থা অনেক সময় ঘটেছে যে, কোন রাগের হিন্দী খেয়াল যে গুলো জানা আছে তা যাকে শেখাচ্ছি তার গ্রহণের ঠিক উপযোগী হচ্ছে না, বা সে গানগুলো অন্যের শেখা হয়ে গেছে বলে তার মনঃপুত হচ্ছে না, - অন্যের না জানা গান চাই, - তখন একটু ভেবে নিয়ে সেই রাগের নূতন কায়দায় বন্দেজী সুর দিয়ে অস্থায়ীটা রচনা করে সেটা শিখিয়ে দিয়ে ওই অংশ তার রেওয়াজ করতে করতে অন্তরাটা তৈরী করে শিখিয়ে দিয়েছি। শেষোক্ত ধরণেরবাছ বিচারকারী ছাত্র-ছাত্রীরা এই টাটকা রচিত গান পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছে। অবশ্য তাদের জানাতে পারিনি গানটা আমিই রচনা করে শিখিয়ে দিলাম বলে।

যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা আমার রচিত গান শুনে সেই সব গান শিখতেই বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে এসেছেন তার মধ্যে প্রধান হলেন মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।

এরপর মূল প্রসঙ্গে যাই,—কোলকাতায় থাকার সেই সময়ে মাস দুই না যেতে যেতে বেশী করে দুরাদৃষ্টের গর্ত্তে পড়ে গেলাম, অর্থাৎ ভোলাবাবুর সঙ্গত করার সখ মিটে গেল। সুতরাং রাত্রের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, যে খাওয়াটার উপরই মূলতঃ আমার শরীরের শক্তি নির্ভর করেছিল। কি আর করা যাবে—ভগবান যেভাবে নিয়ে যাবেন সেই ভাবেই চলতে হবে তাঁর উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তি রেখে। ছোট থেকেই দাদুর কাছে শিখে মনে প্রাণে ধরে রেখেছি তিনি যা করেন তা ভালর জন্যই। তবে এত বড় বিশ্বাস রেখে যাওয়া খুবই শক্ত বলে মন এক এক সময় দিশা হারিয়ে ফেলে।

যাইহোক— রাত্রের খাওয়াটা দু'এক পয়সার মুড়ি-মুড়কীতেই চালিয়ে নিতাম। বরাবরই আমার খিদেটা খুবই বেশী ছিল কিন্তু তাকে দমিয়ে সময় সময় রাখতেই হত। প্রথম দিনের সেই ছারপোকা সঙ্কুল যমালয় সদৃশ মেসের গৃহ হ'তে পরের দিন থেকে যে বাড়ীতে স্থান পেয়েছিলাম—সেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রী একদিন আমাকে ডাকিয়ে বললেন—বাবা! তুমি বামুনের ছেলে তাই বলতে ভরসা পাচ্ছি না তবু সঙ্কোচ নিয়ে বলছি —রাত্রে তুমি আমাদের হাতের রান্না ভাত খাবে? চাকরটা খুব দুঃখ করে বলছিল—তুমি নাকি রাত্রে শুধু চাট্টি মুড়ি খেয়ে কাটাচ্ছ, সে তোমার অবস্থার এইসব কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেল্‌ল; শুনে আমারও মনটা কি রকম হয়ে গেল তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি পারবে কি খেতে?"

আমি একটু থেমে ক্ষুধার যন্ত্রণাদায়ক আক্রমণ স্মরণ করে বলে ফেললাম আপনাদের রান্না খাব।

প্রথম দু'চার দিন গৃহকর্ত্রী নিজে বসে থেকে যত্ন করে খাওয়ালেন। অবশ্য আয়োজন অতি সাধারণ মতই ছিল। অন্নগুলি দেখে মনে হত এ অন্ন তাঁদের নিজেদের জন্য নিশ্চয়ই নয়। অবশ্য তাতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হত না—পেট ভরলেই হচ্ছে এবং পেট ভরে খেতে যে পাচ্ছি এই যথেষ্ট মনে করতাম কিন্তু দু' চার দিন পরেই দেখতে পেলাম গৃহিণীর যত্নের ওজন বেশ কমে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল খেতে দেওয়াটা যেন খুব অনিচ্ছার উপর এসে গেছে। এর কারণ বুঝতে গিয়ে কম বয়সের বুদ্ধিতে

মনে হল খাওয়ার ওজনের গুরুত্ব দেখেই বোধ হয় পিছিয়ে পড়ছেন, দেখা যাক্ কম খেয়ে। পরের দিন অর্দ্ধ ভোজনের অনুরূপ অন্ন-ব্যঞ্জন নিলাম কিন্তু তাতেও অদৃষ্টে সুরাহার লক্ষণ দেখা দিল না। সে দিন এ কথাও মনে হয়েছিল বোধ হয় গৃহকর্ত্রীর আমার উপর এই অহেতুক সহানুভূতি ও মমতার উপর গৃহ পরিজনদের ঘোরতর আপত্তি এসেছে—তাই এই পরিণতির মূল কারণ। যাই হোক্ এ রকমভাবে খাওয়া যে আর চলতে পারে না সে কথাই পরিষ্কারভাবে অনুভব করলাম। সেই সুহৃদ ভৃত্যটি খাবার সময় প্রত্যেক দিনই দাঁড়িয়ে দেখত, সে দিন খাদ্যবস্তু খুব কম নেওয়া দেখে সংগে সংগে সে পালিয়ে গেল। সে সবই বুঝতে পেরেছিল। সকালে আমাকে বেদনাহত চিত্তে বলল—খোকাবাবু! তুমি অন্য কোথাও থাকবার জন্য চেষ্টা কর, আর সব চে' ভাল হয় যদি দেশে মায়ের কাছে চলে যাও, আমি তোমার এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।"

এই বলেই চোখ দিয়ে তার ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগল। তখন আমার মনে হয়েছিল মায়া-মমতার সম্পদগুলো ভগবান কি এদের মত দুঃখী জীবীদের অন্তরেই অধিক্ দিয়ে পবিত্র করে রেখেছেন? অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলাম—তাই দেশেই চলে যাই, কিন্তু পরক্ষণেই মনের ভেতর থেকে কে যেন জোরে সাহস দিয়ে বলতে লাগল, এত শীঘ্র পরাভব মেনো না, তুমি তো সে ছেলে নও, চেষ্টা করে দেখ অন্যত্রে থাকতে খেতে পাও কি না, সর্বদা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, যেমনভাবে নির্ভর করে এসেছ সেই রকমভাবেই তাঁকে নির্ভর করে যেতে হবে; ৺পূজার আসন্ন সময় পর্য্যন্ত যদি কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে পার তার চেষ্টা কর বাড়ীর অবস্থা ভেবে, কর্ত্তব্য ও আদর্শ রক্ষার জন্য দুঃখ-কষ্ট পেতেই হবে…।"

এই সব কথাগুলো মনের সামনে এসে পড়ায় থাকার চেষ্টাই বড় হয়ে উঠল।

শ্যামবাবুর কাছে তৎক্ষণাৎ গিয়ে সব কথা জানালাম এবং আসন্ন পূজা পর্য্যন্ত থাকার একান্ত ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন—আমাদের ঠাকুরবাড়ীর এই কুঠরীতে থাক এবং এক্ষুণি সেখান থেকে জিনিসপত্র সব নিয়ে এস। দাদা কোন রকমেই অমত করবেন না—এইসব কথা এখন তাঁকে জানালে; তারপর চেষ্টা করে দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।" গৃহ মালিকদের কাছে গিয়ে বললাম আমি অন্যত্রে সরে যাচ্ছি, মনে হল তাঁরা খুসীই হলেন, সর্বদা গান, সেতার সাধনায়

আওয়াজও মনে হয় তাঁদের কাণে অসহ্য হয়ে উঠেছিল ॥

একটা মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে যখন নীচে নেমে এলাম তখন দেখি তাঁদের সেই মানবহৃদয় ভৃত্যটি সদর দরজার কাছে অতি করুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দৃশ্য দেখে আমার চোখে জল এসে গেছল। তার গায়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হাত বুলিয়ে বিদায় চাওয়ার সময় তার হাতে চার আনা পয়সা দিতে গেছলাম কিন্তু সেটা যে কত অন্যায় ও ভুল হতে পারে তার বিচার আগে আসেনি, যখন দেখলাম সে রেখে দিয়েছিল আগে থাকতেই হাত করে আট আনা পয়সা এবং গ্রহণ করবার জন্য খুব মিনতি জানাতে লাগল, তখন বিচার ভুলের জন্য লজ্জায় মাথা নেমে এসেছিল। যে জিনিস তার কাছে পেয়ে এসেছিলাম এবং সেই মুহূর্তে আরো বেশী করে পেলাম সেই সম্পদের কাছে অন্য আর কোন জিনিস কি নিতে পারা যায়? সেই মানুষটির মানবতাপূর্ণ হৃদয়ের স্পর্শ আমার অন্তরে নিবিড় হয়ে আছে। সেদিন মনে হয়েছিল—তাই লোকে বলে গরীবের কাছেই ভগবান।

শ্যামবাবুর চেষ্টায় দু' চার দিনের মধ্যেই দশ টাকার আয় বাড়িয়ে আর একটি ছাত্র জুটে গেল। মোট আয় কুড়ি টাকা হয়ে যাওয়ায় অসুবিধা বিশেষ রইল না। ঠিক করে নিলাম এই কুড়ি টাকা থেকে অন্ততঃ আটটি করে টাকা বাঁচিয়ে দাদুকে পাঠাতেই হবে। এই সময় থেকে প্রায়ই এ বাড়ী ও বাড়ী এবং নানান আসরে আমার গান ও সেতার হতে লাগল। এই সব জায়গায় গানের পর জল খেতে দেওয়ার মধ্যে যা থাকত তাতেই রাত কাটিয়ে দিতাম। অন্যদিন সেই রকমভাবে মুড়িই খেয়ে থাকতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য—আহারাদির এই অবস্থাতেও শারীরিক দুর্ব্বলতা কোন দিনই অনুভব করিনি, বরং দেশে যাবার সময় বেশ একটু মোটাসোটাই হয়েছিলাম। এই কথাই এখন ভাবি কর্ত্তব্য পালনে যদি নিষ্ঠা থাকে এবং তাঁর উপর নির্ভর করা যায় তাহলে শরীর মন কোনটারই ক্ষতি করে না, উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই সহায়ক হয়। সব বিষয়ে সন্তুষ্টই মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর।

ঠাকুর বাড়ীতে থাকার বিনিময়ে শ্যামবাবু আমার কাছে সুরবাহারে আলাপ এবং গান শিখতেন। পাঁচ 'ছ' ইঞ্চি চওড়া ডাণ্ডির সেতার তৈরি করিয়ে তাতেই তখন যন্ত্রীরা শুধু আলাপ বাজাতেন এবং এই রকম সেতারকে সুরবাহার নামে ব্যবহৃত হত। কোলকাতার সেই দাদু

(নীলমাধব চক্রবর্ত্তী) এই রকম একটি বৃহৎ সেতার আমাকে দান করেছিলেন, ছোট সেতারে আমার আলাপ বাদন শুনে। ওই বৃহৎ সেতারটিতেই তিনি আলাপ বাজাতেন। এই ঠাকুর বাড়ীতে আসার কিছুদিন পরে ৺রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এক ধনীর গৃহে আমার গান হওয়ায় পাঁচটি টাকা পেয়েছিলাম।

ওই পাঁচ টাকায় শ্যামবাবুর ব্যবস্থাপনায় বড় এক ঝুড়ি কাশীর নেংড়া আম দাদুর নামে পার্শেল করে দেশে পাঠিয়ে দিই। মাঝে মাঝে লোকের দেওয়া এই আম যখন এক আধটা খেতে পেতাম তখন তার অপূর্ব স্বাদে মনে হত আমি খাচ্ছি—মা, দাদু প্রভৃতি এমন জিনিষ খেতে পাচ্ছেন না, মনের সেই কষ্ট ভগবান রাখেন নি, তাঁরই কৃপায় আম পাঠাতে পেরেছিলাম।

শ্যামবাবুর ঠাকুর বাড়ীতেও খুব জাঁকজমকের সহিত সাত দিন ধরে রথযাত্রার উৎসব হত। এই উৎসবে প্রত্যেক বছরই ঠাকুর জগন্নাথ দেবের সামনে একদিন করে শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর হয়ে আসত। সে বছর কাকারা এসেছিলেন এই আসরে।

সেই স্বামীজী হঠাৎ দশ-পনর দিনের জন্য বাইরে চলে যাওয়ায় সেই ক'দিন আমাকে দুপুরে দৈ-চিড়ে খেয়ে থাকতে হয়েছিল।

এই সময় হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় অদ্ভুত চেহারায় টলতে টলতে এক ব্যক্তি এসে ঠাকুরবাড়ীর রাস্তার রোয়াকের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল, আমি তখন দৈ-চিড়ে কিনে ফিরছিলাম। শ্যামবাবুও ঠাকুরবাড়ীতে আসছিলেন। তিনি তাকে দেখেই আমাকে বললেন—ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক রম্‌জান্ খাঁ সাহেব।

নাম শুনেই আমি চমকে উঠলাম। মেজকাকার মুখে শুনেছিলাম—এঁর মত টপ্পা গায়ক আর দ্বিতীয় নেই। সেই ব্যক্তির এ-কি দশা! পরণে ছেঁড়া পেণ্টুলুন, গায়ে ছিন্ন মলিন লম্বা জামা, হাতে মাংস সমেত কটরা, মুখে বিড়ির টান, চোখ দুটো লাল ও ঘোরাচ্ছন্ন, কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেশী মদের উৎকট গন্ধ আসতে লাগল। এইরূপ অধঃপতনে যাওয়া দেখে মনে হতে লাগল—বড়দরের নামকরা গায়ক হয়ে কি করে এমনভাবে নিজের সর্বনাশ ঘটাতে পারে!

দেখতে দেখতে সেখানে বেশ কয়েকজন লোক এসে পড়ল। আমি কখনও তাঁর গান শুনিনি বলে একটা টপ্পা শুনাবার জন্য অনুরোধ জানালাম। খাঁ সাহেব বললেন—প্যয়সা দেনা হোগা; আমার

সাধ্যানুযায়ী চার আনা পয়সা দিলাম, তিনি তাতেই খুসী হয়ে ভৈরবী রাগের বিখ্যাত গান "মানিলে বসন্ত আয়া……।" এই গানটি গাইলেন। কণ্ঠ নেশায় জড়িয়ে ছিল এবং স্বরের মাধুর্য্যও নষ্ট হয়ে গেছল, তত্রাচ বন্দেজী কায়দা এবং ওই রাগের উপর সুরের কতকগুলি নূতন কৌশলপূর্ণ উপস্থাপনা ও মধ্যগতির পাকা গমকী জোড় তান আমাকে বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত করে দিয়েছিল। এখনও তাঁর গাওয়ার চিত্ররূপ সম্পূর্ণই মনে আছে।

সেদিন মনে হয়েছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় না জানি কত ভাল গাইতে পারতেন। অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে ভাবতে লাগলাম কত সাধনা করে কত উচ্চে উঠেছিলেন কিন্তু এই সাংঘাতিক নেশায় সব নষ্ট করে দিয়ে একেবারে নীচে নামিয়ে দিলে? এই নেশায় শুধু এই মানুষটিই নয়; দেখে এসেছি কত নাম করা গায়ক-বাদকও এর প্রভাবে চরম অবস্থায় পৌঁছে অসময়ে মৃত্যুকে ডেকে এনেছেন। শুনেছিলাম রম্‌জান খাঁ সাহেবের সেই সময়ের কিছুকাল পরে মৃত্যু হয়েছিল ফুটপাতে।

পাঠান ও মোঘল যুগের সময় থেকে অধিকাংশ সম্রাটদের, আমীর ওমরাহ, রাজা, জমিদার ও ধনীব্যক্তিদের পানদোষাদি এবং অনেক কিছু নৈতিকহীনতার ব্যাধি ছিল। সেই সকল ব্যক্তিদের কাছে সংযম ও বুদ্ধিহীন সঙ্গীত শিল্পীরা (এর মধ্যে বেশীর ভাগ খেয়াল গায়ক ও যন্ত্রীরাই প্রধান) তাঁদের পালকপ্রভুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে গরীবের ঘোড়া রোগের (রেস্ খেলা) মত পানাদি নৈতিক চরিত্রকে উচ্ছন্নে পাঠিয়ে নিজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন এবং নষ্ট করে এসেছেন এত বড় ব্রহ্ম বিদ্যার মর্য্যাদা, তার সংগে নিজেদেরও ব্যক্তিত্ব মান-সম্মান প্রভৃতিকে। এমন কী অনেকে মোসাহেব শ্রেণীতেও পরিণত হয়েছেন—দেখেছি। অথচ এঁরা সঙ্গীতের সাধনায় বড় বড় শিল্পীরূপে পরিচিত ছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, সঙ্গীত বিদ্যা এখন সমগ্র সভ্য সমাজে আদৃত হওয়া সত্ত্বেও পানদোষাদি অনেক শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে। সভ্য সমাজ এবং শিক্ষার্থী ভদ্র সন্তানরা যদি এই দোষণীয় ঘোরতর অন্যায়কে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য মনে করে প্রতিরোধ করতে পারতেন তাহলে ওই সব শিল্পীদের এবং শিক্ষার্থীদেরও অশেষ কল্যাণ হত এবং সভ্য শিক্ষিত সমাজে সমস্ত শিল্পীদেরই পরিচয়ে আরো উন্নত সম্মান বজায় থাকত। আমি জানি, কতকগুলির মধ্যে গুরুতর আপত্তিকর এই সব

দোষের জন্য সমগ্র সঙ্গীতজ্ঞ গোষ্ঠীটারই বহুকাল ধরে বিশেষ স্থানে শ্রদ্ধার আসন নেই। পান দোষাদিতে রপ্ত শিল্পীরা মনে করেন তাঁদের জন্য সাত খুন মাপ। কিন্তু সে ধারণা যে সব দিক দিয়েই কি ভীষণ ক্ষতিকর তা ভেবে দেখা হয় না। শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি ভদ্র মহিলারা পর্য্যন্ত তাঁদের এই রকম শিক্ষকদের নাম ডাকের মহিমায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে ওই সব অসভ্য অনাচার নির্বিবাদে ও স্বচক্ষে সহ্য করে থাকেন।

এই সব শিক্ষা গুরুদেবদের উপর শিষ্যদের অত বেশী বিচার হীন অন্ধ ভক্তি থাকে যে গুরুদেব হাত বাড়িয়ে গেলাস দিলে বা ছোট কোল্‌কে দিলে (গাঁজা) শিষ্যরা গুরুর কৃপাপ্রদত্ত বস্তু পরম পবিত্ররূপে গ্রহণ করে নেন। তারপর ক্রমশ: সঙ্গীতকে পাওয়ার চেয়ে ওই পাওয়ার বস্তুতেই রপ্ত হয়ে পড়েন। গুরু বড় শিল্পী হয়ে নিজের সর্বনাশ করেন, আর শিষ্যরা ওই বস্তুগুলিতেই বড় হয়ে উঠেন।

তাই আগে ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা ছেলেদের ওস্তাদদের কাছে গান-বাজনা শিখতে দিতেন না, তাঁরা ভালভাবেই জানতেন তাহলে উচ্ছন্নে যাবে। পানাদি ব্যাভিচারের আর একটি পরিচয় না দিয়ে পারলাম না। বঙ্গীয় সরকারের সাহায্য ও সহায়তাপুষ্ট খুব বড়দরের এক সঙ্গীত বিদ্যালয়ে দু'জন ভীষণ মদ্যপায়ী কণ্ঠসংগীত শিক্ষক ও চর্মবাদ্যবিদ্ মদ্য পান করে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে টল্‌তে টল্‌তে এসে ভদ্র মহিলাদের ও ভদ্রসন্তানদের ক্লাস নিতেন। এতবড় স্পর্দ্ধা কি করে আসে? তাঁরা জানতেন তাঁদের মান্য ও পদ ঠিকই থাকবে—গলাধাক্কা দিয়ে কেউ বিতাড়িত করবে না। এই সাহসেই এই রকম ব্যক্তিরা নির্বিবাদে সমস্ত সম্ভ্রমবোধ ও ভদ্রতা এবং সঙ্গীতের মর্য্যাদা নষ্ট করে গুরুর মর্য্যাদার স্থানকে গরুর যোগ্য করে আসছে। অবশ্য এঁদের চেয়ে গরুরা অনেক বেশী মান্যের। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হই কর্তৃপক্ষরা জেনেশুনেও এতবড় বেয়াদপী বরদাস্ত করে ওরকম বিরাট প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত ও সম্ভ্রম নষ্ট করতে দিয়েছিলেন। প্রথম থেকে প্রতিরোধ করলে এই দু'জন নাম করা শিল্পী হয়ত এখনও অনেক দিন বাঁচতে পারত—অকালে চলে যেত না এবং এরকমভাবে আরো অনেকেই।

এখন আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সেদিন রমজান্ খাঁ সাহেবকে আবার আসবার জন্য বলতে তিনি ফির্ আউঙ্গা বলেই টল্‌তে টল্‌তে চলে গেলেন। কেউ কেউ বলল—ওই চার আনা পয়সা শুঁড়ির দোকানে দিতে চলল, দোকান খোলার সুরু থেকে বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যাতায়াত

অব্যাহত থাকে, আগের নামডাকের জন্য যাত্রায় পরিচিত ব্যক্তিরা পয়সা না দিয়ে পারে না।

শ্যামবাবুকে বলে রাখলাম—এরপর যেদিন খাঁ সাহেব আসবেন সেদিন দু'চারটে টপ্পা গাইতে বলবেন আমি ঠিক জায়গায় ঘরের ভেতর বসে স্বরলিপি করে নেবো।

দু'দিন পরে ঠিক সেই সময়ে খাঁ সাহেব এসে বে-টা বে-টা বলে ডাকতেই শ্যামবাবু ও আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। রমজান সাহেব বললেন—প্যয়সা দো। বললাম, ভাল ভাল টপ্পা গান শুনান—বেশী করে পয়সা দেবো—এই বলে আমি ভেতরের ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় খাতা-পেনসিল্ নিয়ে বসলাম। খাঁ সাহেব গাইতে সুরু করলেন সুন্দর বন্দেজের খাম্বাজ রাগের "মিয়াঁ মৈতো চাল পহ্ছানী।" গানটা দু' তিন বার শ্যামবাবু গাইতে বললেন খুব ভাল লাগছে বলে। আমি সমস্তটা স্বরলিপি করে নিলাম। দ্বিতীয় গান "মাণ্ডি লে তু…" বলে ঝিঁঝিঁট রাগে ধরলেন। খুব সুন্দর লাগছিল। আমি খুব চুপচুপ্ অস্থায়ীটা আর একবার গাইতে শ্যামবাবুকে যাই বলেছি এমনি খাঁ সাহেবের চমক ভাঙ্গে। দেখলেন আমি কাছে নেই, তখন বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—ক্যা মেরা গানা চোরি করকে লে লেতা হ্যায়, ঔর কভি নহি গাউঙ্গা" এই বলেই টল্‌তে টল্‌তে গলির দু'পাশে ধাক্কা খেতে খেতে চলে যেতে লাগলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে আট আনা পয়সা দিতে যেতেই আমার হাতে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন—নহি লুঙ্গা।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—রাস্তার মাতালে পরিণত হয়ে এবং ভিক্ষুকের স্তরে নেমে গিয়েও মন্ত্রগুপ্তির কথা একটুকুও ভুলেন নি! শুনে আসছি অনেক শিল্পীরা বিদ্যাদানে অত্যন্ত অনুদার ও কৃপণ স্বভাবের। বহু উপঢৌকন, অর্থ ও তোষামোদের বিনিময়ে তাঁরা কিছু কিছু শেখান, ছাত্ররা তাতেই কৃতার্থ হয় এবং বিজ্ঞাপনের মূলধন হয়ে থাকে। আবার এ-ও দেখেছি না শিখেও মৃত ব্যক্তির নাম করে অমুক খাঁ সাহেবের কাছে এত বছর শিখেছি এবং দেশের নাম করে গোয়ালীয়রে কুড়ি বছর থেকে তালিম নিয়েছি, কিরাণাঘরে পঁচিশ বছর তালিম নিয়েছি ইত্যাদি বলে নিজেদের জাতে তুলে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন। এই রকম ধাপ্পায় বিশ্বাস করে গদগদচিত্তে এঁদের প্রচারে ব্রতী হবার মত লোকও থাকে।

তারপর কোলকাতায় সেই ওই রকম অবস্থার মধ্যে আরো দু' তিন মাস থেকে বহু কষ্টের দ্বারা সঞ্চিত কয়েকটি টাকার বাড়ীর জন্য কাপড় ক্রয় করে এবং ট্রেন ভাড়া বাদে পঁচিশটি টাকা সংগে নিয়ে বেশ কয়েক মাস পরে ৺পূজার দু' দিন আগে বাড়ী এলাম।

ওই সময়ে মধ্যে ঝুলনযাত্রা উৎসবে দু'টি ধনীর গৃহে গানের আসরে গান গেয়ে দশটি টাকা পেয়েছিলাম।

সে সময়টা ছিল আগের মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর। তাই কাপড়ের দাম চড়াই ছিল। আমার দিদি ও বৌদিদির জন্য চওড়া কাল পাড়ের উপর সরু লাল রং এর নক্সা করা মাঝারি জমিনের কোরা কাপড় পাঁচ টাকা করে দাম দিয়ে কিনেছিলাম। ওই রকম কাপড় পেয়েই তাঁদের কি আনন্দ। সেই আনন্দের মধ্যে বড় জিনিষ ছিল মনের প্রসন্নতা ও সন্তুষ্ট চিত্তের তৃপ্তরূপ।

তাঁরা কাঁপড় দুটিকে জল কাচ করে আল্‌নায় মেলে দিয়ে জমিন ও পাড়ের কত প্রশংসা করে মনের খুসীভাব প্রকাশ করতে লাগলেন।

পাড়ার মহিলারাও বলতে লাগলেন বাঃ বেশ সুন্দর কাপড় সত্যকিঙ্কর নিয়ে এসেছে। তাই ভাবি তখন স্বল্পে তুষ্ট হওয়ার কি সুন্দর মনভাব ও সহজ-সরল বিচারবোধ ছিল, আর এখন সৌখিনত্যের মারাত্মক ব্যাধি এসে ঢুকেচে সকলের মনে। সামর্থ্যে না কুলালেও কুড়ি পঁচিশ টাকার কমে পার পাবার উপায় নেই।

এই মারাত্মক ব্যাধি ক্ষয় রোগের মত মধ্যবিত্ত ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের মধ্যে প্রবেশ করে সামর্থ্যের রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে। অন্য আর এক দিকে লক্ষ লক্ষ লোক যে জীর্ণ-শীর্ণবস্ত্রে ও অর্দ্ধ নগ্নে লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় সন্ত্রস্ত হয়ে কাল কাটাচ্ছে সেদিকে ভদ্র, সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নেই। আমরা মনুষ্যত্ব নিয়ে ভাবি না যে তারাও আমাদের।

(৩৪)

৺দুর্গাপূজা ও বিভিন্ন পরিচয়,—

বিষ্ণুপুর সহরের নানান স্থানে কয়েকটি ৺দুর্গা প্রতিমা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তারমধ্যে মল্লরাজাদের মৃণ্ময়ী নামে উক্ত দেবীর নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সব প্রতিমার পূজাদি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। শারদীয়া পূজার সময় নূতন গড়া দশভুজা মূর্ত্তির যেমনভাবে পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় ঠিক সেই রকমভাবে উক্ত স্থায়ী প্রতিমাগুলিরও পূজাপর্ব্ব সমাধা হয়।

এই সহরের তখনকার মনোহারি দ্রব্যের বিরাট এক ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তির গৃহের অভ্যন্তরস্থ মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী ৺দুর্গামাতার ওই বড় পূজার সময় সেখানে আমার ৺পিতাঠাকুর বহু বৎসর যাবৎ তন্ত্র ধারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি তন্ত্রধারকের মন্ত্র অনুসরণ করে পূজা করতেন। আমি চার বছর বয়স থেকে ওই পূজার স্থানে বাবার কাছে বসে খুব আগ্রহ নিয়ে পূজানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতাম। রাগের উপর সুকণ্ঠে বাবার মন্ত্রোচ্চারণ এখনও আমার কাণে লেগে আছে।

পরমযোগী বিশেষ পিতৃদেব যখন ৺মহাষ্টমীর সন্ধি মুহূর্ত্তে হাত জোড় করে সময়োপযোগী রাগরূপের উপর ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তোত্রপাঠ করতেন তখন মনে হত যেন ৺দেবী সহাস্যে পাঠ শুনছেন। আমার সমস্ত শরীর তখন শিউরে উঠত এবং লোমগুলো খাড়া হয়ে যেত। গৃহস্বামী ও তাঁর পরিবারবর্গ সকলে এবং আগত দর্শনার্থীরা সে সময় ভাবে গদগদ হয়ে মায়ের চরণোদ্দেশে অশ্রু নিবেদন করত।

সে সময় জিনিসপত্রের দাম খুব সুলভ ছিল বলে পূজার মিষ্টান্ন উপকরণাদি বস্তুর খুবই প্রাচুর্য্য ছিল, বিশেষ করে বিত্তশালীদের দ্বারা পূজানুষ্ঠানে।

সেই ব্যবসায়ীর গৃহের দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার সময় মিষ্টান্নাদি যে সকল বস্তু নিবেদিত হত তার আয়োজন এত প্রচুর ছিল যে, বণ্টনের সময় আমার পিতার অংশে আসত বিবিধপ্রকারের মিষ্টান্ন প্রায় দেড় মনের মত, তার সংগে থাকত চিনি দশ সের, নৈবিদ্য হতে আতপ চাল দু' মণের মত, ৺পূজা সমাধার পর পেতেন কাপড় সাত-আটখানা ও দক্ষিণা।

আমার কাকা ও ঠাকুরদা'ও অন্যস্থানে তন্ত্রধারকের পদে নিযুক্ত থাকতেন। বাড়ীতে মিষ্টান্নাদিতে ঘর ভরে যেত। কয়েকটা মাঝারি আকারের জালাতে মা ওই সব মিষ্টি ভরে রাখতেন। আমরা এই পূজায় কত মিষ্টি যে খেয়েছি তার নিরাকরণ নেই। এখন ছেলেদের মুখে সামান্য মিষ্টি দেওয়ার সময় আগের কথা মনে এসে ভীষণ মন কেমন করে।

সেবারে ৺পূজার উৎসব শেষ হবার পর থেকেই বাড়ীতে বসে যথা-নিয়মে আমার সাধনা চলতে লাগল। এই সময় ভোলানাথ নন্দী, (শাঁখারী) (প্রখ্যাত তবলাবাদক স্বর্গত সুবোধ নন্দীর কাকা) গৌরহরি কবিরাজ (শাঁখারী) রামপদ দে, (গন্ধবণিক) দুর্গাদাস দেবঘরিয়া (ব্রাহ্মণ), প্রভৃতি আমার কাছে শিখতে লাগল—আরম্ভের প্রথমপর্য্যায় থেকে। এইভাবে দিনগুলি সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে পৌষ মাসে ভ্রমণের সঙ্কল্প এসে গেল। এই সঙ্কল্পে যে একটা বড় রকম কল্পনা মনে স্থান পেয়েছিল তা হল পুরাতন জীর্ণ বাটাকে ভেঙ্গে নূতন করার বাসনা। নানান স্থানে দালান বাড়ীতে বাস করে মনের কোণে বাসা বেঁধেছিল দালান করতে পারার ইচ্ছে। যদিও এটা আকাশ কুসুমের মতই তখন মনে হয়েছিল তত্রাচ কেমন যেন একটা প্রেরণার তাগিদ এসে গেছল। তাই দাদুকে বলে ফেললাম,—চলুন ভেলাইডিহার রাজবাড়ীতে। শুনেছি ওই রাজার বড় বড় শালগাছের বিরাট জংগল আছে, যদি গান-বাজনা শুনিয়ে বাড়ী করার জন্ম গাছ পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে বাড়ী করার একটা বড় জোগাড় হয়ে থাকবে।

আমাদের দেশে তখন দালান বাড়ীর কড়ি-বরগা-জানালা, দরজা ইত্যাদির জন্ম বড় রকম শালগাছ জোগাড় করা দুঃসাধ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সংসারে অর্থেরও তাই সেই আশা নিয়েও ওখানে যাওয়াই স্থির করা হল। আমরা বরাবর শুনে এসেছিলাম ওই রাজবাড়ীর প্রায় সকলেই শাস্ত্রীয়সংগীতের খুব অনুরাগী। আমার কাকারাও সেখানে গিয়েছিলেন এবং আরো আগে থাকতে দেশের গায়ক-বাদকরাও যেতেন।

দাদু আমার এই সবকথা শুনে সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়ে বললেন পাঁজিটা নিয়ে আয় এবং তোর-আমার কোষ্ঠী দুটো। ৺গোপীনাথের কৃপায় তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে আমার মন বলছে। তাঁর চরণে মন সমর্পণ করে উদ্যম ও নিষ্ঠা নিয়ে যে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যের জন্ম যদি সঙ্কল্প করা যায় তাহলে তা বিফল হয় না।

ঠাকুরদা' কোষ্ঠীর ফলাফল মিলিয়ে গমন যাত্রার দিনস্থির করলেন দু'দিন পরে বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকালে।

মা শুনে বললেন—একে পৌষ মাস—তায় বৃহস্পতিবার—দক্ষিণে দিকশূল সুতরাং এই দিনে যাওয়ার দিন কি করে ঠিক হল?

ঠাকুরদা' উত্তরে বললেন – গমনকারীদের কোষ্ঠীর লিখিত শুভ ফলের সংগে যদি দিন তারিখের গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির শুভযোগ থাকে তাহলে দিকশূল ইত্যাদিতে কোন বিঘ্নই আসে না। তুমি দেখবে বৌমা ৺গোপীনাথের কৃপায় এই গমন যাত্রা আমাদের শুভ করবে।

বিষ্ণুপুর হতে ভেলাইডিহা রাজধানীর দুরত্ব প্রায় বত্রিশ মাইল। তখন গোযানই ছিল একমাত্র যান হিসেবে যাবার উপায়। অবশ্য এ রকম সব দুরত্ব তখন বহু মানুষ একাদিক্রমে হেঁটে যাতায়াত করত। আমার দাদামশায়ের গ্রামে যখন ঠাকুরদা' বা বাবা যেতেন এবং দাদামশায় যখন বিষ্ণুপুরে আসতেন তখন পা' এ হেঁটেই। দুরত্ব হ'ল উনিশ মাইল। ভোর ৪টায় রওনা হতেন এবং যথাস্থানে পৌঁছতেন বেলা ৯টার মধ্যেই।

তখনকার মানুষের হাঁটার এই রকম অভ্যাস ছিল বলে স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া গ্রাম থেকে একটি ষোল বছরের ছেলেকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিল তার পিতা কাকাদের কাছে তার গান শেখার জন্য। বলল খুব ভোরে বেরিয়ে একাদিক্রমে হেঁটে চল্লিশ মাইল রাস্তা এসেছি।" এসেছিল তারা বেলা এক প্রহরের মধ্যেই। পিতা, পুত্রের বলিষ্ঠ চেহারা দেখবার মত ছিল।

ঠাকুরদা ভেলাইডিহা যাবার জন্য গোগাড়ী ঠিক করে এলেন। গাড়ীর মালিক ও চালক একই ব্যক্তি, জাতিতে কলু। দাদুকে কৌতুহলী হয়ে বললাম—যাত্রাকালীন, কলু, ধোপাকে দেখলে সব অশুভ হয় তাহলে সেই জাতের গাড়ী করলেন কি করে? এর উত্তর তিনি যেটুকু দিলেন তাতে বুঝলাম মানুষ বা জাত নিয়ে উঁচু নীচের বিচার নেই, সকলের মধ্যে সেই এক ভগবান। সুতরাং ভগবানের আবার জাত বিচার কি? সবাই আপন—সবাই সেই পরমাত্মার প্রকাশ রূপ।

বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে— মুচি হয়েও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে,
আর শুচি হয়েও মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।

নিজে শুচি হলেই সব শুচি আর নিজে অশুচি হয়ে থাকলে সবই অশুচি। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা দুর করে' রাখতে পারলে সবই স্বচ্ছ হয়ে যায়।"

দাদুর কাছে নিয়তই শিক্ষার বস্তু ছিল। তিনি নিজে আচার নিষ্ঠ ছিলেন সত্য কিন্তু আসলের উপর গোঁড়ামী ও ভণ্ডামীর লেশ মাত্র ছিল না।

যথা দিনে বেলা দশটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে সেই কলুর গোযানে আমরা রওনা হলাম। এবং পরের দিন সকাল ৪টায় আমাদের

রথ এসে থামল রাজ কাছারির সামনে। সেতার হাতে পনর বছরের কাছাকাছি এক যুবক গাড়ী থেকে নামতেই অনেকে কৌতূহলী হয়ে কাছে এলেন। দু'জন বেশ হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিও কাছে এসে দাঁড়ালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিচয়ে জানা গেল এঁরা রাজাবাহাদুরের কাকা। একজনের নাম ঈশান—ইনি হিকিম সাহেব আর অন্যজনের নাম জগবন্ধু—ইনি বড় ঠাকুর সাহেব। এই রকম সম্বোধন বহু রাজ বংশে চলে এসেছে। রাজার ঠিক পরের ভাই হন হিকিম সাহেব, তার পরের হন বড় ঠাকুর সাহেব, বাকী ভাইদের অমুকবাবু—এই সম্বোধন থাকে।

দাদু গাড়ী থেকে নেমে আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানান মাত্র। সকলেই খুব উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করলেন। মনে আনন্দ নিয়ে বুঝতে দেরি হল না এখানের লোকেরা সত্যই খুব সংগীতপ্রিয় বলে। প্রত্যেকের মধ্যে এমন বিপুল আনন্দ ও উচ্ছলতা জীবনে আর কোথাও দেখিনি। আমার নাম এঁরা অনেক আগেই শুনেছিলেন। শাস্ত্রীয়সংগীতের উপর বোধ শক্তি, অনুরাগ বা শুনার আকাঙ্ক্ষা শুধু থাকলেই হয় না, এই রকম পল্লীর মানুষদের মত স্বচ্ছ ও সরল অন্তঃকরণ না থাকলে সঙ্গীত সাধকদের প্রকৃত উৎসাহ ও মর্য্যাদা লাভ হয় না।

সেদিন সে সময় আমরা বুঝতে পারিনি রাজাবাহাদুর অদূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছেন এবং আমাদের থাকার সুব্যবস্থার জন্য তাঁর লোকদের নির্দেশ দিচ্ছেন। একটু পরেই তিনি কাছে এসে দাদুকে নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে আমাদের সমাদরে সংগে করে নিয়ে যেতে যেতে সব কিছু পরিচয় নিলেন এবং বললেন—আপনাদের আসাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তারপর নিজের বৈঠকখানায় বসিয়ে কথাপ্রসঙ্গে জানালেন—তাঁর কাছে ৺গয়াধামের মিশ্র বংশের এক ঘরাণা সেতার বাদক আছেন। তিনি নিজে এবং আরো দু'চারজন তাঁর কাছে সেতার শিখছেন। রাজাবাহাদুরের সরল—অমায়িক ও শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যবহারে আমরা খুবই মুগ্ধ হলাম।

এই প্রসঙ্গে এই রাজবংশের উৎপত্তির ইতিহাস একটু জানান আবশ্যক মনে করলাম।

বিষ্ণুপুর মল্লরাজের রাজত্বের বিরাট বিস্তৃত সীমানার অভ্যন্তরে এবং সীমান্তের স্থানে স্থানে ক্যান্টনমেন্টের মত সেনানিবাস ছিল। সেই সকল স্থানের সেনানীদের যাঁরা কর্ণেল, মেজর বা প্রধান ছিলেন তাঁদেরকে সেই

অঞ্চলের ভূসম্পত্তির উপর কিছু কর ধার্য্য করে মল্লরাজারা জায়গীর স্বরূপ দান করেছিলেন। সেই স্থানের আয় হতে সৈন্তরা প্রতিপালিত হত এবং অন্যান্য উৎপাদন বস্তুর কাজেও নিযুক্ত থাকত এবং নিজে নিজে গৃহাদি নির্মাণ করে সংসারী হয়েছিল। তবে সময় বিশ্বার চর্চা তাদের অব্যাহতই ছিল মল্লরাজত্ব টিকে থাকা পর্য্যন্ত। এখন সেই সব সৈন্তদের আর কোন পরিচয়ই নেই, সবাই গৃহী এবং একমাত্র কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। সে সময় যারা জায়গীর পেয়েছিলেন তাঁরা রাজা ও জমীদার নামে পরিচিত হয়ে সেই থেকে তাঁদের বংশধররা ওই নামে চলে আসছেন। রাজার আসনে অধিষ্ঠিত হন একমাত্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রই। মল্লরাজ্যের মধ্যে এই রকম অনেকগুলি রাজঅঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা এই দু'টি স্থানেই এখন পর্য্যন্ত রাজা নামে পরিচয় আছে।

মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহদেব যখন উড়িষ্যা জয় করেন তখন সেখানের যাঁরা সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ-বংশের। উড়িষ্যারাজ পরাস্ত হওয়ায় ওই সব সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণপদের ব্যক্তিরা আগ্রহ সহকারে মল্লরাজের বীরত্বে ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপুরে তাঁর সংগে চলে আসেন এবং উক্ত মল্লবীর মহারাজা তাঁদেরকে দক্ষিণ সীমানার দিকে পূর্বকথিত ব্যবস্থার উপর নিয়োগ করেন।

সেই থেকে ক্রমশঃ এই অঞ্চলে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদির সংখ্যা বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হতে থাকে।

এই ইতিহাস আমি ভেলাইডিহার রাজার কাছে এবং তাঁর খুড়োদের কাছে শুনেছিলাম। এইসব রাজাদের প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসকাল থেকে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা সঙ্গীত চর্চার সূত্রপাত হয়।

মল্লভূমের মহারাজাদের এবং এই সব জায়গীরদার রাজাদের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বা প্রাসাদ নামে গৃহাদির জৌলুস কিছু ছিলই না বলা চলে। তাঁদের মধ্যে খুব বেশী সংখ্যক রাজাদেরই ছিল ব্যবহারিক জীবনের ভাবধারা সহজ, সরল ও বিলাস বাহুল্য বর্জ্জিত।

এই রাজার দেশটি সহর সভ্যতার মত চাকচিক্য ও জমকাল একেবারেই নয়। নিতান্ত অনাড়ম্বর একটি স্বল্প পরিসর গ্রাম্যরূপের মতই। নামের সম্বোধনে রাজধানী না বলে রাজপল্লীই বরং বলা চলে। পল্লীর এই

মূর্তি আমার খুব ভাল লাগত। এর দৃশ্যরূপ দেখে মনে হত যেন প্রকৃতি-দেবীরই এক সাধারণ বেশযুক্ত সরম-সরলতাপূর্ণ আধ ঘোমটাটানা স্নিগ্ধ-মধুর রূপ।

তার পদপ্রান্তে পশ্চিম হতে উত্তর-পূর্ব ধরে এঁকে বেঁকে ঘিরে আছে শীলাবতী নদী। সে হেলে দুলে ত্বরিত পদে ধেয়ে চলে আসছে চির অভিসারিকার মত। দেখলে কবি মনে উদয় হবে শীলাবতী তার দয়িতকে পাবার সন্ধানে যেন আকুল হয়ে ত্রস্তপদে চলতে চলতে একবার এ কূলের উপর আছাড় খেয়ে পরক্ষণে নিরাশ হৃদয়ে ছুটতে ছুটতে আবার ও কূলের উপর লুটিয়ে পড়ে' ভাবে বুঝি সেই আমার কাম্যধন, কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায় যখন, তখন সে অশ্রুর হ্রদ সৃষ্টি করে' সংগে সংগেই তার গমনগতি চলতে থাকে বিরামহীন ভাবে।

এই পাহাড়ী জলকন্যাটির দুর্বারগতি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচরে আসত যখন সে প্রকৃতিপ্রদত্ত বর্ষার বারি সম্ভারে ভরা যৌবনের রূপ নিয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গর্বভরে স্খলিত-সচঞ্চল ও ত্রস্তপদে ধাবিত হত দু'কূল ছাপিয়ে জনগণকে ভীত-চকিত করে দিয়ে।

শীলাবতীর দক্ষিণ কূলের সৌন্দর্য্যপূর্ণ ঘন তরুরাজীর কুঞ্জসমূহ দেখলেই মনে হয়ে যেত যেন তারা মমতাভরা দর্শকের মত শীলাবতীর বারিদেহের উপর সর্বদা মস্তক অবনত করে শ্যামল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। আবার তারা যখন বায়ু হিল্লোলে সঞ্চলিত হত তখন যেন সেই পল্লবান্দোলিত তাদের শীর্ষদেশ শীলাবতীকে আয়-আয়-বলে ডাকছে মনে হত। সেই সংগে যখন নানান রং এর শোভা সুন্দর বিহঙ্গমকুল তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠে ধ্বনি তুলত তখন মনে হত যেন শীলাবতীর ক্রন্দনের কুল্ কুল্ শব্দে এদের ধ্বনি সমবেদনায় মিলে যাচ্ছে।

স্থানে স্থানে কুঞ্জবনের মধ্যস্থিত সরু পথ ধরে আধ ঘোমটা টানা মুখে সুঠাম গঠনের পল্লীবধূরা সর্পিলগতিতে যখন নদীতে স্নানের জন্য বা জল ভরতে যাতায়াত করত তখন তার স্বভাব সুন্দর দৃশ্য শোভা মনকে সরস স্নিগ্ধ করে তুলত। মনে হত এর মধ্যেও যেন সুর-ছন্দের জীবন্ত রূপ আছে।

শীলাবতী নদীর বনানীকুঞ্জকূলে বিকেলে বা যে কোন সময় যখন উপস্থিত হতাম তখন মনে হয়ে যেত সেই দ্বাপর যুগে যমুনার কূলে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের লীলা মাধুর্য্যের কথা। তখন কেমন যেন একটা গভীর

ভাব এসে মনকে প্রেমের রসে আপ্লুত করে দিত এবং সেই বাস্তব সান্নিধ্যে মনকে টেনে নিয়ে যেত।

পূর্বের কথায় তারপর,—আসার সেই দিনেই রাত্রিতে আমার গান-বাজনা শুনার আগ্রহে বেশ বড় রকমের আসর হল। জানতে দেরি হয়নি—গানের মধ্যে ধ্রুপদের উপরই সকলের অনুরাগ বেশী। রাজাবাহাদুরের বৃদ্ধ পিসেমহাশয়, দুই কাকা এবং তিনি নিজে পাখোওয়াজ খুব ভাল বাজাতে পারেন বলে আগেই জেনেছিলাম। এঁরা সকলেই আজ আমার গানের সংগে সঙ্গত করবেন একথা অনেকেই বললেন। দাদু বললেন—এতগুলি মাননীয় বাদককে সঙ্গতে সন্তুষ্ট করার মত পরিশ্রম কি করে তোর একার পক্ষে সম্ভব হবে তাই ভাবছি ·····।

আমি বললাম,—গুরুর এবং আপনার আশীর্বাদে তাঁদের সন্তুষ্ট করার মত সামর্থ্য নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।

এই রাজার পিতা থেকে আরম্ভ করে এঁরা সকলেই পাখোওয়াজ বাদ্য শিক্ষা করেছিলেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মৃদঙ্গাচার্য্য গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে, তাঁকে দীর্ঘকাল গুরুর যোগ্য সমাদরে রেখে। এই চাটুজ্যে মহাশয়ের মত মৃদঙ্গ বাদ্যে সুপণ্ডিত আজ পর্য্যন্ত আর কাউকে আমি দেখিনি। যে সকল অপ্রচলিত তাল অন্য কোন বাদকের জানা আছে বলে আমি পরিচয় পাই নি সেই সব তালের ঠেকা-বোল-পরণ এবং সেই সেই তালের এক একটি করে গান তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে গেছলাম। তালগুলির নাম—যথা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, বীরপঞ্চক তাল, রাশতাল, মোহনতাল, দোবাহারতাল, লক্ষ্মীতাল ইত্যাদি। এর গানগুলি শিখেছিলেন অনন্তলালের কাছে।

ছাত্রদের তালিম দিয়ে উপযুক্ত করে তুলার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল চাটুজ্যে মশায়ের। নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের কাছে যখন দীর্ঘকাল ধরে ছিলেন তখন তাঁকে এবং তাঁর পুত্র কুমার বাহাদুরকে ওই বাদ্যে তালিম দিয়ে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন।

আর এক সময় অগ্রদ্বীপের জমীদার বাড়ীতে আচার্য্যের পদে থেকে জমীদারকে এবং ওই বাড়ীর অন্যান্য অনেককে পাখোওয়াজ বাদনে যোগ্য করে তুলেছিলেন। শেষ জীবনে নাড়াজোলরাজ নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুরের দরবার মৃদঙ্গাচার্য্যের পদে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁর চরিত্রও রীতিধারা আদর্শ ব্রাহ্মণের মত ছিল। ভেলাইডিহার রাজবাড়ী

থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বহু বৎসর ধরে মাল্য স্বরূপ বার্ষিক অর্থাদি পেয়ে এসেছিলেন। চাটুজ্যেমশায়ের বাড়ীতে বছর বছর ৺কালীপূজা হত। তাতে সাহায্য বাবদ উক্ত রাজার কাছ হতে পেতেন নগদ টাকা, বলির জন্ত একটি ছাগ, হোমের গাওয়া ঘি এক সের, আতপ চাল আধ মণ, মর্তমান কলা কাঁদি ইত্যাদি। বিশেষ করে দেখেছি আমাদের দেশের ছোট ছোট রাজা, জমীদাররা এবং অন্তান্ত অনেক শিষ্যই শিক্ষা গুরুর প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন ও কর্ত্তব্য পালন করতেন। এখন অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায় গুরু তাঁর নিজের গুরুত্বপূর্ণ মর্য্যাদার—আসনকে যথাযথ ভাবে রাখেন না বলে শিষ্য-শিষ্যারাও গুরুকে যে ভাবে দেখা উচিত সেভাবে তাঁরা দেখেন না। সঙ্গীত গুরুকে দাদা বা দা' সম্বোধন এ আবার কি! সঙ্গীত গুরু এ সম্বোধন কেন সমর্থন করবেন?

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ থাকবে পিতা-পুত্রের মত। সেখানে বয়সের প্রবীনত্ব নবীনত্ব বলে কিছু নেই। সর্বদাই মনে রাখা দরকার তিনি হলেন আচার্য্য। সঙ্গীত গুরুর প্রতি গুরুজী, গুরুদেব, আচার্য্য এই সম্বোধন থাকবে। দাদা বা নামের শেষে দা' বলে ডাকার মত এত বড় অযোগ্য সম্বোধন আমি আগে কখনও শুনিনি। সঙ্গীতকে বিলাস সামগ্রীর মত না ভাবলে ওইরূপ সম্বোধন আসবে না। আমি সম্প্রতি দেখে এসেছি এই মতি-গতির ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত বিদ্যা ও তার আধ্যাত্মিক রূপ আয়ত্ত করতে আসে না, আসে শাস্ত্রীয়সংগীতের গাত্র শুকতে। ছাত্র-ছাত্রীদের সব দিকে তাদের কল্যাণের জন্ত একান্ত দৃষ্টি রাখা যে একান্ত কর্ত্তব্য সে কথা বোধ হয় মনে রাখতে আমাদের আর প্রয়োজন থাকছে না।

পনর বছর বয়সে ভেলাটভিহার রাজার কাছে ছিলাম,—সেখানের সকলেই ওস্তাদজী বা গুরুজী বলে ডাকতেন। ওই রকম বয়সের সময় থেকে যেখানেই শিক্ষকতা করেছি এবং স্থায়ীভাবে থেকেছি সেখানেরও প্রত্যেকে ওই সম্বোধন রাখতেন। কেবল চার জায়গার মহারাজারা কেউ ছেলের মত কেউ নাতির মত সম্পর্ক ধরে স্নেহাদরের উপর সম্বোধন রাখতেন। তাছাড়া তাঁরা ছাত্র ছিলেন না। এই চার জন মহারাজা ছাড়া আর কেউই তুমি সম্বোধন করেন নি ওই বয়স থেকেই। সম্বোধনের বিষয় নিয়ে আমার দাদামশায়ের গ্রামের মানুষরা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। সেখানের জনসাধারণ সংগীতে আমার পরিচয় থাকার জন্ত তার উপর মাল্য

রাখা যে কর্তব্য সে বিষয়ে জ্ঞানবোধ রেখে সম্পর্ক অনুযায়ী কেউ নাতি-সাহেব, কেউ কেউ ওস্তাদ, কেউ ওস্তাদজী, বন্ধুরা খাঁসাহেবের 'খাঁ'টা বাদ দিয়ে, ভাগনে বাবাজী, ভাগনেবাবু এইভাবে সম্বোধন দেখিয়ে এসেছেন। গ্রামের মহিলা পর্য্যন্ত আমার সংগীতে সামর্থ্যের উপর দৃষ্টি রেখে অনুরূপ ভাবে সম্বোধন রেখে তার সংগে স্নেহাদর দেখিয়ে এসেছেন। নিজের দেশে এরকম বিচারবোধ থাকলে সত্যই খুব উৎসাহ ও সার্থকতা আসে।

সম্বোধন সম্বন্ধে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,—প্রায় বছর বার আগে ডায়মেসন স্কুলে যখন শিক্ষকতা করি তখন একদিন জরুরি চিঠি লেখার প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষিকা মিস দাস লেখার প্রারম্ভে শ্রীচরণেষু লিখে-ছিলেন। তাঁর ওই সম্বোধনে আমি অবাক হয়ে গেছলাম। তিনি আমার চেয়ে অন্ততঃ ছ' সাত বছরের বড় ছিলেন। ক্লাসের দিকে গিয়ে চিঠিটি দেখিয়ে বলি—আপনি বোধ হয় কোন গুরুজনকে লিখতে গিয়ে শ্রীচরণেষু লিখে আমাকে লিখে ফেলেছেন। উত্তরে মিস দাস বললেন,—আমি আপনাকেই শ্রীচরণেষু লিখছি এবং ঠিকই লিখেছি,—কারণ আপনি যখন আমাদের মেম্ গুরুমাদের শেখাতেন তখন আমি তাঁদের ছাত্রী ছিলাম। সুতরাং আপনি আমার গুরুর গুরু।" তাঁর এই কথা শুনে তাঁকে বলে-ছিলাম—আপনাদের মত ব্যক্তিরাই মানুষ গড়ার উপযুক্ত গুরু।

এই রকম বিচারবোধও হৃদয়কে মহত্ত্বে গড়ে তুলাই প্রকৃত শিক্ষা। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই,—শিক্ষকতার মধ্যে পরিপূর্ণ আদর্শ গুরু-বোধ রেখে তার সব কিছুর মধ্যে যোগ্যমর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

চাটুজ্যে মহাশয়ের সাধনায় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের কথা,—

ইনি শিক্ষা সাধনার বয়সে অনন্তলালের কাছে গানের সংগে সঙ্গত করার অভ্যাসের জন্ত প্রত্যহ আসতেন সন্ধ্যার পর আমাদের বৈঠকখানায় অর্থাৎ পূর্ব কথিত টোলগৃহে। বিষ্ণুপুরের পশ্চিমপ্রান্তসীমা ছাড়িয়ে গোপালপুর নামে একটি গ্রাম আছে। চাটুজ্যে মশায়ের বাড়ী সেখানে। সেখান থেকে আমাদের বাড়ীর দুরত্ব তিন মাইলেরও অধিক। কাঁধের উপর বাঁ হাতে পাখোওয়াজটি ধরে, ডান হাতে লণ্ঠন ও লাঠিটি নিয়ে তার সংগে পাতাতে জড়ান মাখা আটা থাকত। এইভাবে এসে অনন্তলালের সংগে গানে রাত ১০টা পর্য্যন্ত সংগত করে বাড়ী ফিরতেন। কতকটা

রাস্তা খুবই নির্জন ও ভয়াবহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

শিক্ষা ও সাধনায় তখনকার দিনে এর উপর নির্ভরশীল যাঁরা হতেন তাঁরা এই রকম আদর্শ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা রেখে যেতেন। চাটুজ্যেমশায় আশী পেরিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রত্যহ সব রকম তালেরই রেওয়াজ রেখেছিলেন।

এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেককেই সাধবার জন্য অনুরোধ করতে হয়, যেন দায়টা গুরুরই বেশী। শিক্ষাগুরুর যদি তাদের হয়ে সেধে দেওয়া চলত তাহলে তাদের পক্ষে খুবই ভাল হত।

ধ্রুপদ গানের চর্চা এবং পাখোওয়াজ বাদ্য শিক্ষার উপর এখন আগ্রহ খুবই কমে গেছে। পরিবর্তে এখন খেয়াল গানের চর্চা ও তবলা বাদনের উপরই আগ্রহ সমধিক। কিন্তু সেই অনুপাতে গায়কদের গানের উপর শক্তি, সামর্থ্য ও দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্য কতখানি লাভ হয়েছে তার বিচারে আমরা যাই না। দেখতে পাওয়া যায় সারা ভারতে যে কয়েকজন শিল্পী খেয়াল গানে ও যন্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—তাঁরা নাম সংগ্রহের প্রথম সময়ে সুরের পরিবেশনে যে সামর্থ্য দেখিয়েছেন, সেই সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক জায়গাতেই যেন দাঁড়িয়ে গেছেন, অগ্রসরের পরিচয় আর সে রকম পাওয়া যায় না। এর কারণে আমার ধারণা ঘরাণা পরিচয়ের মধ্যে ধ্রুপদ চর্চার অভাব। এই জন্য সংযম নিয়ে সৃষ্টি সন্ধান আসে না।

অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে প্রকৃত সাধনায় দাঁড়িয়ে থাকা নেই—অগ্রগমনই অব্যাহত থাকে।

অন্যান্য শ্রেণীগত গানের হয়ত একসময় সীমিত প্রচারে আসার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে কিন্তু ধ্রুপদ গানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব অমর ও উজ্জ্বল হয়েই থাকবে।

ধ্রুপদ সংগীত সাধনার মধ্যে আসে আত্মসংযম, ধীরপ্রজ্ঞা, রাগরূপের দীর্ঘপদী স্বর সংযোজনায় তার অবয়বের উপর দমের ক্রিয়ায় প্রাণায়াম যোগের উপকারিতা এবং খেয়াল প্রভৃতি শাস্ত্রীয়সংগীতের গানে ও তারের যন্ত্রে প্রকাশিত রাগ রূপকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করে রাখবার দায়িত্ব ও বিচারের জ্ঞান। সুতরাং ধ্রুপদকে ত্যাগ করে যাঁরা সংগীতের অন্যান্য শ্রেণীবস্তু শিক্ষা-সাধনা করে যাবেন তাঁরা হয়ত বড়দরের শিল্পী হতে পারবেন কিন্তু জ্ঞানী-গুণী এবং প্রকৃত কাম্যবস্তু লাভের উপযোগী সাধক

২৫ পারবেন কিনা এতে সন্দেহ থেকে যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাই, ধ্রুপদের প্রতি এই অনাস্থার মনোভাব দূরীভূত হতে পারে যদি উচ্চ স্তরের আলাপ ও ধ্রুপদ গায়ক এবং উচ্চস্তরের একজন খেয়াল গায়ককে এক আসরে পরের পর গাওয়ান যায় তাহলে অভিজ্ঞ ও অনুরাগী শ্রোতাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না সত্যই ধ্রুপদের স্থান ঊর্দ্ধে কিনা।

আমি বোলব যাঁরা ধ্রুপদের উপর উদাসিকতা দেখান তাঁরা সংগীতের ভেতরে প্রবেশ করেন নি, বাইরের উৎকীর্ণ নক্সারই ভক্ত। খেয়ালকে উপমায় আমি বলি সে গান গানের সম্রাট, এবং ধ্রুপদকে বলি মহামুণি। মুণি সম্রাটের কাছেও পূজিত হন। টপ্পা ও ঠুমরী গানের উপমায় বলা যায় প্রথমটি জমিদারের মত এবং দ্বিতীয়টি ফুলবাবু।

এবার মূলসূত্রে ফিরে যাই,—সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে আসরের স্থানে গিয়ে দেখলাম ভিতরে শ্রোতার ভর্ত্তি এবং পৌষ মাসের দারুণ শীত উপেক্ষা করে চতুর্দিকের জানালার সামনে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে গান শুনার আগ্রহে। এই দৃশ্য দেখে সহজেই বুঝতে পারলাম এখানকার লোকদের শাস্ত্রীয়সংগীতের উপর কত বেশী অনুরাগ। গায়কের বয়সের সংবাদ জেনে তার জন্যও বোধ হয় শ্রোতাদের বেশী করে আসরে টেনে এনেছিল। রাজাবাহাদুর গান আরম্ভ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা মাত্র তানপুরার সুর মিলিয়ে দাদুর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে এবং গুরুকে স্মরণ করে সুরু করলাম ইমন-কল্যাণ রাগের আলাপ। সেই রাগের গানের সংগে সঙ্গত করলেন রাজাবাহাদুরের বৃদ্ধ পিশেমশায় রায়চরণবাবু।

তারপর পাখোওয়াজ নিলেন ক্রমান্বয়ে রাজার বড়কাকা হিকিমসাহেব, ছোটকাকা বড়ঠাকুর সাহেব, এবং রাজা নিজে।

তিন ঘণ্টা একাধিক্রমে ধ্রুপদ চলল, শেষে এক ঘণ্টা সেতার সমানে একটা রাগের উপর বাজান হল।

গানের প্রথম সময় থেকেই সকলে খুব উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলেন। সেতার শুনে রাজশিক্ষক মিশিরজী খুবই বিস্মিত হলেন। অন্যান্যদের মন্তব্য বিশেষ করে আর কি জানাব।

পরিশেষে দাদু গাইলেন, খেয়াল, ঠুমরী এবং বাংলা প্রাচীন গীতি-খেয়ালের অনুরূপ।

রাজাবাহাদুর প্রভৃতি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন এই বয়সে

একাধিক্রমে চার ঘন্টা। এইরকম রাগরূপ উপস্থাপনার উপর পরিশ্রম আমাদের আশ্চর্য্য করে দিয়েছে।

এই রকম মন্তব্য যখন শুনি তখন আমি অবাক হই। কারণ যে কোন বিদ্যাকে ধরে, বিশেষ করে সংগীতের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে গ্রহণ করে তার সাধনায় সর্বদা মগ্ন তো থাকতেই হবে এর বিরাট বিস্তৃত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য, ক্লান্তি থাকবে কেন! চুয়াত্তর বছর বয়স হল এখনও সমানে এক সংগে দু'তিন ঘণ্টা গাইতে কষ্ট হয় না। প্রত্যেক দিন সাধনার সময় বুঝতে পারি অগ্রসরে গমন অব্যাহত আছে কিনা।

তারপর সেদিন রাত ১২টায় আসর শেষ হবার পর রাজাবাহাদুর এবং তাঁর পিশেমশায় ও কাকারা আমাদের নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে।

ধ্রুপদাঙ্গের একই রাগের বিভিন্ন তালের উপর সুরের বৈচিত্র্য রচনাবলীর যে পরিচয় থাকে তাকে আয়ত্তে আনার পর বেশ বুঝা যায় এই গানের মধ্যে রাগরূপের পরিচয় বিপুলভাবে ও প্রকৃত রূপে পাওয়া যায়। তাঁরা উপস্থিত থেকে বহুবিধ ভোজ্য বস্তু খাওয়ালেন।

সকলের একান্ত অনুরোধে আমাদের তিন দিন থাকা হয়ে গেল। প্রত্যেক দিন দু' বেলাই পুরাদমে গান বাজনা হয়েছিল। তার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছিল এখানের লোকগুলি যেন সঙ্গীত সমঝদার রূপে সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়—বহুকাল ধরে সংগীত চর্চার ধারাবাহিকতা থাকলে তবেই এইরূপ মানুষের অন্তরে সুর-ছন্দের উপর স্বাভাবিক বোধ এসে যায়।

আমার সে সময়ের সমবয়সী রাজপরিবারের সন্তানরা প্রথম দিনের প্রথম সময় থেকেই নিবিড় সখ্যস্থাপন করে নিয়েছিল। তাদেরও শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল এবং অনেকেই কিছু কিছু চর্চাও করত। একজন্য এত বেশী করে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল। এখানের সংগীত চর্চার প্রাচীন তথ্য ও ইতিহাস যা সংগ্রহ করেছিলাম তাতে জেনেছিলাম এর মূল ধারা বিষ্ণুপুর ঘরাণা হতেই—প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ওই তিনদিন বিকেলে বন্ধুর দল রাজাবাহাদুরের বিরাট অবয়বের উচ্চ দৈর্ঘ বিশিষ্ট হাতীর উপর চড়িয়ে আমাকে নানান স্থানে ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসত। ছোট ছোট পল্লী এবং সেখানের মানুষদের স্বভাব, সুন্দর ব্যবহার, প্রাকৃতিক শোভা, বিরাট জংগলের দৃশ্য—তার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কুল্ কুল্ ধ্বনি মনকে

মুগ্ধ ও বিহ্বলিত করে দিত। এইসব বস্তুর উপর আকর্ষণ বাল্য জীবন হতেই আমার থেকে এসেছে।

তারপর এখানের রাজাবাহাদুর প্রভৃতি সকলেই ৺দোল উৎসবে আসবার জন্য বিশেষ করে জানালেন। শুনলাম এই উৎসব খুব জাঁক-জমকের সহিত তিন দিন ধরে হয়। এবং প্রত্যেক দিন রাত্রের প্রথম সময়ে হয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর, পরে হয় বাঈজীদের নাচ-গান এবং শেষে হয় যাত্রাভিনয় পরের দিন বেলা ৮টা-৯টা পর্য্যন্ত।

বিদায়ের দিন বিকেলে ওখান হতে গৃহাভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের গো-যানটি রেখে দেওয়া হয়েছিল। যাতায়াতের ভাড়া তার নিজ ধার্য্য মতই ছিল পাঁচ টাকা। তখন পাঁচ টাকায় মোটা চাল দেড় মণ পাওয়া যেত।

রওনা হবার সময় লোকজনের বেশ ভিড় জমে গেছল। রাজা-বাহাদুর দাদুর হাতে চল্লিশটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করে নত মস্তকে প্রণাম জানালেন। খাজাঞ্চিবাবু বলেছিলেন—বিদায় দেওয়ার নিয়মের চেয়ে আট গুণ বেশী দিয়েছেন। রাজাবাহাদুর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বার বার আসতে বললেন ৺দোলের সময়। দাদু গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ী চলতে সুরু করল। রাজাবাহাদুর ও তাঁর কাকারা এবং অন্যান্য বহুলোক বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। আমি করজোড়ে সকলকে নমস্কার করলাম। গাড়ীতে আমার ওঠা হল না, কারণ গাড়ীর পেছনে সেই বন্ধুর দল ও আরো অনেকে হাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গ ত্যাগের বেদনা দুই পক্ষেরই করুণ ভাবের সৃষ্টি করেছিল। গ্রামপ্রান্তের তখনকার সমস্রোতা-লীলাবতী নদী পার হয়ে আরো অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁরা সকলে এলেন। সে সময় প্রীতির মায়া আরো গভীর করে তুলেছিল। তার তৃপ্ত মধুরস মনের আধারে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিল। এই জিনিস জীবনে সেই প্রথম পেয়েছিলাম এবং শেষও বলা চলে। দাদু স্নেহমাখা স্বরে নিষেধ করে তাদের আর বেশীদূর হাঁটতে দিলেন না। আর একবার গাড়ীর ভেতরেই দাদুকে সকলে প্রণাম করল। আমি প্রত্যেকের সংগে বিদায় আলিঙ্গন করে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী চলতে লাগল, অপলক নয়নে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল। অদৃশ্য হওয়ার শেষ মুহূর্তে বহু দূর হতে অনেকগুলি প্রীতিমাখা হাত উঠল। সূর্য্যদেব তখন অস্তমিত, —মনের আনন্দজ্যোতিও যেন নিষ্প্রভের মত হয়ে গেল। দাদু বললেন

কেমন লাগল? উত্তর দিতে পারিনি, হাসির সংগে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়েছিল।

(৩৫)

পরের কথা,—

ভেলাইডিহা হতে ফিরে এসে ৺দোলের আগে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বাড়ীতেই থাকা হল। এই সময়ের মধ্যে দেশ বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ আমার কাছে গান শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি নিলো। জ্ঞানেন্দ্রর কণ্ঠছিল বাল্যকাল থেকেই সুমিষ্ট ও দরদ ভরা। কিন্তু শেখবার সুযোগ না পেয়ে এবং পড়াশুনাতেও নিযুক্ত না থেকে কেবল পাড়ার হরিজন ছেলেদের সংগে খেলাধূলোতেই সময় নষ্ট করে দিচ্ছিল।

একদিন ওই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কাণে এল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে (জ্ঞানেন্দ্র) ডাং গুলি খেলতে খেলতে একটা গানের অংশ গেয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে গেলাম এবং সবিশেষ পরিচয় নিয়ে অনেক কিছু উৎসাহমূলক উপদেশ দিয়ে গান শেখার জন্য আগ্রহ জানালাম। ভগবানের কৃপায় সেদিন আমার আন্তরিকতায় আকর্ষিত হয়ে আমার কাছেই শেখবার বাসনা জানাল। জিজ্ঞেস করল—সত্যই আমি ভাল গায়ক-হতে পারব? বললাম নিশ্চয়ই পারবে, তোমার মধ্যে পারার মত সব কিছুই শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে।

পরের দিন থেকেই আমার কাছে যাতায়াত করতে লাগল এবং সেই থেকে নিয়মিত শিক্ষা সাধনায় নিষ্ঠা এসে গেল। বাড়ীতে তার তানপুরা ছিল,—সুরবাঁধা শিখতে মোটেই বিলম্ব হল না। ভগবানের কৃপায় তার সংগীতে সুমতী দেশের কাছে গায়কের পরিচয়ে বরেণ্য করে তুলল এবং তার নাম স্মরণীয় হয়ে রইল।

আমার কাছে শিক্ষার সময়ের কিছুকাল পরে তার খুল্লতাত ওই গোঁসাইজী শিক্ষার কথা জানতে পেরে দেশে এসে জ্ঞানেন্দ্রকে সংগে করে নিয়ে গেলেন বহরমপুরে। তিনি তখন কাশিমবাজারের মহারাজার গায়ক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বহরমপুরের সংগীত বিদ্যালয়ের আচার্য্য।

জ্ঞানেন্দ্রর কণ্ঠ ছিল যেন ভগবানের এক অপূর্ব্ব দানের মত, কোনদিন ক্ষয় বা নষ্ট হতে দেখিনি। আসরে গান ধরে প্রথমেই জমিয়ে দিতে পারত। এ রকম সম্ভাবনা অধিকাংশ গায়কেরই থাকে না। এমন জনপ্রিয় গায়ক চল্লিশ বছর বয়সের পরই সঙ্গীত জগৎ হতে বিদায় হয়ে গেল। তার মৃত্যু আমাকে খুবই আহত করেছিল।

একবার আমার দাদামশায়ের পল্লীগ্রাম মান্দারবনীতে ৺রাশপর্ব্ব উপলক্ষ্যে খুব জাঁকজমকের সহিত বিরাট আকারে বাঁকুড়া জেলা সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রকে বলা মাত্র সেই অনুষ্ঠানে আমার সংগে গিয়ে যোগদান করেছিল এবং সেই সংগে রমেশচন্দ্র ও গোকুল নাগ সেতারীও। ট্রেনে যাবার সময় জ্ঞানেন্দ্রের সমস্ত রাত ধরে সে কি উল্লাস ও রসালাপ! আমাদের কাউকেই ঘুমোতে দেয়নি।

ভোরে বাঁকুড়া ষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে দ্বারকেশ্বর নদীতে বালির মধ্যে চাকা বসে যাওয়ায় জ্ঞানেন্দ্র ঝাঁপিয়ে নেমে চাকা ঠেলতে থাকে আর মজার মজার বাক্য আওড়াতে থাকে। আমরাও তখন নেমে পড়েছি এবং খুব হাসছি তার কথায়। এই রকম আনন্দের মধ্যে দিয়ে ষ্টেশন হতে সাত মাইল দুরবর্ত্তী নির্দিষ্ট গ্রামে গিয়ে পৌছলাম একটু বেলায়। একটু পরেই জলযোগের বিপুল আয়োজন। আয়োজন দেখে জ্ঞানেন্দ্র ভারি খুসী। বাঁকুড়া ষ্টেশনে আমাদের নিয়ে যেতে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর সম্মেলন মণ্ডপে এবং চতুর্দিকের বিস্তৃত স্থানে বহু শত লোকের জমায়েত দেখে জ্ঞানেন্দ্র, রমেশ প্রভৃতি শিল্পীরা অবাক বিস্ময়ে বলেছিল, দাদা! এ-যে জনসমুদ্র এবং যে রকম কোলাহল এতে গান-বাজনা কি করে হবে? তায় মাইক নেই। গান আরম্ভ হতেই শ্রোতাদের আগ্রহ ও উৎকর্ণ হয়ে সারা রাত ধরে গান-বাজনা শুনা দেখে জ্ঞানেন্দ্র, রমেশ প্রভৃতি বলেছিল এত দীর্ঘ সময় ধরে এইরূপ জনসমুদ্র শ্রোতাদের যা ধৈর্য্য ও আগ্রহ এবং প্রকৃত সমঝদারের মত শক্তি দেখলাম এ রকমটি কোথাও দেখা যায় না, শ্রোতাদের উপর আমরা শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়েছি,—সত্যই এই রকম আগ্রহ ও শোনার নিষ্ঠা বোধ হয় কোন জায়গায় পাওয়া যাবে না।

এই সম্মেলনে সিমলাপালের ও ভালাইডিহার রাজা এবং রাজ-পরিবারের বহু লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তিরিশ-চল্লিশ মাইলেরও বেশী

দূরদূরের গ্রামসমূহ থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গো গাড়ী করে এসেছিলেন — দু'দিন আগে থাকতে গ্রাম থেকে রওনা হয়ে। বাঁকুড়া সহরের এবং চতুষ্পার্শ্বের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সঙ্গীতজ্ঞরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সংগীতের এই রকম বিরাট আসর বাঁকুড়া জেলায় আজ পর্য্যন্ত হয়নি।

মান্দারবনীর মত গ্রামের সাধারণ অবস্থার মানুষদের পক্ষে এত অর্থ ব্যয় করে আসর করার এই যে প্রেরণা ও উৎসাহ এসেছিল তার মূল কারণ আমার প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকায় আমার ইচ্ছেকে রূপায়িত করার একান্ত প্রেরণা এসেছিল। তাছাড়া শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রতি অনুরাগের লোক-সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল।

এই প্রসঙ্গে—বিষ্ণুপুরে আমার দেখা সময়ে সঙ্গীতচর্চারত ব্যক্তির সংখ্যা কিরূপ ছিল তার পরিচয় এখন অনেককে বিস্মিত করবে। রাধিকা-প্রসাদ, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, অম্বিকা, এইসব বড় বড় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়াও ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক আমার পিতামহ, গঙ্গানারায়ণ, জ্ঞানেন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ, নকুল গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র, হারাধন এবং পরের স্তরে অনন্ত চক্রবর্ত্তী, তারপর—দুখীরাম শাঁখারী, দেবাকর শাঁখারী, আমার ছাত্র ভোলানাথ শাঁখারী, এরাও কণ্ঠ সংগীতে, আরো যাঁরা তাঁরা হলেন, ধ্রুপদে— কালিদাস শাঁখারী, রামপদ দত্ত, রাইচরণ কুঁচলিয়া, পাখোওয়াজে—শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন—গিরিশ চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর সরকার, কীর্ত্তিচন্দ্র গোস্বামী, পরের স্তরে—বিজন শাঁখারী, নগেন্দ্রনাথ শাঁখারী, কেশব চট্টরাজ, শ্যামসুন্দর সেনগুপ্ত;—এসরাজে বিপিন পোদ্দার বামুন, গঙ্গাবিষ্ণু চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই পরলোক গত। এই সংখ্যার দ্বারা সহজেই অনুমান হবে ওই সময়েও বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতচর্চার কি বিরাট পরিচয় ছিল।

আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন—কোন নির্দিষ্ট গায়কীর উপর কি বিষ্ণুপুর ঘরাণার পরিচয় আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমার কাছে যে সব তথ্য ও নির্দিষ্ট পরিচয় নিয়ে ইতিহাস আছে প্রমাণের উপর সেই প্রমাণ ধরে তাঁদের জানাই — গায়কীর রীতি ধারার উপর বিষ্ণুপুর ঘরাণার সৃষ্টি হয় নি। তার কারণ যে সময় থেকে ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি শ্রেণীগত গান বিষ্ণুপুর ঘরাণায় সংগৃহীত হয়েছিল তা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট ঘরাণার গায়ক গুণীদের মাধ্যমে। সেইসব গায়কদের বিভিন্ন গায়ন পদ্ধতিকে বিষ্ণুপুরের

গায়করা পছন্দমত গ্রহণ করে চর্চ্চায় রেখেছিলেন। এই সবের বিশদ পরিচয় আমার প্রণীত 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। বিষ্ণুপুরে গায়কীর বিভিন্নরূপ প্রবেশ করলেও দু'একটি বাদে সমস্ত রাগের রূপ একই গঠন পদ্ধতির উপর ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে আছে বিষ্ণুপুর ঘরাণা রাগরূপের প্রাচীন ও বাস্তব নীতি ধারার একমাত্র সংরক্ষক ও প্রতিভূ এবং নিদর্শন স্বরূপ।

এই ঘরাণার সর্ব্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এই, ভারতের বহু স্থান হতে আগত গুণী পরম্পরায় শাস্ত্রীয়সংগীতের মহামূল্য রত্নরাজী সদৃশ ধ্রুপদাদি শত শত গান সংগৃহীত হয়ে এখানের সঙ্গীত ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। গানের মধ্যে দিয়ে রাগরূপের শাশ্বত নীতিধারার প্রমাণ বিশেষ করে এইখানেই এখন পাওয়া যাবে। এজন্য এই ঘরণার পরিচয় শুধু বিখ্যাত বিখ্যাত গায়ক যন্ত্রীদের নিয়েই নয়, ঘরাণার ওই পরিচয়ও আদর্শ স্বরূপ।

এবার মূলসূত্রে ফিরে যাই,— ভালাইডিহার রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে লোক মারফৎ নিমন্ত্রণ লিপি এল ৺দোলে উপস্থিত হবার জন্য।

দাদু ও আমি সেই কলুর গোগাড়ীতে করে রওনা হয়ে ৺দোলের দিন বেলা ৯টার ভালাইডিহায় পৌছলাম।

আমাদের উপস্থিতিতে সকলের মধ্যেই বেশ একটা আনন্দের আলোড়ন এসে গেল। বন্ধুরা বোল্‌ল—আপনাদের আসার সময়ের উপর আন্দাজ করে আমরা নদীর ওপারে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় থেকে এইমাত্র ফিরে আসছি।

গানের আসরের জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে বিষ্ণুপুরের সংগীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ধ্রুপদ গায়ক হারাধন দেবঘরিয়া মহাশয় এবং ধ্রুপদ গায়ক কালীনাথ নন্দী আমাদের আসার আগের দিনেই পৌছে গেছলেন। ভেলাইডিহায় দোলের তিন দিন উৎসবের প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর দোলমঞ্চে ৺রাজাদের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরজীউ এর আরতি সমাধার পর, সামনের নাট মন্দিরে গানের আসর হয়ে থাকে। নাট মন্দিরের অভ্যন্তরে এবং তার চতুষ্পার্শ্বে লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং প্রত্যেকেই নিবিষ্টচিত্তে গীতাদি শ্রবণ করে।

আসরের গৌরব ও গুরুত্ব পাছে নষ্ট হয় এজন্য এবং গুনীর আগ্রহ ও উৎসাহদানের কর্ত্তব্য রেখে রাজাবাহাদুর এবং তাঁর পরিবারবর্গ সকলেই বিবিধ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আসর থেকে ওঠেন না। এই

বিচারবোধ বংশ ঐতিহ্যের পরিচায়ক। আমাদের প্রথম যাওয়ার বছরে দেখলাম—সন্ধ্যার পর আসরে বসার একটু পরেই কুলপুরোহিত প্রত্যেকের কপালে চুয়া-চন্দন মিশ্রিত সৌরভময় আবীর লেপন করলেন। তারপর অদূরে তিনবার তোপধ্বনি হয়ে যেতেই গান আরম্ভ হল। প্রথমে স্থানীয় দু' একজন ধ্রুপদ গাইলেন, তারপর বিষ্ণুপুর থেকে আগত ধ্রুপদ গায়করা, তারপর আমার ধ্রুপদ, খেয়াল এবং হোরীঠুংরীর গান হবার পর গাইলে পিতামহ খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরী। অবশেষে আমার হল সেতার বাদন। এখানে তিন দিন ধরে প্রথমতঃ গান-বাজনার আসর, পরে বাঈজীদের নাচ এবং শেষে যাত্রাভিনয় হত।

দোলপর্ব সমাধার পর চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে রাজাবাহাদুর আমার পিতামহকে সাগ্রহে প্রস্তাব করলেন আমাকে তাঁর কাছে থাকবার জন্য। বললেন - আপনার নাতির সেতার বাদন পদ্ধতিতে খুব আকৃষ্ট হয়েছি। এই উচ্চ-পদ্ধতিতে আমি শিখতে চাই এবং অন্যান্য যারা মিশিরজীর কাছে শিখছিল তারাও এই বাদন কায়দায় শিখবার জন্য ভীষণ আগ্রহী হয়েছে। কয়েকজন ধ্রুপদ, খেয়ালও শিখতে খুবই বাসনা জানিয়েছে। তারা একটু একটু গাইতে যে পারে তার পরিচয় আপনারা প্রথম দিনের আসরে পেয়েছেন।"

প্রসঙ্গক্রমে একসময় ঠাকুরদা' বাড়ী করবার আকাঙ্ক্ষায় রাজাবাহাদুরকে তার উপযোগী কাঠের কথা জানিয়ে রেখেছিলেন, তার সূত্র ধরে বললেন,—যত কাঠ লাগবে তা আমি নিশ্চয়ই দেবো এবং বাড়ী তৈরীর অন্যান্য খরচ বাবদ যা টাকা লাগবে তা এক একবারে বেশী করে দিয়ে যাব। অবশ্য সেটা মাইনের মধ্যেই ধরা থাকবে এবং তা মাসে পঞ্চাশ টাকার কম হবে না। আমি গয়ার মিশিরজীকে মাসে তিরিশ টাকা করে দিই।" তখনকার মাসে পঞ্চাশ টাকা করে বেতনের এখনকার সংখ্যা কত তা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন।

রাজাবাহাদুরের প্রস্তাবে আমরা সাগ্রহ সম্মতি জানালাম। এখানে প্রত্যেকের কাছে আন্তরিক আদর যত্ন লাভ করে থাকার আকর্ষণ স্বভাবতই এসে গেছল। তাছাড়া পনর বছর বয়সে রাজার সঙ্গীত শিক্ষকের পদ পাওয়া এবং তখনকার দিনের অতগুলি করে টাকা পাওয়া তার সংগে খাওয়া-পরার সবকিছু সুব্যবস্থা যেন একটা বিরাট পরিবর্ত্তন বলে মনে হয়েছিল। শুধু তাই নয় বাড়ী করার আকাশ-কুসুম কল্পনা এরকমভাবে

এত শীঘ্র ভগবান বাস্তবে রূপায়িত করে দেবেন তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যেন ম্যাজিকের মত হয়ে গেল। দাদু বললেন—গোপীনাথকে ধরে থাকলে তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে দেরি করেন না। আমি বললাম—আমি কি সত্যই তাঁকে তেমনভাবে ধরতে পেরেছি? দাদু বললেন—ধরতে পেরেছিস কি না পেরেছিস, সেটা তোর চেয়ে আমি তোর সম্বন্ধে বেশী জানি। বললাম,—যদি কিছু পেরে থাকি তাহলে সেটুকু পারার সামর্থ্য লাভের পথপ্রদর্শক আপনিই এবং আপনিই তার তালিম গুরু।

যাইহোক্—রাজাবাহাদুরকে সম্মতি দিয়েই আমাদের মনে হতে লাগল মিশিরজীর অন্ন মারা হবে—মনের এই কষ্ট ও সঙ্কোচ প্রকাশ করায় রাজাবাহাদুর বললেন,—তাঁর শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা ও শৈথিল্য তো আছেই তাছাড়া আমরা এই উত্তম পদ্ধতির বাজনাই শিখব মনস্থ করেছি এবং গানের চর্চ্চা বাড়ানও আমার একান্ত ইচ্ছে। মিশিরজীর জন্য আপানাদের ভাবতে হবে না। আপনাদের প্রথম বারে আসার সময়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর থাকা আর সম্ভব হবে না। তখনই সকলে আমাকে ধরে বসেছিল—সত্যকিঙ্করবাবুকে রাখবার জন্য। আমি তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম - ৮দোল পর্য্যন্ত মিশিরজী থাকুন, তারপর ৮দোলের সময় আপনারা এলে এই প্রস্তাব উত্থাপন করব। অন্যান্য সকলের তো বটেই আমারও সব দিক দিয়েই আপনার নাতির প্রতি গভীর আকর্ষণ এসে গেছে, মনে হচ্ছে এত দিনে যোগ্য গুরু পাব। বয়েসে যতই ছোট হোন্ আমার কাছে প্রকৃত গুরুর মতই মান্য পাবেন।" রাজাবাহাদুরের কাছে এই রকম শ্রদ্ধান্বিত আগ্রহের কথা শুনে আমরা অভিভূত হয়ে গেছলাম। আমার ভিতরটা হতে যেন কি এক অপূর্ব্ব জিনিস পূতপবিত্র ধারা নিয়ে চোখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

আমার থাকা হয়ে গেল। সকলের উল্লাস আর ধরে না। ৮দোলের আসরের দাদু চল্লিশটি টাকা পেয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। সংগে আর একটি গো গাড়ী গেল আমার তানপুরা, বাক্স ও বইপত্তর আনবার জন্য।

থাকার স্থান হল রাজাবাহাদুরের বৈঠকখানার পাশের কুঠরীটিতে। দিন দুই বাদে ভাল দিন দেখে বৃহস্পতিবারের সকালে রাজাবাহাদুর ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যথা নিয়মে নূতন করে সঙ্গীতে দীক্ষা নিলেন। আমার ওই বয়সে অনেকগুলি ছাত্রকে পেয়ে তাদের জন্য খুব আগ্রহ নিয়ে পরিশ্রম করতে লাগলাম আনন্দ সহকারে।

রাজাবাহাদুর রাত ৪টার সময় ঘুম থেকে উঠে মিনিট পনর প্রাতঃভ্রমণ করে সেতার নিয়ে সাধতে বসতেন। আমিও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর সংগে হস্ত সাধনগুলো দু'ঘণ্টা ধরে বাজিয়ে যেতাম। তারপর শৌচাদিক্রিয়া সমাধা করে আমি গান সাধতে বসতাম। ৬৷৷৹টা থেকে ৮৷৷৹ পর্য্যন্ত কেবল স্বর সাধনার ক্রিয়াগুলোই সেধে যেতাম।

তারপর আসত জলখাবারের বস্তু প্রায় আধসেরের মত সুগন্ধযুক্ত খুব পাতলা চিঁড়ে (আমাদের দেশে পরিমাপ অনুযায়ী কাঠের বা পেতলের তৈরি কুন্‌কীর মত আকৃতি বস্তুকে সের নামে ব্যবহার করার প্রচলন এখনও আছে। ভেলাইডিহা অঞ্চলে এই সের বা পাই নামের পাত্রটিতে ভর্ত্তি বস্তু ১২০ ভরি ওজনে থাকে) তিন পো দুধ, তার সংগে এক পো গুড় এবং সময় সময় মর্ত্তমান কলা দু'তিনটে। এইগুলি সংমিশ্রিত করে পরম তৃপ্তির সহিত অম্লান বদনে জলযোগ সমাধা করতাম। জল-খাবারের এই পরিমাপ শুনে এখন সকলে অবাক হয়ে যায় এবং হাসির ব্যাপারেও পরিণত হয়। এই অবিশ্বাসের কারণ স্বল্প ও পরিমিত ওজন ধরা খাওয়ার অভ্যাস হয়ে আসার দরুণ ক্ষুধার শক্তি এবং খেতে পারার শক্তির ধারণার অভাব। আগেই বলেছি—ডাক্তারী ব্যবস্থার নির্ঘণ্টানুযায়ী শিশুদের ওজনধরা পরিমিত খাইয়ে গেলে এই অবস্থাই হয়। ভেলাইডিহার রাজপরিবার থেকে সকলের কাছেই চিঁড়েই প্রধান খাদ্য। কারণ এঁরা উৎকল প্রদেশেরই মানুষ তাই ····। তাছাড়া এই খাদ্যটি যেমন পুষ্টিকর তেমনি শক্তিবর্দ্ধক এবং এর প্রস্তুতে ও গ্রহণে কোনই অসুবিধে নেই। ভেলাইডিহা অঞ্চলের বহু দূরত্বের বিস্তৃত অঞ্চলের বহু গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষদের প্রধান খাদ্য হল চিঁড়ে, ভাতটা বৈকালিক আহারের মত ভেবে খুব একটা আকর্ষণ থাকে না। সাধারণ মানুষরা জলে ভিজিয়ে নুন-লঙ্কা দিয়েই পরম পরিতোষ সহকারে চিঁড়ে খায়। গুড় কোন স্তরেরই জন্য দরকার হয় না। উপর স্তরে চিঁড়ের সংগে তরকারীর সহযোগ অপরিহার্য্যরূপে থাকে। রাজাবাহাদুরকেও দেখেছি এইভাবে খেতে। চিঁড়ে প্রধান খাদ্যরূপে থাকার জন্য প্রত্যেকেরই শরীর স্বাস্থ্য খুবই শক্ত পোক্ত দেখেছি।

পূর্ব প্রসঙ্গে, তারপর জলযোগ সেরে ১০৷৷ টা পর্য্যন্ত ছাত্রদের শিখিয়ে গান সাধতে বসতাম। ১২৷৷৹টায় তানপুরা তুলে দিয়ে দলবদ্ধভাবে নদীতে স্নান ও সাঁতারকাটা সেরে রাজাবাহাদুরকে শেখাতে বসতাম।

তাঁর সাধনার উপর অধ্যবসায় ছিল ভবিষ্যতে বড় শিল্পীর সমতুল্য হবার মত। নূতন কোন একটা সুর শিখিয়ে বলতাম আমার সংগে এইটা পাঁচশ' বার বাজিয়ে যান। তিনি তাই করতেন, একটুও ক্লান্তিবোধ করতেন না। সাধনার প্রকৃত এই নিয়ম অনুসরণ করার সেতারে তাঁর হাত খুব শীঘ্র তৈরি হয়ে উঠেছিল। আমার সেই বয়সে এখানে থাকার ভাগ্যগুণে শিক্ষকতার ধৈর্য্য এবং তার মধ্যে দিয়ে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্পদগুলি সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম এবং এতগুলি ছাত্রকে গান ও গৎএর স্বরলিপি করে দিতে হত বলে দ্রুতভাবে করার দক্ষতা তার উপর এসে গেছল।

কম বয়স থেকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ এলে বিদ্যার অধিকারের যে শক্তি বৃদ্ধি হয় তাতে আমি মনে করি ছাত্ররাও গুরুর মত উপকার করে। বেশ বুঝতে পারা যায় তাদের শিখানর মধ্যে দিয়ে আমিও বড় কম লাভবান হচ্ছি না। প্রত্যেক দিনই যাচাই হতে থাকে নিজের দক্ষতা কিরূপ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যথার্থ পথে ও যথার্থ নিয়মে শিক্ষকতা করতে পাওয়া এ-ও খুব সৌভাগ্যের বিষয়, অবশ্য যদি শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিষ্যের মত হয়। শিক্ষককে একদিন এই মর জগৎ ত্যাগ করতে হবে কিন্তু তার সাধনা সম্পদ যদি ছাত্রদের মাধ্যমে থেকে যায় তাহলে যথা সময়ে মৃত্যু দেহেরই ঘটবে, আসলের মৃত্যু হবে না এবং আত্মার তৃপ্তিরও কারণ হয়ে থাকবে।

(৩৬)

ভেলাইডিহায় থাকার বিবরণের জের—

ভেলাইডিহায় থাকার সময় মধ্যাহ্নের খাওয়া বেশ একটু উত্তীর্ণ বেলায় হত। অর্থাৎ প্রায় তিনটে বেজে যেত। এর কারণ উদরে চিঁড়ের প্রভাব। খাস অন্দর হতে আমার জন্য অন্নাদি আসত। খাওয়া সেরেই বসতাম স্বরলিপি দেখে গান তুলতে—যে গুলো আমার সেখার সুযোগ হয়নি। তবে স্বরলিপি দেখে ধ্রুপদ গান মুখস্থ করে মনে রাখা খুব শক্ত হয়, যদি না সেগুলো নিয়মিত রেওয়াজ করা যায়। মুখে শেখা গান কোন দিনই ভুল হয় না। এজন্য আমার মতে গান বা গৎ স্বরলিপির উপর নির্ভর করা বেশী উচিত নয়; কেবল সংরক্ষণের জন্য এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে। ঘণ্টা দুই বাদে বন্ধুদের সংগে বেড়াতে যেতাম নদীর ধারে; জংগলে কিংবা

রাজাবাহাদুরের একান্ত তত্ত্বাবধানে মনোমত করে তৈরি ফুলের বাগানে। এই বিরাট বাগিচাটিতে আধুনিক কৃত্রিমতার রূপ-সজ্জা কিছু ছিল না। দেখে মনে হত বাগিচা-সুন্দরী যেন তার স্বাভাবিক রূপের আকাঙ্ক্ষা রেখে সেইভাবে সজ্জিত হয়ে বিনয়-নম্র ও লজ্জাবনত মূর্তিতে দর্শকদের সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তাই এত আকর্ষণ আসত তার সান্নিধ্যে যাবার জন্য এবং গেলেই তৃপ্তি ও শান্তিতে মন ভরে যেত। বাগিচাটির চতুর্দিকের বিস্তৃত সীমার পরিধি ছিল প্রায় বিঘে কুড়ির মত জায়গা নিয়ে। থাককাটা মেহদী গাছের বেড়ার ভেতরের প্রথমস্তরের চারিদিকে ছিল শ্বেত ও স্বর্ণ চাঁপার গাছ। দ্বিতীয় সারিতে ছিল নাগেশ্বর ফুলের গাছ। এর ফুল এত সুন্দর, কোমল ও সুগন্ধযুক্ত যে, হাতের কাছে পেলে মনে হত যেন কি এক তৃপ্তির বস্তু পাওয়া গেল। স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের গুণাবলীই শুনা যায়,—সেই গুণাবলীর সংগে যদি মেলান সম্ভব হত তাহলে নাগেশ্বর ফুলকে বোধ হয় তার সমমর্য্যাদায় ফেলা যেতে পারত। এই ফুল এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে।

তারপর বাগিচার তৃতীয় সারিতে ছিল জুঁই ও কুন্দ ফুলের গাছ অতি সুন্দর করে সাজান। তার সামনের মধ্যস্থলে মাটির দ্বারা নানান অঙ্করূপ তৈরি করে তার এক একটিতে গোলাপ ও বেল ফুলের গাছ ছিল। এক একটা গোলাপ গাছে এত বড় আকারের গোলাপ ফুল হত যেন এক একটি রেকাবীর মত আকার বিশিষ্ট। যথাসময়ে এত বেশী বেল ফুল ফুটত যে আমরা মালিকে দিয়ে তুলিয়ে সবুজ ঘাসের উপর স্তূপাকার করে রেখে তার চারদিকে বসে সৌরভের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে যেতাম। খানিকক্ষণ বাদে মনে হত যেন সারাদেহ জুড়েও বেল ফুলের সুগন্ধ বের হচ্ছে। বাগানের বেড়ার পশ্চিম দিকে খুব বড় বড় কয়েকটি শালগাছ ছিল। সন্ধ্যায় সেইসব গাছের শাখায় নানান জাতের নানান রং ও গঠনের সুন্দর সুন্দর পাখীরা কুলায় এসে যখন সুকণ্ঠে ধ্বনি তুলত তখন মনকে অভিভূত করে দিত।

কোন কোন দিন বিরাট জংগলের দিকে বন্ধুদের সহিত হাতীতে চড়ে বেড়াতে যেতাম। সেদিন সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করত তার দৃশ্য শোভা। জংগলে প্রবেশ করবার সময় থেকেই মনে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে দিত। বন্ধুরা গাইতে অনুরোধ করার সংগে সংগেই গান ধরে দিতাম। কণ্ঠ গাইত গান আর চক্ষুদ্বয় দর্শন করত জংগলের বিরাট ও বিশাল

রূপ সৌন্দর্য্য। এরূপ সৌন্দর্য্যময় বনশোভা সেই আমার প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। আট-দশ হাত অন্তর অন্তর বিপুল বলিষ্ঠ দেহে দীর্ঘাকৃতি শত শত শাল তরুদের ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখে মনে হত যেন কোন আকাঙ্ক্ষিত জনের আগমন প্রতিক্ষায় সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছে। বায়ুর সঞ্চরণ যখন দ্রুত ও গুরুছন্দের নৃত্যে চলত তখন মনে হত তরু-রাজীদের যেন সেই পাওয়ার বস্তুর জন্য অস্থিরতা বেড়ে গেছে— তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে ডাকছে ওগো এসো, ওগো এসো বলে।

এখানে বসন্তকালের শোভা ছিল আরো অপরূপ ও আকর্ষণীয়। ফুলে-ভরা শাখায় শাখায় নানান জাতীয় বিহঙ্গমের কলতান আকাশ-বাতাসকে ভরিয়ে দিত। তখন তাদের সেই কণ্ঠধ্বনির মধ্যে যে অবোধ্য ভাব-ভাষা থাকত তাকে ভাবের মনে উপলব্ধি করে মনকে কোন এক অপূর্ব্ব লোকে যেন নিয়ে যেত। ভাবতাম ভগবান এদের যে এমন সুন্দর সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে বৃক্ষের প্রাণী করে নির্জনে স্থান দিয়েছেন তা বোধ করি তাঁর নিজে শুনবার জন্যই। তাই বোধ হয় এরা নির্জনে, বনে, গহনে তাঁকে উপলব্ধি করে সঙ্গীতে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে আনন্দ পায়। আর মানুষ সঙ্গীতকে নিয়ে চায় খ্যাতি, প্রশংসা এবং তার সঙ্গে থাকে নাম-ডাকের লালসা ইত্যাদি। শুনান হয় যাদের সেখানে নিজের কাজ প্রকৃতভাবে কিছু হয় না এবং আসল কাজের জন্য চেষ্টার একান্ত অভাবই থেকে যায়। এক এক সময় ভাবি এই এত বড় জিনিস নিয়ে কারবার করলাম যাদের সংগে তাদের কাছে যা মূল্য পেলাম তা সেখানে নিয়ে যাবার মত কিই বা রইল!

(৩৭)

সেখানের জের,—

ভেলাইডিহার দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটতে লাগল। কিছুদিন থাকার পর রাজাবাহাদুর আমাকে দু'শ টাকা দিয়ে বললেন—দেশে গিয়ে বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করে আসুন। সেইদিনই রাত্রে গো-যানে রওনা হয়ে প্রথমতঃ দাদা মশায়ের ওখানে গিয়ে তাঁকে সংগে করে নিয়ে গেলাম বিষ্ণুপুরে। তাঁর সাংসারিক সব বিষয়েই পাকা বুদ্ধি ছিল, এবং জানতেনও

সবকিছু। বাড়ীতে পৌঁছে দাদা মশায়ের নক্সামত বাড়ীর ভীতকাটা ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে যেতেই তাঁর উপর সব ভার দিয়ে আমি রাজবাটীতে ফিরে এলাম।

রাজাবাহাদুরের মাছ ধরা এবং শিকারে অত্যন্ত সখ ছিল। একদিন তিনি নিজেই আগ্রহী হয়ে আমাকে বন্দুক চালনা শিখিয়ে দিলেন। পাহাড়তলির একটা বড় শালগাছের আগায় সাদা ঘুঘু বসে ডাকছিল, রাজাবাহাদুর আমাকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে বললেন—বন্দুকটা এইভাবে খুব শক্ত করে ধরে পাখীটার মাথা লক্ষ করে ঘোড়াটা টিপে দিন, নলের মাথায় যে ছোট চিহ্নটি আছে তার সংগে পাখীর মাথা এক করে নেবেন।" আমি ঠিক সেই নিশানা ধরে বন্দুক বাগিয়ে ঘোড়াটা টিপে দিলাম। আওয়াজের সংগে সংগে পাখীটা প্রাণহীণ দেহ নিয়ে লটু করে পড়ে গেল। আমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—প্রথম প্রচেষ্টাতেই কি করে এমন হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। রাজাবাহাদুর আমার নিশানার অব্যর্থতার তারিফ্ করলেন বটে কিন্তু আমার মন তখন বলেছিল—এই কাজ যদি পুণ্যের হত তাহলে পাখীটা স্থির বসে থাকার উপর বার বার গুলি চালালেও বোধ হয় তার গায়ে লাগত না। যাই হোক্, এই নেশা আমাকেও বেশ কিছুকাল পেয়ে বসেছিল। ১৯২৩ সালে অল ইণ্ডিয়ার লাইসেন্স পেয়ে একটি দোনলা ভাল বন্দুক কিনেছিলাম। কিন্তু ১৯৩৫ সালের পর থেকে আর বন্দুক ব্যবহার করি না। প্রাণী হত্যা এবং মাংস ভক্ষণের প্রবৃত্তি এটা সেই আদিকালের জন্মধারার সহজাত হয়ে থেকেই গেছে। এখন আবার মানুষকে হত্যা করার উন্মত্ততা সমস্ত অন্যায়কে ছাড়িয়ে গেছে। হত্যা এখন দুই প্রথায় পশুদের হার মানিয়ে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। এক প্রথায় চলছে আক্রমণ ও আক্রোশ নিয়ে হত্যা আর এক প্রথায় ব্যবসায়ী ও চোরা-কারবারীরা মানুষদের খাদ্যাদির উপর অশেষ কষ্ট দিয়ে চালাচ্ছে হত্যার কাজ। অর্থাৎ হত্যাটা সমভাবে সকলেই বেশ ব্যপ্ত করে নিয়েছে নানান পদ্ধতিতে। এই সব দেখে মনে হয় আদি জাতিরা এত অমানুষ ছিল না। অর্থের মর্ম বুঝত না তাই অর্থ পিশাচ ছিল না, দগ্ধে দগ্ধে অসংখ্য লোককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিত না। নিজের স্বার্থে অন্যের যতই অনিষ্ট হোক্ তাতে আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না। আগের কথায় আমিষাশি সম্প্রদায়দের জীবের মাংস ভক্ষণের স্পৃহা সেই আদিকাল থেকে সমভাবেই থেকে এসেছে।

জীবন্ত বা মৃত মাছ এবং খাসী, পাঁঠা, পাখী বন্য জীব ইত্যাদি বধ

করে ও কেটে খেতে আমরা খুব আনন্দ পাই কিন্তু কি করে আনন্দ ও তৃপ্তি আসে সেটা মানবতার বিচারে সত্যই ধারণায় আসে না। জীবের দেহ নষ্ট করছি ও খাচ্ছি এবং তাতে আনন্দ পাচ্ছি এই প্রবৃত্তি মানুষের রুচিবোধ এবং দয়া মায়া-ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি গুণবস্তুগুলি বুঝতে পারার পরও কি করে মনে স্থান পেল তাই ভাবি। আমরা বলব স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন আছে কিন্তু যারা নিরামিষাশী তাদের স্বাস্থ্য তো আমিষাশীদের চেয়েও অনেক ভাল, যেমন হাতী, গণ্ডার, বাইসন্ মহিষ প্রভৃতি। এদের শক্তিও অসামান্য। যাক্ এসব যুক্তির কথা, মোটের উপর আমরা মাছ-মাংস খেয়ে যাবই এবং যাঁদের শিকার করতে ভাল লাগে তাঁরা পাখী এবং অন্যান্য প্রাণী হত্যা করবেনই। হত্যাটা একটা আনন্দের বস্তু যখন তখন বলবার কিছু নেই। মানুষের সংগে অন্য প্রাণীদেরও হত্যায় আইনগত কোন চরম দণ্ড যদি থাকত তাহলে কি হত বলা যায় না।

কি রকম নিষ্ঠুর আমরা,—জলে মাছ খেলা করছে—সে জানে না তার জন্য মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে, জলের ভেতর দেখতে পেল খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় এল ধেয়ে খাদ্যটিকে গ্রহণ করবার জন্য। যেমনি মুখে দেওয়া ওমনি মেছড়ি দিলে হেঁচকা ঘাই,—বেচারির গলায় গেল কাঁটা আটকে, জলের ভেতর যন্ত্রণায় ছটপট করতে লাগল, এদিকে মেছড়ির আনন্দে বুকের ভেতরটায় তখন নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। মাছ বেচারির প্রাণপণ শক্তি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা আর অন্য দিকে তাকে ডাঙ্গায় আনবার জন্য বিপুল প্রচেষ্টায় সার্থক করে তুলা। জলের মধ্যে তাদেরও সন্তানাদি সবকিছু প্রিয়জন আছে। তখন তারাও আপন জনের এই মৃত্যু যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই খুব কাতর ও অস্থির হয়ে পড়ে। সব প্রাণীদেরই বাঁচবার কামনা ও বিয়োগ ব্যথা মানুষের মতই আছে কিন্তু আমরা তা জেনেও তাদের জন্য বিচারবোধ রাখি না।

হিংস্র প্রাণীদের অনেক কিছু সহজ সামর্থ্যে আসে না কিন্তু মানুষের সবই সহজে আসে। তাই আমার বলতে ইচ্ছে হয়—কবির কথার অংশ নিয়ে,—উল্টোভাবে,—

শুনহ মানুষ ভাই সবার চেয়ে মানুষ হিংস্র
তার উপরে নাই।

(৩৮)

ভালাইডিহার জের,—

ভেলাইডিহায় থাকার সময় সাইকেলে চড়তে পারার খুব একটা আকাঙ্ক্ষা এসেছিল। এ কথা রাজাবাহাদুরের কাণে যাওয়ায় তিনি তাঁর সাইকেলে আমাকে চড়ার ও চালানর কৌশল দেখিয়ে দিয়ে চারদিনের মধ্যেই আয়ত্তে এনে দিলেন। সে যুগে আমাদের দেশে সাইকেলের ব্যবহার অত্যন্ত কম ছিল। তার কারণ টাকার মূল্য খুব বেশী ছিল তাই ধনীরাও অহেতুক অর্থব্যয় মনে করতেন এবং ভাবতেন শুধু শুধু এ সখের প্রয়োজন কি আছে? যে দু' চারজন অর্থশালী ব্যক্তি অতি প্রয়োজন মনে করে সাইকেল্ কিনে চড়ে যেতেন সাধারণ মানুষ তাদেরকে খুব সৌখিন ও ভাগ্যবান মনে করত। ক্রমশঃ এর ব্যবহার বাড়তে বাড়তে সেই কৌলীন্য মর্য্যাদা কমের দিকে এসে একেবারে নমঃশূদ্রের পর্য্যায়ে এসে গেল। এখন মোটর গাড়ীর অত বড় আভিজাত্য পদেরও আর তেমন সম্মান নেই। এর আরোহীদের উপরও লোকের আর কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না, বরং বিরক্তিই আনে।

আমি যখন সেই আগের সময়ে রাজাবাহাদুরের সাইকেলে চড়ে কোন স্থানে যাতায়াত করতাম তখন লোকের ব্যবহারে বেশ বুঝতে পারতাম তাদের কাছে আমি যেন মস্ত বড় একটা গৌরবের বস্তু। এখন আমাকে কেউ সাইকেলে চড়তে বললে আধুনিক গান গাইতে বলার মতই মনে হবে। তবে ওই গানের চেয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য স্বাতন্ত্র্য এত বেশী যে সে হিসেবে অবশ্য তুলনা মূলক বিচার চলে না। সে সময় রাজা-বাহাদুরেরই একটি মাত্র সাইকেল ছিল। তিনি ছাড়া আর কেউ চড়তে পেত না কিন্তু আমার ব্যবহারের জন্য অবাধ অধিকার দেওয়া ছিল। প্রথম প্রথম ওতে চড়ে ছত্রিশ মাইল পাড়ি দিয়ে দেশের সহরের মুখে যখন প্রবেশ করতাম তখন দ্রুতগামী যানের আরোহীর উপর দু' পাশের লোক এমনভাবে বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে দণ্ডায়মান থাকত যে মনে হত এই রকম দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে তারা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে এবং আমাকে ভাবছে মহাপুণ্যবান ও ধন্য পুরুষ। দু' ধারের রাস্তায় দরজার সামনে ঘণ্টার আওয়াজ কাণে শুনতে পেয়ে সারিবদ্ধ হয়ে ভীড় করে ছেলে-মেয়ে ও

মহিলারা দাঁড়িয়ে থাকত যতক্ষণ না দৃষ্টির অন্তরালে আসতাম। রাস্তার লোকজন ঘণ্টার আওয়াজ শুনে এমনভাবে দৌড়তে সুরু করত যেন বাঘ বেরিয়েছে। এখন এক সংগে দু' দশটা সাইকেলের ঘণ্টার ধ্বনি শুনেও লোকে ভ্রূক্ষেপ করে না—ভাবটা যেন যাওনা যেদিকে হোক পাশ কাটিয়ে কে তোমাদের গ্রাহ্য করে বাপু!

(৩৯)

শিকার অভিযান,—

ভেলাইডিহায় থাকার পরের বছরের চৈত্র মাসে রাজাবাহাদুরের সংগে বেশ বড় রকমের শিকার অভিযানে যাওয়া ঘটেছিল। তার অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু সুরের পথে যাত্রায় এক বিরাট ও বিস্ময়কর হয়ে আছে।

তারই বিস্তৃত পরিচয়—ভেলাইডিহা হতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্গম বনাবৃত পাহাড় শ্রেণী আছে। তাতে প্রায় সব রকম বন্যজন্তু ও জানোয়ার থাকে। ওই সব অঞ্চলের সাঁওতালরা প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ ধরে শিকার অভিযানে বের হয়। তাদের সংখ্যা দু' তিন হাজারের মত থাকে। তারা এক একদিন এক একটা পাহাড়ের কতক অংশ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে বেষ্টন করে এগিয়ে এগিয়ে যায় শিকারের সন্ধানে। জন্তু-জানোয়াররা বেড়া জালে পড়ার মত হয়ে পড়ে। সাঁওতাল শিকারীদের অস্ত্র থাকে তীর-ধনুক, টাঙ্গী, বল্লব, বর্শা প্রভৃতি, তার সংগে বাদ্য থাকে নাগাড়া ইত্যাদি।

এদেরই এই শিকার পর্বে রাজাবাহাদুর সদলবলে প্রত্যেক বৎসর শিকার যাত্রায় বহির্গত হন। যেদিন যে পাহাড়ে সাঁওতালরা ঝাড়াই করতে বেরোবে তার সংবাদ আগে থাকতে জেনে নিয়ে তাঁর লোকেরা সেই পাহাড়ের উচ্চ সীমায় শিকারীর সংখ্যানুপাতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দু'শ' গজ অন্তর অন্তর শালগাছকে বেষ্টন করে খুব মজবুত ভাবে মাচা তৈরি করে নেয়। শিকারীরা বন্দুক নিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে মাচায় চড়ে বসেন।

সে বছর শিকারীরা যেদিন যাত্রা করলেন সেদিন তাঁদের সংগে গেল

চাকর, রাঁধুনী, সিপাই-শান্ত্রী প্রভৃতি এবং তার সংগে রসদাদি। বিশেষ কাজের জন্য রাজাবাহাদুরের যাওয়া একদিন পিছিয়ে গেল। পরের দিন রাজাবাহাদুরের সংগে তাঁর খাস্ চাকর, ডাক্তার আশুবাবু (ইনিও ভাল শিকারী), আমি এবং ভীমকায় মুসলমান সেপাই আমেদ আলি, এই ক'জন বিকেলে রওনা হলাম। বৃহৎ বলদদ্বয়ের গাড়ীতে রাজাবাহাদুর তাঁর চাকরকে নিয়ে চড়লেন। আর একটা গো-গাড়ীতে আমি এবং আশুবাবু, পরেরটাতে সেই সিপাহী। তার গাড়ীতে রইল তানপুরা ও সেতার। আমাদের সংগে রইল বন্দুক, রাজাবাহাদুরের ঝক্‌ঝকে তলোয়ার (ওটা আমার জন্য) এবং একটা বাঁওয়া। আশুবাবুও শাস্ত্রীয়-সংগীতে খুব অনুরাগী ছিলেন। গান-বাজনার সংগে শুধু বাঁওয়া বাজিয়েই বেশ ঠেকা দিতে পারতেন, এমন কী সেতারের চৌদুনেও। আগে এই রকম সঙ্গতে সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীত পরিবেশন করতে বেশ পছন্দ করতেন।

আশুবাবুর বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশী ছিল কিন্তু সমবয়সীর মতই সখ্যতা রাখতেন। বলতেন—গুণের কাছে বয়সের ব্যবধানকে ধরে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মন চায় না—আগ্রহ নিয়ে একাত্ম হতে চায়। মনের এই রকম পরিচয় অনেকের কাছেই কম বয়স থেকে পেয়ে এসেছি।

আমাদের গাড়ীগুলো চলতে সুরু করার একটু পরেই রাজাবাহাদুরের বৃহদাকার শক্তিশালী বলদেরা ঘোড়ার মত পদবিক্ষেপে আমাদের পশ্চাতে ফেলে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের মনখোলা আনন্দের বাধা কেটে যাওয়ায় বেশ সুবিধেই হল।

কিছু পথ যাবার পর জংগল সীমানার পাশ দিয়ে গাড়ী যখন চলতে লাগল তখন বেলা পড়ে এসেছে। সে সময়টা ছিল বসন্তকালের চৈত্র-মাসের প্রথম। বনপ্রান্তের নানান বৃক্ষের কিশলয়ে নব নব রংএর অপরূপ শোভা ছিল তখন দর্শনীয় ও মুগ্ধকর হয়ে। কোকিল, বৌ কথা কও, বুলবুল, ফিঙে, হলদি প্রভৃতি মনভুলান কণ্ঠের পাখীরা এক এক বৃক্ষের শাখায় বসে তাদের সুমধুর ধ্বনির ভাষায় যে মনোভাব ব্যক্ত করছিল তাতে আমার ভাবুক মন তার ব্যাখ্যায় এই কথাই বলেছিল—হে কবি! হে সুরশিল্পীরা! এসো—এই রকম সান্নিধ্যে, তোমাদের তো জনসমাজে থাকার যোগ্য স্থান নয়, দেখ দেখি কেমন চিত্ততৃপ্তি করা বসন্তের বায়ু-হিল্লোল, আমাদের আজ কত আনন্দ, প্রকৃতির যে এখন নববধূর সাজ—তাইতো আমরা ফিরে আসা নবযৌবনের সুন্দররূপ দর্শন করতে করতে

মঙ্গল সংগীতে ভরিয়ে রেখেছি। চেয়ে দেখ ঋতুরাজ কেমন সুন্দরভাবে জড়িয়ে ধরে আছেন তাঁকে।

পশ্চিম দিকে বনের শ্যামল শোভার শেষ দিকে আর একটি ভাবাবেগের দৃশ্য দেখ! কি সুন্দর ভাবে আকাশের নিম্নভাগে অলক্ত-রাগে রঞ্জিত হয়ে তপনদেবের মুখমণ্ডল আবেশের ভরে ক্রমশঃ অদৃশ্য মায়াময়ীর কোলে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে!

প্রায় বাল্যকাল হতে অনেক সময় প্রকৃতির স্বভাব কোলে কাটিয়েছি—তাই এইসব লীলা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ মনকে এত বেশী আবিষ্ট ও ভাবাতুর করে তুলে।

প্রকাশ করার ইচ্ছে যেন অবোধ্য হয়ে উঠে। এই সামর্থটুকু পিতৃগত হয়ে পাওয়া। আমার পিতার গান রচনায়, কাব্যে এবং সাহিত্যের উপর রচনাশৈলী ছিল অতি সরল ও মধুর ভাবসমৃদ্ধ। বহু রকমের বিষয়-বস্তুকে ধরে তাঁর রচনার খাতাগুলি আমার দাদামশায়ের গ্রামের তাঁর এক ভক্ত ও বন্ধু চেয়ে নিয়েছিলেন সাময়িকের জন্য। তারপরই বাবা দেহ রাখলেন। ওই ব্যক্তি খাতাগুলির কথা এক সময় আমাকে বলেছিলেন। তখন বয়েস কম ছিল বলে ওর মূল্য ও প্রয়োজন যে কত বেশী তা বুঝতে পারিনি। বাবার ওই বন্ধুও কিছুকাল পরে মারা যান। মনে যখন খুব তাগিদ এল তখন সেখানে গিয়ে আর পেলাম না। তাঁর গৃহমধ্যে যেখানে কাঠের পাটাতনের উপর তুলে রাখা ছিল, গিয়ে দেখলাম অন্যান্য গ্রন্থের সংগে বাবার খাতাগুলি উইএর দংশনের পর মৃত্তিকার স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। তাঁর রচনা সম্পদ আমার ভাগ্যে এল না, তাঁর সংগেই চলে গেল। কেবল শ্রীচৈতন্যের চরিত নামক তাঁর রচনার খাতাটিই আছে। আমার মায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠে বাবার রচনা গান দু'চারটি শুনে বেশ বুঝতে পারা যায় প্রত্যেকটিতেই আছে কত সহজ-সরল ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত রসোত্তীর্ণ কাব্যরূপ। আমার সন্তানদের এইসব গান ছেলেবেলায় আমার মা দু'চারটি করে শিখিয়েছিলেন। গানে তাঁর কাছেই ছেলেদের প্রথম হাতে-খড়ি হয়েছিল।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গে—তারপর মনভুলান দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম গন্তব্য স্থানের পথে এগিয়ে। একটু পরেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল এবং শুক্লাতিথির চাঁদ যেন হাসির কিরণ ছড়িয়ে দিল ধরণীর উপর। তার রূপালী আভা ঘাসের উপর ও বৃক্ষশাখায় ঝলমল্ করতে লাগল। সে সময় আমাদের

গাড়ী একটা আম বাগানের পাশ দিয়ে চল ছিল। তারপরেই গাড়ির রাস্তা যখন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করার মুখে এল, তখন সেখানের পাহারাদাররূপে সারমের দল ঘেউ ঘেউ শব্দ করেই তাদের কর্ত্তব্য সমাধা করে নিল। বোধ হয় তারা বুঝতে পারল গাড়ীতে ভদ্রলোক আছে তাই আর চিৎকার না করে পুচ্ছকে ৩ অক্ষরের রূপ দিয়ে পৃষ্ঠ কুব্জাকৃতি করে দূরে সরে গেল। এ-ও মনে হল নেহাত পল্লীর সারমের বলে তারাও গ্রামের মানুষদের মতই সমীহ ও সম্ভ্রব দেখানর প্রকাশভঙ্গী শিখে নিয়েছে।

তারপর গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই দেখতে পাওয়া গেল দু' তিনটি বুড়ো-মানুষ রোওয়াকে বসে আছে। তার মধ্যে একজন চোব্‌ড়া হুকোর তামাক টানছে আর মাঝে মাঝে টান কাশির ধাক্কা সামলাচ্ছে। একজন উঠে এসে গাড়ী থামিয়ে তাদের ওই অঞ্চলের গাঁওয়ালী ভাষায় জিজ্ঞেস করল এ বঁ আপনকারা কুথা যাচ্চন, আর কুথা থেকে আসচন? (হে মহাশয়, হে বাবু, এই অর্থে 'হে-বঁ' ব্যবহার করে)। আশুবাবু সবিশেষ পরিচয় দেওয়া মাত্র তারা সকলেই গাড়ীর সামনে রাস্তার উপর মাথা নামিয়ে প্রণাম কোর্‌ল এবং বিনয়-সম্ভ্রমের মূর্ত্তরূপ ধরে হাত জোড় করে দাঁড়াল। মুগ্ধ করে দিল তাদের সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা সমন্বিত অনাবিল অন্তরের বহিঃপ্রকাশ মূর্ত্তিগুলির দৃশ্য। মনে হয়েছিল এই তৃপ্তিকর জিনিসটি সহরের বহুদূরে অবস্থিত ও নকল সভ্যতার প্রভাবমুক্ত এই সব গ্রাম্য মানুষরাই সঞ্চিত করে রেখেছে।

গাড়ী চলতে সুরু করল, এক জায়গায় দেখতে পাওয়া গেল কপাট-বিহিন সদর দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ঘোমটায় মুখমণ্ডল আবৃত করে কয়েকটি মহিলা গাড়ীর শব্দে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে অল্প দূর থেকে আমাদের নিরীক্ষণ করছে। তারা হয়ত ভেবেছিল গাড়ীতে কোন বধূ যাচ্ছে পিত্রালয়ে কিংবা শ্বশুর গৃহে, জিজ্ঞাসাবাদ করে একটু পরিচয় নেবে। যারা এক জায়গায় সারা জীবন থাকে তাদের এই আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই আসে। দেখেছি কেউ কিছু বিক্রয়ের জন্য, বা খেলা দেখাতে কিংবা কোন সাধু-সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী ইত্যাদি এলে পল্লীর লোকেরা ভীড় করে এসে দাঁড়ায়। তারা সেই সব আগত ব্যক্তিদের খুব ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা দেখায়। আমাদের গাড়ী সেই দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের নিকটবর্ত্তী হবার সময় তাদের মুখ তুলে গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি দেওয়ার আকর্ষণে প্রকাশ হয়ে পড়ল সুন্দর সুন্দর মুখগুলির উপর চক্‌চকে বড় বড় চোখ কাজলে রঞ্জিত

এবং স্বর্ণবেশর শোভিত নাসিকা ও চিবুক পর্য্যন্ত। সৌষ্ঠবপূর্ণ ভঙ্গী নিয়ে দরজায় হাত রেখে দাঁড়ানর সেই দৃশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল।

নারীদের সঘোমটা মুখমণ্ডলের দৃশ্যরূপ শুদ্ধ শাত্ত্বিক ভাবেরই এক প্রতীক। তাই বোধ হয় মহাশক্তি দশভূজার বীরামূর্ত্তির আরাধনায় সর্বাগ্রে তাঁর মাতৃময় কল্যাণময়ী ও স্নিগ্ধ-শান্তরূপের প্রতীক স্বরূপ কলাবৌ রূপিণী মূর্ত্তির পূজা করতে হয়। ওই ঘোমটাটানা কলাবৌটিই যেন পূজা-মন্দিরের সমস্ত সত্যের আধার হয়ে থাকে—মানসমনে আলোর রূপ জেলে দিয়ে। এ জন্য ৺বিজয়া দশমীর দিন কলাবৌ চলে গেলে সবই যেন অন্ধকার হয়ে যায়—যতই কেন থাক না অন্যান্য সব বস্তু ও দেবীমূর্ত্তির শিল্প জৌলুস। ৺দুর্গাপূজার সূচনা থেকে তার মাঙ্গলিক সুর যেমন কলাবৌ এর ওই মূর্ত্তির উপস্থিতি পর্য্যন্তই বিদ্যমান থাকে তেমনি নারীদের ওই রকম ঘোমটা মূর্ত্তির মধ্যেও থাকে বলে আমি মনে করি।

বর্ত্তমানের সভ্য পরিচয়ের নারীদের কাছে ঘোমটা এ যেন গাঁওয়ালী অসভ্যতার বস্তু হয়ে গেছে। কিন্তু এই ঘোমটা প্রথার বস্তুটির মধ্যে নারীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সুন্দর যে এক মনোবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব আছে তাকে অস্বীকার করার মধ্যে থাকে শুধু উন্মুক্ত স্বেচ্ছার জোর ছাড়া আর কিছু নয়। বয়সে নব্বই পেরিয়েও আমার মা যখন প্রয়োজনে ঘোমটা দিতেন তখন তাঁর সে সময়ের মাতৃমূর্ত্তি যেন আরো অপূর্ব হয়ে উঠত। নারীত্বের সম্ভ্রম মহিমার রূপ যাঁদের জানা আছে তাঁদের কাছে ঘোমটা-মুখের মান্য থাকবেই এবং পূজামণ্ডপেও চিরকাল কলাবৌএর ঘোমটারূপই বড় হয়ে থাকবে।

তারপর সেদিন যেতে যেতে দেখলাম গ্রামের মধ্যস্থিত ৺দুর্গার দালানের সম্মুখের একটি ছোট আট চালার (নাট মন্দির) ভেতরে বসে কয়েকজন খোল-করতাল সহযোগে নাম সংকীর্ত্তন গানে মাতওয়ারা হয়ে আছে। এই রকমভাবে গন্তব্য পথের গ্রাম্য রাস্তাধরে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল কোন বাড়ীতে ঢেঁকিতে করে ধান ভানা হচ্ছে, কোন এক বাড়ীর গোওয়ালে চরর্ চরর্ শব্দ নিয়ে গৃহিণীর গাভীদোহনের মূর্ত্তি, কোন একবধূ ধুচুনীর মধ্যে তৈলপ্রদীপ রেখে চলেছে বোধ হয় মন্দিরের দিকে, দেখলাম একটি বাড়ীর রোয়াকে বসে হ্যারিকেনের আলোতে তিন চারটি শিশু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়া মুখস্থ করছে। তাদের নাড়ুগোপালের মত গোলগাল চেহারা ও মুখগুলি বড় ভাল লেগেছিল। পরণে তাদের ছোট ছোট কাপড় বাঙালী ছেলের পরিচয়কে শুদ্ধ করে রেখেছিল।

তারপর যেতে যেতে আর এক আকর্ষণীয় সান্নিধ্যে উপনীত হলাম। দেখলাম—একটি পাথরে নির্মিত শিব-মন্দিরের সম্মুখস্থ চত্তরে বসে কয়েকটি বৃদ্ধা নারী ও কিশোর-কিশোরী তন্ময় হয়ে এক বৈষ্ণববাবাজীর রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান শুনছে। ভাবযুক্ত হয়ে বৈষ্ণববাবাজীর ডান হাতে গোপীযন্ত্র এবং বাঁ' হাতে বাঁওয়া বাজিয়ে সুকণ্ঠে তানযুক্ত গাওয়া গান আমাদের বেশ কিছুক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখল। সেই সময়কার সেই স্থানটির সামগ্রিক পরিবেশ মনকে নিবিড় করে টেনে নিয়ে গেছল। এই গ্রামটিতে পাকা বাড়ী একটিও দেখতে পাইনি। পল্লীর জীবন ধারার এই সব সরল সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপ দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ী গ্রামের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে পড়তেই কাণে এল হরিজন জাতিদের মাদোল বাদ্য সহযোগে গ্রাম্যগীতি। গাড়ীটা একটু তাদের নিকটে নিয়ে গিয়ে সেই গীত-বাদ্য ও নৃত্য উপভোগ করলাম একটুখানি দাঁড়িয়ে। এই সব গানের সুর ও তার সহজ-সরল ভাববস্তু মনের মধ্যে বেশ রেখাপাত করে। এই জাতিদের নানান বিষয়ে যতই দুঃখ কষ্ট থাক— মনের আনন্দকে তারা নষ্ট হতে দেয়নি, সেদিকে তারা উজ্জ্বল প্রাণপূর্ণ।

একটু পরেই আমাদের গাড়ী গন্তব্যের দিকে ঘুরে এসে পড়ল এক বিরাট শূন্য প্রান্তরের উপর। নিশাচর পাখীরা তখন ডাকতে সুরু করে দিয়েছে। আশুবাবু বাঁওয়ায় ঠেকা দিয়ে তাঁর পেটেন্ট গান ধরলেন খাঁটি পাহাড়ী রাগের উপর তৈরি—

> "বাগাল্যা কি করলি আমার সাদা গায়ে কাদা দিলিরে,
> তোর দিকে চাঁইয়ে আমার জাল ছিঁড়ে মাছ পালিই গেলরে।"

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রান্ত পথে যখন যাতায়াত করতাম তখন মনে হত যেন যাকে আমরা পাহাড়ীয়া রাগ বলি—তার সেই সুরটি সর্বদা অলক্ষ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে কাণে স্পর্শ দিয়ে।

বিশেষ করে এই সুর নিয়েই তখন ওই সব জাতির লোকেরা গান করত। গানের এই সুর যখন শুনতাম বিশেষ করে এই সব স্থানের পরিবেশে তখন মনকে উদাস-বিহ্বল করে দিত এবং এখনও দেয়। পল্লী অঞ্চলের অনেক গান আমাদের দেশের হরিজনদের কথ্য ভাষায় তাদের স্বভাব কবিদের দ্বারা রচিত হয়ে কণ্ঠে স্বভাব সুন্দরের মতই এই সব গানের ভাব-রস প্রেমাবেগে উছল ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এখন তাদের কণ্ঠেও সিনেমার ও আধুনিক

গানের স্থানে রুচির অরুচি গান প্রবেশ করেছে। সমস্ত জাতির বিশুদ্ধ মনকে হত্যা করবার জন্ম যেন চতুর্দিকে দানবশক্তি ঘিরে ফেলেছে।

আশুবাবুর ওই অযত্নে লালিত গানটির ভাবার্থ,—'বাগাল্যা' মানে শ্রীকৃষ্ণ, হরিজন কবি তাঁকে তাদের পরিবেশে এনে মাছ ধরার উপমায় শ্রীরাধাকে দিয়ে বলাচ্ছেন, হে বাগাল্যা অর্থাৎ কৃষ্ণ! তুমি আমার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মনের উপর তোমার কালরূপের মুগ্ধ মাধুর্য্যের ছাপ এঁকে দিয়ে সেখানে কেন তুমি আমাকে কৃষ্ণময় করে দিলে? শুধু তাই নয়, আমার কুল, মান, লজ্জা প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ বস্তুগুলো আজ হৃদয়ের জাল ছিঁড়ে যে পালিয়ে গেল! এখন আমার উপায় কি হবে?

স্বভাব সংগীতের মধ্যে যেখানেই সুর ও ভাষা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার গীতিকাব্য—সেখানেই মূর্ত হয়ে আছে সেই প্রেমময়ের অপূর্ব্বলীলা-মাধুর্য্য।

নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় রচিত এই ক্ষুদ্রাকৃতি গানটি যখনই স্মরণে এসে যায়—বিশেষতঃ পল্লীপ্রান্তের নির্জন, নীরব ও নিস্তব্ধ স্থান সমূহে তখন ওই গান অজান্তিকে কণ্ঠে এসে গিয়ে অন্তরে এনে দেয় যেন এক আকাঙ্ক্ষিত মধুর প্রেমভাব রসের এক স্রোতধারার উৎস।

আমার বছর চল্লিশ বয়সের সময় একবার পৌষ মাসে বিশেষ প্রয়োজনে এক গ্রামে গেছলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরবার পথে শুনতে পেলাম হরিজন জাতিদের একটি কিশোর বয়সের মেয়ে ওই গানটি গাচ্ছে। সে তখন একটা ধানজমির কোণায় জলজমে থাকাকে হাড়ি ভাঙ্গায় করে ছিঁচে নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছিল। কিছুদূরে আরো দু'চারটি ছেলে-মেয়ে ওই কাজে নিযুক্ত ছিল।

সেই মেয়েটির গাওয়া গানে আকৃষ্ট হয়ে রাস্তা থেকে নেমে তার কাছ বরাবর গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম তার সুমিষ্ট কণ্ঠের গাওয়া ওই গানটি কিছুক্ষণ শুনব বলে।

ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা আবৃত সুন্দর চেহারাখানির স্থানে স্থানে ও মুখ-মণ্ডলে কাদার দাগগুলি দেখে মনে হয়েছিল যেন গানের ভাবার্থের সংগে সম্বন্ধ রেখেছে বাস্তবের মত তার সেই রূপের পরিচয়।

ওই স্বল্প পরিসর সুরের রূপকে মনে হতে থাকে বাস্তবিকই যেন এই সব স্থানের ধরিত্রীর ইচ্ছানুযায়ীই এই রকম বিয়োগ ব্যথার সুর-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। সুর যেন সন্তানের মা'কে পাওয়ার মত আকুল হয়ে

ধরিত্রীর বুকে লুটিয়ে পড়ে আছে। যে সব প্রেমিক মানুষ তাকে সআদরে অন্তরে ধারণ করতে পেরেছিল তারাই তার মূর্তি জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রকৃতির নির্জ্জন পরিবেশে সৃষ্ট সংগীত যখন প্রকৃতির সেই কোলে প্রকাশিত হয় তখন বেশ উপলব্ধিতে আসে এই সব সুরের রূপ-মাহাত্ম্যের মধ্যে সত্যই কত গভীর তাৎপর্য্য আছে। প্রকৃতির নির্জ্জন লীলাক্ষেত্রে নানান বৈচিত্র্য ও মন-মুগ্ধকর শোভার দৃশ্য যখনই দৃষ্টি গোচর হয় তখনই মনে হয় যেন ওই দৃশ্যসমূহের মধ্যে বায়ুহিল্লোলিত হয়ে প্রাণের যে স্পন্দন চলছে সে যেন কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছে হৃদয়ভরা এক অপূর্ব সঙ্গীতের অস্তিত্ব ও মহিমা। তাই আমার মনে হয় সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হতে ওঙ্কাররূপ-নাদধ্বনির সুররণণ সমগ্র বিশ্বে অখণ্ডভাবে যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তারই হয়ত প্রতিবিম্ব খণ্ড খণ্ড মেঘের মত যে সব স্থানে ধরিত্রীর উপর প্রতিফলিত হয়েছিল সেই সেই স্থানে প্রকৃতি দত্তরূপে স্বভাবগত হয়ে এক একটি সুরের রূপ এক এক যুগে মানুষের কণ্ঠে ধরা দিয়েছে এবং সেই সব সুরকেই অনুধাবণ ও অনুসরণ করে সিদ্ধ-সাধকেরা করেছিলেন রাগ-রূপ। এই সত্যের প্রমাণ ধরে তাই আমরা যে রাগগুলি প্রকৃতির রূপ-ভাবের সংগে নিবিড় মিলন-সম্বন্ধ আছে বলে বুঝতে পারি সেগুলি আদি ও প্রধানজনক রাগ বলে প্রতীয়মান হয়।

আমার ধ্যান-ধারণায় এ কথাও মনে আসে যে, আদি চারটি স্বরের উৎপত্তিও এই রকমভাবে ধরা দিয়েছিল এক সময় আদি মানব জাতির কণ্ঠে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা,—সংগীতের প্রভাব ও মহিমাদৃষ্টে মনে হয় এই ভারতবর্ষই যেন সেই লীলাময়ের সংগীত লীলার আদি ও প্রধান ক্ষেত্র। তাই আমাদের দেশে সব কিছুর মধ্যে সংগীতের প্রভাব শক্তিরই স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশভেদে পৃথিবীতে যত রকমের জাতিগত গান ও সুরের পরিচয় আছে তারমধ্যে এই ভারতবর্ষেই বিশেষ করে পাওয়া যায় প্রেম-ভক্তির অপূর্ব সন্ধান ও তার বিহ্বলিত প্রভাব। সংগীতকে ভগবৎ আরাধনার শ্রেষ্ঠ সম্বল রূপে এত বেশী করে বোধ হয় কোন দেশই দেখে আসেনি। মনে হয় একমাত্র ভারতবর্ষের সিদ্ধ-সাধকরাই বলে গেছেন—"গাণাৎপর-তরং নহি।" "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।" ভগবানের বাণী উদ্ধৃত করে

বলেছেন—"ভক্তরা যেখানে গান করে সেখানেই আমি থাকি।"

এ ছাড়া শাস্ত্রীয় সংগীতের শিল্পকলা বৈচিত্র্যের ও তার উপস্থাপনার-ভাব কৃতিত্বের তো তুলনাই নেই।

এবার মূলসূত্রে ফিরে যাই,—আমাদের গাড়ী একটা খুব ছোট গ্রামের নিকটে যেতেই রাজাবাহাদুরের গাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সিপাহীর গাড়ীতেই রাত্রের খাবার ছিল। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই গাড়ী চলতে সুরু করল।

(৪০)

তারপর আমরা সেদিন গড়ীতে দু'জনে দু'দিকে হেলান দিয়ে শয়ন করলাম। সংগে সংগেই বসন্তের মধুর বাতাস নিয়ে এল নিদ্রাদেবীকে। গাঢ় নিদ্রায় কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবার পর ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ীর রাস্তা চলেছে পাহাড় পার্শ্বের গাত্র বেয়ে। পরক্ষণেই চতুর্দিকের বৃক্ষ শাখায় বিহঙ্গকুল মধুর ধ্বনি তুলে সমগ্র স্থানটি ভরিয়ে দিলে। চতুর্দিকে কেবল পাহাড়েরই দৃশ্য। বিহঙ্গ কলকণ্ঠের ঐকবাদন শুনতে লাগলাম বিভোর হয়ে। চারিদিকের দৃশ্য-শোভা বর্ণনায় আসেনা। মনে হলেই ছুটে যেতে চায় মন সেখানে একটি পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করে সাধন-ভজনের জন্য থাকবার, সংগের সাথি হবে কেবল একটি 'একতারা।' প্রত্যহ সাধনায় যখন বসি তখন মনটাকে আগে ভজনের উপযোগী এই রকম স্থানে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। সেদিন দেখেছিলাম কত রকমের পাখীর মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর বাহার আছে এবং তাদের রকম রকম কণ্ঠের ধ্বনি যে কত সুখশ্রাব্য তা সেই দিনই আরো অধিকভাবে উপলব্ধি ও উপভোগ করেছিলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়কর এই রকম সব জায়গায় আসার সুযোগ ঘটে গেলে স্রষ্টার কথাই তখন বিশেষ করে অন্তরে উদয় হয়ে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেয়।

আমাদের গাড়ী সামান্য পথ অতিক্রম করার পরেই তপনদেবের লোহিতবরণ দৃষ্টি গোচর হল পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে,—সে এক কল্পনাতীত ও বিহ্বলিত করার অপূর্ব্ব দৃশ্য।

তারপর গাড়ী ঢালুপথে গড়্‌গড়্‌ করে নেমে পড়ল একটি

গিরিপ্রপাতিত নির্ঝরিণী হতে ক্ষুদ্রাকারে কুলকুল শব্দে বেয়ে যাওয়া নদীর নিকটবর্ত্তী সমতল ভূমিতে। দূর থেকে বারি সংলগ্ন তিনটি যুবতীনারীকে দেখে আমরা হকচকিয়ে গেছলাম। দৃষ্টির মুহূর্ত্তেই মনে হয়েছিল এরা কারা? মুনিবালা না কি? নিকটবর্ত্তী হতেই বুঝা গেল যুবতীত্রয় স্থানীয় আদিবাসীদের সন্তান। তারা প্রত্যুষে এসেছে মাটির কলসীতে করে জল ভরে নিতে। অকস্মাৎ আমাদের এই রকমস্থানে গাড়ী দেখে এমন সুন্দর ভঙ্গীমায় তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, যেন মনে হল কোন সুনিপুণ ভাবুক চিত্রশিল্পীর অপূর্ব্ব কৃতিত্বের নিদর্শনের মত আঁকা রূপ। এই জাতিদের গায়ের রং কালই হয় কিন্তু এদের মধ্যে রং এর উজ্জ্বলতা দেখে মনে হয়েছিল স্রষ্টা বোধ হয় নিজের হাতে এইরূপ গড়া সুঠাম মূর্ত্তি দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে রং প্রদানের সময় কাল রং এর তুলি তুলতে ভুলে গেছলেন কিংবা ইচ্ছে করেই।

এই স্থানের প্রকৃতির শোভাময়ী রূপ দেখে মনে হয়েছিল স্রষ্টা যেন শিল্প-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সৃজন করেছিলেন।

অল্প দূরে অগভীর জলের উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী ওপারে উঠে চলতে লাগল। নারী তিনটি তেমনিভাবেই বিস্ময়াবিষ্ট ও স্বভাব সরল মুখগুলি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েই রইল। মনে হতে লাগল ওদের কাছে আমরা যেন একটা অসম্ভব কৌতূহল। চাহনির মধ্যে কত সরল ও পবিত্রতা যে থাকে নির্মল তৃপ্তির রূপ নিয়ে তা সেদিনই আমার সেই বয়সে প্রথম প্রত্যক্ষ হয়েছিল।

এই সমস্ত জাতিদের মধ্যে অনেক কিছু স্বচ্ছন্দ সম্পদ ও স্বভাবিক রূপের সংগে ব্যবহারের আকর্ষণীয় পরিচয় আছে। যেমন,—সহজ-সরল জীবনযাত্রার পদ্ধতি, অবাধ নির্ভিকতা, গতি গমনে সাবলীল ভঙ্গী, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের মধ্যে স্বভাব সৌন্দর্য্য এবং স্বনির্ভরতা ইত্যাদি।

সুস্থ স্বাধীনতার সমস্ত লক্ষন এদের মধ্যেই বিশেষ করে ছিল কিন্তু এখন আমরা এদের এই সমস্ত বস্তু সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়ে সভ্য শিক্ষিত করবার জন্য অনেক আগে থাকতেই উদ্‌যোগী হয়েছি। আমাদের স্তরে ওদের তুলতে হবে এই হল মহৎ সঙ্কল্প। ওরা এতকাল স্বভাবগত সুস্থ শরীর ও মনকে যেভাবে উপলব্ধি ও উপভোগ করে এসেছে তার পরিবর্তে এখন আমাদের শরীর ও মনের উপর যা কিছু ক্রিয়া পরিচয় আছে সেগুলো তাদের পেতে হবে, অর্থাৎ তারা এবার জানতে পারবে, হয়ত

অনেকেই পেয়েছে টায়ফায়েড্, কলেরা, টি-বি, ক্যানসার, থ্রম্বসি প্রভৃতি ব্যাধিগুলো কেমন, বুড়ো হবার অনেক আগেই দাঁত পড়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি বাল্যকালেও নষ্ট হয়, ষোল বছর বয়েসেই বুড়ো হওয়া যায়, সাদা জামা-কাপড় পরে দাসত্বের কি সুখ ও আরাম, সিনেমা দেখে, রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে, আড্ডা জমিয়ে গোল্লায় যাওয়ার কি অপূর্ব্ব জীবন যাপনের পদ্ধতি।

স্বর্গত: প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুজী তিব্বতে গিয়ে সেখানের গ্রাম্য-অধিবাসীদের সুস্থ-সবল ও সুঠাম চেহারা দেখে এবং সরল সুন্দর আদর যত্নে মুগ্ধ হয়ে তাদের বলেছিলেন—তোমাদের এখানে যেন সহর সভ্যতা প্রবেশ না করে, এই রকম তৃপ্তিকর স্বাস্থ্য ও অন্তরগুলি যেন কোনদিন ম্লান না হয়ে যায়।" যদি তাঁর মত হৃদয়গ্রাহী যোগ্য বিচারক ব্যক্তির এই আশীর্ব্বাদ তাদের প্রতি থাকে তাহলে আমাদের দেশের এই রকম সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন মন নিয়ে যারা আছে তাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সভ্য করে গড়বার এ প্রয়াস কেন এল?

তারপর ছোট ছোট পাহাড়গুলোর দু'পাশ দিয়ে গাড়ী চলতে লাগল। কতকটা প্রান্তর পেরিয়ে মাঝে মাঝে আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়ী যেতে থাকল। তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট মাটির বাড়ীগুলির চেহারা দেখে এবং তার সংগে তাদের নারী-পুরুষ ও শিশুদের কালপাথরে খোদাই করার মত চেহারাগুলি দেখে মনকে পুলকিত করেছিল। সডৌল সতেজ গঠনভঙ্গীর উপর অপরিসর মোটা বস্ত্রে আবৃত দেহের উপরিভাগে কামনা শূন্য মুখগুলি নিয়ে তারা যখন পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল তখন মনে হয়েছিল এরা একেবারে নিস্পৃহ ও নির্ভেজাল। মন এখানেও বলেছিল থেকে যাও কোন একটি গাছের তলায় ঘর বেঁধে—দেখবে গান নিয়ে সাধনায় সত্যিকারের কাজ হবে। চেতন মন এখন বিশেষ করে এই কথাই বলতে থাকে এই স্বার্থদ্বন্দ্ব ও ভেজালের যুগে সংগীতকে ধরে তার কৌলীন্য ও আদর্শকে বজায় রাখতে পারলে কি? অন্তর থেকে আর একজনের উত্তর আসে—সুরের কেবল তৈরী কসরত্ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়াই যখন চরম লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার সংগে নাম-ডাক ও অর্থের বিপুল আকাঙ্ক্ষাই বেড়ে চলেছে—তখন সংগীতে সিদ্ধিলাভের উপায় কি করে আসতে পারে?

আমরা সংগীতের দেবতাকে খুঁজবার তেমন আবশ্যক রাখি না তাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা বাদ দিয়েই নানান অলংকার দিয়ে মূর্ত্তি গড়েই চলেছি। ভাবি না এই প্রাণহীণ মূর্ত্তিগুলি নাম, ডাক ও প্রতিষ্ঠার কাজে ছাড়া নিজের প্রকৃত কাজে কোন দিনই আসবে না।

তারপর সেদিন বেলা প্রায় ১১টার সময় আমাদের গাড়ী নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। অল্পদূর থেকেই আমারা দেখতে পেলাম পাহাড় সংলগ্ন শ্যামল তৃণে আবৃত এক বিস্তৃত স্থানে রাজাবাহাদুরের লোকজনেরা ডেরা ফেলে স্থানটিকে বেশ জমজমাটি করে রেখেছে। তার পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ী ঝরণা হতে সরু নদীর আকারে বেয়ে চলার দৃশ্য অতি চমৎকার লাগল। তার গতিবেগ এত দ্রুত ও চঞ্চল ছিল যে দেখে মনে হয়েছিল যেন কোথাও যাবার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে কোন বাধা না মেনে স্থানে স্থানে আটক করে রাখা শীলা খণ্ডের উপর আছড়ে পড়ে ছুটার বেগকে অপ্রতিহত করে চলেছে। বড় সুন্দর লাগছিল তার সেই এঁকে বেঁকে ফেনিলযুক্ত সর্পিল গতির ছন্দরূপ।

এদের গতিশীলতা দেখে এই শিক্ষা আসে যে, মানুষেরও সাফল্য-লাভের জন্য সকল বাধাকে মুক্ত করে কি রকম গতিশীল উদ্যম থাকা উচিত।

সেখানকার চতুর্দিকের দৃশ্য মনকে যেন কামনার শ্রেষ্ঠ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা সেই ডেরার স্থানে পৌঁছবার কিছু আগেই গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিলাম। যথা সময়ে আসা হয়েছে দেখে সকলের মনে বেশ একটা আনন্দের আলোড়ন এসেছিল।

শিকার সম্বন্ধে রাজাবাহাদুর সংবাদ নিয়ে জানলেন এ অঞ্চলে বাঘের আস্তানা নেই, তবে হরিণ, ভালুক, চিতা, নেকড়ে, বুনোশুয়র ইত্যাদি যথেষ্ট আছে। একটু পরেই সেই ঝরণা নদীর শীতল স্বচ্ছ জলে খুব আরাম করে স্নান সেরে খেতে বসলাম। চতুর্দিকের দৃশ্য-শোভা অবলোকন করার আকর্ষণে আহারে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল— মনকে পুলক শিহরণে নাচিয়ে। খাওয়া-দাওয়া চুকে যেতেই শিকারীরা প্রস্তুত হবার পর যথাস্থানে রওনা হওয়া গেল। কিছুদূর হাঁটার পর পাহাড়ের চড়াইএ অনেক-খানি উঠতে হল। অর্দ্ধবৃত্তাকারে তৈরি করাণ মাচাগুলোর মধ্যেরটাতে রাজাবাহাদুর, আমি এবং দেহরক্ষী আমেদ আলি উঠে বসলাম। তার ভেতরে একটি মসৃণ কার্পেট পাতা ছিল এবং খাবার জলও রাখা হয়েছিল।

মাচাটির পরিসর চার হাত করে হবে। তার ঘেরার জায়গার ডাল-পালা অল্প অল্প ফাঁক করে স্থানে স্থানে রাখা হল—জন্তুদের দেখতে পাওয়ার মত করে।

বেলা প্রায় তিন প্রহরের কাছাকাছি সময় বীটকারী সাঁওতালদের কোলাহল ও বাদ্যভাণ্ডের আওয়াজ কাণে আসতে লাগল। রাজাবাহাদুর চুপুচুপু বললেন এবার তাড়াখেয়ে জন্তু-জানোয়াররা আমাদের দিকে আসতে থাকবে। আমার বুকটায় তখন উদ্‌গ্রীবতার সহিত ভয় মিশ্রিত হয়ে দ্রুত স্পন্দন হতে লাগল।

একটু পরেই দেখতে পেলাম সামনের পাহাড়ের গা' বেয়ে একটা বিরাট আকারের ভালুক ঝড়ের বেগে নেমে আসছে। আর একদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি বেশ বড় আকারের একটা চিতল হরিণ শাখাসমৃদ্ধ বিরাট শিং দুটো নিয়ে বৃহৎ শালতরুর অন্তরালে কর্ণদ্বয় উত্তোলন করে সকম্প দেহে দাঁড়িয়ে আছে। তার সেই ভয়াতঙ্কের চেহারা দেখে মনে খুব মায়া এসে গেছল। মনে হয়েছিল এদের হত্যা করার মত নিষ্ঠুর কাজ আর নেই। তার সেদিন ভাগ্যের খুব জোর ছিল তাই ভালুক বধের আশায় তার প্রতি গুলি নিক্ষেপ হল না। সেই মুহূর্ত্তে বাঁ দিকের মাচা হতে একটা গুলির আওয়াজ হল—আর সংগে সংগে কর্ণপটাহ বিদারি চিৎকার করতে করতে গুলি বিদ্ধ একটা পা'কে ঘস্‌ড়ে নিয়েই তীরের মত ছুটে এল। বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল আমাদের তাই রাজাবাহাদুরের বন্দুক ধরার প্রস্তুতির পূর্বেই মরিয়া হয়ে একপলকে মাচার গাছ ধরে উঠে হাত চালাল রাজাবাহাদুরের পা' এর কাছ বরাবর। মতলবটা ছিল বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে তাতে এক কামড় দিয়ে রাজাকে ফেলে দিয়ে জীবন শেষ করে চলে যাবে। সকলের অদৃষ্টেই তাই হত যদি না ক্ষিপ্রহস্তে আমেদ আলি তার বুকে বল্লম বিদ্ধ করে ফেলে না দিতে পারত। আমি তখন গাছের মোটা ডাল ধরে ঝুলছি আর ভগবানকে ডাকছি। ভালুকটা পড়ে গিয়েই দৌড়ে পেছনের জংগলে ঢুকে গেল। রাজাবাহাদুর তার পেছনদিকেই একটা গুলি ছুড়লেন কিন্তু ঘন গাছে আড়াল পড়ে যাওয়ায় বোধ হয় কার্য্যকরী হল না। তবে আমেদ আলি যে রকম সজোরে তার বুকে বল্লম বিদ্ধ করেছিল তাতে মনে হয়েছিল ভালুকটা শেষ দম নিয়েই ছুটে পালিয়েছে—বেশী দূর যেতে হবে না।

এই ঘটনার বিবর বর্ণনা করতে যতটা সময় লাগল কার্য্যক্ষেত্রে

ভালুকটা যেন এক নিমেষেই তার কেরামতি দেখিয়ে দিয়ে গেল। গুলি খেকো ভালুকের কি ভীষণ ও ভয়াবহ রূপ এবং সেই সংগে পাহাড় কাঁপান চিৎকার ও বিস্ময়কর দৃশ্য তা না দেখলে উপলব্ধি করা অসম্ভব। মাত্র একটা ভালুক তার আগমন থেকে বহির্গমনের সময়টুকুর মধ্যে দেখিয়ে দিয়ে গেল তার প্রচণ্ড প্রতাপ ভয়াল রূপ ও কেরামতি। আমাদের সেদিন শিকারের কেরামতি বেরিয়ে যেত যদি ভালুকটা আর একটু সময় পেত মাচাটাকে টেনে ফেলে দেবার। ভালুকের দাঁতের জোর এমন সজ্ঘাতিক যে তার প্রমাণ রেখেছিল আমার কাকার জামাতার বন্দুকের নল দুটো চিবিয়ে ফুটো করে দিয়ে। তিনি ভালুকের সন্ধান পেয়ে তাকে বধ করতে যাচ্ছিলেন। জংগলে ঢুকার মুখেই অকস্মাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়েই বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে দাঁতের কামড়ে নল দুটো ফুটো করে দেয় এবং পিঠে মারে এক থাপ্পড়। থাপ্পড়ের চোটে পিঠে অনেকগুলো ফুটো হয়ে গেছল এবং অনেকটা মাংস উঠে যায়। বাঁকুড়া হাসপাতালে ছ' মাস থাকতে হয়েছিল।

সে'দিন ওই কাণ্ডটার পর কেবল উপরদিকে দীর্ঘ পুচ্ছ নিয়ে ময়ূর উড়ে যেতে লাগল এবং মাচার তলা দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল বনকুক্কুটের দল ও খরগোস। তাদের ভীত চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ও সন্ত্রস্ত গতিভঙ্গীর দৃশ্য এবং প্রাণ রক্ষার করুণ রূপ আমাকে কাতর করে দিয়েছিল। এদের এ রকম ভয়াতুর রূপ দেখিনি বলে মনের মায়াজড়িত আবেগে চোখ দুটো আমার বিস্ফারিত হয়ে শুব্ধ হয়ে গেছল।

বন্দুক থেকে গুলির আওয়াজের পর আমাদের দিকে আর জন্তু এল না। বেলা প্রায় ৫টার সময় ডান দিকের মাচা থেকে একটা গুলির আওয়াজ হওয়ার সংগে সংগে বাছুরের যন্ত্রণাদায়ক কান্নার মত দু'একবার শব্দ হয়ে থেমে গেল। রাজাবাহাদুর বললেন একটা হরিণ মারা পড়ল। তারপরেই আমরা দেখতে পেলাম দুটি বাচ্চা চিতল-হরিণ একবার এদিক—একবার ওদিক—এইভাবে অস্থিরচিত্তে ছুটাছুটি করছে। মনে হল বোধ হয় এদের মা'ই মারা পড়েছে তাই এরা এমনভাবে ভয়-কাতর মন নিয়ে যেন খুঁজছে মা কোথায় গেল। এই দৃশ্য আমার কাছে গভীর মর্মান্তিক বেদনা রূপে দেখা দিয়েছিল। খুব ভাবনা হচ্ছিল পাছে রাজাবাহাদুর এদের উপর গুলি ছুড়েন কিন্তু না—তাঁর মুখও দেখলাম ব্যথা কাতর।

হরিণ শিশু দুটি একটু পরেই গভীর জংগলে ঢুকে গেল বোধ হয়

মাতৃহারা হয়েই।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই বিট্‌কারী সাঁওতালরা কাছে এসে যেতেই আমরা মাচা থেকে নেমে পড়লাম।

আমাদের ধারণা মত সেই হরিণটিই রাজাবাহাদুরের কাকার গুলিতে মারা পড়েছে বলে জানা গেল। শিকারী বললেন হরিণটা তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে ছুটে যেতে যেতে একটা নালা পেরবার সময় থমকে দাঁড়িয়ে লাফ দিতেই গুলি চালাই।" কাছে গিয়ে দেখলাম গুলিটা ঘাড়ের নীচে দিয়ে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। লাফ দেওয়ার মুখে শিকারকে যথাস্থানে গুলিবিদ্ধ করা নিশানে সিদ্ধহস্ততার পরিচায়ক। হরিণটির স্থান বিশেষের পূর্ণ লক্ষণ দেখে মনে স্থির ধারণা হয়ে গেল এ সেই হরিণ শিশু দু'টিরই মা। তখন বাচ্চাদুটির জন্য মনের বেদনা খুব বেড়ে গিয়ে চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। মনে হয়েছিল সত্যই হিংসা ও হত্যার মত মহাপাপ ও অন্যায় আর কিছু নেই।

আমাদের থাকার স্থানে দু'জন সাঁওতাল হরিণটাকে পৌঁছে দিয়ে এল। প্রথম দিনের শিকারযাত্রা নিষ্ফল হল না বলে সকলের মনে খুব আনন্দ এল। আমার কিন্তু হরিণ বধ করা সম্বন্ধে গভীর দুঃখই এসেছিল। তৃণলতাভোজী প্রাণীটির নিরীহ-নির্বিরোধি শান্ত-করুণ মুখখানি যতবার নজরে পড়তে লাগল ততবারই বিবেকে আঘাত দিয়ে কে যেন বলতে লাগল—এরা তো কারো অনিষ্ট করে না, পাহাড়-জংগলে থাকে বনদেবীর সহচররূপে শোভা বর্দ্ধন করে'—তত্রাচ কেন এদের উপর এই ঘৃণ্য বধের স্পৃহা? মনুষ্যত্বের বিচারে কি অধিকার আছে এদের বধ করবার?

শিকার পর্ব সেরে যখন আমরা থাকার স্থানে পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল,—কতকগুলো চিঁড়েকে জলে ধুয়ে নিয়ে চিনি মিশিয়ে খেয়ে ফেললাম।

তখন আমাদের দেশে চা খাওয়ার রেওয়াজ ছিলনাই বলা চলে। এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চা' এর নেশা এমন পেয়ে বসেছে যে, প্রাণ ধারণের খাদ্যের চেয়েও ওর আগ্রাধিকার বেশী।

পল্লীতে দেখি গরীবরাও প্রত্যহ দোকানে গিয়ে সামান্য চা-চিনি কিনে এনে গরম জলে সেদ্ধ করে গেলাস ভর্ত্তি করে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে তবে তাদের কর্মশক্তি চাঙ্গা হয়। বলে—এই চা না খেলে কাজে যেতে মন চায় না।

জমায়েত থাকা বহুশত সাঁওতালদের কাছে গিয়ে তাদের গীত-বাদ্য ও নৃত্য দেখে যথাস্থানে ফিরে আসতেই রাজাবাহাদুর বললেন—এবার একটু গান-বাজনা শুনি।

আমার শরীরের অবস্থায় তখন মোটেই মেজাজ আসছিল না—কিন্তু তাঁদের মেজাজের অভাব ছিল না—। গান-বাজনা শুনার প্রতি এত আগ্রহ যে শিকারে বেরিয়েও সেতার তানপুরা ও বাঁওয়া সংগে নিতে ভুলেন নি। একেই বলে প্রকৃত অনুরাগ।

ঘণ্টা দুই ধরে গান-বাজনা হল। আসরে ও ঘরের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের চেয়ে এখানে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মনকে এক অন্যভাবে নিয়ে গেছল তন্ময় করে। রাত প্রায় ১১টার সময় আমরা খেতে উঠলাম।

বড় বড় শাল পাতা দিয়ে তৈরি পাত্রে ভাত এবং ওই পাতার তৈরি বেশ বড় রকমের বাটির মত পাত্রে প্রায় আধসের করে রান্না হরিণ মাংস এবং ওই রকম পাত্রে ডাল, তরকারী ও ভাজা কোলের কাছে উপস্থিত হল। ঠাকুরকে মাংসের পাত্রটা তুলে নিয়ে যেতে বললাম। সেটার দিকে চোখ পড়তেই তার পূর্ণ অবয়বের সেই যন্ত্রণা কাতর করুণ মুখটি মনে পড়ে গিয়ে অন্তরটা কি রকম করে দিয়েছিল। চির নিদ্রিতের সেই অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষুদ্বয় যেন মনের সামনে এসে বলতে লাগল—তোমরা অতি নিষ্ঠুর, নির্দয়, পশু বল আমাদের···, আমার বাচ্চা দুটোর অবস্থার কথা ভাব দেখি! তোমাদের নিজের মত করে জানা কি উচিত নয় যে, সব প্রাণীদেরই ঘর সংসার আছে।"

মাংসের পাত্রটি তুলে নিয়ে যাওয়াতে প্রত্যেকেরি খাওয়ার আনন্দের উপর একটু রসভঙ্গ হয়ে পড়ল।

তারপর রাত্রি প্রায় দ্বি'প্রহরের সময় গোরুর গাড়ীর মধ্যে শয়ন করলাম,—সংগে সংগে ঘুম চলে এল।

পরের দিন সকালে কিছুদূরের একটা গ্রামে গিয়ে সেখানের পাঠশালার গৃহে আমাদের আশ্রয় নেওয়া হল। আগে থাকতে গ্রামের লোকদের বলা ছিল। তারা শুধু ঘরখানাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখেনি তার সংগে অতিথি সৎকারেরও সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। দুধ, চিঁড়ে, গুড়, সরু চাল, মাছ তরকারী সবই। অতিথি সৎকারকে তখন মানুষের কাছে অতীব কর্ত্তব্য ও ধর্ম হয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর অন্তরে

রাখাছিল। এই দিনটি আমাদের খাওয়া-দাওয়া যেমন ভাল হয়েছিল তেমনি সমস্ত দিনটি হাসি-তামাসা, গান-বাজনা, তাস ও দাবায় খুব আমোদে কেটেছিল। গান শুনে সেখানের লোকেরা বলতে লাগল—"কেমন গলা খেলছে দেখছিস।" এই মন্তব্যের মধ্যেও তাদের বিচার বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

তখনকার দিনে এক জায়গায় পাঁচজন জড় হলে কথাবার্ত্তার মধ্যে হাসি-তামাসাই প্রধান হয়ে থাকত। লোকের কাছে ছিল খুব প্রিয়বস্তু হয়ে কৌতুক ও রসালাপ। এ বিষয়ে যে যত বেশী পারদর্শী হত তাকে ততবেশী কাছে পেতে চাইত। এজন্য হাস্য-কৌতুক ও আনন্দের পরিবেশ ছিল স্বাধীন উন্মুক্ত। অন্তরে অন্তরে সেই আনন্দ সঞ্চারিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রাণের যোগাযোগ ও প্রেমের বন্ধন নিবিড় করে তুলত। এখনও এই অপূর্ব জিনিসটি বেঁচে আছে বিশেষ করে পল্লীর অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত মানষদের মধ্যে। দারিদ্রের ভীষণ পীড়নেও তাকে রসহীন শুষ্ক করে ফেলেনি। প্রত্যেক পল্লীতে তখন অন্তত: দু' একজনও বিধবা বয়স্ক মহিলা এমন থাকতেন যে তাঁরা লোকের যে কোন কাজে উপকার করতে দৈহিক সাহায্যের দ্বারা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যেতেন, আবার প্রত্যেকের বাড়ীকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন। রসালাপের জন্য কবিতা, ছড়া-গান ইত্যাদি, কি করে অত তাঁরা সংগ্রহ করে রাখতেন তা দেখে আমি আশ্চর্য্য হতাম। তখন তাঁরা জানতেন মানুষের মন ও স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে রাখবার জন্য ওই জিনিসগুলির একান্ত প্রয়োজন আছে। আগে সহর অঞ্চলেও হাসি-তামাসার অভাব ছিল না—এখন যেন তারা বনবাস নিয়েছে। বড় সহরের সভ্য হাসিকে দিনের মধ্যে সভ্যরূপী মানুষকে অনেকবারই প্রকাশ করতে হয় গৃহ হতে বহির্গত হয়ে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত। পরিচিত ভদ্রলোকের সংগে দেখা হলেই মনের জরাজীর্ণ হাসি এক সেকেণ্ডের মধ্যে দন্তাগ্রে প্রকাশ পেয়েই অন্তর্হিত হয়ে যায়। হাত তুলে নমস্কারের পদ্ধতিটি যেন নিতান্ত দায়সারার এক অপূর্ব সৃষ্টি। হাসির রূপটির ব্যাখ্যায় আসে—শিশুদের জন্য কিনে দেওয়ার এক প্রকার বেবিডলের বুকটা চেপে ছেড়ে দিলেই তার চোখ দুটো চেয়ে উঠেই যেমন সংগে সংগে বুজে যায়; ঠিক তেমনি শহর' সভ্যতার হাসিটির দৃশ্যরূপ থাকে,—যেন মৃত হাসির প্রেতাত্মা উঁকি মেরে চলে গেল।

শিকার যাত্রার পরের দিন খুব সকালেই আমরা সব কিছু সাজ-সরঞ্জম

সংগে নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম এক দুর্গম পাহাড় অভিমুখে। পথপ্রদর্শক হল স্থানীয় দু'জন সাঁওতাল যুবক হাতে বিরাট টাঙ্গি নিয়ে। তাদের দেহের বলিষ্ঠ আকৃতি ও গঠন ছিল দেখবার ও দেখাবার মত। দু' জনেরই যেন ভীমকায় লৌহমূর্ত্তি কিন্তু ব্যবহারে তারা অতি শান্ত ও সরল ছিল। আমার মনে হয় ভেতরে যাদের শক্তি সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের স্বভাব এই রকমই হয়। মাইল দুই হাঁটার পর গভীর জংগলে প্রবেশ করা গেল ছোট ছোট পাহাড়কে অতিক্রম করে। পথ অতি দুর্গম, সরুমত রাস্তাটির উপর বহুদিন হতে মানুষের চলাচিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র তার চিহ্নটুকুই ছিল। অতি সন্তর্পণে আমরা এগোতে লাগলাম। এই ভাবে অনেকখানি হাঁটার পর পাহাড় থেকে গড়ান গাছ ধরে ধরে প্রায় আধ মাইল নীচের দিকে নেমে এসে সমতল ভূমিতে পড়লাম। সেই স্থানটির চতুর্দিকের জংগলাবৃত বিরাট পাহাড় যেন এক বিস্ময়কর মৌনী রূপের মত লাগল। তার ভীষণ ভয়াল রূপ দর্শন করে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেছল। কি অদ্ভুত বিহ্বল করা দৃশ্য! নিম্নতলে বহুদূর ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে শ্যামল তৃণে আবৃত হয়েছিল। এই স্থানের সামগ্রিক দৃশ্যের শোভা বর্ণনায় আসে না।

সমতল ভূমির উপর যেতে যেতে দেখা গেল পাহাড়তলির সন্নিকটে আদিবাসীদের কয়েকটি ক্ষুদ্রকুটির জীর্ণশীর্ণ দেহে দাঁড়িয়ে আছে। তার আসে-পাশে আম-কাঁঠালের কতকগুলি গাছ ফলের সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শোভা বর্দ্ধন করে।

আমাদের সংগের সেই সাঁওতাল ভ্রাতৃদ্বয় তাদের এখানে বসবাসের পরিচয় দিয়ে বলল—এই ঘরগুলিতে স্বজাতির সহিত বেশ কয়েক পুরুষ তাদের বসবাস ছিল। বরাবরই বড় আকারের বাঘ এখানের পাহাড়ে ছিল না। কয়েক বছর আগে থাকতে ভীষণ আকারের মানুষ খেকো বাঘেরা এসে উপদ্রব সুরু করে' মানুষ মারতে লাগল। ক্রমশঃ তাদের এই হত্যা বেড়ে গেল, এখানে আর থাকা সম্ভব হল না, বছর খানেক আগে আমরা সকলে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে বাস করার ব্যবস্থা করি। এখানের জমীতে ধানগুলো তখন পাক ধরে এসেছিল সে গুলো কেটে নিয়ে আসবার জন্য আমরা চার ভাইএ এখানে আসি। আমাদের চেহারার চেয়ে বড় দু' ভাই এর চেহারা আরো জোরাল ছিল। আমরা প্রত্যেকেই একটা করে খুব বড় আকারের টাঙ্গি নিয়ে এখানে এসেছিলাম।

দাদারা পাহাড় ধারের জমিতে ধান কাটতে সুরু করল, আমরা তাদের পশ্চাতের কিছুদূরে কাটতে আরম্ভ করলাম। সেই মুহূর্ত্তেই দাদাদের গলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত আঁ-আঁ শব্দ কাণে আসতেই চেয়ে দেখি ঘোড়ার মত রংএর খুব বড় দু'টো বাঘ দাদাদের উপর লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করেছে। আক্রমণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে দাদাদের কাছে মাটির উপর ফেলে রাখা টাঙ্গি দু'টো তুলবার আর অবসর রইল না, আমরা দু' ভাই টাঙ্গি নিয়ে দৌড়ে পৌঁছবার পূর্বেই তারা দাদাদের এক নিমেষে মুখে করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কি কাণ্ড যে ঘটে গেল তা বুঝবার মত অনেকক্ষণ আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। সেদিন থেকে আর আমরা কোন দিনই এদিকে আসতে সাহস করি নাই, আজ তোদের জন্য আসতে হল, সেদিনের কথা মনে হয়ে ভিতরটা যে কি করছে তা তোদের কি করে বুঝাব।" এই পরিচয় তারা আধা বাংলায় বলে গেল। শুনে আমাদের গভীর বেদনা এসে গেছল। এবং তার সংগে ব্যাঘ্রভীতিও নিদারুণ ভাবে। ঘোড়ার মত লাল রংএর যে বাঘের রং হয় তা কখনও শুনা যায় না এবং বিশ্বাসও হয়নি কিন্তু এই রকম রং যুক্ত বিরাট আকারের বাঘের কথা অনেক দিন পরে আমার দাদা মশায়ের গ্রামবাসীদের মুখেও যখন শুনলাম তখন মনে হল তাহলে হয়ত সেই সাঁওতাল ভ্রাতাদের কথা মিথ্যা নয়। ওই গ্রামের যারা ওই রকম বাঘ দেখেছিল তারা বল্ল— সন্ধ্যার সময় জংগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আমরা পুকুরপাড় থেকে দেখেছিলাম। পরের দিন আর এক গ্রামের জংগল থেকে বেরিয়ে একটা বড় মোষকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে খানিকটা খেয়ে উধাও হয়ে যায়। সেই গ্রামের রাখালরা দেখে বলেছিল তার লাল রংএর কথা। বাঘটাকে আর দেখা যায়নি। সাঁওতাল শিকারীদের তাড়া খেয়ে দিশাহারা হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের জংগল দিয়েই যে এই অঞ্চলে এসে পড়েছিল,— সেই সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ হয়েছিল।

তারপর সেই দিন আমরা একটি গাছের তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার চলতে সুরু করলাম জল পাওয়ার মত জায়গা খুঁজতে। বন্দুক হাতে প্রস্তুত হয়ে শিকারীরা সতর্ক ছিলেন এবং সিপাহী ও অন্যান্যরাও বল্লম ও টাঙ্গি বাগিয়ে হাতে ধরে রেখেছিল। তলোয়ারটা আমার হাতেই ছিল, তবে বিপদের সম্মুখীন হলে হাতে ধরা থাকত কিনা জানি না।

চলতে চলতে আমরা পশ্চিমমুখী হলাম। সেই দিকের দৃশ্য ছিল আরো আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে প্রশস্ত জায়গা পড়ে আছে নানান ভঙ্গীমায়, তার দু'পাশে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে জংগলাবৃত হয়ে উঁচু উঁচু পাহাড় একটির পর একটি ঢেউ খেলিয়ে কতদূর পর্য্যন্ত যে চলে গেছে তা বলা দুঃসাধ্য। তবে শুনেছিলাম না-কি এইসব পাহাড় সংযুক্ত হয়েছে ময়ূরভঞ্জের (ওড়িষ্যার) এবং হাজারীবাগ পাহাড়ের সংগে। এই দিকেও দেখা গেল আদিবাসীদের কয়েকটি ভাঙ্গা-চুরা কুটির এবং সেই রকম আম, কাঁঠাল ও কুলের গাছ। আম গাছে থোপা থোপা আম ঝুলছে এবং কাঁঠাল গাছের গায়ে গায়ে ঝুলছে কাঁঠাল। কুলের সময় নয় তবে তার গাছের তলায় বিস্তর শুকন কুল পড়েছিল। দু'চারটে মুখে দিলাম—বেশ মিষ্টি লাগল। আর দেখতে পাওয়া গেল স্থানে স্থানে কেঁদ গাছে (আবলুস গাছ) গাছ ভর্ত্তি কেঁদ ফল এবং পিয়াল গাছে প্রচুর পাকা পিয়াল ফল ধরে আছে। পিয়াল ফল খেতে অম্ল-মধুর, এর সরবত্ খুব ভাল হয়।

খানিকটা আরো এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল পাহাড় থেকে একটি ঝরণা নেমে এসে তার স্বচ্ছ বারি কুল্‌কুল্ শব্দে বেয়ে চলেছে খুব সরু নদীর আকারে ; তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি খুব বড় বটগাছ। আশ্রয়ের জন্য অতি সুন্দর স্থান পাওয়া গেল। গাছের তলাটা পরিষ্কার হবার পর সত্‌রঞ্চি ও চাদর বিছান হয়ে যেতেই তার উপর বসে পড়ে খুব আরাম উপভোগ করতে লাগলাম। বট গাছের সুশীতল হাওয়ার সংগে পত্রের মর্মরধ্বনি এবং ঝরণা নদীর কুল্‌কুল্ শব্দ ; এই দুইএর সুর-ছন্দ মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল।

নররক্তের স্বাদ পেলে ব্যাঘ্র প্রভুদের সময় অসময় জ্ঞান থাকে না সেজন্য পশ্চাতে পাহাড়ের দিকে মুখ করে সিপাহীরা বন্দুক নিয়ে সতর্ক হয়ে বসে রইল। বেলা তখন এক প্রহরও হয়নি। আমাদের সামনেই রান্নার জোগাড় হতে লাগল। শিকারীরা তাঁদের বন্দুক দেখে শুনে নিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এককড়া হালুয়া তৈরি হয়ে গেল প্রাতঃরাশের জন্য। রাজাবাহাদুর এর একটুও মুখে দিলেন না, দুধ-চিঁড়েই খেলেন আলুভাজা দিয়ে। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে জনা পনর লোক চলে গেল— যে পাহাড়ে সাঁওতালরা বীট্ চালাবে তার চড়াই পার্শ্বে মাচা তৈরি করে আসবার জন্য।

রাজাবাহাদুর আমাকে একটু সেতার বাজাতে বললেন। সেতার ও বাঁওয়া এ দুটি কোন স্থানেই কাছ ছাড়া হত না। ভৈরবী রাগের আলাপ বাজাবার পর গৎ ধরতেই আশুবাবু বাঁওয়ায় সঙ্গত করতে লাগলেন। আগে তখন আমাদের দেশের গায়ক-বাদকদের তব্‌লার তালে শুধু বাঁওয়া নিয়েই বেশীর ভাগ সঙ্গতকারেরা সঙ্গত করতেন। আমারও খুব ভাল লাগত। কারণ অহেতুক বোল পরণের আতিসয্য থাকে না এবং তব্‌লার ধ্বনির চড়া আওয়াজ ওতে থাকে না বলে রাগরূপকে গড়ে তুলার একাগ্রতায় ও ধ্যানমগ্নতায় মনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া আমার মনে হয় শ্রোতারাও পরিবেশনের সামগ্রিক বস্তু পরিপূর্ণভাবে একাগ্র হয়ে উপভোগ করার সুযোগ পান। অবশ্য মুদারার 'সা'এ তব্‌লা বেঁধে বাঁওয়া-তবলার যুক্ত ঠেকার উপর এবং প্রয়োজনমত সীমিত বোল রেখে সঙ্গত করলে ভালই লাগে, কোন বিঘ্নতার সৃষ্টি করে না। তবে শুধু বাঁওয়ায় সঙ্গতে সুর বাঁধার জন্য ঠক্‌ঠক্ করে বেশ কিছুক্ষণ তব্‌লার জন্য যে সময়টা গত হয় তাতে ধৈর্য্যের কিছু বিচ্যুতি ঘটে। এই অবস্থাটা বিশেষ করে এনেছে তারা সপ্তকের 'সা'এ সুর বাঁধার নীতিবর্জিত অসঙ্গত প্রথা আঙ্গুলগুলি সহজে খেলানর সুবিধার জন্য। চড়ায় সুরে বাঁধার এই প্রথায় প্রায়ই শিল্পীর সুর অঙ্কনের সময় তব্‌লার সুর নেমে বা চড়ে যায়, তখন শিল্পীর মনের অবস্থা কিরূপ যে হয় তা ধ্যানমগ্ন শিল্পীরা এবং একাগ্রহী শ্রোতারা বিশেষ করেই জানেন। আমার তরফ থেকে বলতে পারি মেজাজ তখন দুর্বাশামুনির মত উগ্র ও উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় সুর-সাধকের পক্ষে এ যেন এক বিড়ম্বনা। সে সময় আবাহন করে যে সুরের মুর্ত্তি অঙ্কিত হচ্ছিল সে তখন সংগে সংগেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। অভিজ্ঞ শিল্পীরা এবং সেই স্তরের শ্রোতারা বিচার করে দেখবেন রাগরূপের অনন্ত বিস্তারি মহিমা প্রচারের জন্য যে সঙ্গীত সেই সঙ্গীতে তালরূপ অঙ্কশাস্ত্রের পরাধীনতার বেষ্টনীর উপর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা হতে সত্যই মুক্তির কামনা আসে কি না আর যাঁরা উচ্ছল কসরত্ প্রয়াসী এবং শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা এক সাথে সুর ও তালবাদ্যের মিশ্রণ রূপের চিত্র অঙ্কনকারীদ্বয়ের কৃতিত্বের দিকে মনকে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনের উপর চালনা করে আনন্দ পান তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব ও মূল্য থাকবে। গানে ও যন্ত্রে অপরিহার্য্যরূপেই সঙ্গতের ব্যবস্থা থাকুক কিন্তু গায়ক-যন্ত্রীদের রাগরূপ পরিবেশনের সামগ্রিক রূপ উপভোগ্য করার বিঘ্নতা আনয়ন না করে।

সুর শিল্পীদেরও সে দায়িত্ব নিশ্চয়ই রাখা আবশ্যক হবে। নাম করা সেতারী এবং নামকরা তব্‌লাবাদকের একসাথে প্রোগ্রাম শুনতে বসলে বেশীক্ষণ শুনার ধৈর্য্য থাকে না। কারণ বিলম্বিত গৎ আরম্ভের পরই মনে হয় প্রোগ্রামটা তব্‌লাবাদকের লহরাবাদনের জন্য। তিনি যেন জানাতে চান সেতার শুনে দরকার নেই। অবশ্য তব্‌লা চর্চারত ব্যক্তিদের এতে আনন্দ দেবে কিন্তু সংগীতের তখন হয় নাভিশ্বাস। বাদ্যযন্ত্রশিল্পী যেন তাঁর কর্তব্যকে ভুলে গিয়ে তব্‌লাবাদকের তাঁবেদার হয়ে পড়েন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যার অপূর্ব মহিমাকে যদি যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে বিলম্বিতের মধ্যেই সর্ব্বাধিক সাত্বিকভাবে আধ্যাত্মিক ধ্রুপদীভাব ধারায় এর ভাব মূর্ত্তিকে রূপে-রসে ভরিয়ে রাখার উপায় আছে। মোটের উপর বিলম্বিতের ভাব মর্য্যাদা রক্ষায় কোন কিছু তরলতা না আনাই বিধেয়।

পূর্ব্বের সূত্রে—সেই শিকার ক্ষেত্রের সেদিন সেই জায়গায় সেতার বাজান বন্ধ হবার সংগে সংগে অল্প দূর থেকে ঝড়ের মত আওয়াজের শব্দে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি যেতেই দেখা গেল উত্তর দিকের পাহাড় থেকে নেমে চার পাঁচটা ভালুক বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়ে তীরের মত বেগে দৌড়ে সামনের পাহাড়ে ঢুকে গেল। বেশ একটা অকল্পনীয় দৃশ্য চাক্ষুষ হল।

একটু পরে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহীকে সংগে নিয়ে আশুবাবু ও আমি সামনের কেঁদ গাছের তলায় পাকা কেঁদ ফল পড়ে আছে দেখে গেলাম এখানের এই ফল খেতে কি রকম লাগে তা পরীক্ষা করতে। এই ফলের গাছ জংগলের সীমানা প্রান্তেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ওই রকম স্থানে এই গাছ প্রচুর আছে। সাঁওতাল ও হরিজন জাতির মেয়েরা বাজারে বিক্রি করতে আসে, তবে তাদের আনা সেগুলো খেতে মোটেই ভাল লাগে না, শিশুদেরই ভাল লাগে। এখানের ওই ফল সেদিন খেয়ে অবাক হয়ে গেছলাম তার যথার্থ স্বাদের সন্ধান পেয়ে। এত উন্নত পর্য্যায়ের এই ফল হতে পারে তা ধারণায় ছিল না। খোসা যেমন পাতলা তেমনি ভেতরে মাত্র একটি খুব ছোট বীজ আর শাঁশ ভর্ত্তি। খেতে খেতে মনে হচ্ছিল খোয়াক্ষীরের সংগে গোলাপী আতর দিয়ে তৈরি জিনিসের মত। আমরা তাড়াতাড়ি কতকগুলো কুড়িয়ে এনে খেতে লাগলাম। সকলেই বললেন—এই ফল খুব শক্তি বর্দ্ধক ও হজম কারক।

এই সব অঞ্চলের জল-হাওয়ার এমন গুণ ছিল যে, খাদ্যবস্তু হজম হতে দেরি হত না, কিছুক্ষণ পরেই মনে হত আবার কিছু খাই। স্থানীয় লোক-জনদের জিজ্ঞেস করেছিলাম— বদহজম এবং অম্বল হয় কি না? তারা বলেছিল ও দুটো কথাই আমরা শুনিনি। ভেলাইডিহায় থাকার সময় বুঝেছিলাম তাদের কথাটা খুবই সত্য।

তারপর বেলা ১২টার সময় নাওয়া-খাওয়া সেরে শিকারী বেশে প্রস্তুত হয়ে যে যার মাচার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের দিকে রওনা হওয়া গেল। অনেকটা পথ হেঁটে তারপর পাহাড়ের চড়াই এ আধ মাইলের বেশী উঠে আমাদের নির্দিষ্ট মাচাতে উঠে বসলাম।

ভয়—বিপদ সম্ভাবনা ও উৎকণ্ঠা এই তিনের মিশ্রিত বস্তু যে কিরূপ তা সেদিন বেশী করে উপলব্ধি করেছিলাম।

ব্যাঘ্র মহাশয়দের আগমনে যে কি কাণ্ড ঘটবে তার সম্ভাবনার চিন্তা মনের ভেতর ক্ষণে ক্ষণে উদয় হয়ে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন তুফানমেলের মত দ্রুত গতিতে চলছিল। কিন্তু তাঁরা না আসুন এ ইচ্ছেও হচ্ছিল না। বরং মনে হচ্ছিল এলে বেশ হয়, তাদের বিরাট-বিস্ময়কর তেজোময় মূর্ত্তির ভীষণ দৃশ্যরূপ দেখতে পাব। তবে মাচার উপর লম্ফপ্রদান করতে যেন পছন্দ না করেন—এ কথা অবশ্য অতি সন্ত্রাস নিয়েই মনে হচ্ছিল। এই চিন্তার আলোড়নে ঘোরপাক খেতে খেতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা যেন বিরাট আকৃতি বিশিষ্ট জন্তু আসছে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে। রাজাবাহাদুরও তৎক্ষণাৎ চুপ্‌ চুপ্‌ বললেন—একটা বুনো মোষ আসছে। শিং দুটো ছোট হলেও কি রকম চক্‌ চক্‌ করছে দেখছেন!" আমি ভাল করে তাকিয়ে বললাম—ওটা মোষ নয়-শূয়র,—মাথা নীচু করে আসছে তাই দাঁত দুটো শিং বলে ভ্রম হচ্ছে।

রাজাবাহাদুর বুঝতে পেরে বললেন—অনেক বুনোশূয়র মেরেছি ও দেখেছি কিন্তু এত বড় কখনও দেখিনি এবং এত বড় হয় বলেও শুনিনি।

শূয়রটা বিকট দেহ নিয়ে সোজা আমাদের দিকেই আসছিল, পরেই বোধ হয় কিছু সন্দেহ করে দুর থেকে আমাদের ডান দিক ধরে অর্থাৎ দক্ষিণ-মুখো হয়ে চলতে সুরু করে দিল দ্রুত লয়ে। আমরা তাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি চারিদিকেই উৎকণ্ঠাযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ রেখেই ছিলাম। দৃষ্টি দক্ষিণ দিকে ঘুরাতেই দেখি প্রায় দু'শ হাত দূরে আমাদের ডান দিকে সেই শূয়রটা মন্থরগতিতে আপন মেজাজে চলে যাচ্ছে বড় বড়

শালগাছের আড়াল দিয়ে। আমি রাজাবাহাদুরের গায়ে চাপ দিয়ে সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সংগে সংগেই শূয়রটাকে গাছের ফাঁকে পেয়েই বন্দুক ছুড়েন। আর সে কি কাণ্ড! পাহাড় কাঁপান বিকট চিৎকার করতে করতে পড়ে গিয়েই শেষ শক্তি দিয়ে গাছ-পালা ভেঙে ধ্বংসকর ঝড়ের বেগে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

ভীষণ আরণ্যীক পাহাড় বলে এবং নীচের দিকটা বহু গভীর থাকায় আমরা তাকে আর দেখতে পেলাম না। তবে বেশ বুঝা গেল তার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হবেই।

তার দাঁত দুটোর জন্য খুব দুঃখ হতে লাগল। সত্যই দাঁত দুটো দেখাবার মত ছিল। এই লোকসানের জন্য মনে হয়েছিল তাঁর পাহাড়ের তলায় গড়িয়ে পড়া ভাল কাজ হয় নি।

রাজাবাহাদুরও আফ্‌সোস্‌ করতে লাগলেন—বিরাট চেহারার শূয়রটা উদ্ধার করা যাবে না বলে। পরে বললেন—গুলির আওয়াজ হয়ে গেল—আর এদিকে বড় জানোয়ার আসবে না মনে হয়। শুনে ভেতরে ভেতরে আশ্বস্ত হলাম,—মুখে বললাম—তাহলে বাঘ শিকার দেখা ভাগ্যে ঘটল না।

বেলা পাঁচটা নাগাদ আমাদের ডান দিকের মাচা হতে গুলির আওয়াজ আসতে লাগল। মারা পড়েছিল—দুটো হরিণ ও একটা ভালুক।

বীটদারদের বাজনা ও গলার আওয়াজ যতই নিকটে আসতে লাগল ততই সাহস বেড়ে গিয়ে মনে হচ্ছিল অন্ততঃ ছোটখাটও একটা বাঘ এসে পড়ত তাহলে বেশ হত—কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এলোই না—বড় আফ্‌সোস্‌ হতে লাগল।

বীটদাররা যখন একবারে কাছে এসে গেল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমরা মাচা থেকে নেমে পড়লাম। যখন সমতল ভূমিতে উপস্থিত হলাম তখন চারদিকে চাঁদের আলো ভেসে উঠেছে।

দু'পাশের পাহাড়ের উপরভাগের মাঝখানে দেখতে পাওয়া শুক্লা-নবমীর চাঁদকে মনে হল যেন একটি দীর্ঘ-প্রস্থ নীলাম্বরের মাঝ দিয়ে তাঁর মুখের শুভ্র-স্নিগ্ধ হাসির প্রতিচ্ছবি লুটিয়ে পড়েছে—আর সেই নীলবস্ত্রে ঝিল্‌-ঝিল্‌ করছে চুম্‌কি বসানর মত তারাগুলি স্থানে স্থানে। আকাশের সেই চন্দ্র বিরাজিত অপূর্ব শোভার চিত্রিত রূপকে যেন উভয় দিকের গগণচুম্বি

পর্বতরা তাদের গঠন ক্রেমে আটকে রেখেছে। সেই মনোহরণ শোভার দৃশ্যরূপ ঠিক ব্যাখ্যায় আসে না।

রাত্রি হয়ে পড়ায় হেঁটে সেই গ্রামে যাওয়া বিপদসঙ্কুল মনে হওয়ায় একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হল।

সেই বাড়ীটার স্থানে স্থানে তখন ছাউনী এবং সামনের দিকটা ভাঙ্গা-চুরা পাঁচিলে ঘেরা ছিল।

ঘরের ভেতরটায় আমরা জনকয়েক প্রবেশ করে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম। বাকী সকলকে উঠানের মাঝেই বসতে হল। সকলেরই শরীর তখন বেশ ক্লান্ত।

দুর্দান্ত চতুষ্পদদের আক্রমণকে আটকে রাখবার জন্য বাড়ীটার চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হল। এই কাজের জন্য কাছাকাছি দু' তিনটা বাড়ীর কাঠামোর কাঠগুলো সিপাহীরা তুলে নিয়ে এল। যদি রাত হয় এই ভেবে একটা বড় হেসাক্‌লাইট সংগে ছিল সেটা জ্বেলে রাখা হল।

বসন্তের ঝির্ ঝির্ হাওয়ার মধুরতা শরীরকে অল্পক্ষণের মধ্যে শীতল করে দিলে।

রাত বাড়বার সংগে সংগে আমার মধ্যে সুরু হল ক্ষুধা রাক্ষসীর তাড়না। সে দিনেও যে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মূর্ত্তি নিয়ে সে আক্রমণ করেছিল তা জীবনে ভুলবার নয়।

তার আক্রমণ যখন চরমসীমায় এসে গেল তখন মনে হতে লাগল ক্ষুধারাক্ষসীটা নাড়ি-ভুড়ি খেতে আরম্ভ করেছে—এবার হয়ত হাড়-মাস খেতে সুরু করবে। থাকতে না পেরে কোন রকমে উঠে এসে ভৈরব ঠাকুরকে বললাম—ও বেলার কিছু চাল টাল যা হোক যদি থাকে তো দাও, ক্ষিদের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। সে বল্‌লে—গ্রামে ফেরা হবে বলে কিছুই রাখা হয়নি, বা সে রকম আনাও হয়নি, তবে রাজাসাহেবের জন্য কিছু দুধ আছে— দাঁড়ান তাঁকে জিজ্ঞাস করি। তিনি শুনামাত্র সব দুধটা আমাকে দিতে বললেন। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে এক নিঃশ্বাসে পান করার পর ধড়ে প্রাণটাকে যেন ফিরে পেলাম। বিশেষ করে সেদিন রাজাবাহাদুর আমার প্রতি যেরূপ মমতা প্রদর্শন করেছিলেন তাতে আমি অতীব মুগ্ধ হয়ে গেছলাম। তাঁর এই আদর্শ ব্যবহার গভীরভাবে তৃপ্তির রূপ নিয়ে মনে এঁকে আছে। সত্যই এই রকম আদর্শ শিষ্য পাওয়া খুব

ভাগ্যের বিষয়।

তারপর সেইরূপ দেয়ালে হেলান দিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানতে পারিনি। জীবন হজম্ করে দেওয়ার মত ক্ষুধার আক্রমণের উপর দুধটা পেটে পড়ায় মকিস্নার মত কাজ করেছিল্। তাছাড়া নিদ্রাদেবী যখন কৃপা করে কাছে এসে রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে দেন তখন শয্যাদির কোন আবশ্যকই করে না—যে অবস্থাতেই হোক, সংগে সংগে এসে যায় গাঢ় নিদ্রা। এই ঘুমের জন্য অনেক সময় কত চেষ্টা করতে হয়, কত প্রার্থনা করতে হয়। তবে শারীরিক পরিশ্রমী মানুষদের তা করতে হয় না। বর্দ্ধমানে থাকার সময় একটি ঠিকে ঝি ছিল,—সে কাজ করতে এসে বৃষ্টির সময় তাকে দেখেছি দেয়াল ঠেস দিয়ে ঘুমোতে।

আমাদের দেশে একটি খুব পরিশ্রমী মানুষ ছিল—সে রাস্তায় চলতে চলতে ঘুমোতো। আবার অনেককে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমকে আনতে হয়। ঘুম মানুষের সুস্থতার একটি বড় লক্ষণ। তারপর সেদিন ঘুম ভাঙ্গল একেবারে ভোরে। শুনলাম বাইরের উঠানে বসে থাকা লোকেরা সমস্ত রাত ধরে চিৎকার-কোলাহল করে কাটিয়েছে—বাঘের হুঙ্কার শুনার পর।

একটু সকাল হতেই আমরা গ্রামের পথে কয়েক পা' অগ্রসর হতেই দেখতে পেলাম রাতের বৃষ্টিঝরা কাদামাটির উপর এদিকে ওদিকে বাঘের পায়ের ছাপ ছোট বড় আকারে আঁকা রয়েছে। ছাপগুলোর রকম রকম আয়তন দেখে সকলের মনে হল গোটা পাঁচ-ছয় এসেছিল মুলাকাত করে তাদের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে অতিথি সৎকার করবার জন্য কিন্তু তারা সে পুণ্যসঞ্চয়টুকু পাওয়া হতে বঞ্চিত হয়েছিল বোধ হয় অগ্নিদেবের বেড়াজাল থাকায় এবং সজাগ ও কোলাহলের শব্দের জন্য ভয় থাকায়। বেচারীদের কেবল আশায় আশায় রাত জেগে অশেষ কষ্টভোগ ও জিহ্বায় লালা নির্গতই সার হয়ে গেছল। এইসব কথার আলোচনা করতে করতে বীরদর্পে আমরা পৈত্রিকপ্রাণ ও দেহটাকে টেনে এনে ফেললাম সেই গ্রামের পাঠশালা গৃহে। শিকারের তিনটি মৃত প্রাণীকেও বহন করিয়ে আনা হয়েছিল।

সেদিন যদি ব্যাঘ্র মহাশয়েরা সদলবলে মরিয়া হয়ে ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাহলে কার কার ভাগ্যে যে কি ঘটত তা মনে হয়ে শিউরে উঠতে হয়েছিল।

তবে বেশ জানা গেল ওরা অতবড় হিংস্র দুর্দান্ত ও ভীষণ শক্তিশালী

হয়েও মনে ওদেরও যথেষ্ট ভয় ও সতর্কতা আছে। যতই লোভনীয় বস্তু হোক না কেন নিজের সাবধানতাকে খুব বেশী রক্ষা করে চলে। মানুষের মধ্যে যারা হিংস্র তারা কিন্তু বেপরোয়া। তারা অনেক উচ্চস্তরের অন্যায় ও শত্রুতা করতে পারে এবং একসংগে কত বেশী হত্যা ও ধ্বংস করতে পারা যায় তার চেষ্টাও অব্যাহত রাখে।

তার পরের দিন সকালেই তিন মাইল দূরে আর একটা গভীর জংগলাবৃত পাহাড়ে গিয়ে মাচায় বসা গেল বাঘ শিকারের আশায়। গ্রামের লোকেরা বলেছিল এই পাহাড়ে বাঘের সংগে আমাদের মুলাকাত হবেই। কারণ বাঘের সংখ্যা এই পাহাড়েই বেশী আছে বলে বরাবর তারা শুনে আসছে।

মাচার উপরে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বীটদারদের তাড়া পেয়ে আমাদের তলা দিয়ে এবং দু' পাশ দিয়ে বন্যকুকুট, খরগোশ, তিতির, গুড়ুর প্রভৃতি আকর্ষণীয় খাদ্যপ্রাণীরা দল বেঁধে ছুটে যেতে লাগল এবং উপর দিকে দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ময়ূরেরা।

তারপরই নানান প্রকারের গঠন সৌন্দর্য্য নিয়ে হরিণরা ইতস্ততঃভাবে কেউ থমকে দাঁড়িয়ে রইল সভয় কম্পন দেহে, কেউ বা ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল। প্রাণীদের উপর বন্দুক ছুড়া দেখার চেয়ে এই সব দৃশ্যই আমাকে আবিষ্ট করত এবং তাতে ছিল বিস্ময় নিয়ে করুণ অভিজ্ঞতার মর্মস্পর্শী বস্তু। দেখতাম প্রাণরক্ষার জন্য তারা কি রকম আকুল উদ্বেগ নিয়ে ভয়াতঙ্ক হয়ে উঠে এবং সেই দৃশ্য কি করুণাত্মক ও বেদনাদায়ক হয়। যাই হোক্ এ দিন এদের ভাগ্য খুব ভাল ছিল—শিকারীরা বাঘের আগমন প্রত্যাশায় এদের উপর গুলি চালালেন না।

ব্যাঘ্র মহাশয়দের শুভাগমনের প্রত্যাশায় আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম।

বীটদাররা যখন মাচার নিকটে এসে গেল তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর। মাচা থেকে নেমে শিকারীরা বীটদারদের জিজ্ঞেস করলেন—বাঘের রাজ্যে বাঘ দর্শন হল না কেন? ভাঙ্গা বাংলায় বুঝানর মত করে যা বলল তার অর্থ—যেখানে যেখানে বাঘ থাকার সম্ভাবনা খুবই বুঝেছিল নানান নিদর্শনের মাধ্যমে-সে সব জায়গায় তারা প্রাণের ভয়ে যাই নি,—বলল—আমরা শিকার করতে আসি ভাল ভাল মাংসের স্বাদ পেতে এবং অনেকের সংগে একযোগ হওয়ার মিলন আনন্দ থাকে। যে গুলো খাই সে গুলোই

বধ করি— বাঘকে ঘাঁটাতে চাই না, আমরা জানি কোন রকমে বেরিয়ে পড়লে আমাদের দু' চারটাকে শেষ করে দেয়। অবশ্য এই জংগলের বাঘগুলো মানুষের রক্তর স্বাদ এখনও পায়নি—তাই তারা অত উগ্র ও ভীষণভাব দেখায় না, গোলমাল শুনলেই শান্ত-শিষ্টর মত দূরে চলে যায়। আমরা আজ অনেকবার দূর থেকে দেখেছি তাদের মন্থরগতিতে চলে যাওয়া।"

ফেরার পথে শিকারীরা আফসোস্ করে বলতে লাগলেন—এমন জানলে দু' চারটে হরিণ অক্লেশে মারা যেত,—শুধু শুধু কষ্ট ভোগই সার হল। কতকটা পথ এগিয়ে আসতে হঠাৎ রাজাবাহাদুর আমাদের কাছ থেকে হাত-পাঁচ ছয় ডান দিকে এগিয়েই গুলি ছুড়লেন—সংগে সংগেই প্রায় দু' তিনশ' হাত দূরে একটা গাছের আড়ালে শরীর পতনের পরই ঝট্‌পট্ শব্দ হতে লাগল।

আমরা সকলে ছুটে গিয়ে দেখি একটি মধ্যবয়সী চিতল হরিণের ভবলীলা সাংগ হচ্ছে। গুলিটা বুক ভেদ করে ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বেচারী আমাদের দিকে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যেন ঘৃণায় আয়ত চোখ দুটি নামিয়ে নিলে।

সকলেই খুব উল্লসিত হলেন—যাত্রা একেবারে নিষ্ফল হল না বলে। এই রকম ভাবে আরো তিন জায়গায় শিকারে বসা হয়েছিল এবং হরিণ ইত্যাদি বধও হয়েছিল কয়েকটা। রাজাবাহাদুর দুটো ভালুকও মেরে ছিলেন। শিকার অভিযানে এসে আমার সত্যকারের যা লাভ হয়েছিল তা হল অপূর্বমহিমাময় প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ দর্শন, গ্রামবাসীদের নির্মল ও উদার সেবাপরায়ণ মনের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহুবিধ অভিজ্ঞতা এবং তার সংগে স্বভাবগত সুর ও ছন্দের সৃষ্টিগত তত্ত্বের কিছু সন্ধান ও পরিচয়।

এই সব অঞ্চলের দূরে দূরে পাহাড়ে ঘেরা গ্রামগুলির চতুষ্পার্শে বিশাল বিস্তৃত হয়ে ধরিত্রীর যে দৃশ্যরূপ আছে তা যেন পূর্বেকার পণ্ডিতদের নিরাভরণা শুচীশুভ্র সাধ্বী জায়ার মত পবিত্র ও তপস্বিনী স্বরূপ। এখানের দৃশ্যরূপে কোন জৌলুস বা আকর্ষণ নেই,—আছে বৈরাগ্যের পথে নিবিড় করে টেনে নেবার আহ্বান। এই রকম ভাববিহ্বল স্থানে দাঁড়িয়ে মনে হত সহর সভ্যতার মানুষ শুধু সহরেরই উপযোগী, আর এই সব অঞ্চলের মানুষ এই রকম স্থানেরই উপযোগী—যেখানে কৃত্রিম

বলে কিছু নেই। ঐহিক বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর আরাধনার ওই রকম স্থানই উপযুক্ত; সঙ্গীতের জন্যও তাই।

এরপর শিকারের শেষ পর্বের শেষ অঙ্ক লিখে এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদ সমাধা করি। স্বস্থানে ফেরার পথের যেখানে ছোট ছোট পাহাড় সংযুক্ত হয়ে আছে বৃক্ষে সমাবৃত হয়ে, সেই সব পাহাড়ে বেশ কিছু হরিণ আছে। এ কথা লোক মুখে শুনে রাজাবাহাদুর বললেন—তাহলে এ সুযোগ ছাড়া হবে না—ওখানেই শিকার পর্ব সমাধা হবে।

সকাল সকাল রান্নাবস্তু খেয়ে নিয়ে সেই গ্রাম থেকে রওনা হয়ে যখন ওই পাহাড়গুলির নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে উপস্থিত হলাম তখন বেলা প্রায় চতুর্থ প্রহর। গ্রামবাসীদের কথামত আমরা গাড়ী ছেড়ে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে চললাম। পাহাড়ে উঠে তার গাত্রের উপর দূরে দূরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে শিকারীরা বসলেন। গুলি ছুড়ার লক্ষ্যের বাইরে কয়েকটা হরিণ দেখা যেতে লাগল। মনে হল তারা আমাদের নিকটবর্ত্তী হবে। কিন্তু আমাদের শিকারের আশা নির্মূল করে দিয়ে ভীষণ ঝটিকার আবির্ভাব হল তার পশ্চাতে বিপুলাকার ঘন-ঘোর মেঘকে নিয়ে। ঝটিকার তাণ্ডবে গাছের ডাল পালা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। পর-ক্ষণেই ভীষণ অন্ধকার করে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তীরের মত গায়ে পড়তে লাগল। তারপরই প্রবল বর্ষণ। আমাদের তখন অবস্থা মারাত্মক করে তুলল। জলের ঝাপ্টায় বসে থাকা অসম্ভব হওয়ায় গাছের শিকড় ধরে শুয়ে পড়া গেল কিন্তু তাও পারা গেল না,— পাহাড়ের উপর থেকে প্রবল বেগে জলের স্রোত নেমে আমাদের ঠেলে অতল গহ্বরে ফেলে দেবার উপক্রম হয়ে পড়ায় তাড়াতাড়ি গাছের গোড়াকে শক্ত করে ধরতে হল। মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি ও চোখ ঝল্সান বিদ্যুৎ এবং তার সংগে ঝড় ও বৃষ্টির দাপট যেন প্রলয় কাণ্ডের মত হয়ে পড়ল।

প্রাণ নিয়ে আর ফিরে যেতে হবে না একথাই কেবল নিদারুণ সন্ত্রাস নিয়ে মনে হতে লাগল। গাছকে জড়িয়ে থাকাও যখন অসম্ভব হয়ে উঠল তখন রাজাবাহাদুর চিৎকার করে সকলকে বললেন—রাস্তা লক্ষ্য করে গাছ ধরে ধরে যে কোন প্রকারে নেমে পড়বার জন্য চেষ্টা কর— এ রকমভাবে মরা চলবে না। আমেদ আলিকে বললেন—আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে থাকবার জন্য। কব্জির উপর তার লৌহসদৃশ হস্তের চাপ গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি করল।

যাইহোক্—ভগবানকে ডাকতে ডাকতে (এই রকম সময়েই তাঁকে ডাকবার খুব আকুলতা আসে মানুষের) গাছ ধরে ধরে বহু কষ্টের উপর কম্পিত কলেবরে সভয় পদক্ষেপে অল্প অল্প করে নীচে নামবার চেষ্টা হতে লাগল। বরুণদেব যেন ক্ষিপ্ত হয়ে এই কথাই জানাতে চাইলেন আজ আমি তোমাদের চরম শাস্তি দেবো ! অনিষ্টকারী জন্তুদের তোমরা বধের চেষ্টা করতে পার কিন্তু এইসব নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করার মজাটা আজ বুঝ ! মন তখন ওই মনে হওয়া কঠোর উক্তির উত্তরে বলতে চেয়েছিল—ওগো বরুণদেব ! জীবহত্যার যে কি আনন্দ তা যদি তুমি বুঝতে পারতে তাহলে বেরসিকের মত আমাদের উপর এমন ব্যবহার দেখাতে না। তাছাড়া তুমিই বা এই কাজে কম কিসে, বরং তোমারি শাস্তি পাওয়া কঠোরভাবে উচিত। কারণ তুমি ঘর-বাড়ী সব ভাসিয়ে দাও, শত শত মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রাণ নিয়ে নাও শস্যাদি নষ্ট কর। শুধু এতেই নয়—চুপ করে বসে থেকেও এই নির্মম কাজ কর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনিষ্ট করতে প্রায় সবাই সমান কেবল কম-বেশী এইমাত্র। ভগবানকেই এক সাধক কবি বলেছেন "…প্রলয়-সৃষ্টি তব পুতুল খেলা …"। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন, তুমি নিমিত্তমাত্র—আমিই সবকে বধ করে রেখেছি।" সুতরাং শিকারীরাও বলতে পারে আমরাও নিমিত্ত মাত্র। মনের মধ্যে দিয়ে এইসব উত্তর শুনে বরুণদেব লজ্জিত হয়েই যেন তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। আমরাও সে যাত্রা বেঁচে গেলাম। আস্তে আস্তে নেমে সমতল ভূমিতে পা' দিয়েই সেখানে পা' ছড়িয়ে বসে পড়া গেল অনেকক্ষণ ধরে। তখন সূর্য্যের শেষ আলো আভাও দেখা গেল।

সেই দিনের সেই দুর্য্যোগের ভীষণ দুর্দ্দান্তরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সে যেন মৃত্যুর এক সাংঘাতিক দানব রূপ, যখনই মনে পড়ে তখনই শরীরকে দেয় রোমাঞ্চিত করে।

দুঃখ—কষ্ট—ভয়—বিস্ময়—আনন্দ—অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী এবং নানান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বস্তুসকল এই শিকার যাত্রার মাধ্যমে পেয়েছিলাম॥

(৪১)

অপূর্ব সঙ্গ লাভ,—

ভেলাইডিহার রাজাবাহাদুরের কাছে থাকার সময় বহু চিত্তাকর্ষক

ঘটনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। সে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে বলার মত ছিল কিন্তু এখানের কয়েকটি মাত্র ঘটনার পরিচয় দিতেই লেখার কলেবর যেরূপ বেড়ে গেল তাতে অন্যগুলোর স্থান রাখতে পারলাম না।

শিকার থেকে ফিরে এসে যথানিয়মে দিন চলতে লাগল। ইতিমধ্যে একদিন রাজাবাহাদুর বললেন—বাড়ী তৈরির কাঠের জন্য যে শালগাছটা আপনাকে দেবো স্থির করেছি—সেটা কাল সকালে আপনাকে দেখিয়ে আনব।"

পরের দিন সকালে গান বাজনা শেখানর পর জলখাবার (দুধ-চিঁড়ে) খেয়ে নিয়ে রাজাবাহাদুরের সংগে হাতীই চড়ে গেলাম।

মাইল তিন রাস্তা পেরিয়ে হরিজন জাতিদের একটা ছোট পল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী জংগল ধারে উপস্থিত হতেই রাজাবাহাদুরেব আদেশে মাহুত হাতীকে বসিয়ে দিতেই আমরা নেমে পড়লাম।

একটুকু এগিয়েই খুব মোটা ও দীর্ঘাকৃতি এক শাল গাছের কাছে যেতেই রাজাবাহাদুর বললেন—এই গাছটি আপনাকে দেবো মনস্থ করেছি। এই গাছটির বয়স আমার জংগলের সমস্ত শাল গাছের চেয়ে অনেক বেশী। আমার মনে হয় এই গাছের কাঠেই আপনার বাড়ীর সমস্ত কাজ হয়ে যাবে—যদি অকুলন হয় তাহলে আর একটা দেব।

অতবড় শালগাছ কখনও দেখিনি তাই তার অবয়ব দেখে তাক্ লেগে গেছল। জন্মেছে সে জংগল ছেড়ে প্রান্তরে-গোষ্ঠিছাড়া হয়ে। সে সময় গাছটিকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিলাম—এতদিনে তোমার স্বজাত সঙ্গিহীন অবস্থার চির অবসান ঘটিয়ে দেবার ব্যবস্থা এসে গেল। নিজ সমাজে তোমার কেন স্থান হয়নি তা জানবার উপায় নেই। একাই তুমি এতকাল তপস্বীর মত কাটিয়ে এসেছ। তোমার দেহাশ্রয়ে যে সব বিহঙ্গ বাস করত, মনের আনন্দে সুকণ্ঠে সুর তুলত, এডালে ওডালে নেচে বেড়াত, নীড় রচনা করে সন্তানদের পালন করত তারা তোমার এবং তোমাদের অকাল মৃত্যুতে কত যে বেদনাহত হয় সে কথা আমরা কোন দিনই বুঝি না ও বুঝতে চাই না—কারণ আমরা মানুষ। ওদের কিছুই দরকার হয় না কিন্তু আমাদের সবই চাই।

গাছকে কেটে ফেলা—সে-ও হত্যার মতই নৃশংস কাজ। অন্য জীবেরা তবু ঘাতকের কাছে করুণ ক্রন্দন তুলে আকুতি জানাতে থাকে কিন্তু এরা

মুক—তাই দুঃখ-যন্ত্রণা ও নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আহত হতে থাকে। আমাদের মনে কোন দুঃখ-কষ্টই আসে না এদের প্রতি ঘাতক-বৃত্তির জন্য। হত্যা, বধ ও প্রাণনাশ এগুলো মানুষের উপর হলেই অপরাধরূপে গণ্য হয় এবং তারজন্য শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু অন্যদের জন্য অন্যায় ও অপরাধ নয়। মানুষকে হত্যা করে যদি দণ্ড না পেতে হত এবং সেই শরীরটা খাদ্যাদির কাজে লাগত তাহলে বড় ভাল হত।

গাছটি দেখে আমরা ফিরে এলাম। সে সময় সকলে বললেন ওই গাছটির দাম এখন দু'শ' টাকার কম নয়।

আমার খুব আগ্রহ এসেছিল কাঠুরিয়ারা কখন যাবে গাছটির কাছে। তাহলে রাজাবাহাদুরকে বলে আমিও যাব তাদের সংগে। আমার যাওয়ার আগ্রহের মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল যেক'দিন সুযোগ পাব সেক'দিন সেই সাধন-ভজন তুল্য নির্জন মনোরম স্থানে এক গাছতলায় বসে তাঁকে শুনাচ্ছি মনে করে গান গাইব। এই আকুল কামনা আমার অন্তরে আলোড়িত হচ্ছিল। যাই হোক্—রাজাবাহাদুর শীঘ্র ব্যবস্থা করে দিলেন এবং আমার যাওয়া শুনেও কোন আপত্তি করলেন না।

যথাদিনে বেলা ন'টায় খেখান সেরে কাঠুরিয়াদের নিয়ে গেলাম সেই গাছটির কাছে। আমি একটি বটগাছের তলায় বসে পড়লাম। অল্প দূরে কাঠুরিয়ারা গাছটির পরমায়ু শেষ করার ব্যবস্থা চালাতে লাগল। আমার বসে থাকার পরই কাণে এল মধুরকণ্ঠের এক সংগীত। সেইদিকে তাকিয়ে দেখি নিকটবর্ত্তী সেই ছোট গ্রামটির শেষের দিকে অর্থাৎ আমার বসে থাকার দক্ষিণ দিকের সম্মুখে একটি কুঁড়েঘরের উঠানে আম গাছের তলায় বিপরীত মুখে মধ্যবয়সী একজন গান করছে। আমি সেই গানে আকৃষ্ট হয়ে নিজের সাধনার কথা ভুলে গিয়ে তার পেছনে যেয়ে দাঁড়ালাম। লোকটি কারো উপস্থিতি বুঝতে পেরে গান থামিয়ে পেছন দিকে ঘুরে আমার দিকে বিস্ময় ও কৌতূহল ভরা দৃষ্টি দিয়ে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল।

আমার পরিচয় পাওয়ার মধ্যে রাজাবাহাদুরের সংগীত শিক্ষক জানতে পেরে কিভাবে সে আমাকে খাতির-যত্ন ও অভ্যর্থনা জানাবে, কোথায় বসাবে তারজন্য অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি একটা ছেঁড়া থলে পড়েছিল—সেটাকে টেনে এনে তার কাছে বসে পড়ে বললাম—তোমাকে আমার জন্য এত ব্যস্ত হতে হবে না,—তুমি যখন অমন সুন্দর

গাইতে পার তখন আমার পর নও—একগোষ্ঠীর আপন জন, তাছাড়া বয়সে বড় সুতরাং তুমি আমার দাদার মত।

মানুষটি আমার এই কথা শুনে যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গেল এবং চোখ দিয়ে তার অশ্রু গড়াতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে বলল—আপনাদের মত এত বড় ব্যক্তিদের কাছে এ রকম মমতাযুক্ত মর্মস্পর্শী কথা শুনলে হৃদয়টা কি রকম করে উঠে,—গরীবের হাতে হঠাৎ অনেক অর্থ এসে গেলে তার যেমন অবস্থা হয়,—অর্থাৎ কোন্ যোগ্যস্থানে সেই সম্পদ রাখবে তা খুঁজে পেতে যেমন দিশাহারা হয়ে পড়ে তেমনি মহা ভাগ্যগুণে আপনার দর্শন পেয়ে আমারও আজ সেই অবস্থা।

লোকটির মুখে এই কথা শুনে মনের ভেতরটায় কি রকম এক আলোড়ন এসে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তার হৃদয়ের বিমল প্রীতিধারায় আমার অন্তরকে স্নিগ্ধ-স্নাত ও তৃপ্তিময় করে তুলল।

আমাকে ও বুকে নিয়ে নিজের ভাই এর মত করে কত যে আদর-ভালবাসা জানাতে লাগল সে কথা এখনও মনে হলে মনের ভেতরটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হয়ে গিয়ে সেই স্মৃতির বাস্তব ও প্রত্যক্ষরূপ সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়; মনে হয় এখনও সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—ওরে ভাই আয় আমার হৃদয়ের শূন্যস্থানে !"

ভাই হয়ে জন্মানর মধ্যে যদি কিছু তৃপ্তির সম্পদ ও স্বাদ থাকে তাহলে সে-ই আমাকে দিয়েছিল কয়েক দিন ধরে অল্প নয়— অপর্যাপ্তভাবে ঢেলে। নিঃস্বার্থ ভালবাসার মত আর কোন তৃপ্তির বস্তু নেই।

তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নামটি কি ? এবং যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তোমার পরিচয় একটু আমায় দাও। একটু মিষ্টি হেসে জানাল—'আমার নাম গোবিন্দ, জাতিতে ডোম্। ক্রোশখানেক দূরের এক গ্রামে পুরুষানুক্রমে আমাদের বসবাস ছিল। কয়েক বছর আগে গ্রামের প্রায় সকলকেই ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রমণ করে এবং ওষুধপত্র, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে অনেকেই মারা যায়। আমাদের পাড়াটা গ্রাম থেকে একটু ফাঁকায় ছিল এবং নীচ জাতিদের তাই বলে মনে হয় ওই রোগটা আমাদের তেমনভাবে জব্দ করতে পারে নি, তাছাড়া কুইনাইন কিনে খাবার পয়সা আমাদের জুটে যাওয়ায় বেঁচে গেছলাম। তারপর সেখানের লোকশূন্য ভীতিকর জায়গায় থাকা সম্ভব

না হওয়ায় এই ছোট গাঁ-এ এসে শেষ প্রান্তে কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করছি। এই জায়গার শোভা সৌন্দর্য্য আমার বড় ভাল লাগে। আমাদের জাতিগত ব্যবসা সানাই, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উপার্জন করা এবং অবসর সময়ে স্ত্রী-পুরুষ মিলে বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করে সেগুলো বিক্রির দ্বারাও কিছু আয় হয়। এই রকম করে কোন প্রকারে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই আমাদের বরাবর জীবন কেটে আসছে—পরিবর্ত্তন কোন দিন হয়নি—হবেও না। বাল্যকাল থেকে আমার গাওয়ার গলা ভাল ছিল বলে বাবা আমাকে এক পেশাদার যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দেন। সেখানে যা পাই তাতেই আমাদের কোন রকমে দু'বেলা দুমুঠো আহার জুটে যায়। যাত্রা যখন বন্ধ থাকে তখন কি আর করব,—যা কিছু সম্বল থাকে তাতেই সংসার চালিয়ে নিতে হয়, অন্য কাজ আর কিছু করতে পারি না, তাছাড়া আমরা শিখবার অবকাশও পাইনি, তাই সর্বদাই এক রকম এই কুঁড়েঘরে বসে, কিংবা গাছতলায় ভগবানের নাম গান করি। এজন্য দেহরক্ষার খাদ্যাদির অভাব-অনটন থাকলেও মনের অভাব কিছুমাত্র অনুভব করি না—বেশ তৃপ্তিতে ও আনন্দে থাকি। গানের সময় খুব আকুলতা এসে গিয়ে মনে হয় আমার মত এই নীচ অধমের গাওয়া গান কি তিনি শুনেন! বল না ভাই তিনি সত্যিই এই অভাজনের গান শুনেন কি-না?"

আমি সজল চোখে বলেছিলাম,—এর উত্তর দেবার মত আমার কোন সম্বল নেই, তবে আমার অন্তর এই কথাই বলে—যদি তিনি সত্যাই গান ভালবাসেন ও শুনেন তাহলে তোমার মত এই রকম করে গাওয়া গানই শুনেন।

আমার এই কথাগুলো শুনে গোবিন্দর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগল। মনে হল একেই বলে প্রেম ও অনুরাগের অশ্রু। আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল সত্যই একটি সংগীত সাধকের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ভগবান করে দিয়েছেন, আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ও আকর্ষণের টান যেন ভগবান সফল করে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। গোবিন্দর সম্বিদ্ ফিরে আসবার পর অনুরোধ করলাম দু' একটি গান শুনাবার জন্য।

গোবিন্দ ধ্যানস্থর মত হয়ে চোখ বুজে গাইতে আরম্ভ করল সাধক

কবি নীলকণ্ঠের রচিত একটি গান—"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব রূপ সার
তুমি সর্বলীলা প্রকাশিলে প্রসবিলে ত্রিসংসার…"
পরে উক্ত কবিরই আর একটি গান—

"হরি দুঃখ দাও যে জনারে
তার কেউ দেখে না মুখ ব্রহ্মাণ্ড বিমুখ
স্থান নাই তার ত্রিসংসারে… ।"

সেদিন সেই প্রকৃতির স্বভাব সুন্দর এবং আধ্যাত্মা সাধনার উপযুক্ত পরিবেশে গোবিন্দ তার অপূর্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত কণ্ঠ নিয়ে ভাব বিহ্বলিত তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে যে গান শুনিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল শাশ্বত সংগীতের তৃপ্তিময় স্থানে চলে গেছলাম। গান থেমে যাবার পর কেবল মনে হতে লাগল—এমন দরদ ও ভাব দিয়ে সাবলীল সুর শিল্প এঁকে কি করে গাইতে শিখল? কোথায় শিখল? এমন সুন্দর কণ্ঠই বা কি করে লাভ করল? এ বিষয় নিয়ে বহু পরে অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছি যে, সত্যকারের প্রাণময় সংগীত শুধু শিখে হয় না, যথার্থভাবে লাভ করতে হলে চাই উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ এবং ভগবানের কৃপা করার মতই পাবার আবশ্যক হবে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা এবং তার সংগে স্বভাবগত গভীর অনুভূতি ও অনুরাগ, আর বর্জন করতে হবে লোভ, মান-মর্য্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তির লালসা।

তারপর গোবিন্দর সংগে সংগীত সম্বন্ধে নানা বিষয়ের কথা চলতে থাকার সময় দেখতে পেলাম গোবিন্দরই স্ত্রী বোধ হয় জলভর্ত্তি মাটির কলসী কাঁকালে নিয়ে উঠানে প্রবেশ করেই আমাদের দেখতে পেয়ে এক হাত ঘোমটা টেনে ত্রস্তপদে পেরিয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দ ডেকে বল্‌ল—ওগো শুন্‌চো? তোমাকে অত লজ্জা দেখাতে হবে না, যদিও মহা সম্মানি—রাজাবাহাদুরের সংগীত গুরু তত্রাচ কৃপা করে ইনি নিজেকে তোমার দেওর সম্পর্ক দান করেছেন,—তুমি সেইরূপই ভাববে।" গোবিন্দর স্ত্রী ঘোমটা একটু সরিয়ে আমাদের দিকে সলজ্জ আনন্দ মিশ্রিত হাসির রেখা মুখে টেনে মন্থর গমনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোরল।

কয়েক দিনের আসা-যাওয়ায় ওই নারীটির মধ্যে দেখেছিলাম সুঠাম সুন্দর পবিত্র মুখখানির মধ্যে আছে মায়া, মমতা ও সরলতাপূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল বস্তুসকল এবং ওষ্ঠপ্রান্তে মধুর হাসিটি সর্বদাই দেখা দিত। মাতৃভাব

থাকার যেসব গুণ তার সবগুলিই যেন মনে হত অন্তর থেকে বাহিরে সর্বদাই বিরাজ করছে। তাছাড়া বুঝবার উপায় ছিল না শিক্ষা-অশিক্ষার কিছুমাত্র তফাৎ আছে এবং জাতিগত উপর-নীচ পার্থক্য।

তারপর সেই প্রথম দিনের কিছুক্ষণ পরে আমার খুব তেষ্টা পাওয়ায় গোবিন্দকে বললাম জল খাব।

গোবিন্দ বল্ল—কিছুদূরে নদীর ঝরণার ভাল জল আছে, আমরা সেই জলই ব্যবহার করি, আপনাকে আমি কাঁধে করে এক দৌড়ে নিয়ে যাব সেখানে—এবং নিয়ে আসব, এতটা পথ আপনাকে এই রৌদ্রে কষ্ট করে হেঁটে যেতে দেবো না।

বললাম, কেন? বৌদি'তো এইমাত্র জল নিয়ে এল তবে আমাকে নদীতে যেতে হবে কেন? এবং হাঁটার প্রশ্ন নিয়ে তোমার কাঁধেই বা চড়ব কেন? আমি কি পঙ্গু?

গোবিন্দ জানাল—আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আর আমরা নীচজাতি, —আমাদের ছোঁওয়া জল কি আপনাকে দিতে পারি?" এই কথা বলেই সন্ত্রস্তে নিজের জিভ দাঁতে চেপে ধরল।

আমি তার এইসব কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মন অতিশয় ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ভাবতে থাকল—উঃ কি নির্মম আমাদের জাতি-ভেদের ব্যবধান, কুসংস্কার ও অমানবতা !!

আমার জাতরক্ষার জন্য আমাদেরই মানবগোষ্ঠীর একটি প্রকৃত মানুষ আমার হাঁটতে কষ্ট হবে বলে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে জলপান করাতে, জল থাকতেও দিতে পারবে না, অসম্ভব অপরাধ হবে বলে জেনে রেখেছে! এতবড় নির্মম পার্থক্য রেখে কি আমরা মহাপাতক হইনি? গোবিন্দর হাত দুটো ধরে ক্ষমা চাওয়ার মত করে বললাম—তুমি যে কথা শুনালে তাতে আমার মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ভীষণ আঘাত পেয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে,—আমি ছোট-বড় জাত জানি না, অন্তর আত্মার ছোট-বড় নেই, তুমি বড় না আমি বড় এ বিচার জাতি নিয়ে হয় না, হয় কর্ম-সাধনা ও মনুষ্যত্ব নিয়ে। আমি তো দেখি তোমরাই বরং বড় সবদিক দিয়ে, নচেৎ এত বঞ্চনা কি তোমরা সহ্য করে আসতে পারতে?

যাক্ এখন একথা বাদ দিয়ে দেখি চেষ্টা করে তুমি তোমাদের ছোঁওয়া জল দিতে ভয় পেলেও বৌদি' দেন কি-না, দেখব—মায়ের জাতরা সন্তানকে জল না দিয়ে কি করে পারে?

গোবিন্দর স্ত্রী নিকটেই ছিল—আমার কথা শুনে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল একটা গর্বের তৃপ্তি নিঃশ্বাস ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ নিয়ে এল ঝক্‌ঝকে ঘটিতে করে জল ও তার সংগে শালপাতায় করে খানিকটা গুড়। পরম আদরের সহিত আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌ল খাও ভাইটি আমার! এই কথা বলেই হাসির সংগে চোখের জল পড়ে গেল মাটিতে।

আমি পরম আগ্রহের সহিত তাঁর হাত থেকে নিয়ে সেই বস্তু ভক্তি ও তৃপ্তির সহিত খেলাম। তারপর গোবিন্দকে বল্‌লাম—দেখলে! পুরুষ আর নারীতে কত তফাৎ, তোমার গানের বাণীই এখন বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্বরূপ সার··· ।"

গোবিন্দ কোন কথারই আর জবাব দিতে পারল না, কেবল অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে দুজনেই আমার প্রতি এমন একটা মন্তব্য করে বসল, যা শুনে লজ্জায় আমি অভিভূত হয়ে হাত জোড় করে রইলাম। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দ কোলের কাছে টেনে নিয়ে এমনভাবে আদর করতে লাগল যেন সত্যসত্যই আমি তার ছোট ভাই হয়ে গেছি।

আমি গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলাম—কৈ তোমার তো কোন সন্তানাদি দেখছি না? এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বার-তের বছরের সুন্দর সুডৌল ফুটফুটে মেয়ে ছোট ছোট কাঠ এক বোঝা মাথায় করে এনে দাঁড়িয়েই বোঝাটা এক পাশে নামিয়ে রাখল। তার ঢলঢলে চোখ দুটি, কলিপাণা মুখখানি এবং তরঙ্গায়িত গতি-ভঙ্গীর মত ছন্দময় দেহের শাবলীল চলন, গঠন দেখে মনে হয়েছিল যেন নির্জন সরোবরের স্বচ্ছ ঢেউএর উপর একটি লালিমা আভাযুক্ত পদ্মকোরক। মেয়েটি যেন মায়ের চেহারারই শিশু সংস্করণ।

গোবিন্দ বল্‌ল—এইটিই আমার একমাত্র সন্তান—নাম লক্ষ্মী। আমি যাত্রার দলে নাচ দেখে ওকে খুব ছোট থেকেই শিখিয়েছি, এবং গানও অনেকগুলো। বাজনার কোন সাহায্য পায় না তবুও প্রথম থেকেই ঠিক সুর রেখে গাইতে পারে। আপনাকে এক্ষুণি ওর নাচ-গান শুনাব।"

অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলাম মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ,—কোনরূপ সংকোচ বা জড়তা নেই। শীগ্‌গীর মধ্যে আমার পরিচয় জেনে নিয়ে মিষ্টি কথা ও ব্যবহারে মুগ্ধ করে ফেল্‌ল। তার মনের ভাব-গতিতে বুঝলাম আমি যেন

তাদের এক অপ্রত্যাশিত দুর্লভ বস্তু।

লক্ষ্মীর নাচ দেখে এবং গান শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে তার প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলাম। মনে বার বার এই কথাই উদয় হতে লাগল—তার এই কৃতিত্ব গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের কাছে অজানাই থেকে যাবে। যে রত্ন জংগলপ্রান্তে নিজেই উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেই রত্ন হয়ত এখানের এই রকম জায়গাতেই বিলীন হয়ে যাবে। তার কণ্ঠস্বরের মনমুগ্ধকর বস্তু ও নৃত্যের শাবলীল ছন্দ-বৈচিত্র্যও ওই রকমভাবেই দিগন্তে মিলিয়ে যাবে।

বেলা বেড়ে গেল। গাছের উপর কুঠারের আঘাত কাণে আসতে লাগল। ভীষণ রোদ্দুর, ধরিত্রীর উপর ঝিল্ ঝিল্ করছে রৌদ্র-বর্ষণের রূপ। ফেরবার জন্য উঠে পড়লাম। গোবিন্দ ও লক্ষ্মী অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। শাল গাছের একটা ছোট ডাল ভেঙে আমার হাতে দিয়ে লক্ষ্মী বল্ল—কাকামণিবাবু! এটা মাথায় ধরুন, রোদ্দুর লাগবে না, কাল খুব শীগ্‌গীর আসবেন কিন্তু। আমি হেসে সম্মতি জানিয়ে তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বিদায় নিয়ে ত্বরিত পদে চলে এলাম। লক্ষ্মীর মা-ও অনেক দূর পর্য্যন্ত এসেছিলেন। যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন বার বার নিষেধ পেয়ে তখন মনে হয়েছিল মাথা নুইয়ে প্রণাম করি। এই জিনিসটির উপর অন্তর চাইলে ভেদাভেদের বিচার আসতে চায় না। আমার মন বলে, যার ভেতরে প্রকৃত বস্তু আছে সেই প্রণম্য।

গাছ কাটার ব্যাপার নিয়ে কয়েক দিন যাওয়া-আসায় গোবিন্দদের সংগে এত বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এসে গেছল যে—তখন মনে হয়েছিল এদের ছেড়ে থাকা অসহ্য কষ্টকর হবে। লক্ষ্মীকে সত্যই নিজের ভাইঝির মত মনে হত।

একদিন সেখানে যাবার সময় দেখি লক্ষ্মীর মা একলা ঘরে আপন-ভাবে-বিভোর হয়ে গান করছে। মনে হল তাই লক্ষ্মী দু' তরফ থেকে এমন সুন্দর গলা পেয়েছে। খুব ভাল লাগছিল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই গান থামিয়ে আদর করে কাছে বসিয়ে বলল—একটি গান শোনাও তো ভাই! বল্লাম—তোমার ওই মিষ্টি গলার মিষ্টি গানের কাছে আমার গান তেঁতো লাগবে।

লক্ষ্মীর মা এর উত্তরে বলল, আহা—কিসে আর কিসে, তোমার মত সঙ্গীতজ্ঞ চাঁদের কাছে আমি জোনাকীও নই।

বল্‌লাম—বৌদি! কাগজের কারুকার্য্য করা ফুলের চেয়ে একটি বনফুলও উৎকৃষ্ট।

লক্ষীর মা তাড়াতাড়ি বল্‌ল খুব হয়েছে থাম! তোমাকে কথায় পারা যাবে না, এই গরীব গুলোকে বড্ড বেশী ভালবেসে ফেলেছ সত্যিই, কিন্তু তাই বলে তাদের অনুপযুক্ত প্রশংসার জয়ঢাক এত করে বাজিও না ভাই —বড় লজ্জা করে। এখন কেবল একটা অবস্থার কথা সর্বদা মনে আসে, —একবার যাত্রা শুনতে গেছলাম, পালা হচ্ছিল ধ্রুব চরিত্র, সুনীতির কোল থেকে রাত্রি বেলায় বালক ধ্রুব যখন ভগবানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল তখন আমি কেঁদে বাঁচি না,—এখন আবার চোখের জলে কেবল ভাবি আমার ধ্রুবদেওরটি কাজ শেষ হয়ে গেলে আর যখন আসবে না তখন কি করে মনকে ভুলিয়ে রাখব? এই কুঁড়েঘরের আঁধারে কেন তুমি এত আলো জেলে দিলে ভাই! বললে হয়ত খুব অপরাধ হবে তবুও না বলে পারছিনা— তোমাকে মনে হয় আমার প্রথম সন্তান।

একটু সামলে নিয়ে বল্‌লাম—বৌদি! সত্যই তুমি মাতৃসমা, আশা-করি আমার অভাব তোমাদের বেশীদিন স্থায়ী হবে না। কারণ তোমাদের অন্তরে ভগবান যে আলো জেলে দিয়েছেন তার একটু ক্ষীণরশ্মি আমি অন্তরে পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি, আশীর্ব্বাদ কর যেন এই রশ্মি ম্লান না হয়ে যায়,—আমার পথ প্রদর্শনে সহায়ক হয়। হঠাৎ কাণে এল সুমধুর গান, চেয়ে দেখি "তুমি কার কে তোমার কারে ভাবরে আপন…" এই গানটি গাইতে গাইতে গোবিন্দ বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করছে।

(৪২)

গোবিন্দদের সংগে,—

গাছ কাটা শেষ হবার পরও সময় পেলেই গোবিন্দদের কাছে চলে আসতাম। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেটা মোটেই পছন্দ করলেন না। তার কারণ গোবিন্দরা যে জাতি সেখানে আমার যাতায়াত শিক্ষাগুরুরই শুধু নয় তাঁদেরও মর্য্যাদার ক্ষতিকর, এই অভিমতই কাণে আসতে লাগল। সুতরাং মানুষের সামাজিক সংকীর্ণ ও নির্মম বিচার বুদ্ধি সেখানে আমার যাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছিল। জাতির বর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব, ধন, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা

এ গুলোই বড় প্রকৃত মানুষ বড় নয় যদি জাতিতে ছোট হয়। বিবেক বর্জিত এই নিয়ম এখনও আমরা মেনে চলি এটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্য হৃদয় দৈন্যতার।

গোবিন্দদের চির জীবনের মত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের সব কিছু গুণের মহিমা চিরতরের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে আছে।

আমার রচিত—'সঙ্গীত ও কাহিনী' গ্রন্থে লক্ষীর আদর্শ চরিত্র অঙ্কনের জন্য মনের তুলিতে যে রং সংগৃহীত হয়েছে তা ওই বাস্তব অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত অন্তর ভাণ্ডার থেকে পেয়েছি।

ওদের মত জাতির সংগে আমি বহু সময় বহু রকমে মিশে কেবল দেখেছি তাদের হৃদয়ে আবিলতা নেই। দুঃখ-কষ্টকে চিরসঙ্গী করেও ওরা থাকে আনন্দে। পরশ্রীকাতরতা কাকে বলে জানে না। নির্ভর করে থাকে শুধু সেই নির্বিকার ভগবানের উপর। আবহমান কাল হতে নির্বিবাদে ও নির্বিরোধে কেবল ওরা দেখে আসছে—ভগবান কেমন সুন্দর করে অন্যদের জন্য ধন, সুখ, ঐশ্বর্য্য, আরাম, বিলাস, পরিপাটি বাসগৃহ, প্রাসাদ, খ্যাতি-মান-যশ ইত্যাদি দিয়ে আসছেন। ওদের অবস্থার কথা ভাবলে—নিজের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয়। যাই হোক কিন্তু যতই আমরা হৃদয়হীনের মত ওদের উপেক্ষা করে চলি না কেন এবং বলি না কেন মুর্খ ছোট জাত, তত্রাচ ওদের কাছে একটা জিনিস খুবই শ্রেষ্ঠ হয়ে আছে—তা হল, ওরা মুখোস্ পরে না।

গোবিন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম—মাঝে মাঝে রাজবাড়ীতে এসে আমার সংগে দেখা করবার জন্য কিন্তু সে সবিনয়ে হাত জোড় করে বলেছিল—ভাই! আমি বড়লোক, শিক্ষিত বা ভদ্রলোকের কাছে যেতে খুব সঙ্কোচ বোধ করি, কারণ আমরা মূর্খ ও গরীব ছোট জাত বলে তাঁরা আমাদের অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য ভাবেন অর্থাৎ আমরা মানুষই নই এই তাঁদের মনভাব। কাজেই কিজন্য ভাই শুধু শুধু ওঁদের কাছে গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে মহা অপরাধীর মত দাঁড়াতে যাব? তাঁরা চিরকাল সবদিক দিয়ে বড় হয়ে থাকুন তাতে আমাদের দুঃখ নেই কিন্তু তাঁদের কাছে চিরকাল ছোট ও ঘৃণিত হয়ে থাকলেও নিজের অন্তরে যে বড় জিনিষটি আছে তাকে কেন ছোট করব ভাই? সে যে পরম পবিত্র এবং মহান ও শ্রেষ্ঠ।

গোবিন্দর কাছে মনুষ্যত্বের এরূপ বলিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠা মনের পরিচয় পেয়ে আরো গভীরভাবে তার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছল এবং বিরাট এক শিক্ষার বস্তু লাভ করেছিলাম।

ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং বাল্য থেকে যাত্রার দলে মহান মহান চরিত্রের উপাখ্যানগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখে দেখে এবং তার সংগে অভিনয়ে ধর্মসংগীত ও মানব শিক্ষামূলক গান গেয়ে গেয়ে গোবিন্দ নিজের মনকে এই সকলের শ্রেষ্ঠরসে পুষ্ট করে নিয়েছিল। তাই সবদিক দিয়েই তার চরিত্র গড়ে উঠেছিল বাস্তব ও উর্দ্ধমুখী হয়ে এবং তার প্রভাব স্ত্রী-কন্যার উপরও সমানে বর্তে গেছে। পরিবেশের গুণাগুণেই মানুষকে ভাল,—মন্দ করে।

আমার অভিজ্ঞতায় এইটুকুই বুঝেছি যে, মন যদি ঈশ্বরমুখী হয় তাহলে দুঃখ-কষ্ট এগুলো কল্যাণকরই হয়।

গোবিন্দদের কথা যখনই মনে পড়ে তখনই মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয় এবং তাদের মুর্ত্তিগুলির উদ্দেশ্যে মাথা নেমে আসে। সত্যকারের মানুষকে পেলে মনে হয় যেন এরাই ভগবানের প্রকৃত সন্তান।

আমার জীবনে এই ঘটনার অধ্যায়টি বিশেষভাবে স্মরণীয়, পবিত্র ও চিত্তাকর্ষক জ্ঞানে সমৃদ্ধ॥

(৪৩)

আর এক অভিজ্ঞতার পরিচয়,—

ভালাইভিহার থাকার সময় মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য গোরুর গাড়ীতে চড়ে দেশে আসতাম। তখনকার সেই সময়ের যাত্রাপথের দৃশ্যাবলী ও নানান রকমের চিত্তাকর্ষক স্মৃতির কথা মনে হয়ে গেলে মায়া মমতায় ঘেরা সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ এনে দেয়। রওনা হবার দিনে রাত্রে গান বাজনা সেরে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায় ১২টার সময় গোযানে চড়তাম। রাজাবাহাদুর প্রত্যেকবারই বাড়ীর জন্য গোটা দুই মর্ত্তমান কলার বড়কাঁদি, তরিতরকারী, খুব সরু ও সুগন্ধ চিঁড়ে এক বস্তা এবং আরো অন্যান্য জিনিসে গাড়ী ভরে দিতেন, অবশ্য আমার

কষ্ট হবে কিনা তা আগে জিজ্ঞেস করে নিতেন। কষ্টটা বরাবরই আমার যথেষ্ট গা' সওয়া,—সুতরাং ও কথাটার কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই।

গাড়ীর ভেতরে একটু জায়গা করে নিয়ে চিঁড়ের বস্তায় হেলান দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে যেতাম। মাঝে মাঝে শরীরটা আড়ষ্ট লাগছে মনে হলে—সোজা হয়ে বসে কোন একটা রাগের মূর্তিকে ধ্যানে এনে কণ্ঠে গড়ার কাজ সুরু করে দিতাম—নানানভাবে সুন্দর করে তুলবার জন্য। জংগলের মাঝে গভীর রাতে বেহাগের সুরকে প্রকাশ করার সময় মনে হত যেন এই রাগের ঠিক এই রকম স্থানেই জন্ম হয়েছিল—কোন পর্ণকুটীর বাসিনী বিরহিনীর কণ্ঠে আকুল-আবেগ নিয়ে। সে সময় তানসেন বিরচিত বেহাগ সুরের একটি ধ্রুপদ গান গাইতাম; তার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ,—"সাঁইতো না আয়ে আজ—আঁধিরাত মাঝ মাঝ—সিংহিনী জগায়ে সিংহ কানন পুকার। চন্দন ঘসত ঘসগয়ী নখ মেরা বাসনা না পুরত উনকো না নেহার......।" ভাবার্থ—স্বামী তো আজ এলেন না,—রাত্রি এখন দ্বিতীয় প্রহর, সিংহিনী সিংহকে জাগাবার জন্য কাননে হুঙ্কার ছাড়ছে। চন্দন ঘসে ঘসে আমার নখ ক্ষয়ে গেল, কিন্তু তাঁকে না দেখতে পেয়ে আমার বাসনা পূর্ণ হল না......।" রাগের স্বাভাবিক বা স্বভাবরূপ ধ্রুপদ গানের মধ্যে যেমনভাবে ধরতে পারা যায় তেমন মনে হয় অন্য শ্রেণীর গানে ধরা দেয় না। বিশেষ করে এইজন্য ধ্রুপদ গান শেখার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী বলেই আমি জানি। তারপর যেতে যেতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়তাম। পূর্বাকাশে যখন ভোরের শুভ্ররূপ ফুটে উঠত তখন গাড়ী এসে পৌঁছে যেত পাকা রাস্তার উপর এবং একটু পরেই জয়পণ্ডানদের বালুময় গর্ভে গাড়ি এসে যেত। বর্ষা ছাড়া এইসব নদ-নদীতে স্বচ্ছ জল সামান্য স্রোত নিয়ে বয়ে চলে। এই নদে গাড়ী দাঁড়করিয়ে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে তারপর গাড়ীর সংগে হাঁটতে সুরু করতাম। সেই সময়ের নানান দৃশ্য খুব আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর হত। দেখতাম, কৃষকেরা তখন লাঙ্গল, মই কিংবা কোদাল কাঁধে নিয়ে ঝুমুর গান গাইতে গাইতে মাঠের আইলের উপর দিয়ে যাচ্ছে, রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে চলেছে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে—পাহাড়ী রাগের কিয়ৎ অংশ প্রকাশ করতে করতে, গাছে গাছে পাখীরা কলরব তুলে যেন মানুষকে শয্যা ত্যাগ করার নির্দেশ জানাচ্ছে, কাঠ বা অন্য জিনিসে বোঝাই করা কতকগুলো গোগাড়ী লাইন দিয়ে চলেছে। কোন কোন ডোবার ধারে বকেরা বসে আছে মাছের ধ্যানে

কৃচ্ছসাধনার মত এক পায়ে ভর করে। তাদের সেই সংযম-নিষ্ঠার রূপ শিক্ষণীয় হয়ে থাকত। শিমুল-গাছের আগডালে বসে সাদা ঘুঘু পাখী ডাকত করুণ-আবেগ স্বরে খো-খো-চ্চ, খো-খো-চ্চ বলে, যেন তার সঙ্গীরা সঙ্গিনীকে জানাচ্ছে তুমি কোথায় আছ শীঘ্র মিলিত হও। পরক্ষণেই অল্প দূরের গাছ হতে একটি ওইরূপ ঘুঘু চাঁ-ই, চাঁ-ই (যাই-যাই) শব্দ তুলে উপস্থিত হওয়া মাত্র আগের ঘুঘুটির ডাক থেমে যেত। সেই বয়সেই আমার জ্ঞানে মনে হত সকলেরই কামনা কেবল যেন মিলনের জন্ত। সংগীতের প্রকাশরূপও যেন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মিলন কামনারই এক অভিব্যক্তি। মনে হয় এই যেন তার পরম সত্য এবং সংগীতকে এই অর্থে আনলেই তার যথার্থ অর্থ হয়, সে যেন জানাতে থাকে তার প্রকৃত সত্বা এইভাবে,—হে সাধক! আমাকে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য বুঝে যদি সেইভাবে ডাকতে পার তাহলে তোমার শূন্যস্থান পূর্ণ হবে অর্থাৎ তাঁর সহিত মিলিত হতে পারবে,—আমাকে নিয়ে থাকার অর্থ ও সার্থকতাই তাই।

তারপর ভোরের ফর্সাভাব কেটে যাবার সংগে সংগেই পূর্বদিগের সীমান্তরাল হতে তপনদেবের লোহিত বরণে উদত রূপের অপরূপ শোভা মনকে ভাবুলতায় আবিষ্ট করে দিত এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে মাথা নামিয়ে প্রণাম মন্ত্রে উচ্চারণ করতাম—"জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব-পাপঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকরং।"

এই সব মনহরণ দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হত জীবনটা যেন এই সকল স্বাভাবিক বস্তুই চায় এবং এতেই যেন মিশে থাকতে ভালবাসে। বাসে, মোটরে কিংবা ট্রেনে চেপে প্রাকৃতিক দৃশ্য বস্তুর এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার কিছু পরিচয় ও উপলব্ধিতে এলেও পায়ে হেঁটে পথ যাত্রার মত ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতে আসে না। তাছাড়া নিজের জ্ঞান এবং শিক্ষাতেও সে রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। গোরুর গাড়ীতে যাওয়া হেঁটে যাওয়ার মতই সব কিছু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আসে এবং তাতে অন্যগুলির মত চঞ্চল মন সৃষ্টি করে না। তখন গোরুর গাড়ীতে ও পা'এ হেঁটে যাতায়াত করে মনের ও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক পুষ্টিকর বস্তু লাভ করেছিলাম।

তারপর সেদিন কিছুক্ষণ হাঁটার পর 'তালডাংরা' নামক একটা নাম করা সদরের মত গ্রামের পাকা রাস্তার দু' পাশের একটা মুদির দোকানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রান্নার জিনিস সব কেনা হত। তার ফর্দ যথা,—আগেকার এক পয়সার একটা বড় মালশা ভাত রাঁধবার জন্য, ছ' পয়সার

পাঁচপো চাল, এক পয়সায় আধপো মসুর ডাল, আলু আধ পয়সায় আধপো', দেড় পয়সায় এক ছটাকের বেশী সরষের তেল, নুন-লঙ্কা আধ পয়সায়, গোরু দুটোর জন্য খৈল দু' সের চার পয়সায়, কুঁড়ো আট সের দু' পয়সায়, কাঠ দু' পয়সায়। অন্য এক দোকানে মুড়ি দু' পয়সায় তিন সের, (আমাদের দেশে চাল-ধান, মুড়ি ইত্যাদি বড় রকমের কাঠের বা পেতলের কুনকীতে করে মেপে দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলে। একটা কুন্‌কীর ভর্ত্তি চাল এক কে, জি, হয়, অবশ্য হালকা মুড়ি তিন কুনকীতেই মনে হয় এক কে, জি, হয়) এক পয়সায় ফুলোরি চারগণ্ডা এবং এক পয়সায় ভেলি গুড় আধপো, —এই সব জিনিসগুলি কিনে গাড়ীতে উঠতাম। তখন আমাদের দেশে চা' এর দোকান ছিল না।

তারপর বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় আমাদের যাত্রাপথের জংগলের মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তার ধারে একটি স্বচ্ছজলপূর্ণ পুষ্করিণীর কাছে গাড়ী দাঁড়করান হত, রান্না-খাওয়ার উপযুক্ত সুন্দর স্থান ভেবে।

গরু দুটো ছাড়া পেয়ে ধারে পাশের ঘাস খেতে থাকত। আমি মুড়ির একসেরি ঠোঙ্গাটা নিয়ে অন্যটা গাড়োয়ানকে দিতাম ফুলুরি ও গুড় সমেত। সে খেয়ে নিয়ে একটা গাছের তলায় ঢেলা দিয়ে উনুন তৈরি করে শুকন ডাল-পালা এনে আগুন ধরিয়ে দিলে পর আমি মালশাটাতে চাল ঢেলে নিয়ে পুকুরের জলে বেশ করে ধুয়ে সিদ্ধ হওয়ার আন্দাজ মত জল রেখে উনুনে চড়িয়ে দিতাম। তারপর শালপাতা দ্বারা বেশ বড় আকারের পানের খিলির মত করে মসুর ডালগুলো ধুয়ে তার মধ্যে ঢেলে দিয়ে কাটি দিয়ে মুখটা এঁটে মালশার মধ্যে ফেলে দিতাম, তার সংগে আলুও। খানিকবাদে সারথিকে বলতাম আমি নাইতে যাচ্ছি দেখবে উনুনটা না নিভে যায়—ভাল করে জ্বাল দেবে। আমি বামুন বলে উনুনটা ছুঁতে ইতস্ততঃ করলে ধমক দিয়ে বলতাম—তাতে দোষ নেই, কারোরই জাত যায় না—যদি কাউকে ঘৃণা না করে।

ঘাটের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে তেল মেখে সুন্দর স্বচ্ছ জলে নেয়ে নিয়ে এসে দেখতাম ভাত হয়ে গেছে। গাড়োয়ান শালপাতা তুলে কাটি দিয়ে দুটো বড় আকারের পাতা তৈরি করে রেখে দিত। তার একটাতে ভাত কিছু কম নিয়ে আর একটা পাতায় গাড়োয়ানের জন্য বেশী দিতাম। আমারটার পরিমাপ আধ সের চালের কম হত না। তারপর ভাতে দেওয়া জিনিসে নুন-তেল-লঙ্কা মেখে নিয়ে একটা খড়ের আটিকে

আসন করে—শিশিতে আনা খানিকটা গাওয়া ঘি গরম ভাতে ঢেলে দিয়ে পরম তৃপ্তি করে খাওয়া সমাধা করতাম। সেই মনোরম তপোবনের মত স্থানে প্রকৃতির কোলে বসে আহারের কথা যখন স্মরণে আসে তখন মনকে সেখানে টেনে নিয়ে যায় সেই রকমভাবে রান্না করে খাওয়ার জন্য ও তৃপ্তি পাওয়ার জন্য। খেতে খেতে যদি জংগলের গাছে বসা পাখীদের সুকণ্ঠ কাণে আসতে থাকে তাহলে সে খাওয়ার যে কত সুখ তা বলে বুঝান যায় না। যেখানে যেখানে প্রকৃতির সত্যকারের লীলাভূমি সেখানে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ আসার সৌভাগ্য এলে মনের পুষ্টিসাধনে প্রভূত সহায়ক হয়। তাছাড়া আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি সংগীতের অনেক বিষয়ের তথ্য সম্বলিত সত্যের সন্ধানও বিশেষ করে পাওয়া যায় এইসব পরিবেশের মধ্যে।

গাড়োয়ানের খাওয়া হয়ে গেলে সে গরু দুটোকে খৈল-কুড়ো খাইয়ে নিতো, তারপর পড়তি বেলার মুখে গাড়ী চলতে সুরু করত ঢিলে ভালে টুক্-টুক্ করে। গরুকে ঠেঙ্গিয়ে চালান একেবারে নিষেধ করা থাকত। যেতে যেতে যে সব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হত তাতে মনে হত এইসব জায়গার বেশীর ভাগই যেন প্রকৃতির বৈরাগ্যবিধুর রূপ এবং এও মনে হত—সাধু-সন্ন্যাসীদের তপস্যাগত আত্মা যেন এই রকম তাপসরূপের মধ্যে সময় সময় বিচরণ করতে আসে। সেই সময়ের নির্বাচিত রাগরূপ কণ্ঠে প্রকাশ করে মনে ভাব-ভক্তি এসে যেত,—অনুভব করতে পারতাম—প্রকৃতির সংগে তাদের মিলন সম্বন্ধ সত্যই কত ঘনিষ্ঠ। এইভাবে কত মাঠ, গ্রাম, জংগল ইত্যাদি অতিক্রম করে যখন কতকটা রাত হয়ে আসত তখন ওন্দা নামক একটা ছোট সহরের মত স্থানে গাড়ী পৌঁছে যেত। সেখানের দোকানে মুড়ি-মিষ্টি কিনে উভয়ে খেয়ে নিয়ে আমি চিঁড়ের বস্তায় হেলান দিয়ে পরে ঘুমিয়ে পড়তাম। ভোরের সময় গাড়ী এসে থামত বাড়ীর সদর দরজার সামনে। নেমে পড়ে ৺গোপীনাথকে প্রণাম করে দরজার কাছে মা' বলে ডাকতেই এক ডাকেই মা দরজা খুলে দিতেন,—তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বাড়ী ঢুকতাম। গাড়ীটাকে দিনদুই রেখে দিয়ে তারপর ভেলাইডিহায় ফিরে আসতাম।

(৪৪)

বড় রকম বিবাহের বরযাত্রী হয়ে,—

ভেলাইডিহায় থাকার দু'বছরের মুখে সিমলাপাল রাজার বড় ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে ফাল্গুন মাসে বরযাত্রীরূপে রাজাবাহাদুর ও তাঁর পরিবার-বর্গের সংগে আমাকেও যেতে হল পাত্রীর পিত্রালয় ঝাড়বাগ্দা গ্রামে। দূরত্ব প্রায় বত্রিশ মাইল। আগে মনে হয় জানিয়েছি সিমলাপাল ভালাইডিহার রাজবংশেই বড় শাখা। জমীদারী বণ্টনের সময় সিমলাপালের অংশে যায় দশ আনা ভাগ। এইজন্য এই দুই রাজার অংশ সম্পর্ক ধরে লোকে বলে আসছে দশ আনি,—ছ'আনির রাজা।

আমরা ওই বিবাহে রওনা হলাম আগের রাত্রে। পাত্রীর দেশের নিকটস্থ কংসাবতী নদীর তীরভূমির বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে বর ও বরযাত্রীদের যাত্রা বিরতির স্থান নির্ণীত হয়েছিল। আমরা প্রাতঃকালে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম—বরযাত্রী ইত্যাদি মিলে প্রায় চারশ' লোকের সমাগম হয়েছে, যেন মেলা বসার মত।

বরকর্ত্তা রাজাবাহাদুর ও তাঁর প্রধানেরা আমাদের সমাদরে নিয়ে গেলেন বিশ্রামের স্থানে। একটু পরেই এল বৃহৎ পাত্রে করে আয়োজনের প্রাচুর্য্য নিয়ে জলযোগের নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য।

আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন দেশ বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, জনপ্রিয় গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ।

সিমলাপালের রাজবংশের এঁরা বংশপরম্পরায় দীক্ষাগুরুর পদে বরিত হয়ে এসেছেন। এই বংশের সকলেই শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি খুব অনুরাগী। সুতরাং দুই দিক দিয়েই এঁদের সম্মান উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

বেলা ৯টায় সময় গানের আসর বস্‌ল। বড় বড় পলাশ, মহুয়া ও বটগাছের ছায়াতলে বিছান কার্পেটের উপর সকলে উপবিষ্ট হলেন। নদী তীরের উপর উন্মুক্ত স্থানে এ রকম স্বাভাবিক পরিবেশে গানের আসর সেই প্রথম ও এখন পর্য্যন্ত শেষ।

প্রথমে গাইলেন গোসাঁইজী, তারপর জ্ঞানেন্দ্র এবং সব শেষে আমার গান হল। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে গান চলেছিল। সকলেই আগাগোড়া

নির্বাক হয়ে শুনেছিলেন।

তখন আসরে যাঁরা উপস্থিত হতেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই স্বভাবগত শিষ্টাচার বোধ দেখা যেত। কোন বড় বস্তু বুঝতে না পারলেও সংযম নীতিবোধ নিয়ে তার সম্মান যে রেখে যেতে হয় সে কথা কেউ বিস্মৃত হতেন না।

তারপর বেলা প্রায় দু'টোর সময় অন্ন-আহারে বসা হল। আয়োজনের প্রাচুর্য্যের কথা বিশেষ বলাই বাহুল্য। বিকেলে বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে বরের সংগে অনুগমন করা হল কন্যাকর্ত্তার গৃহাভিমুখে। রাত ৭টার সময় সেখানে আমরা পৌঁছে গেলাম। কন্যাকর্ত্তা এবং আরো অনেকে সরল গ্রাম্য হৃদয়ের আন্তরিকতায় বিনয়নম্র সহকারে অভ্যর্থনা ও নমস্কার জ্ঞাপন করে হাত দুটি যুক্ত রেখে সামনের দিকে পশ্চাৎ হয়ে সকলকে সভামণ্ডপে বরাসনের জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালেন ফরাসের উপর। দুই পক্ষের ইংরেজী বেণ্ডবাদ্য, হলেণ্ডের ব্যাগপাইপ বাদ্য এবং দেশীয় সানাই ইত্যাদি বাদ্যের তুমুল রবে চতুর্দিকের আবহাওয়া ভরে গেল। বরযাত্রীদের জন্য কয়েকশ' কাঁসার বড় রেকাবিতে বিবিধ মিষ্টান্ন ও ফলে ভর্ত্তি হয়ে এল বহুলোকের মাধ্যমে এবং তার সংগে এক গ্লাস করে সুগন্ধিযুক্ত ঘোলের সরবত্। খাবার জল ও সরবত্ কাঁসার গেলাসে করেই এসেছিল। এই রকম ব্যাপারে এত সংখ্যক কাঁসার রেকাবি ও গেলাস আজ পর্য্যন্ত আমি কোথাও দেখিনি। নূতনবাজারে (কলিকাতা) অতগুলো বাসনের দোকানেও বোধ হয় এক সংগে পাওয়া যাবে না। তখন বর্ণশ্রেষ্ঠ আচারবিদ্ মানুষরা কাঁচের জিনিস ব্যবহার করত না।

বেশী রাত্রে বিয়ের লগ্ন তাই সকলের অনুরোধে গানের আসর বসল। সকালের মতই আমার শেষে গান হল। গোঁসাইজী আমার গান শুনে দু' বেলাই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে আশীর্বাদ মহাসৌভাগ্যের মত অন্তরে ভরে আছে।

গোঁসাইজীর গানের পরিচয়ে ছিল অপূর্ব ভরাট-রসাল কণ্ঠের সংগে রাগ-রূপের উপর আবেগময় সাত্ত্বিক রচনা, মুদ্রাদোষ শূন্যতা এবং স্বহস্তে তানপুরা বাদন।

গোঁসাইজীর ধ্রুপদ-খেয়ালে যথেষ্ট দখল ছাড়াও বাংলা খেয়াল এবং দেব-দেবী বিষয়ক গানের উপরও দখলশক্তি ছিল দরদ সমৃদ্ধ হয়ে। অধিকাংশ আসরে শ্রোতাদের অনুরোধে শেষের দুই শ্রেণীর গানও পরম

আগ্রহ নিয়ে শুনাতেন। তার আকর্ষণ শ্রোতাদের কাছে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এর মত হত।

এই রকমই সাত্ত্বিক পদ্ধতির উপর এবং ওই সব শ্রেণীর গানে যথেষ্ট অধিকার রেখে আমার গুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং আমার পিতা প্রভৃতি গাইতেন। এই ভাবধারাই তখন গায়কদের মধ্যে বেশী ছিল বাঙালী গায়কদের।

আমাদের দেশের প্রথানুযায়ী বিবাহে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে বর ও বরযাত্রী প্রভৃতি সকলকেই বিবাহের পরের দিনে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশী থাকা হত। বিবাহের পরের দিনই বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের মত ঘটা থাকে এবং তার সংগে প্রধান হয়ে থাকে আগেকার এক আইন-গত সামাজিক নিয়ম। যথা,—প্রাতঃকালে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাতে বরযাত্রীদের উপস্থিতির সাক্ষ্য ও মান্যস্বরূপ একটি আধারে করে তাম্বুল ও অর্থ দিয়ে তাঁদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জাতিত্বের নির্মলতা ও তার কৌলীন্য রক্ষার নিমিত্তই এই প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। তারপর মধ্যাহ্নে অন্নগ্রহণ করা, এর মধ্যেও থাকে ওই একই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অন্নভক্ষণ করে গেলে ভবিষ্যতে কন্যাপক্ষের জাতিত্ব নিয়ে কোন শত্রুতামূলক আচরণ থাকবে না। এখন এইসব বাঁধা-ধরা নিয়ম শিথিল হয়ে গেছে।

একদিন বেশী থাকার আর একটা কারণও ছিল। তখন গো-গাড়ীর মত মন্থর যানবাহনে এবং পদব্রজে বহু দূর দূরান্তরের গ্রামে বিবাহ দিতে যেতে হত পাত্রপক্ষকে। এজন্য একদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হত।

বিবাহের পরের দিন সকাল থেকে মধ্যাহ্নের আহার সময় পর্য্যন্ত নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া এবং বর ও কন্যাপক্ষের ঢুলি সম্প্রদায়রা তাদের সাধনা কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করল। এক এক ঢুলিদার এমন সমস্ত দুরূহ ছন্দ এবং পাখোওয়াজের ও তব্‌লার ঠেকা ধরে বোল-পরন ও তেহাই শুনাতে লাগল যে, মনে হচ্ছিল কতকাল ধরে তাদের গুরুমুখি শিক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু আসলে বিশেষ তা নয়, বংশধারাগত বুদ্ধি-প্রতিভায় তারা সাধনাকেই মূল সম্পদ করে নিয়ে এত বড় কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে এসেছে। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি! এদের বংশের যে ব্যক্তি প্রথম এইসব বাদ্যে অধিকার লাভ করেছিল সেও কি গুরুমুখি হয়নি? তা কখনও কি সম্ভব? নিশ্চয়ই শিখেছিল। তাহলে প্রশ্ন আসে সেই

শিক্ষাগুরু কি সত্যই ঢুলিদের জাতি ছিল, না কোন রাজদরবারের তিনি গুণী বাদ্যবিদ্ ছিলেন ?

এই প্রশ্নের সত্য নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, কারণ প্রকৃতির প্রভাব-শক্তিতে কিভাবে কোন্ বস্তুর জন্মলাভ হয় তা বলা খুবই শক্ত। তবে মল্লভূমের সঙ্গীত ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধান করে আমার মনে হয় এদের আদি গুরু মল্লরাজ দরবারের কোন বাদ্যবিদের কাছেই শিক্ষালাভ হয়েছিল। কারণ ধরে বলা যায়,—পাখোওয়াজ ও তব্লার বিভিন্ন প্রকারের মাত্রাসমষ্টি নিয়ে বিভিন্ন তালের ঠেকা 'ছন্দমঞ্জরী'র প্রাচীনগ্রন্থ থেকে ছন্দের শ্লোক ধরে তৈরি হয়েছিল। আদি জাতিদের স্বভাবগত নৃত্যের ও বাদ্যের মাধ্যমে যে একটি তাল পাই তাতে থাকে নর্তক ও নর্তকীদের দেহ আন্দোলিত ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে উৎপন্ন এক মাত্রার বিরতি দিয়ে মোট চার মাত্রার এক প্রকার তাল; যথা—¹ তি¹না ধা¹ধিগ্ ধি¹না। বিরতির স্থানটিই 'সম' তালের মত এবং তৃতীয় মাত্রার অক্ষরের উপর ছন্দের ঢেউটি ফাঁক তালের মত। এর এই দু'টি তালের উপরই দু'দিকে দেহ আন্দোলিত হতে থাকে। সুতরাং প্রমাণ সূত্রে দেখা যাচ্ছে সেদিন সেইসব বাদ্যকারের বাদ্যে চৌতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, তেওট (ঝুম্রা) প্রভৃতি তালের যে সব ক্রিয়াপ্রকরণ প্রকাশ পেয়েছিল তা বিশেষ-ভাবে গুরুমুখি ধারারই নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন ধারণার অবকাশ থাকছে না। এইসব পরিচয়ের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়ে আছে মল্লভূমে শাস্ত্রীয় গীত-বাদ্যের এক বিরাট প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা,—যার বিস্তৃত প্রভাব শক্তির মধ্যে দিয়ে এই জাতিদের বংশধারাতেও তার স্পষ্টরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তাদের অনেকে সাধনার দ্বারা শিল্পীরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আমার সেই বয়সেও দেশের নানান জায়গায় অনেককে এই রকম গুণ-বিশিষ্ট গীত-বাদ্যে অধিকারীরূপে দেখেছিলাম। পূর্বে আমাদের দেশে তারের যন্ত্রের মধ্যে তাউস্‌বাদ্যের প্রচলন খুবই বেড়েছিল। উর্দু ভাষায় ময়ূরকে তাউস্ বলে। দিল্লীর সম্রাটের বসবার আধারটির নাম ছিল 'তক্তাউস' অর্থাৎ ময়ূরাসন বসার আধারকে বলে 'তক্ত'। আমাদের দেশে বলে 'তক্তা'।

তাউস যন্ত্রটি দেখতে যেন ময়ূর পেখম নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন ঢুলিদার বাদকদের সংগে গৎএ মহড়া রাখবার জন্য তাউস যন্ত্রই ছিল প্রধান হয়ে। এই জাতিদের সেদিন সেই বিবাহ ক্ষেত্রে একজন

খঞ্জনী বাদক তার সাধনার যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাতে সকলকেই অবাক ও আশ্চর্য্য করে দিয়েছিল। খঞ্জনীবাদক তাউসের গৎএর সংগে প্রথমতঃ একটি খঞ্জনী নিয়ে সংগতে তৈরির ক্রিয়া দেখাতে দেখাতে তারপর দু'টো খঞ্জনী নিয়ে তালের ছন্দ খেলা দেখাতে লাগল,—ক্রমশঃ পাঁচটা খঞ্জনী নিয়ে লুফালুফি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত দিতে দিতে ছন্দ তালের খেলা দেখিয়ে গেল,—যেন ম্যাজিকের মত। তারপর এক একটাকে কমিয়ে কমিয়ে শেষেরটাতে বোল-পরম ও তেহাই দিয়ে গৎ এর 'সমে' শেষ করল।

এইরূপ খঞ্জনীবাদকের বাদন ক্রিয়া ওর আগেও আমি আমাদের দেশে ওই শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এই রকম বাদক এখন বোধ হয় আর কেউ নেই। কি করে থাকবে? সব অনুষ্ঠানেই এখন মাইকের রাক্ষসী চিৎকার চলেছে এবং ইংরেজী পেটার্ণের বাদ্য। সংগীত ও বাদ্যবিদ্যার এবং নানান শিল্প ও অন্যান্য শিক্ষাবস্তুর সাধনায় পূর্বে মানুষের মধ্যে যে নিষ্ঠা, সংযম ও তপস্যার মত একাগ্রতা ছিল তার কথা যখন ভাবি তখন এই কথাই মনে হয়—দেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার—এমন কী সাধারণ স্তরের মানুষদেরও চর্চারত ব্যক্তিদের উৎসাহ ও সববিধ সাহায্যে কত কর্ত্তব্যবোধ ছিল গভীর অনুরাগ নিয়ে এবং কত রকমভাবে কত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে সংযুক্ত করে এদের প্রতিপালন করে এসেছিলেন —যার ফলে এত বিভিন্নতা নিয়ে শিল্পী তৈরি হয়েছিল।

সেই বিবাহ ক্ষেত্রের আর একটু পরিচয় দেবার মত আছে,— বিকেলে এক ঘেরা ময়দানে ফরিখেল্ খেলা দেখতে যাওয়া হল। হরিজন শ্রেণীরই এক সম্প্রদায়দের নানারকম শক্তি চর্চার অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শনকে 'ফরিখেল' বলে। এই কথার ভাষাগত অর্থ কি তা ঠিক জানা নাই। তবে মনে হয় এটি উর্দু কথা। বোধ হয় উর্দুতে 'ফরি' কে ব্যায়ামের অর্থে ব্যবহার হয়।

তখন মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও বিবাহ যাত্রায় ফরিখেল্ দলকে সংগে নিয়ে যেত। এই নিয়ে যাওয়ার দুটো উদ্দেশ্য থাকত, এক হচ্ছে যাত্রাপথের নিরাপদের জন্য—কারণ তখন পথে ডাকাতির ভয় ছিল। দুই হচ্ছে এদের ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখিয়ে কন্যার দেশের লোকজনদের আনন্দ দেওয়া এবং নিজেদের দেশে বিবিধ বিষয়ের চর্চা ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা যে আছে তার পরিচয় প্রদান করা। এ জন্য তখন বরকর্ত্তারা সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত ও দাবার খেলোয়াড় প্রভৃতি সংগে নিয়ে যেতেন তাঁদের যথাযথ

মর্য্যাদা দিয়ে। কন্যাকর্তারাও অনুরূপ ব্যবস্থা রাখতেন।

এর দ্বারা দুই পক্ষের মানুষরা উপলব্ধি করতে পারতেন এই সব চর্চায় উভয় দেশ কতখানি উৎকর্ষতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি লাভ করেছে। কুস্তিখেল খেলোয়াড়দের দেহের পেশীযুক্ত গঠন যেন লৌহ সদৃশ-ভীমকায় মূর্ত্তির মত মনে হত। প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘ দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের চারদিকে ফিতের মত করে বাঁধা কাপড়ের ছেঁড়া লালপাড়, গলায় কালসুতোর সাদা মাদুলী বাঁধা, দু' হাতের বাহুতে কাঁসার গোল তাগা, হাঁটুর উপর মালকোচ্ছা করে খাটো কাপড় পরা এবং হাতে বাঁশের মোটা লম্বা লাঠি— এই ছিল তাদের পরিচয় স্বরূপ। দল বেঁধে একসংগে যখন লাঠি ঘুরিয়ে লাফাতে লাফাতে গলায় একটা কি রকম ডমরু বাদ্যের মত আওয়াজ বের করত তখন মনে হত এরা এক্ষুণি একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। ভয়ও হত আবার গর্বও আসত তাদের ওই সামগ্রিক দৃশ্য দেখে। এদের খেলা দেখে মনে হত সার্কাসের চেয়েও আরো উচ্চ স্তরের। ক্রীড়া ও শক্তিচর্চার সাধনায় এই সব কৃতবিদ গোষ্ঠী এখন একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। শরীর ও স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে অদ্ভুত অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখানর আগ্রহ তখন প্রায় অধিকাংশ পল্লীযুবকদের মধ্যেও ছিল—বিশেষ করে বৈশ্য ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাজীপুড়ানর মধ্যে দিয়ে রোশনাই এর নানান রঙীন চিত্র এবং অদ্ভুত অদ্ভুত প্রদর্শনী দেখে অবাক হয়ে গেছলাম। রণতরীর যুদ্ধ, আকাশের যুদ্ধ ইত্যাদি কত কি যে দেখেছিলাম তা আশ্চর্য্যের সহিত মনে গেঁথে আছে। রোশনাই দেখানর এত বড় বিরাট আয়োজন আমি আর কোথাও দেখিনি। প্রাচীন খান্দানী প্রথায় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবধারায় এই রকম জমকাল ও বিরাট ব্যয়বহুল বিবাহ দেখার মধ্যে পাওয়া যায় নানাবিধ অভিজ্ঞতার মূল্যবান বস্তুর সন্ধান ও পরিচয়। এখানে খাবার আয়োজনে দেখেছিলাম- মাছ, দৈ, ক্ষীর, সন্দেশ ও মেঠাই এর যেন ছড়াছড়ি। মধ্যাহ্নের আহারে সব রকম শ্রেণীর লোকসংখ্যা এত বেশী ছিল, যা দেখে অবাক লেগে গেছল। শ্রেণীগত খাওয়ানর তারতম্য ছিলনা।

বিবাহ উপলক্ষ্যে এই রকম আয়োজনের ঘটা এখন গল্প হয়ে দাঁড়াল।

ভবিষ্যৎ বংশধররা অবাক হয়ে যাবে বা হয়ত বিশ্বাসও করবে না শুনে যে, আমাদের বাল্য জীবনেও ছিল—বড় মাছ দু' আনা সের, টাকায় ষোল সের চাল, দুধ ছিল টাকায় বার সের, ঘি ছিল এক টাকা সের, গরু দিয়ে পেশাই কাঠের ঘানির সরষের তেল ছিল চার আনায় এক সের। খাঁটি ঘি'এর লুচি, জিলেপী, অমৃতি ও পানতোয়া ছিল চার আনা সের, ভাল কাপড় একখানার দাম ছিল বার আনা। ইংরেজ আমলের শেষেও জিনিসপত্রের দাম যেরূপ সস্তা ছিল তার পরিচয় দিলেও এখন কেবল আফসোস্ হবে। সেই কন্যাপক্ষের সেখান থেকে সদলবলে পাত্র-পাত্রীর সংগে আমাদেরও সিমলাপাল রাজবাটিতে আসতে হয়েছিল। ওখানের রাজাবাহাদুর আমাদের সংগেই ছিলেন তিনি অতি সমাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার হল ঘরে। তাঁর বিশেষ আগ্রহে ওখানে আমাদের দু'দিন থাকতে হল। এখানেও বিবিধ আয়োজনের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার বিপুল ব্যবস্থা তো ছিলই তাছাড়া গান-বাজনা, বাঈনাচ, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি নির্ঘণ্ট মত দিবা রাত্রি চলেছিল। তৃতীয় দিনের সকালে আমরা স্বস্থানে ফিরে এলাম।

(৪৫)

কাঠের গাড়ীতে,—

ভেলাইডিহার রাজা ও ছাত্ররা গানে এবং সেতার বাদনে বেশ অগ্রসর হতে লাগলেন। শিক্ষা ও সাধনায় খুব নিষ্ঠা ছিল তাই সময়ের পরিমাপের চেয়ে বেশী উন্নতি এসেছিল। বিবাহ উৎসব থেকে ফিরে এসেই রাজাবাহাদুর সেই গাছটিকে খণ্ডাকারে কাটিয়ে আনালেন এবং মিস্ত্রি দিয়ে বাড়ীর মাপ মত কড়ি, জানালা, দরজা এবং আলমারির ফ্রেম তৈরি করিয়ে দিলেন। হিসাব মত কাঠের একখণ্ড রইল বরগার জন্য।

তৈরি জিনিসগুলো কিছুদিন ধরে মাটিতে পড়ে থাকা দেখে দেশে পাঠাবার জন্য রাজাবাহাদুরকে একদিন স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনিও বুঝলেন এতদিন ফেলে রাখা ঠিক হয়নি। খাস্ চাকরকে বলে দিলেন নিকটের ওই

সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে মোষের গাড়ীর ব্যবস্থা করে আসতে। দু'চার দিনের মধ্যেও চাকরটার সময় না হয়ে উঠায় এবং গড়িমসি দেখে আমি একদিন জোর করেই নিয়ে গেলাম সেই সাঁওতাল গ্রামে। সেদিন রাজাবাহাদুর অসুস্থ ছিলেন বলে বেরোন নি। সেই গ্রামে যখন পৌছলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। সাঁওতালদের মোড়ল তখন বাড়ীতে ছিল না, তার আসার অপেক্ষায় আমাদের বসে থাকতে হল। ইত্যবসরে হঠাৎ মেঘ করে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। সাঁওতালদের মোড়ল বাড়ীতে আসতেই তাকে আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানাতে সে বলল—কাল সকালে রাজবাড়ী যেয়ে দেখে আসব ক'খানা গাড়ী লাগবে।

তখন একটু রাত হয়েছে এবং টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে,—তার উপর অন্ধকার। দিনের আভা থাকতেই আমাদের ফিরবার কথা, তাই হ্যারিকেন নেওয়া হয়নি। ধান ক্ষেতের মাঝের আইলের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। বেশ বুঝলাম বৃষ্টিতে এঁটেল মাটি দারুণ পিচল্ হয়ে গেছে, চলা দুঃসাধ্য হবে। সাঁওতালরা কেউ সংগে আসতে পারল না—কারণ মোওয়ামদের নেশায় তাদের তখন অবস্থা একেবারেই অনড় ছিল। জমির আইলের পার্শ্ব গর্তে সে সময় কেউটে সাপরা বাস করে, তাদের একমাত্র খাদ্য বেঙকে সহজে পায় বলে।

ফিরতেই হবে,—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে সর্পভীতি নিয়েই চলতে সুরু করা গেল অতি সন্তর্পণে বিদ্যুতের আলো ধরে পথ নির্ণয় করতে করতে এবং চাকরের জানা পথের আন্দাজ মত। একটু গিয়েই আইলের উপর কাদায় পা' পিছলে গিয়ে দারুণভাবে আছাড় খেয়ে পড়ে যেতেই সংগে সংগে লম্বামত একটি জীব সর্ সর্ করে ধানের গাছের পাশ দিয়ে চলে গেল। আইলের উপর দিয়ে চলার সময় চাকরটি আমার হাত শক্ত করে যে ধরবে তারও উপায় নাই। তারও পা' পিছলে যেতে লাগল। তত্রাচ সে আমার কোমরের দিকের কাপড়টা শক্ত করে ধরে রইল। একটু পরে এই অবস্থাতে সেও আমার জন্যই আছাড় খেল আমারই উপর। দুটো একসংগের এই স্বাদ কি সাংঘাতিক যে হয়েছিল তা কি আর বলব! তারপর থেকে নিজেই অতিকষ্টে চলতে লাগলাম এবং আরো তিন-চার বার আছাড় খেয়ে কোন রকমে সে যাত্রা বেঁচে নদীতে এসে পড়া গেল। সেই জলে সমস্ত শরীর ভাল করে ধুয়ে স্বস্থানে পৌছে দেখি—শরীরের

বহু জায়গায় ছড়ে গিয়ে রক্ত মুখো হয়ে আছে। সটান শুয়ে পড়লাম। চার-পাঁচদিন সমস্ত শরীরে অসম্ভব ব্যথা ছিল। কিন্তু কাউকেই এই অবস্থার কথা জানান হয়নি, রাজাবাহাদুরের কাণে গেলে চাকরকে ভীষণ ভৎ র্সনা করতেন এবং আমার জন্য সবাই খুব দুঃখ পেত।

সেদিন যে কি অবর্ণনীয় কষ্ট হয়েছিল তা একমাত্র সেই চাকরটিই জেনে ছিল আর হয়ত ভগবান।

বাল্যকাল থেকে সংসারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে বড় ভেবে নিজ উপার্জনের অর্থে দেশের পুরাণ জীর্ণ বসত বাড়ীকে ভেঙ্গে দালান বাড়ী করা ইত্যাদি, বহু অর্থ দিয়ে দাদামশায়ের সম্পত্তি রক্ষা করা। এর কারণে ছিল—তাঁর মৃত্যুর পর বিরাট আড়ম্বরের সহিত শ্রদ্ধাদি কার্য্য করার জেদ এসেছিল দিদিমা ও মায়ের। তাঁরা বলেছিলেন—মৃতের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করেও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ এবং থানার সমগ্র গ্রামের ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে হবে। দাদামশায়ের ক্ষুদ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আমরা দু' ভাই হয়ে পড়ায় আমি চিন্তা করে দেখলাম গ্রামের লোকদের বলবার কেন সুযোগ দেবো—আমরা দাদা মহাশয়ের সম্পত্তি ভোগ করছি। তার চেয়ে শ্রাদ্ধের জন্য সমস্ত টাকা দিয়ে ক্রয় করে নেওয়ার মতই তাকে রক্ষা করেছিলাম। সব টাকাটাই আমাকেই দিতে হয়েছিল। দিদিমার শ্রাদ্ধের ব্যাপারেও আমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব আসে এবং এ রকমভাবে সমস্ত ব্যাপারেও। দীর্ঘকাল ধরে অগ্রজের নাম যুক্তকরে বিষয় সম্পত্তি বাড়ী ঘর ইত্যাদি করানর জন্য যে পরিশ্রম যে দুঃখ কষ্ট পেতে হয়েছে করার নেশায় তা শেষ পর্য্যন্ত টিকে রইল না। সেটাই বেশী দুঃখ। আর সবচেয়ে বেশী দুঃখ ও হতাশা স্বীকৃতির অবমাননা ও নির্মম অবিচার॥

পরের দিন সাঁওতালদের গ্রামের সেই মোড়ল ও তাদের আরো দু' চারজন এসে কাঠের সমস্ত জিনিস দেখে বলল সাতটা গাড়ী লাগবে। রাজাবাহাদুর তাদের ভাড়া ও যাতায়াত রাস্তা খরচ দিয়ে জানিয়ে দিলেন বিকেলে এসে কাঠ যেন গাড়ীতে তুলে নেয়।

তারা ঠিক সময়ে এসে গাড়ী বোঝাই করে বলল—গাড়ীগুলো আমরা নিয়ে যাচ্ছি—রাতে খাওয়া সেরে রওনা হব—কেউ যেন আগে থাকতে বিষ্ণুপুরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে—পরশু খুব সকালে। রাজাবাহাদুর বললেন, আপনিই কি যাবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন? তাহলে কাল সকালে জল খেয়ে নিয়ে আমার সাইকেলে চড়েই যাবেন।

পরের দিন সকালে সাইকেলে চড়ে রওনা হলাম। পাকা রাস্তায় কিছুটা পথ যেতেই কাঠের গাড়ীগুলোকে পেছনে রেখে সাইকেল হাওয়ার মত ছুটতে লাগল। যেতে যেতে হঠাৎ একটা জংগলের শেষ প্রান্তে সাইকেলের ডানদিকের প্যাডেলটা খুলে পড়ে গেল। সেটাকে তুলে নিয়ে কোন রকমে বাঁদিকের প্যাডেল ঘুরিয়ে কতকটা যাবার পর বাম পার্শ্বে একটা গ্রামের কাছে নেমে পড়ে তার সামনের আম-কাঁঠালের ছোট বাগানের একটা গাছে সাইকেলটা ঠেসিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছতে লাগলাম। গ্রামটির সামগ্রিক রূপ বেশ স্বভাব শোভাময় ছিল। কতকগুলি মাটির দেওয়ালযুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ীর উপর নূতন খড়ের ছাউনীকে যেন সোনালী রং-এ মুড়ে দেওয়ার মত সুন্দর দেখাচ্ছিল। খড়ি ও মাঠের শুভ্রমাটি দিয়ে চতুর্দিকে লেপন করে দেওয়া এবং প্রত্যেকটির দরজার মাথায় ও দু'পাশে গিরিমাটি ও সিঁদুর দিয়ে মাঙ্গলিক চিহ্নগুলির শিল্পসুলভরূপ যেন পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। এই রকম গৃহ চোখে পড়লে বেশ একটা ভাবভক্তি আসে। গৃহাঙ্গনের মধ্যস্থলে ধানের মরাইকে দেখে মনে হয় যেন মানুষের পরিশ্রমলব্ধ এই মূর্ত্তি অন্নপূর্ণার মহাকৃপায় সার্থক করেছে। আমার মনে হয় মরাইগুলি যেন বলে—ওরে তোরা প্রত্যেকে মা লক্ষ্মীকে পাবার কামনায় এই রকম পবিত্ররূপ ও বস্তুকে ঘরে আনার চেষ্টা কর। ঘরে যদি ধান্য দর্শন করতে পারিস তাহলে তার সোনার রং তোদের অন্তরে প্রতিফলিত হতে পারবে। টাকার নোট ওতো দাহ্যবস্তু, ওর প্রাচুর্য্য নিয়ে আসে শুধু গর্ব, মনের সরলতা ও কোমলতাকে দগ্ধই করে। কিন্তু কোন বনেদীগৃহে সতাধিক মরাই থাকলেও সেই গৃহের পরিজনদের অহংকার, বেশভূষায় চাক্‌চিক্য, গর্বের জৌলুস ও মত্ততা থাকে না, দেখলে মনে হবে এরা সাধারণ মানুষের মতই।" একটা মরাইএ আজকালকার দিনে বহু টাকার ধান থাকে। আগে তা না থাকলেও অভাব-অনটন ছিল না। তার একমাত্র কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য বলে কিছু ছিল না। মোটা কাপড় মোটা ভাত এতেই মানুষ সন্তুষ্ট ছিল। সামর্থ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং সেইভাবে চলাই হচ্ছে মানুষের একটি অন্যতম বিশেষ গুণ।

হাঁটতে হাঁটতে গ্রামটির তৃপ্তিকর চেহারা দেখে এসে গাছতলায় দাঁড়াতেই গ্রামের এক বয়স্ক ব্যক্তি ছুটে কাছে এল। তাকে অবস্থার কথা জানাতেই সংগে সংগে একটি খাটিয়া এনে পেতে দিয়ে বলল—আপনি

এতে বসে বিশ্রাম করুন—আমি হাত মুখ ধুওয়ার জল আনছি। দেখতে দেখতে শিশু, যুবা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামবাসী আমার কাছে এসে জড় হল। গ্রামটিতে শুধু গোয়ালারাই বাস জানতে পারলাম। তাদের উদ্দেশ করে বললাম কাঠের গাড়ীগুলো না আসা পর্য্যন্ত আমাকে এইখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,—তাদের রান্না-খাওয়া সেরে এখানে পৌঁছতে বোধ হয় বেলা পড়ে আসবে। সাইকেলের অবস্থা সকলেরই নজরে আসতে অবস্থাটা সহজেই তারা বুঝে নিতে পারল।

বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যক্তি গ্রামের প্রধান—সে অনুনয় সহকারে জানাল—আমাদের বাড়ীতে অন্ন আহারের জন্য রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা এক্ষুণি করে দিচ্ছি—আপনি একটু কষ্ট করে তৈরি করে নিন,—আমাদের মেয়েরা আপনার সব কিছু সাহায্য করবে,—তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন।"

আমি বললাম—তোমাদের গৃহলক্ষ্মীরা রেঁধে দিলে আমার তা খেতে কোনই আপত্তি নেই বরং আগ্রহই আছে কিন্তু আমি জানি তোমরা তাতে কোন রকমেই রাজী হবে না, সুতরাং আমারও রান্নার হাঙ্গামে যেতে এখন মোটেই ইচ্ছে করছে না, তার চেয়ে চাট্টি মুড়ি পেলে তাই আমার যথেষ্ট হবে।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি তখন বলল তাহলে ফলারের ব্যবস্থা করে দিই। এই বলে একটি লোককে সংগে নিয়ে গিয়ে বাড়ী থেকে নিয়ে এল পাথরের বড় থালায় করে সরু চিঁড়ে, সেরখানেক দুধ এবং চাযের সোনালি রং এর গুড় এক বাটি।

আমি আর একবার হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে, সাইকেলে বাঁধা ছিল একটা ছোট থলের পাকা মর্তমান কলা। তার থেকে এক একটা শিশুদের হাতে দিয়ে পাঁচ-ছ'টা দুধ-চিঁড়ে ও গুড়ের সংগে মেখে নিলাম, তারপর তার থেকে বালকদের হাতে অল্প অল্প দিয়ে তৃপ্তির সহিত সমস্তটা খেয়ে ফেললাম। খাদ্যবস্তুটির পরিমাপ দেখলে এখন অনেকেই অবাক হয়ে ভাবত কি করে এতখানি খেতে পারলাম। তারপর খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। তখনকার মত সকলে যে যার গৃহে চলে গেল। গাছের ডালে বসে থাকা কোকিল ও হল্‌দি পাখীর সুমধুর ডাক কাণে আসতে লাগল। মধ্যাহ্ন সময়ে এদের কণ্ঠস্বর প্রকৃতির নিঝুম অবস্থায় মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়।

তৃতীয় প্রহরের প্রথম মুখে গ্রামবাসীরা আমার কাছে উপস্থিত হল। আগেই আমার পরিচয় জেনে নিয়েছিল। তারা বল্‌ল—আমাদের গ্রামে একটি ছোট-খাট যাত্রার দল সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। পালার গান শেখাতে অন্য গ্রাম থেকে একটি বামুনদের যুবক আসে। সেই গানের মাষ্টার ৺দোলের সময় ভেলাইডিহায় গিযে আপনার গান শুনে আমাদের কাছে অনেক কথা বলেছিল। আমাদের মনে খুব আকাঙ্ক্ষা এসেছিল—আপনার গান শুনতে "দোলের সময় সেখানে যাব—কিন্তু ভগবান আশ্চর্যরূপে আপনাকে দর্শন করার সৌভাগ্য এনে দিয়েছেন, আমাদের খুব আনন্দ এসে গেছে। আমরা অনেক দিন থেকেই শুনে আসছি—বিষ্ণুপুরের একটি ছেলে পাঁচ বছর বযেস থেকে তানপুরা বাজিযে ওস্তাদি গান গাচ্ছে।"

দেশের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামসমূহে ঠাকুরদার সংগে পাঁচ বছর বযস থেকে যাতায়াত করার তখন থেকেই অনেকে জেনেছিল—গাইতে পারার কথা। তারপর সেদিন গ্রামবাসীরা অতি সঙ্কোচ সহকারে বিশেষ অনুরোধ জানান একখানিও অন্ততঃ গান শুনাবাব জন্য।

আমি বললাম—অমন করে বলার কোনই প্রয়োজন নেই—আমি এক্ষুণি শুনাচ্ছি। খেয়ালেব অনুরূপ দু'খানি বাংলা গান, একটি বাংলা ভজন ও একটি শ্যামা-সংগীত শুনালাম। সকলেই খুব নিষ্ঠা-আগ্রহ নিয়ে শুন্‌ল। গাইবার পর চুপুচুপু মন্তব্য কাণে এল, দেখলি কি রকম গলা খেলাচ্ছিলেন—কত ভাল লাগছিল শুনতে,—আমাদের গানেব মাষ্টার যখন গায তখন ত কৈ এমন খেলে নাই—আব এমন মিষ্টিও লাগে না, শুধু চেঁচালেই কি গান হয়?" এই মন্তব্যের উত্তরে একজন বল্‌ল—কিসে আর কিসে,—উনি হচ্ছেন ওস্তাদ,—রাজার গায়ক, আর ও হচ্ছে আমাদের গযলার গাযক।" এদের এই কথা শুনে আমার খুব হাসি এসে গেছল। গানের সময় এদের মহিলারাও দরজার কাছে দাঁডিযে মনের আকর্ষণ নিযে শুনছিল।

বাল্যকাল হতে মল্লভূমের বহু গ্রামে যাতাযাত করে দেখেছি, সে সব গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষই ছিল বৈঠকী গানের অনুরাগী। তখন শাস্ত্রীয়-সংগীতকে লোকে বৈঠকীগান বলত। এই গান বাইরে ভীড করে শুনার জন্য যে নয়—বৈঠকখানারই উপযোগী গান এই নির্ভুল ধারণা গ্রামবাসীদের মধ্যেও ছিল।

সেদিন সেই নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কাছে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণই যেরূপ শ্রদ্ধা ও আদর-যত্ন লাভ করেছিলাম তা কোন দিনই ভুলবার নয়। এমন শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আদরের মধ্যেও ভেজাল ঢুকেছে বেশ মাত্রাধিক্য হয়েই। এগুলি এখন নিজ স্বার্থেই বেশী প্রকাশ পায়।

তারপর বেলা পড়তির মুখে গাড়ীগুলো এসে পড়তেই তাদের থামান হল। একটা গাড়ীর উপর সাইকেলটা দড়ি দিয়ে বেঁধে—আর একটা গাড়ীর কাষ্ঠখণ্ডের উপর খড়ের আটি রাখা হল—তার উপর বসে যাবার জন্য। গ্রামবাসীরা একান্তভাবে বল্ল—আমরা একটা গাড়ী দিচ্ছি—আপনাকে পৌছে দিয়ে আসবে—এ রকমে যাওয়া আপনার অসম্ভব কষ্ট হবে।

আমি বল্লাম—আমার সব রকমই অভ্যাস আছে, তাছাড়া কয়েক মাইল গেলেই গুন্দার ষ্টেশনে ট্রেন পেয়ে যাব। সুতরাং চেপে যাওয়া যদি খুব কষ্টকর হয় তাহলে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এদের গাড়ীর সংগে হেঁটেই চলে যাব।

তোমাদের কাছে যেরূপ আদর যত্ন লাভ করলাম তা চিরকাল মনে থাকবে। আমি কামনা করি—এই রকম সুন্দর হৃদয় যেন বংশ পরম্পরায় থেকে যায়।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবং শিশুদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ও আদর জানিয়ে সামনের গাড়ীটার উপর চড়ে বসবার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রত্যেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল—এমন কি বধূরাও কাছে এসে গলায় কাপড়ের আঁচল জড়িয়ে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করল। এ রকম শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন নিয়ে মুগ্ধকর আকর্ষণীয় দৃশ্য বোধ হয় আর কোন দেশেই নেই। এইসব মাতৃজাতিদের প্রণাম নেওয়ার চেয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতেই অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটো আমার তখন জলে ভরে এসেছিল।

তারপর সেদিন গাড়ী চলতে সুরু করল। সকলে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন এক পরম আত্মীয় তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পুরুষরা বলতে লাগল—আজ আমাদের কত ভাগ্য—শুধু দর্শন নয় গানও শুনতে পেলাম—যা আমরা কখনও ভাবতে পারি নাই।"

মহিলারাও দাঁড়িয়ে রইল গাড়ীর দৃষ্টি সীমার শেষ পর্য্যন্ত-ঘোমটার মধ্যে দিয়ে মমতাভরা মুখগুলি নিয়ে।

গ্রামের প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে বললাম—আমাকে অল্প সময়ের জন্য পেয়ে তোমাদের কিছুই তেমন লাভ হয় নি—আমার কিন্তু প্রচুর লাভ হয়েছে হৃদয়কে সুস্থ করে গড়া ও মানবতা লাভের জন্য। বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এরকম তৃপ্তির অমূল্য বস্তু বড় কম লাভ হয়নি বাল্যজীবন হতে অনেক বছর পর্য্যন্ত।

ষ্টেশনের মাঝ রাস্তায় একটা গাড়ীর চাকা গোলমাল হওয়ায় সেরে নিতে দেরি হয়ে গেল এজন্য যথা সময়ে পৌঁছতে না পারায় ট্রেণ পেলাম না। সুতরাং কাঠের উপর চেপেই বরাবর আরো ন' মাইল রাস্তা এলাম সোজা খাড়া হয়ে বসে। সে-ও জীবনে এক উচ্চস্তরের আরাম ভোগ করেছিলাম। এরকম অভিজ্ঞতা পেয়ে তার পরিচয় দেবার মত আমার স্তরের দ্বিতীয় ব্যক্তি বোধ হয় পাওয়া যাবে না॥

(৪৬)

ভেলাইডিহা হতে,—

ভেলাইডিহার রাজাবাহাদুরের কাছে দু'বছর থাকার পর মেজকাকার কাছ থেকে জরুরি নির্দ্দেশমূলক এক চিঠি এল। লিখেছেন,—মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত লালগোলার মহারাজা স্বহস্তে একপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে জানিয়েছেন একাধারে সুগায়ক ও যন্ত্রী এই রকম একজন প্রবীণ শিল্পী রাখবেন—মাইনে পঞ্চাশ টাকা মাসিক এবং ভাল বাসস্থান দেওয়া হবে। আমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করেছেন ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। আমি তোমার বয়সের কথা উল্লেখ করে তোমার সম্বন্ধে সবিশেষ জানাতে তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করে পাঠিয়ে দেবার জন্য লিখেছেন। আমি তোমাকে পাঠাতে পারব এই বলে মহারাজকে সেই চিঠির উত্তর দিয়েছি। আমি খুড়োমহাশয়কেও (আমার পিতামহ) একথা জানাতে তিনি সানন্দে সম্মতি জানিয়েছেন। আমি মনে করি অতবড় রাজার কাছে থাকলে তোমার সবদিক দিয়েই নাম, উৎসাহ এবং প্রচার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তুমি সেখানে যেতে দ্বিধা করবে না মনে করি।"

গুরুতর সমস্যায় পড়লাম,—এই সংবাদ আমি কি করে রাজাবাহাদুরকে জানাব তার চিন্তায় খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম।

রাজাবাহাদুর ব্রাহ্মণ এবং বয়সেও আমার চেয়ে অনেক বেশী, তত্রাচ আমাকে শিক্ষাগুরুর পদে অভিষিক্ত করার দিন থেকে আদর্শ শিষ্যের মত সব বিষয়ে মান্য করে আসছেন। সংগীতগুরুর প্রতি এরকম ন্যায়-ধর্ম্মপালন ও মর্য্যাদা দান রাজা-জমীদারদের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত। এই পরিচয়ের ব্যক্তিরূপে তাঁকেই আমি একমাত্র আদর্শের প্রতীক রূপে পেয়েছিলাম।

কাকার পত্রটি কয়েক দিন চেপে রেখে এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করবার জন্য বিচার বিবেচনা করতে লাগলাম। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হল যে, মেজকাকা যখন লালগোলার মহারাজকে এক রকম কথাই দিয়েছেন—আমার বহির্জগতে প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে তখন গুরুনির্দ্দেশ শিরধার্য্য করে তা পালন করাই কর্ত্তব্য। তিনি যে সব যুক্তির কথা লিখেছেন সেগুলো মনের মধ্যে আলোড়িত হয়ে তার সত্যরূপ দেখা দিতে লাগল। অর্থাৎ মানুষ যাকে সবচেয়ে বড় করে চায় সেই প্রচার-প্রতিপত্তি, সাধনার পরিচয় ইত্যাদি বাহ্যিক লোভনীয় বস্তুগুলো এই পল্লী রাজবাড়ীতে কোনদিনই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং বহির্জীবনে যা কাম্য প্রায় সব মানুষেরই থাকে সেই কামনাই শেষ পর্য্যন্ত বড় হয়ে সত্যকারের তৃপ্তির মন্দির থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তাছাড়া অদৃষ্টই ভাগ্য ও পরিচালনার একমাত্র অধীশ্বর। যেদিকে নিয়ে যাবে, যা কিছু দেবে তার উপর কোন হাত নেই।

পত্রটি চেপে যাওয়ার সেই ক'দিন প্রাণপণে ছাত্রদের সেখাতে লাগলাম এবং বেশ কিছু নূতন পাঠ লিখে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। এত আগ্রহ দেখে সকলে কিরকম একটু সন্দেহ ও উদ্বেগভাব দেখতে লাগল। যাই হোক্,—তারপর একদিন রাত্রে গান-বাজনার পর মেজ-কাকার চিঠিটি রাজাবাহাদুরের হাতে দিলাম। হাতটা তখন কাঁপছিল। চিঠি পড়ে রাজাবাহাদুর মনে খুব দুঃখভাব নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—আপনার সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে কোন রকমেই বাধা দিতে পারি না, কারণ আমি আপনাকে শিক্ষাগুরু বলে এবং যোগ্যতার দিকে বিচার করে মনে প্রাণে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত অন্তরে স্থান দিয়েছি,—কোন দিনই কম বয়েসের কথা মনেই হয়নি। আপনি এই এত কম বয়সে শিক্ষা দানে কোন দিন ক্লান্ত ও বিরক্ত না হয়ে যেরূপ ধৈর্য্য ও শিক্ষা গুরুর কর্ত্তব্য পালনে নিষ্ঠা দেখিয়ে

এসেছেন তাতে আমরা সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত। আমি মনে করি আমাদের এখানের এই সামান্য জায়গার চেয়ে যেখানেই আহ্বান পেয়ে যাবেন সেখানে আপনার যোগ্য প্রচার-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হবে,—লালগোলাও সেই রকমই একটি স্থান হবে বলেই মনে করি। সুতরাং এই সব বিষয়ের বিচারের উপর আমারও তো কর্ত্তব্য আছে,—সেই কর্ত্তব্য পালন করে ভগবানের কাছে আপনার সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রার্থনা জানিয়ে আপনাকে আমরা বিদায় অভিনন্দন দেবো,—আমার এখানের এই ক্ষুদ্র জায়গায় আপনাকে ধরে রাখার কোন মানে হয় না।” শেষের দিকে রাজা-বাহাদুরের চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠেছিল। জলঝরা চোখে কাপড় ঢাকা দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকে গেলাম।

পরের দিন সকালেই আমার চলে যাওয়ার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। খবর শুনে ছাত্রদের, স্থানীয় ব্যক্তিদের এবং রাজপরিবারবর্গের মনের অবস্থা দেখে আমার মনকে সামলান কঠিন হয়ে উঠল। ছাত্ররা কাঁদতে লাগল, বন্ধুরা হতবাক্‌ বিমর্ষ।

ভেলাইডিহা হতে বিদায়ের সময় তার মর্ম্মান্তিককরুণ দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। আমার তরফ থেকে মনের মহাসম্পদ হারিয়ে যাওয়ার মত হল। সে জিনিস বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, অব্যক্তই তার শাশ্বত রূপ।

শিক্ষা ও সাধনা ছেড়ে না দিতে একান্তভাবে ছাত্রদের ও রাজাবাহাদুরকে জানালাম। যখন বললাম— অন্য কোন শিক্ষক নিযুক্ত করবার জন্য, তখন সমস্বরে সকলে বলে উঠলেন—তা কোন রকমেই হবে না, মনের এই জায়গায় আর কাউকেই বসাতে পারব না, আমরা যেটুকু শিখেছি সেটুকুই চর্চায় রেখে যাব, আপনার নির্দ্দেশ যথাযথ পালন করবার একান্ত উদ্যম রেখে যাব।”

আমি এই উত্তরে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে জানালাম—গ্রীষ্মে ও পূজার সময় ছুটি নিয়ে এখানে এসে শিখিয়ে যাব—যেখানেই থাকি না কেন, এ সকল আমি কোন দিনই নষ্ট হতে দেবো না - যদি না দেখি আগ্রহের অভাব ও শৈথিল্য। আমি চললাম—কিন্তু মনটাকে আমার এখানের শিষ্যদের ও বন্ধুদের কাছে রেখে গেলাম। আমার কথায় সকলেই অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

চলে আসবার দিনে বিকেলে রাজাবাহাদুর, তাঁর খুড়োমশায়রা এবং

আরো বহু লোক গ্রামপ্রান্তের নদীধার পর্য্যন্ত সঙ্গে এলেন। একটা গাড়ীতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও তানপুরা-সেতার থাকল, আর একটা গাড়ী আমার জন্য। এই দুটো গোগাড়ী আমাদের সংগে সংগে চলতে লাগল।

নদী পেরিয়ে প্রায় দু' মাইল পথ ছাত্র ও বন্ধুরা সংগে এলেন।

তার পরের দৃশ্য আর লেখা যায় না।

আমি আর তাদের দিকে তাকাতে পারলাম না, গাড়ীতে উঠে বসলাম পেছু হয়ে।

সেখান থেকে মাইল খানেক জংগল পেরিয়েই আমেদ-আলির গ্রাম। গ্রামের কাছ বরাবর গাড়ী দু'টোকে দাঁড়করিয়ে আমি নেমে পড়ে আমেদ-আলির কাছে বিদায় নিতে গেলাম।

শিকারের সেই শেষ দিনে আমেদ-আলি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাকে অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত পাহাড় থেকে নামিয়ে ছিল বলেই আমি রক্ষা পেয়েছিলাম, নচেৎ নিশ্চয় পা' হড়কে নীচের গহ্বরে পড়ে যেতাম। তাছাড়া সে গান-বাজনা যেমন ভালবাসত তেমনি আমাকেও। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলাম আমেদ-আলিকে। সে-ও আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে কাছে এসে অবাক্ হয়ে বল্ল— একি আশ্চর্য্য! আপনি? এই গরীব খানায়?

বললাম—তোমাদের কাছ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাই বিদায় নিতে এলাম, দূরে গাড়ী দুটো দাঁড়িয়ে আছে।

আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারল না, বল্ল—তা আবার হয় নাকি! অমন করে ভয় দেখাবেন না, এতেই আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।" সমস্ত কথায় যখন জানতে পারল্ল সত্যই,—তখন তার মুখের চেহারা যা হল তা তাকিয়ে দেখা যায় না।

আমেদ-আলি তার স্ত্রীকে সব কথা বলতেই—সে শুনে অবাক হয়ে বলতে লাগল— কেন বাবু চলে যাবেন? এখানে খুব কষ্ট হচ্ছিল বুঝি? উনি ভীষণ আঘাত পাবেন। সেদিন আপনি ওকে যে কথা বলেছিলেন সেকথা বাড়ীতে এসে আমাকে বলবার সময় আনন্দের সংগে চোখ দিয়ে ওঁর কান্না বেরিয়ে গেছল। আপনি বলেছিলেন—পাহাড় থেকে নামবার সময় ওঁর হাতের চাপে আপনার কব্জিতে ব্যথা এখনও আছে—ওই ব্যথা যেন চিরকাল থাকে বাঁচানর ও ভালবাসার নজির হয়ে।" না বাবু যাবেন না, ও তাহলে কেঁদে আকুল হবে।"

সত্যই এ জিনিসের কাছে আর কোন কিছুর দাম নেই, আমি আমেদআলিকে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম। তার চোখের সুর্মা চোখের জলে ধুয়ে যেতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে তার স্ত্রী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি আলিঙ্গন ছেড়ে দিয়ে তাদের দিকে আর না তাকিয়ে সটান গাড়ীতে চড়ে পড়লাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি দু'জনাই গাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছচে। গাড়োয়ান সেই দৃশ্য দেখে জোরে গাড়ী চালিয়ে দিলে। আমি তাদের দিকে হাতজোড় করেই রইলাম। দু'জনেই অনেক দূর পর্যন্ত সংগে সংগে আসতে চাচ্ছিল, খুব নিষেধ করতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময়েই সন্ধ্যার অন্ধকার ধরিত্রীর উপর গাঢ় হয়ে নেমে এল—আমার মনের উপরের মতই।

ওদের কাছে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তাতে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম—মানবতাপূর্ণ হৃদয়ের কাছে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, আচার বিচারের গণ্ডী নাই, সব সেখানে এক, "একজাতি একপ্রাণ।" এই পরম সত্যকে গ্রহণ করে চলতে পারলে সবদিক দিয়েই কল্যাণ হয়।

(৪৭)

লালগোলায় যাত্রা,—

ঠাকুরদা' শুভদিনক্ষণ দেখে লালগোলায় যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাল্যকাল থেকে মা' ছাড়া এই মানুষটা এতদিন যদিও তাঁর কাছ থেকে বেশী দূরে ছিল না, এখন তাকে থাকতে হবে বহু দূরের পদ্মানদীর তীরবর্তী স্থানে সতের বছর বয়সে।

বিষ্ণুপুর হতে দিনের ট্রেনে চড়ে কোলকাতায় রাত ৮টার সময় সুরিলেনে সেজকাকার বাসায় এসে উঠলাম এবং তার পরদিন সিয়ালদহ ষ্টেশনে রাত ৯টার ট্রেনে চড়ে লালগোলা ষ্টেশনে ভোরের সময় নামলাম। কুলির মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে, তানপুরা ও সেতারটা দু' হাতে নিয়ে রাজ গায়ক হাঁটতে সুরু করল। কুলি বল্‌ল এখান হতে রাজবাড়ী বেশ কিছুটা দূরে।

রাজ বাড়ীর সদর গেটের কাছ বরাবর হয়েছি যখন, তখন যাঁর সামনে পড়লাম তিনিই যে মহারাজ সে কথা একজন সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক আমার কাছে এসে চুপু চুপু জানালেন। আমি কাছে গিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। সাধারণতঃ প্রায় সকলের পক্ষেই বড়দরের রাজা-বিশেষ মানুষটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না কিন্তু এই মহারাজাকে দেখে কোন নূতন দর্শকেরই সাধ্য ছিল না—উনি মহারাজ বলে।

পরণে গেরুয়া জামা-কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুক পর্য্যন্ত সাদা দাড়ি, হাতে বাঁশের লাঠি,—এই চেহারাকে কি কেউ মহারাজা বলে মনে করতে পারে? আমি পাশে সিপাইদের দেখে মনে করেছিলাম মহারাজার ইনি মন্ত্রগুরু; কোন পাহাড় আশ্রম থেকে নেমে এসেছেন।

যাই হোক- মহারাজা আমাকে দেখে অবধি কৌতূহলযুক্ত মৃদুহাস্যে আমার দিকে আড়ভাবে তাকিয়েই ছিলেন। মনের ভাবটা যেন—এই—এইটুক বয়সে রাজদরবারের উপযোগী সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে থাকার মত কি এমন শিক্ষা সাধনা থাকতে পারে! আমার এই ধারণা যে অমূলক ছিল না তা মহারাজার মুখেই একদিন শুনেছিলাম।

মহারাজা পরক্ষণেই কৌতূহল ভাবটা সামলে নিয়ে আমার বয়সের প্রতি স্নেহ মমতার উপর দৃষ্টি ফেলে সিপাইকে বলে দিলেন থাকার ব্যবস্থার স্থানে আমাকে নিয়ে যেতে।

যেতে যেতে সিপাহী বলল্ · মহারাজা রোজ ভোরে বেড়াতে বেরোন, সংগে নেন নাতি সাহেবকে এবং তাঁর মাষ্টারকে।"

এই নাতিসাহেব হলেন রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাও এবং তাঁর শিক্ষকের নাম অনাথনাথ ভট্টাচার্য্য। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এল।

সেই প্রথম সাক্ষাতে এঁরা দুজনেও এমন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যে, তা দেখে মনে হয়েছিল সঙ্গীতজ্ঞ আমার অন্ততঃ খানিকটাও জাকজমক থাকার ধারণা একবারে নির্মূল হয়েগেছে সাদাসিধে জামা কাপড় ও গোঁফহীন চেহারা দেখে। তাঁদেরও সে দিনের এই মনভাব পরে আমাকে জানিয়েছিলেন।

মহারাজা বলেছিলেন—আসার সঠিক দিন ও সময় জানতে পারলে ষ্টেশনে লোক ও গাড়ী রেখে দিতাম। তখন একটিই মাত্র ঘোড়ার গাড়ী ছিল।

মোটর গাড়ী অনেক পরে একটি এসেছিল মনে হয় হাত ঘুরে।

দেখেছিলাম মহারাজা বিলাস-আড়ম্বর ও আরামে কাটান মোটেই পছন্দ করতেন না। এমন ঘরে তিনি বাস করতেন যা অত্যন্ত সাধারণের মত। বেঁচে ছিলেন একশ' আট বছর পর্য্যন্ত। শেষ কয়েক বছর মেঝের উপর শয্যা পেতে শুতেন। তাঁর স্বভাবের ধারা ছিল, যখন যে জিনিষটার উপর আগ্রহ আসত তখন তাকে পাবার জন্য ও সমাধার জন্য ভীষণ তৎপর হয়ে উঠতেন। তারপর আগ্রহ বস্তুর বাস্তবরূপ ঘটে গেলেই কিছুদিনের মধ্যেই তার আদর আর থাকত না। অর্থাৎ যাকে বলে অনেকটা খেয়ালের উপর চলা। অবশ্য বড় লোকদের অল্প বিস্তর এই গুণ আছেই তা না হলে তাঁদের বৈশিষ্ট্য থাকে না।

সিপাহী নিয়ে গিয়ে তুলল নূতন তৈরি রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী পরিত্যক্ত লালকুঠী নামক বিরাট দর্শনীয় জনমানব শূন্য প্রাসাদে। কারুকার্য্য মণ্ডিত প্রাসাদের সম্মুখ ভাগের একটি প্রকোষ্ঠে গৃহ শিক্ষক অনাথবাবু থাকেন একাই,—তারই পশ্চাৎ ভাগের একটি কুঠ্রীতে আমার থাকার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রেখে গদিযুক্ত তোষকপাতা পালঙ্কের উপর আমার বিছানা পেতে নিয়ে সত্‌রঞ্চিটা নীচে পেতে রাখলাম সাধনায় বসবার জন্য।

একটা চাকর এসে বাথরুম, ইন্দারা ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়ে গেল। চাকরটাকে দিয়ে চার পয়সার মিষ্টি আনিয়ে রেখে—প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে জল খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম চারদিকটা দেখবার জন্য। পরিত্যক্ত এই প্রাসাদটির সম্মুখভাগের চতুর্দিকের বিস্তৃত খোলা জায়গায় স্থানে স্থানে সুনিপুণ ভাস্কর কর্ত্তৃক শ্বেত পাথরের দ্বারা নির্মিত নানান ভঙ্গীমায় দাঁড়ান অবস্থায় ছিল সুন্দর সুন্দর নারীমূর্ত্তি। একস্থানে ছিল অব্যবহার্য্য হয়ে টেনিস্ কোর্ট। চতুর্দিকে কেয়ারি করা নানান প্রকারের চিত্রিতরূপ তৈরী হয়েছিল পুষ্পবৃক্ষকে বেষ্টনি করে রাখার জন্য। এই সব দেখে মনে হয়েছিল—আগে এই প্রাসাদের শোভা-সৌন্দর্য্য সত্যই কি অপরূপ ছিল। এই বিরাট প্রাসাদের মমিরূপকে আর একবার প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ। ভাবতেই পারি না এরকম প্রাসাদ কি করে পরিত্যক্ত হয়। মহারাজার নূতন প্রাসাদ; সেই প্রাসাদের কাছে খুবই নিম্নমানের মনে হত। আজকালকার দিনে ওই রকম কারুকার্য্যমণ্ডিত বৃহৎ প্রাসাদ তৈরী করতে গেলে তার টাকার অংকবস্তু ঊর্দ্ধে চলে যাবে।

সংগীতের ধ্রুপদের মত এই রকম সব ধ্রুপদীসৃষ্ট বস্তু একরকম লোপই পেয়ে গেল। লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিং এর সামনে টেলিফোন বিল্ডিং এর মত সব বিষয়েই দেখা যাচ্ছে খান্দানী রুচি ও শিল্পের দারুণ অধঃপতন। আগেকার জিনিষগুলি ছাড়া নূতন কিছু আর দ্রষ্টব্য বলে থাকছে না। একমাত্র কলকারখানার যন্ত্রদানবদের চেহারা দেখা ছাড়া।

তারপর সেই প্রথম দিনে জল খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম কাছাকাছি কি কি দ্রষ্টব্য আছে তা দেখবার জন্য।

উত্তরদিকে এগিয়ে যেতেই পেলাম রাজবাড়ীর সীমানা বরাবর বহুদূর পর্য্যন্ত পাকা পাঁচিরের পাশ দিয়ে লাল কাঁকরে ঢাকা পরিসর রাস্তা এবং তার পাশ দিয়ে ওই রাস্তার দূরত্ব বরাবর দীঘি আকারে লম্বা আকৃতি নিয়ে এক সরোবর। রাজবাড়ীর পাঁচির ঘেরা অভ্যন্তরে উত্তর গেটের কাছেই আছে এঁদের 'কালীমাতার' মন্দির। খুব পুরাকালের প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশ করে দর্শন করলাম এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে মায়ের মূর্ত্তির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার সময় মনের মধ্যে কি রকম একটা আলোড়ন এসে শিহরণ জেগে উঠেছিল।

মহারাজার কাছে শুনেছিলাম—সাহিত্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই মায়ের সামনে বসে 'আনন্দমঠের' কতক অংশ লিখেছিলেন। আমি এক একদিন মায়ের সামনে বসে যখন গান করতাম তখন মন আকুলিত হয়ে তাঁর চরণের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং চোখে জল এসে যেত। প্রার্থনা করে বলতাম—মা! সুরের দেবতাকে বুঝতে তুমি কৃপা করে তার সক্ষমতা এনে দিয়ো যেন তাঁর সন্ধানে এগিয়ে যেতে পারি।

তারপর সেই প্রথম দিন মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে নূতন বাসগৃহ-সমূহ ও বিরাট বৈঠকখানায় সুসজ্জিত বস্তুসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখে তার প্রধান গেট পেরিয়ে সামনের পুরাতন আদি বাড়ীর ভেতরকার গঠনরূপ যা দেখলাম তাতে মনে হয়েছিল সাবধানতা নিয়ে আভিজাত্য কৃষ্টির এক বিরাট সাক্ষীর মত। এই সব দেখতে প্রায় ঘণ্টা দুই লেগেছিল। সমস্ত রাত জেগে ট্রেনে আসার ক্লান্তি থাকা সত্বেও দেখার আগ্রহের জন্যই পেরেছিলাম এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে। বাল্যকাল থেকে আগ্রহটাই আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। আর সেই আগ্রহের উপর থাকে তাঁর প্রতি নির্ভরতা। রাজবাড়ীর সমস্ত পরিবেশটার ছিল ভাবগাম্ভীর্য্য, শান্ত স্নিগ্ধ ও নিঝুমের মত। এজন্য এইস্থান আমার সাধনার উপযোগী হয়েছিল।

লালকুঠী নামের সেই প্রাসাদের মধ্যস্থলের বৃহৎ হলঘরে তখন বিরাট লাইব্রেরী ছিল। তার চারিদিকের দেয়ালধারে ঠেসান সার্সীযুক্ত বড় বড় আলমারীতে দেশ-বিদেশের নানান বিষয়ের নানান রকমের অসংখ্য গ্রন্থাদি ছিল এবং মধ্যস্থলের বিরাট টেবিলের উপর থাকত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ। বহুবিধ গ্রন্থ এবং সংবাদপত্রাদি পাঠের সুযোগ পেয়ে আমার খুব উপকার হয়েছিল।

তারপর সেদিনের কথা,—খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে. জানলাম অনাথ-বাবুর রান্না করে দেয় একটা কম বয়সের উড়ে ঠাকুর, আমারও একত্রেই খাওয়া হবে সমানভাবে খরচের অংশ দিয়ে। অনেকক্ষণ ঘুরাঘুরি করে এসে পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করছি—সে সময় অনাথবাবু রাজার সংগে প্রাতঃভ্রমণ এবং কুমার বাহাদুরকে পড়িয়ে বরাবর আমার কাছে এসে স্মিত হাস্যে দাঁড়ালেন। আমি সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা সহকারে বসতে বললাম। খুব আগ্রহের সহিত আমাকে গ্রহণ করে কাছটিতে বসে আপন জনের মত আমার অন্যান্য পরিচয় জানার আগ্রহ নিলেন। তাঁর দীর্ঘাকৃতি সুন্দর গঠন—গৌরবর্ণ গাত্র আভা এবং সুন্দর মুখমণ্ডলে দীর্ঘায়ত উজ্জ্বল চক্ষুর উপর চশমার মধ্যে দিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টির সংগে মধুর হাসি ও বাক্য আমার বহুদূরে আসার জন্য দমে যাওয়া মনটায় সান্ত্বনা দান করল। তাঁর তখন বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মত হ'বে। যাই হোক্, এখানে আসার পর বরাবরই মনটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগত। আপন ঘরের চেয়েও বেশী পাওয়া সেই ভালাইডিহার প্রাণস্পর্শ অন্তরঙ্গতার অভাব খুবই অনুভব হত। অনেক আগের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতাম হোমড়া-চোমড়া বড়লোকদের কাছে আমাদের মত মানুষের জন্য আদরের অভাব থাকেই। ভালাইডিহার তাঁরা ছিলেন সাধারণ স্তরের মানুষের মতই তাই তাঁরা বিশেষ করে শিক্ষাগুরু বলে সব দিক দিয়েই অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়ে রেখেছিলেন।

এখানে আসার প্রথম দিনেই রাজদরবারে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সন্ধ্যার পর আমার গান-বাজনা বহুক্ষণ ধরে হল। প্রথম থেকেই মহারাজা রাগ ফরমাস্ করে শুনতে লাগলেন। সংগত করলেন মুরারীমোহন দাস (বৈরাগী)। ইনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক আতাহুসেন খাঁ-এর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। মহারাজাও উক্ত খাঁ সাহেবের কাছে তবলা শিখেছিলেন। এক একদিন সংগত করতেনও। খাঁ সাহেব ছিলেন

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের কাছে শ্রেষ্ঠ বাদক পদে নিযুক্ত।

মহারাজা তাঁর বাদন পদ্ধতির ক্রিয়া ও সাধনার বিষয় নিয়ে বলতেন —খাঁ সাহেব যখন বাজাতেন তখন শরীরের কোন অংশ নোড়ত না, শুধুমাত্র আঙুলগুলিই মেশিনের মত চলতে থাকত। বৃদ্ধ বয়সেও চার ঘণ্টার উপর সাধনা করতেন। নবাববাহাদুর যে সময় বিলেত যান সে সময় খাঁ সাহেবকেও সংগে নেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তাঁর তব্‌লাবাদ্য শুনাবার ব্যবস্থা করেন। ইংরেজদের কাছে নবাবদের তখনও যথেষ্ট সম্মান-সমাদর ছিল। যাই হোক্—সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া আতাহুসেন খাঁ এর তব্‌লাবাদ্য শুনে অবাক হয়ে দেখতে চান আঙুলগুলোয় কোন কলকব্জা লাগান আছে কি-না, নেই দেখে বাঁওয়া-তব্‌লা দুটোই কোলে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন - বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি কি না। পরিশেষে খুব আশ্চর্য্য হয়ে এবং কৃতিত্বে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে খাঁ সাহেবকে মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে পুরস্কৃত করেন। সাধনার দ্বারা বিদ্যার উচ্চ শিখরে পৌঁছনর জন্য সাধকদের শিক্ষায় কিরকম নিষ্ঠা, সাধনায় একাগ্রতা ও তপস্যা রাখতে হয় তার এ-ও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

মহারাজার সংগে নবাববাহাদুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল—তাই খাঁ সাহেব লালগোলায় এসে মহারাজকে তব্‌লা শেখাতে আসতে পারতেন। খাঁ সাহেবের দু' চারদিন থাকার সময় তাঁর সাধনার বিষয় নিয়ে মহারাজা বলতেন,—কোন একটা বোল যতক্ষণ বাজাতেন তখন তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধ্বনি উত্থিত হত। বাঁওয়ার চাপ দিয়ে পাঁচটা আঙুলের ক্রিয়া যখন দেখাতেন তখন মনে হত যেন পায়রাগুলো রকম রকমভাবে ডাকছে।" মুরারীর কাছে কয়েকটি খাঁ সাহেবের বোল লিখে নিয়ে সেখানে রেওয়াজ করতাম। এই সংগৃহীত বোলের কয়েকটি বাদ্যচর্চারত ও প্রতিষ্ঠাবান বাদকদের শিখিয়ে ছিলাম কিন্তু ভারি ওজনের বস্তুর উপর এখন শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার কিংবা আমার কাছে নেওয়ার জন্যই সেগুলির পরিচয় তাঁরা রাখলেন না।

তারপর সেদিন, অর্থাৎ প্রথম দিন আমার গান-বাজনা শুনে মহারাজা ও শ্রোতারা খুসী হয়েছেন বুঝতে পেরে মনটা আশঙ্কামুক্ত হয়েছিল।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় লালকুঠির প্রাসাদে ফিরে এসে উড়েঠাকুরের শ্রীকরনির্মিত দ্বিভুজ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ গঠনের হৃষ্ট-পুষ্ট সদগ্ধ ও অংশ স্থলে

তাপবিহীন রুটি ও তার সংগে স্বাদহীন উপাদেয় ব্যঞ্জন গলধঃকরণ করে শয্যায় সটান শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে মনে হতে লাগল—ভেলাইভিহার টাটকা খাঁটি ঘি এর লুচির কথা, ভাবতে লাগলাম—প্রত্যহ হাতে ভাজা গমের আধ সের আটার লুচিগুলো কত অম্লান বদনে ও আনন্দে খেয়েছি—আর আজ যে রকম খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে দু' বেলা খেলাম তাতে মনে হচ্ছে না খাওয়ার মত করে খাওয়াই খেয়ে যেতে হবে। তবে যে জিনিসটা আমার কাছে বড় সে জিনিসটা এখানে পরিপূর্ণভাবেই পাওয়ার সুবিধা হয়েছিল। অর্থাৎ সাধনা ইত্যাদির সুযোগ পাওয়ায় মনে হয়েছিল ভগবানের অশেষ কৃপা, তাছাড়া এ-ও মনে করতাম—সাধনার সুযোগ যেখানে যত বেশী থাকবে তপস্যার মত হয়ে সেখানে অনেক কিছু তৃপ্তিদায়ক বস্তুর স্থান থাকবে না। সর্বদা তাঁর উপরই নির্ভর করতে হবে।

আমার চতুর্থ পুত্র নিহাররঞ্জন ১৯৬২ সালে বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শাস্ত্রীয় সংগীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে দিল্লী হতে ফিরে এসে তার গানের খাতার প্রথম পৃষ্ঠা'য় তার স্বরচিত একটি কবিতা লিখেছিল। হঠাৎ আমার নজরে আসায় পড়ামাত্র বুঝলাম ছেলের দৃষ্টি ঠিক পথে আছে। কবিতাটি এই— "অনন্ত সুর সাগরে সবে মোর যাত্রা হল সুরু

আসিবে প্রবল ঝঞ্ঝা গরজিবে মেঘ গুরু গুরু।
দৃঢ় হস্তে ধরতে হাল্ যেন নাহি হই গো কাতর
হে প্রভু সন্তান তব আশীর্ব্বাদ মাগিছে সত্বর॥"

মনকে সর্বদা এইভাবে তাঁর উদ্দেশে রেখে যেতে পারলে তবেই নানান বাধা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সব বিষয়ে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

এখানে প্রত্যহ খুব ভোরে উঠে ঘণ্টা দুই গান সেধে নিয়ে—তার একটু পরে বসতাম সেতার সাধতে। ঘণ্টা দুই বাজিয়ে তারপর স্নানাহ্নিক সেরে দু' পয়সার মিষ্টি আনিয়ে জল খেয়ে নিতাম। খিদের অনুপাতে দু' পয়সার মিষ্টি কিছুই হতনা কিন্তু তার বেশী পারতাম না। কারণ ভাবতাম যতটা বেশী পারি দাদুকে মণিঅর্ডারে পাঠাতে ততটাই তাঁকে সাহায্য করা হবে।

একজন খাওয়া-পরা, ঠাকুর, চাকরকে মাইনে দেওয়া ইত্যাদি সব মিলিয়ে মাসে পঁনর টাকার মধ্যে চালিয়ে নিতাম। বার আনা দামের বছরে খান তিনেক কাপড়, দুটো সস্তা গজের (চার আনা) লংক্লথের জামা,

সাত আনায় দুটো গেঞ্জি এবং ছ' আনায় দুটো গামছা—এই এতেই চলে যেত। জামা-কাপড় ধোপার কাছে কাচতে যেতনা, নিজেই সোডায় সিদ্ধ করে কেচে নিতাম।

সল্প ব্যয়ে সাধারণভাবে থাকতাম বলে এদিকটাতেও মহারাজা সকলের কাছে খুব প্রশংসা করতেন।

লালগোলায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় নিযুক্ত হয়েছিলাম, ক্রমশঃ একশ' পর্য্যন্ত হয়েছিল। এখনকার অন্ততঃ পঁনরশ'। কিন্তু মাইনে বৃদ্ধির সংগে আমার অণুমাত্রও ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি এবং হতে দিইনি।

এখানে আসার দ্বিতীয় দিনের কথা—অনাথবাবু নিয়মিত ব্যবস্থায় ভোরে বেরিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন আমার গান ও সেতার সাধা হয়েগেছে। অনাথবাবু নিজের ঘরে জলযোগ সেরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমিও আগের দিনে এনে রাখা একটি মিষ্টির দ্বারা জলযোগ করে তাঁর কাছে গেলাম। অবশ্য তার আগে একবাটি ছোলা ভিজে খেয়ে নিয়েছিলাম সেতার বাজাতে বাজাতেই। এই খাদ্যটি শরীরের সবলতা রক্ষায় বেশ উপকারী মনে হত।

অনাথবাবুর কাছে আসতেই পরম সমাদরে কাছে বসিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানালেন—মহারাজা আপনার সব বিষয়েই খুব প্রশংসা করছিলেন। সেই সময়ে কুমার বাহাদুর এসে পড়লেন। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কালরাত্রে আপনি আসার পর দাদু (মহারাজা) সকলের কাছে বলতে লাগলেন—চোখ বুজে শুনবার সময় মনে হচ্ছিল বয়স্ক ব্যক্তি যথেষ্ট অধিকার নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করছে—চোখ চাইলেই দেখি ছেলে, মানুষ—যার সবেমাত্র গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

এখানে সাধনার তালিকায় ছিল প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা করে গান এবং তিন চার ঘণ্টা করে সেতার ও সুরবাহার। দুপুরে ১২টায় খাওয়া দাওয়া সেরেই ৩টা পর্য্যন্ত বই দেখে গান তুলা, গানের স্বরলিপির উপর তৎপর লেখার অভ্যাস রাখা এবং গান রচনায় চেষ্টা।

একটা বিষয়ে আমার বিশেষ অভাব ছিল—তাহ'ল বাংলা ভাষায় দখল সম্বন্ধে। সংবাদপত্র পড়তাম কিন্তু সব কথার অর্থ বুঝতে পারতাম না। ছেলেবেলায় পাঠশালায় সামান্য মাত্র লেখাপড়া হয়েছিল।

ভাষাজ্ঞানের অভাবের বিষয় একদিন অনাথবাবুকে জানাতে তিনি

উপদেশ দিলেন -এই লাইব্রেরীতে যত রকমের বাংলা খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র ইত্যাদি আসে সেগুলো এবং অন্যান্য বাংলা পুস্তক খুব আগ্রহের সহিত বুঝবার চেষ্টা করে প্রত্যেক দিন কিছুক্ষণ ধরে পড়ে যান তাহলেই অল্প দিনে বুঝবার শক্তিতে অনেকখানি এগিয়ে যাবেন,—যে কথা-গুলোর মানে একেবারে বুঝতে না পারবেন সেগুলো খাতায় লিখে রেখে আমাকে দেখাবেন।" তাঁর উপদেশ মত রাত্রে খাবার পর দু' ঘণ্টা এবং দুপুরে ঘণ্টা খানেক খুব যত্ন নিয়ে পড়তে লাগলাম। এইভাবে পাঠে মনোনিবেশ রাখায় অল্প দিনের মধ্যেই ভাষাজ্ঞানে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলাম। অনাথবাবুও প্রশ্নাদির সন্তোষজনক উত্তরে খুব খুশী হতে লাগলেন।

একদিন আগ্রহ এল দেখি সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধের মত কিছু লিখতে পারি কি-না। 'কণ্ঠ সংগীতের চর্চায় ধ্রুপদের স্থান' এই নাম দিয়ে প্রবন্ধাকারে বেশ খানিকটা লিখে অনাথবাবুকে দেখাতে তিনি কোন কোন জায়গায় ভাষা সংশোধন করে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন—কোন পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন।" আমি সেই সময়কার সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা লেডি প্রতিভা চৌধুরাণীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামক মাসিক পত্রের কোলকাতা ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। পরের মাসেই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বারে 'রাগকল্পদ্রুম' হতে একটি গানের কথা নিয়ে ভৈরব রাগে বিলম্বিত তালের উপর সুরসংযোজনা করে পাঠাই। মেজকাকা গানটি কণ্ঠে তুলে খুব আশীর্বাদ করে বর্দ্ধমান হতে পত্র দেন। লিখেছিলেন—সুরের বিন্যাস ও বন্দেজ আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রবন্ধটিও ভাল লেগেছিল…… ।"

তাঁর এই অভিমত ও আশীর্ব্বাদ আমাকে খুবই উৎসাহিত ও ধন্য করেছিল। অতি ক্ষুদ্র সামর্থ্যেরও স্বীকৃতি তাঁরাই দেন যাঁদের খুব বেশী-রকম পাওয়া আছে। অধিকার প্রচুর না থাকলে হৃদয়ও বড় হয় না। হৃদয় ছোট হয়ে থাকলে সবই ছোট দেখায়। সেই তখন থেকে অর্থাৎ সতের বছরের সময় থেকে উক্ত পত্রিকায় আমার গানের স্বরলিপি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ পেত।

স্বরলিপির বিষয় নিয়ে একটি ঘটনা — জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় খাম্বাজ রাগের উপর ঠুংরী সুরে "শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা……… ।" এই

ভজন গানটি স্বরলিপি করে পাঠিয়েছিলাম এবং মেজকাকার ইচ্ছাক্রমে নাম ও বয়েসের উল্লেখ রেখে। উক্ত ঠাকুর মহোদয় এগার বছর বয়সের উল্লেখ দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে স্বরলিপিটি আগাগোড়া কণ্ঠে তুলে বিস্মিত হয়ে মেজকাকাকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন— স্বরলিপি ভাইপো'র নাম দিয়ে কাকার করে দেওয়া কি-না?

মেজকাকা উত্তরে জানিয়েছিলেন— স্বরলিপিটি সম্পূর্ণভাবে ভাইপো'র নিজের হাতে করা—আমাকে কোন জায়গায় সংশোধনও করে দিতে হয়নি......।" ঠাকুর মহোদয় কাকার চিঠি পড়ে তার উত্তরে আমাকে খুব আশীর্বাদ জানিয়ে তাতে লিখেছিলেন—ছেলেটিকে দেখতে ও তার গান শুনতে খুব আগ্রহ আসছে।" রাঁচীতেই আমার সে সৌভাগ্য হয়েছিল। তার কথা আগেই জানিয়েছি।

বাল্যকাল থেকে বিরাট বিরাট মনীষী ও বড় বড় গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের আশীর্ব্বাদ, উৎসাহ ও স্বীকৃতি আমার জীবনকে ধন্য করে এসেছে এবং সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি ও তপস্যার মত প্রেরণা সবই মহান মহান ব্যক্তিদের আশীর্ব্বাদেরই ফলস্বরূপ বলে মনে করি। এখনকার দিনে যেখানে যতটুকু মনের খাদ্য বিতরণ হয় তা আগের তুলনায় কিছুই নয়। ওইটুকু পাওয়ার কথায় মহাভারতের একটি গল্প মনে পড়ে যায়,—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের বেশ গর্ব্ব এসেছিল—এ রকম যুদ্ধ আমার মত আর কেউ করেনি এবং এত বড় যুদ্ধও কখন হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনের এইভাব বুঝতে পেরে এক নির্জন স্থানে নিয়ে যান—সেখানে গিয়ে অর্জ্জুন দেখেন—একটি খুব বড় শিমুল গাছের ডালে বসে একটি ভিসিণ্ডী কাক কাঁদছে।

অর্জ্জুন জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কাঁদছ কেন?

সেই বৃহতাকৃতি বায়সটি বলেছিল—যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল তখন রক্তের স্রোত এত উঁচু হয়ে বয়েছিল যে, এই ডালে বসে মুখ উঁচু করে আমি পান করেছি, তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধে রক্তের যে স্রোত বয়েছিল তাতেও এই ডালে বসেই ঘাড় নামিয়ে পান করতে পেয়েছিলাম। কিন্তু অর্জ্জুন বলে কে একজন এই সেদিন যে যুদ্ধ করল তাতে আমাকে নীচে নেমে ঠোঁট ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে রক্ত খেতে হয়েছে- তাই ঠোঁটের ক্ষত জ্বালায় কাঁদছি। একে যুদ্ধ বলে না-কি?"

এই উদাহরণে বলা যায়—আগে যে রকম সম্মান স্বীকৃতির বস্তু আকণ্ঠ পানের মত হয়েছিল এখন যেটুকু পাওয়া যায় তা ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাওয়ার মত।

তাও মনের উদরে যায় কিনা জানি না। এখন ঠোঁটের জ্বালার ঘটনার কথাটাই বেশী করে মনে আসে।

(৪৮)

লালগোলার কুমারবাহাদুরের গৃহশিক্ষক অনাথবাবুর একটু পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক আছে। ইনি নবদ্বীপের মহাপণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরমণির পৌত্র, বংশগত সংস্কৃত বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ভাবধারা সমস্তই দেশীয় ও আদর্শগত ছিল।

এঁকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমার বহুবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করেছিল। সময়মত প্রত্যেক দিনই আমার একান্ত আগ্রহে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের নাটক ইত্যাদি, বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা এবং পাশ্চাত্যদেশের সেক্সপিয়র, মিল্টন, সেলী, বাইরণ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবিদের লেখা ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। তার সংগে মাঝে মাঝে বেদ ও পুরাণের গ্রন্থও বাদ যেত না।

লালগোলায় সর্ব্বদা সময়কে কাজে লাগিয়ে দিনগুলি দ্রুত তালে এগিয়ে যেতে লাগল।

কুমারবাহাদুর আমার সংগে অনেকটা সখ্যভাব নিয়েই যেন মেলামেশা করতেন বলে মনে হত, অবশ্য তফাৎ রক্ষায় সতর্কতা বজায় রেখে। আমাকে তো সব বিষয়ে সংযম রেখে যেতে হতই।

মহারাজা ছিলেন সব দিক দিয়েই খুব কড়া নিয়মানুবর্ত্তীর মানুষ। যে যেমন স্থানের ব্যক্তি তাকে ঠিক সেইভাবে থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন। এটা মনে হয় সমস্ত বড় লোকদেরই কৌলীণ্যের বা আভিজাত্যের একটা গর্বিত লক্ষণ। যাই হোক্ কুমারবাহাদুর কিন্তু উক্ত নিয়ম রক্ষার এতখানি বাঁধন সহ্য করে চলতে পারতেন না। নিয়মে ঘেরা শক্ত পাঁচিরের ফুকার কেটে অতি অন্তর্পণে আমাদের কাছে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হতেন এবং এক একদিন রাজ মর্য্যাদার দুর্গে নানান কৌশল অবলম্বন করে মহারাজার চোখে ধুলো দিতে পারলাম ভেবে নিয়ে যেতেন আমাকে তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানার নিভৃত স্থানে। আবার পৌঁছে দিতেন সেইভাবে। আমার কিন্তু ভয়ের উপর বেশ আড়ষ্টভাব থাকতই। কারণ

মহারাজার চোখ এড়ান যে খুবই শক্ত এ ধারণা আমার ভালভাবেই ছিল কিন্তু কুমারবাহাদুরের প্রবল ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারতাম না। যাই হোক্—তাঁর কাছে গেলে সেই সময়টুকু খুব তৃপ্তি নিয়ে কাটত আনন্দোচ্ছল ব্যবহার পেয়ে। তবে খোদ মালিকের এসব অনভিপ্রেত বলে বিশেষ করে যাতায়াতের পথে হৃৎকম্প বড় কম হতনা এবং কুমারেরও।

একদিন কুমারবাহাদুর আমাকে নিয়ে গিয়ে বসলেন দাবা খেলতে। ঘুঁটিগুলো সবে মাত্র চালনা করা হয়েছে সে সময় বারাণ্ডার উপর মহারাজার বংশযষ্টির ঠকাঠক্ শব্দ ও গলার আওয়াজ যেই কাণে এল ওমনি কুমারবাহাদুর ধীরেন্দ্রনারায়ণ সটান চৌকীর তলায় প্রবেশ করলেন হামাগুড়ি দিয়ে, আমি খুনি আসামীর মত ধরা পড়লাম, সে সময় মনে হয়েছিল যেন আমি বেঁচে নাই।

মহারাজ চৌকাঠ হতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফেকাসে মৃত ব্যক্তির মত আমার মুখের চেহারা দেখে অপ্রস্তুতের মত ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যাবার সময় মিষ্টি গলায় বলে গেলেন—সত্য কি কচ্চ হে ?"

আর কি কচ্চি ; তখন মনের অবস্থা যা, তা আমি মারাত্মকভাবেই বুঝচি, মনে মনে বললাম—আপনার নাতিটির অবস্থা একবার চৌকীর তলা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে গেলেই ভাল হত।

ওঃ সেদিন মহারাজার ওই একটু দৃষ্টি নিক্ষেপেই মনে হয়েছিল ফাঁসির হুকুমের চেয়েও বেশী।

কি ভীষণ রাশভারি ছিলেন, জীবনে এমনটি দেখিনি। তাঁর সেই দীর্ঘ-শুভ্র দাড়ি গোঁফ, গেরুয়াবসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে বংশযষ্টি এইসব মিলিয়ে সে সময়কার চেহারায় রাশভারিত্বকে আরো বেশী ভীষণ করেছিল। 'কপালকুণ্ডলা' লেখাটা তখন পড়িনি, পড়লে হয়ত ঠিক জায়গায় তুলনা দিতে পারতাম।

তারপর কুমারবাহাদুর ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চৌকীর তলা থেকে বেরিয়ে এমন এক দৃশ্যের অবতারণা করলেন যে, তখন ভয় ও হাসির যুগপৎ সংঘর্ষে দম্‌বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

কুমারবাহাদুরকে উপভোগ্য রসিক মনে হত। এই গুণ বড়লোকদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তাছাড়া তাঁর সব বিষয়ে প্রতিভাও ছিল উল্লেখযোগ্য। যে কোন কঠিন বিষয় তাঁর কাছে মীমাংসায় আসতে দেরি হয় না। ওই রকমভাবে যাতায়াত করে আমার কাছে সেতার ও তবলা বাজা

শিখে নিতেন। অবশ্য শিক্ষা-সাধনার নিয়ম ধারা কিছু ছিল না,—প্রতিভার প্রকাশই ছিল উদ্দেশ্যমূলক হয়ে। তাল-মাত্রার বোধজ্ঞান খুব অল্পদিনেই আনতে পেরেছিলেন।

আমি বন্দুক চালাতে পারি জেনে তাঁর খুব আগ্রহ এল চালাবার নিয়ম প্রণালী শিখে নেবার।

সেই দিনই বিকেলে আমাকে ও অনাথবাবুকে সংগে নিয়ে গেলেন বন্দুক হাতে করে ফাঁকা জায়গায়।

কলকলি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অল্প দূরে একটা বাবলা গাছে বসে থাকা পাখীকে দেখিয়ে সমস্ত নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে বললাম পাখীটার বুক কিংবা মাথাটার লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে দিবেন খুব শক্ত করে বুকের কাছে ধরে। করলেও তাই—আওয়াজও হল কিন্তু পাখীটা বুঝতে পারল না আওয়াজটা তারজন্য কিনা। বোধ হয় মনে করল—ছেলে-পুলে কেউ দূরে ফটকা ফুটোচ্চে। চালাবার সময় বন্দুক ধরা খুব আলগা হয়ে যাওয়ায় কিংবা বুকে না ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপে দেওয়ায় নলটা উপর দিকে পশ্চাৎমুখী হয়ে টোটার মধ্যস্থিত শ'খানেক শিশের ক্ষুদ্র গোলাকারের অস্ত্রগুলো নদীর জলে বিরাট ঝাটার আকারে সশব্দে পড়ে গেছল। নিশানা যে এমনভাবে উল্টো দিকে ঘুরে আসে তা সেদিনই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কুমারবাহাদুর জলে পড়া অস্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে গাম্ভীর্য্যকে টেনে এনে অপ্রস্তুতত্বকে (অবস্থা) ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর দিকে সকরুণ মমতা নিয়ে দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে খুব মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। যাই হোক— কুমারবাহাদুর খুব রসিক বলে ঘটনার দৃশ্যরূপে নিজেও একটু পরে খুব হেসে উঠতে আমরাও হেসে হাফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। তার পরের দিন থেকে খুব যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে বন্দুক চালনা অভ্যাস করতে লাগলেন। তখন একশ' বিলেতী টোটার দাম ছিল দশ-বার টাকা। প্রত্যেক দিন দু'-তিন শ' নানান স্তরের টোটা নানান পদ্ধতির উপর চালনা করে অল্পদিনের মধ্যেই নিশানায় ও শিকারে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠলেন। আমি কেবল চালনার নিয়মটুকুই বাতলে দিয়েছিলাম। তারপর এই শিক্ষায় তিনি নিজেই গুরু ও নিজেই শিষ্য ছিলেন।

এ বিষয়ে আমি একলব্যের তুলনা দিতে পারলাম না—কারণ তাহলে আমি অন্যায়ভাবে দ্রোণের পর্য্যায়ে এসে যাব।

(৪৯)

লালগোলার পরিচয়,—

এখানে আসার কিছুদিন পরেই আমাদের রন্ধন খেঁটুপটু উড়েছোকরাটি অগ্রিম টাকা নিয়ে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল। এক রকম বাঁচা গেল। তার রান্না দ্রব্যে বদন মধ্যস্থিত তাম্বুলের অভ্যন্তর হতে নিক্ষিপ্ত সুপারিখণ্ড পাওয়া যেত, বোধ হয় কাশির ধাক্কায়।

সেই অভিজ্ঞতার সময় থেকে আমি এই মনে করি এদের হাতে রান্না খাওয়া পাপের শাস্তি স্বরূপ। অথচ এদেরই হাতে রান্নার রাজত্বটার প্রায় সবটাই দখলে আছে। আগে ক্রিয়া কর্ম্মে বাড়ীর মেয়েদের সংগে পাড়ার মেয়েরা যোগ দিয়ে তাঁরা সকলে আনন্দের সহিত শত শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্য বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতেন। পরিবেশনেও তাঁদের একান্ত আগ্রহ থাকত।

আগে বহু জায়গায় দেখেছি মেয়েরা কোমরে শক্ত করে শাড়ীর আঁচলা জড়িয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশন করতেন,—তাঁদের সংগে বধূরা উপযুক্ত মত ঘোমটাটি মাথায় রেখে মধ্যালয়ে সুঠামভঙ্গীর দৃশ্যশোভায় যখন পরিবেশন করতেন তখন মনে হত যত্ন ও আন্তরিকতার এক প্রতিচ্ছবি।

এই পরিচয় এখনও পাওয়া যায় আমাদের দেশের এক বিরাট সম্ভ্রান্ত বংশের 'দুর্গা পূজায়'। উক্ত কাজে নিযুক্ত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা ও পদমর্য্যাদার অধিকারিণী।

এখন সংসারে মাত্র দু'একজনের জন্যও অনেক বধূরা (অবশ্য এখন ঠিক বধূ বলা যায় না—বধূর বিশেষণ ধরে অনেককে দেখে মনে হয় যেন ভাগিনী বা অনূঢ়া) রাঁধুনী রাখেন।

যাই হোক্—উড়েঠাকুরটি চলে যাওয়াতে খাদ্যবস্তুর বীভৎস প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল বটে কিন্তু অন্য কোন রুচিকর লোক এই কাজের জন্য আর পাওয়া গেল না। এখানে রান্নার ঠাকুর মিলে না, ওই প্রভুই ভোজন ভাগ্যবিধাতারূপে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অবতীর্ণ হয়েই তিরোহিত হলেন।

উপায়ান্তর আর কোন না থাকায় আমাদেরই রন্ধনকার্য্যের ভার নিতে

হল। আমার অভিজ্ঞতা থাকায় অনাথবাবুকে কষ্ট পেতে হল না। তিনি কেবল এক একবার পোঁ ধরতেন আর আমি হাতা-খুন্তি নিয়ে রান্নার রাগ-তালের ডেমনেস্ট্রেশন্ দিয়ে যেতাম।

এই বিদ্যাটির এমনই প্রভাব যে, আয়ত্তে আসলে চিরকালই তার প্রকাশ শক্তি থেকে যায়। অভিজ্ঞতায় বুঝে আসছি অদৃষ্টের সংগে এর যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।

ডাল আর একটা তরকারী—এর বেশী আর হয়ে উঠত না। অনাথ-বাবু প্রথম দিনেই আমার রান্না খেয়ে বললেন—বাড়ীর রান্নার মতই খেলাম। তবে তিনি খুব সঙ্কোচবোধ করতেন। আমি বলতাম—আপনি আমার পাড়াশুনা ও তার জ্ঞানের দিকটায় গুরুর কাজ করছেন—সুতরাং এ বিষয়ে শিষ্যেরও কর্ত্তব্য আছে, আমার সামর্থ্য এইটুকুই। আমার এই কথাটি অনাথবাবু অনেকের কাছেই পরিচয়ের গভীরত্ব নিয়ে বলতেন।

এখানে মাসে একবার করে খুব অসুবিধায় পড়তাম, দু'একদিনের জন্য অনাথবাবু যখন বাড়ী যেতেন। অতবড় প্রাসাদ বাড়ীতে একা নিঃশব্দ অবস্থায় কাটান খুব কষ্টকর হত,—বিশেষ করে রাত্রে।

কাছে থাকার কোন ব্যবস্থা করে না দেওয়ায় আমিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতাম না। কারণ বিদেশে এসেছি—একা থাকার সাহস নেই—এ দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারিনি। শীতকালে একটু ভয় বেশী করত। মধ্যরাত্রে জানালার নীচের তলা দিয়ে প্রায়ই চিতে বাঘ হুঙ্কার ছেড়ে চলতে থাকত। জ্যোৎস্না থাকলে বেশ দেখা যেত। দরজার মত বড় রকম জানালাগুলোর রড যে রকম ফাঁক ছিল— ইচ্ছে করলে সেই সুন্দর বদনটি নিয়ে দন্ত বিকশিত করে অক্লেশে ঢুকে পড়ে আলিঙ্গন করে দিয়ে যেতে পারত। এখানকার ঝোপ-জঙ্গলে চিতেবাঘ ও বুনোশূয়োরের সংখ্যা খুবই ছিল। গ্রামপ্রান্তের বাগানে বেড়াবার সময় হঠাৎ ঝোপ থেকে বুনোশূয়োর বেরিয়ে পড়ত— তখন তাড়াতাড়ি গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়তে হত। কোন কোন দিন চিতে ও শূয়োরের মল্লযুদ্ধ ও মাটি কাঁপান হুঙ্কার ও চিৎকার শুনে ছুটে পালিয়ে আসতে হত।

লালগোলার পশ্চাৎ হতে মাইল দুই তফাতে প্রসাদপুর নামে মুসলমানদের একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্তবংশের কেকন মহম্মদ নামে এক যুবক আমার কাছে সেতার শিখতে আরম্ভ করল। অদ্ভুত তার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও গুরুভক্তি ছিল। কেকনের দাদা ছিলেন

বেশ মার্জিত রুচিবান ও উচ্চমনা, সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ সমধিক ছিল, তব্‌লা বাদ্যেও তাঁর অধিকার ছিল। এঁদের বাপ, পিতামহ প্রভৃতি নবাব দরবারে সম্মানীয় ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছিলাম প্রত্যেক সম্রান্ত ব্যক্তির মধ্যেই শাস্ত্রীয়সংগীতের উপর গভীর অনুরাগ।

বিশেষ ব্যবস্থার উপর ফেকন্ যেদিন তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেত সেদিন তার দাদার কাছে এবং গ্রামবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধা, আদর ও আপ্যায়ন পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাল ভাল খাবারের আয়োজনও থাকত। ফেকন্ প্রায়ই মাছ, ফল ইত্যাদি আমার জন্য নিয়ে আসত। বর্ষাকালে রান্নার জন্য গাড়ীতে করে কাঠ, ঘুটে এই সব দিয়ে যেত। এগুলো ঐ সময় ভীষণ দুষ্প্রাপ্য ছিল। ওই ছাত্রটির জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন দিনই আমি অসুবিধায় পড়িনি। ডাল, আটা আমাকে কিনতে হত না। আমের সময় তাদের বাগানের উৎকৃষ্ট আম প্রচুর এনে দিত এবং দেশে পার্শেল করে দু'তিন টুকরি আম, আমসত্ব পাঠিয়ে দিত। দেশে আসবার সময় চাষে উৎপন্ন মসুর ডাল, আটা, খেজুর গুড় ইত্যাদি আমার সংগে দিত ট্রেণে তুলে।

গুরুর প্রতি করণীয় কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি ছিল না। কোলকাতায় যখন এলাম তখনও ফেকনের দাদা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন অর্থাৎ বেশ কয়েক বছর পর্য্যন্ত এখানের বাসায় আমের টুকরী ও আমসত্ব এবং খেজুর গুড় পাঠিয়ে দিতেন।

পাকিস্থান হবার পরই নিরাপদের জন্য রাজসাহীতে ফেকন্‌রা চলে যায়। অল্পদিনেই সেখানে সেতারের শিক্ষকতায় বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশ ভাল শিখে হাত তৈরী করেছিল। এই জাতের একটা বড় গুণ শিক্ষা গুরুকে চিরকাল দেবতার মত দেখে এবং অন্তর দিয়ে সেবা-সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে।

আমের সময় এই দেশটাকে আমের রাজ্য মনে হত। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের বাগানে দু'টি বিখ্যাত আমের পরিচয় ছিল—এখন আছে কিনা জানি না। আম দুটির নাম বীরা ও কহিতুর। এই আমের কলম কারো পাওয়ার অধিকার ছিল না। মহারাজকে বছর বছর অনেকগুলো করে এই আম নবাব বাহাদুর পাঠিয়ে দিতেন। এই আম থেকে মহারাজ আমার কাছে অনেকগুলো পাঠিয়ে দিতেন। সেই

আম খেয়ে তার প্রশংসা কিভাবে করা যায় ভেবে পেতাম না।

আমের সময় দু' তিন মাস শুধু ভাল ভাল আম খেয়েই পেট ভরে থাকত। প্রত্যেক দিনের তার সংখ্যা জানালে এখন হয়ত কেউ বিশ্বাস করবে না।

লালগোলায় প্রথম এসে একাদিক্রমে আট মাস থেকে ৺দুর্গাপূজার সময় দেশে এলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে মাঝে মা, দাদু প্রভৃতির জন্য মনটা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠত। তবে কর্তব্যটা আমার কাছে ছোট ছিল না বলে ধৈর্যাও ছোট ছিল না। তবুও এক একদিন যখন ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে যেতাম তখন কোলকাতা মুখী ট্রেনের লাইনটাকে দেখে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতাম, মনে হত ও-ই আপনজন, আমাকে দেশের পথে নিয়ে যেতে বুক পেতে আছে। ষ্টেশন থেকে চলে আসবার সময় লাইনটার দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে মন যেত। দেশে এসে ৺পূজার পরই ভেলাইডিহায় চলে গেলাম কথা রক্ষার কর্ত্তব্য পালনের জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসেই ধার্য্য সময়ের শর্তমত লালগোলায় চলে এলাম। এক মাসের মধ্যে মাত্র দু' দিন মায়ের কাছে থাকা হয়েছিল। মা আমার কাছে দূরের বস্তু হয়েই থাকবেন তখন এই ছিল ভাগ্যলিপি।

(৫০)

কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের উপর,—

দেশ থেকে ফিরে আসার পরই মহারাজা আমাকে ডেকে বললেন— আমি কোলকাতার ডোয়ার্কিনের দোকান থেকে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র, যেমন— সুরবাহার এসরাজ, জলতরঙ্গ, ব্যাঞ্জো, বেহালা, সারেঙ্গী যদি আনাই তাহলে তুমি অভ্যাস করে আমাকে শুনাতে পারবে? আমার মনে হয় তুমি পারবে—কি বল?

আমি বললাম—যন্ত্রগুলো আনান,—মনে হয় গুরুর কৃপায় পেরে যাব।

খুব শীঘ্রই যন্ত্রগুলো এসে গেল। মহারাজা বললেন—দুপুরে খাওয়া সেরে আমার পাশের ঘরে বসে অভ্যাস করবে—দেখব কেমনভাবে তুমি পারছ।

প্রত্যহ বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত এক একটা যন্ত্রের উপর হাত চালাতে লাগলাম। সুরবাহার বাজাতে কোনই অসুবিধা হল না সেতারে আলাপ বাজানর অভ্যাসের দরুণ।

এসরাজ, জলতরঙ্গ, পর্দাহীন ব্যাঞ্জো—এই তিনটির বাদন পদ্ধতি দেখে-থাকায় সেইমত প্রণালীকে ধরে সাধতে লাগলাম। কিছুদিনের মধ্যেই যন্ত্রগুলোতে রাগরূপ অঙ্কন যখন করতে থাকলাম তখন তা শুনে মহারাজা খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। এক মাসের মধ্যেই রাত্রের আসরে শুনাবার মত হাত তৈরী হয়ে গেল।

মুস্কিল হল সারেঙ্গী ও বেহালাকে নিয়ে। সারেঙ্গীটার বাদনক্রিয়া যে স্থানে যে স্তরের মানুষের দ্বারা বরাবর শুনে এসেছিলাম তাতে ওটার উপর মোটেই শ্রদ্ধা আনতে পারেনি। কাঁধের কাছে তুলে দাঁড় করালেই মনে হয়ে যেত যেন সেই বাদকরা কোমরে বেঁধে বাঈজী বা নর্তকীর দু'পাশে দাঁড়িয়ে বাজাচ্চে—পাগড়ী-চাপকান পরা, সুর্মা চোখে—লাল দাড়ির শোভা নিয়ে আর বাঈজী হাত নেড়ে চোখের ইসারা নিক্ষেপ করে ভাও বাতলে গান ধরেছে—'মেরে জীবন পিয় কঁহা গয়ে······।' সেই বাস্তব দৃশ্য মনে হওয়া মাত্র বাজনাটাকে তৎক্ষণাৎ লজ্জায় নামিয়ে দিতাম একেবারে নীচে। বেহালাটায় দিনকতক আঙ্গুলের টিপ্ বসিয়ে তারপর আর তাকে কদর করতে পারলাম না। কারণ বাল্যকাল হতে ওটাকে যাত্রার দলে বাজাতে দেখে এবং ওর মধ্যে যাত্রার সুর শুনতে শুনতে মনে তার প্রভাব এমন বর্তে গেছল যে কোন একটা রাগের রূপ আনবার ইচ্ছে করলে সেই মুহূর্তে যাত্রার সুরগুলো ভিড় করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেত। তাছাড়া এ-ও মনে হত ওটা আমাদের স্তরের সাধকদের জন্য যন্ত্র নয়—তাই কেউ বাজায় না। অবশ্য এখন অনেক দিন হতে শিল্পী সমাজে ওর যথার্থ সমাদর এসেছে। এখন আবার গিটারের প্রচলন বেশ বেড়ে গেছে। এটিকে অনেকে বলে Cat Crain Interment অনেক দিন আগে মেণ্ডোলীনের খুব প্রচলন বেড়েছিল। আমরা হচ্ছি হুজুগের ও পরসেবীর জাত।

যাই হোক্—সেই যন্ত্র দুটি ভাল হলেও আমার ধাতে সহ্য হল না। মহারাজকে এইসব কথা বলাতে তিনি সহাস্যে বললেন—আচ্ছা তবে ও দুটো যন্ত্র বাজান থাক।

অন্যগুলোর সাধনার সময় আরো কিছুক্ষণ করে বাড়িয়ে দিলাম।

বিকেল পড়ে আসবার সময়ে মহারাজ বলতেন—এবার কিছু খেয়ে এস—আমার সংগে বেড়াতে যাবে।"

তাঁর সংগে বেড়ান মানে পাঁচির ঘেরা বাগানের উঁচু-নীচু মাটির উপর বহুক্ষণ ধরে হাঁটা। বৃদ্ধ মহারাজার সংগে আঠার বছরেরও কম বয়সের যুবকের বেড়ান কিরূপ যে আনন্দদায়ক তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতাম। এঁদের কাছে আমাদের 'হুঁ' ছাড়া 'না'কথার ব্যবহার চলে না,—'না' বলার মত যতই যুক্তি থাক না কেন।

এখানে দুপুর বেলায় আমার কাজ ছিল পড়াশুনা কর', স্বরলিপি অভ্যাস ও স্বরলিপি দেখে গান তুলা এবং কোন কোন দিন গান রচনার চেষ্টা করা। ওই সময়টিতে যন্ত্র সাধনায় নিযুক্ত থাকায় আগের গুলোর অভ্যাসের সময় যথাযথভাবে সমাধান করে নিতাম অন্য অন্য সময়ে ফাঁক পেলেই।

এই রকমভাবে সংগীতের নানা বিষয়ে অধিকার ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিনগুলি কখন যে পেরিয়ে যেত তা বুঝতেই পারতাম না। সময় নষ্ট করতে নেই এই মূলমন্ত্র আমি পেয়েছিলাম গুরুর কাছে, অর্থাৎ মেজকাকার কাছে।

কিছুদিন পরে মহারাজার ইচ্ছে হল বাঁশীতে রাগালাপ শুনবেন। একটা পিক্লো বাঁশী ডোয়াকিনের দোকান থেকে আনিয়ে বললেন—পঁনর দিনের মধ্যে আমার ফর্মাস্ মত রাগরূপ শুনাতে হবে।" আমি জানালাম—তাহলে ওই ক'দিন দুপুরে এসে অন্যান্য যন্ত্রগুলো বাজান বন্ধ থাক। সেইদিন থেকে দুপুরে খাওয়া সেরে থাকার ঘরের দরজা বন্ধ করে দু'দিন কেবল বহুক্ষণ ধরে বাঁশীতে স্বরগুলো তুলতে লাগলাম। রাত্রে গান-বাজনার পর মহারাজা জিজ্ঞেস করতেন বাঁশী কদ্দুর হল ? দিনগুলো যতই কমে আসতে লাগল ততই তিনি জানিয়ে দিতেন তার সংখ্যা।

পঁনর দিনের দিন রাত্রের আসরে বাঁশী নিয়ে উপস্থিত হলাম। সবাই খুব উদ্‌গ্রিব ও উৎসুক হয়েছিলেন।

মহারাজা বললেন 'দরবারী কানড়া' শুনাও।

আলাপের পর গৎ এ তান ইত্যাদি প্রকাশ করে বাজান শেষ করতেই মহারাজা খুব হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন— একজনের মাধ্যমে আমি গায়ক ও বহুযন্ত্রী পেলাম······।"

এখানে থাকার প্রায় দু' বছরের কাছাকাছি সময়ে এক জরুরি প্রয়োজনে পৌষ মাসের প্রথম দিকে বাড়ীতে এলাম দিনকয়েকের জন্য। সে সময় লর্ড লিটনের বাঁকুড়া আসা উপলক্ষ্যে আমাকে যেতে হল সেখানের অনুষ্ঠাতাদের ঐকান্ত আহ্বানে এবং যথা দিনে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে নিয়ে গেলেন। দরবার সভায় পঞ্চকোটের মহারাজা আমার পরিচয় পেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন তাঁর থাকার স্থানে সেই দিনই রাত্রে গাঁন বাজনা শুনবার জন্য এবং ঠিকানা জেনে নিয়ে বললেন—সন্ধ্যার পর গাড়ী পাঠাব। যথাসময়ে গাড়ী আসতেই সঙ্গীত অনুরাগী ডাঃ সতীশ রায়ের সংগে রওনা হলাম। ইনি আমার দাদামহাশয়ের দেশে তখন ডাক্তারি করতেন। অন্য ব্যবসায়ী হয়ে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রতি এত আগ্রহ প্রায় দেখা যায় না। যেতেই মহারাজা আমাকে কাছে ডেকে আদর যত্ন করে বসালেন।

গান-বাজনা আরম্ভ হল। বাঁকুড়া জেলার তখনকার বিখ্যাত তব্‌লাবাদক কেদার মোদক সঙ্গতে বস্‌ল। কয়েকটি রাগের ফরমাসের উপর বহুক্ষণ ধরে গান ও সেতার পরিবেশন করলাম। সকলেই খুব উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করলেন। মহারাজা সেতারের বিষয়ে বললেন —দু' আঙ্গুলে মেচ্‌রাপ্‌ পরে এমন পরিষ্কারের উপর বাদনক্রিয়া শুনা যায়নি, অদ্ভুত লাগল। এঁদের বংশ পরম্পরা শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা এবং সঙ্গীতজ্ঞদের সসম্মানে রাখা ও আহ্বান করা অব্যাহত ছিল।

এই মহারাজের পিতা নীলমণি সিংহবাহাদুর সুরবাহার বাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর সুরবাহারে মাত্র চারটি পর্দা ছিল, তার উপর টান দিয়েই তিনি আলাপ বাজাতেন। বাস্তবিকই এটা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই মহারাজার দরবারে তখন সুরবাহার বাদক মহদদ খাঁ সাহেব ছিলেন এক প্রাচীন ঘরাণার এ কথা আগেই বলেছি। আর কাশ্মীরের বিখ্যাত বংশের খেয়াল গায়ক—আলতাফ খাঁ ছিলেন। এঁর চেহারায় যেমন গৌরবর্ণ রং ছিল তেমনি স্বাস্থ্য ও সুন্দর গঠন ছিল। তবে গানের রসে সুন্দর ছিল না। যাই হোক—সেদিন এই গায়ক ও যন্ত্রী দু'জনও আগ্রহভরে শুনে প্রশংসা ও উৎসাহদান করেছিলেন। পশ্চিমী গায়ক-বাদক ও শ্রোতাদের প্রশংসা প্রদানের মধ্যে ভেজাল থাকে না, অর্থাৎ সামনে এবং পেছনে দু' রকম মন্তব্য এঁরা করেন না—এটা আমি বরাবর দেখে আসছি।

তারপর সেদিন মহারাজা সকলকে নির্দেশ দিলেন আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ধরে রেখে দেবার জন্য। অর্থাৎ তিনি আমাকে সেইদিনই রাত্রের ট্রেণে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যাবেন এবং স্থায়ীভাবে রেখে দেবেন সমস্ত ব্যবস্থা করে, এই কথা একটু পরে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে জানিয়ে দিলেন। শুনে আমি হকচকিয়ে যাই, তাঁকে জানালাম—লাল-গোলার মহারাজার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি, শীগ্‌গীর্ ফিরে যেতে হবে কিন্তু কোন আপত্তিই টিকল না—পঞ্চকোটরাজের আগ্রহের কাছে। আমার কাছে এসে বললেন—চাচা! তোকে নিয়ে যাবই।"

তাঁর এই ভাষা আমি ধরতে পারিনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রাইভেট সেক্রেটারী সৌরীনবাবু বুঝিয়ে বললেন—মহারাজা তাঁর ছেলেদের বড়চাচা, মেজচাচা বলে আদর করে ডাকেন এবং তুই, আয়, এসব ভাষা যাদের খুব আপন ভাবেন তাদেরকে বলেন।"

শুনে আশ্বস্ত হলাম ও আনন্দ এল।

এই সৌরীনবাবু ছিলেন ইংরেজীতে এম-এ, বয়স বেশী ছিলনা, গানও গাইতে পারতেন, গলাটি বেশ মিষ্টি ছিল। আমাকে নিয়ে যেতে তাঁরও আগ্রহ সমধিক ছিল।

উপায়ান্তর না দেখে ডাঃ সতীশবাবুকে ভার দিলাম আমার এই অবস্থার কথা বাড়ীতে জানিয়ে দেবার জন্য।

রাত চারটার ট্রেনে এঁদের সঙ্গে পঞ্চকোট (কাশীপুর) রাজধানী অভিমুখে রওনা হলাম। আদ্রা ষ্টেশনে নেমে গাড়ীতে চড়ে দক্ষিণমুখী পাকা রাস্তায় ছ'মাইল অতিক্রম করে যখন রাজধানীর শেষ সীমায় রাজপ্রাসাদের সামনে এসে নামলাম তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। সৌরীনবাবু এবং সেই বিভূতিবাবু খুব যত্নসহকারে প্রাসাদ অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। প্রথমবারে এই বিভূতিবাবুর কাছে ধর্ণা দেওয়ার মত হতে হয়েছিল কৃপাকণাপ্রাপ্তির জন্য, আর এখন কি খাতির যেন সেই মানুষই নন। খোদ মালিকের নজরে না এলে এই রকমই যে হয় সে কথা অনেক আগেই জানিয়েছি।

রাজপ্রাসাদটি সত্যই দেখবার মত। সোপানের দু'পাশে এবং উপর দিকের নক্সার কারুকার্য্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। রাজপ্রাসাদ বহু দেখেছি কিন্তু এমন সিঁড়ির বাহার কোথাও দেখিনি। জাপানী মিস্ত্রীদের হাতে তৈরী। সেগুন কাঠের সিঁড়ি কিন্তু আগাগোড়াই দেখলে মনে হবে মার্বেল

পাথরের তৈরি। উঠতে-নামতে একটুও শব্দ হত না। প্রসাদটির অন্যান্য বর্ণনা আর অনাবশ্যক। এখানের প্রাসাদভৃত্য, আর্দালী এবং অন্যান্য পরিচারকদের ব্যবহার খুব নম্র ও সহৃদসৌজন্যপূর্ণ দেখেছি।

তারপর সেদিন সকালের কাজ সমাধা হতে মহারাজার ব্যবস্থাপনায় সৌরীনবাবু নিয়ে গেলেন গাড়ীতে করে রাজধানীর পূর্বপ্রান্তে কুমার-বাহাদুরদের স্বতন্ত্র অট্টালিকায়। গেটের কাছে পৌঁছতেই সান্ত্রী সামরিক কায়দায় বন্দুক তুলে অভিবাদন জানাল। বৈঠকখানার সামনে গাড়ী হতে নেমে সৌরীনবাবু বড়কুমারের কাছে যেয়ে আমার বিষয় বলা মাত্র তাঁরা তিন ভাই এসে আমাকে খুব সম্মানের সহিত ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পাশের একটি পৃথক ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। একটু পরেই আমাদের দু'জনের জন্য জলযোগের প্রচুর খাদ্য এসে গেল।

এখানে কিভাবে আসতে হল তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে দাদুকে এবং লালগোলার মহারাজকে পত্র দিলাম।

(৫১)

এখানে আসার প্রথম দিনের রাত্রে রাজা বাহাদুরের কাছে আমার গান বাজনা বহুক্ষণ ধরে হল। তাঁর গায়ক-বাদকরা, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও আমলাবর্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয়েছিলেন।

সৌরীনবাবু আগেই জানিয়েছিলেন—রাজাবাহাদুরের খুড়তুত ভাইদের বড় লালসাহেব, মেজ লালসাহেব, এই রকমভাবে সম্বোধনের প্রথা চলে আসছে। তখনকার তাঁরা সকলেই শাস্ত্রীয়সংগীতের খুব অনুরাগী এবং অল্পবিস্তর চর্চাও করতেন এবং এঁরা খুব ভাল সমঝদার ছিলেন। সেদিন শ্রোতা পরিবেশ খুব ভাল থাকায় আমার গান-বাজনা খুব আগ্রহের উপর পরিবেশিত হয়েছিল

এইসব রসজ্ঞ শ্রোতাদের আলতাফ্ খাঁ এর গান পছন্দ হত না। কারণ—খাঁ সাহেবের বেশ তৈরীর উপর তান্নাদি প্রকরণ খুব ভালই ছিল কিন্তু খুব চড়াসুরে দুর্দান্ত জোরে গাইতেন বলে রসগ্রাহী শ্রোতাদের আনন্দদায়ক হত না।

মহারাজা রেখেছিলেন তাঁর তৈরীর সম্মান দিয়ে। তাঁর বিচারসহ

অভিমত ছিল শুধু মাধুর্য্যের উপরই মান নির্ণয় করা চলে না—ক্রিয়াজ শক্তিতে বিপুল অধিকারী ব্যক্তিদের সম্মান পাওয়ার অগ্রাধিকার আছে। বড় জিনিষের সংরক্ষণে উৎসাহ ও সম্মান না দিলে সেগুলি লোপ পেয়ে যাবে।"

কথাটা খুবই সত্য, তবে সংগীতের মোহিনী শক্তিই হল প্রধান, সুতরাং দেখতে হবে সেই শক্তিকে আয়ত্তে এনে শ্রোতাদের ও নিজের অন্তরকে তৃপ্তি দিতে পারছে কিনা। মোটের উপর আগেই বলেছি—শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে আহা, বাহা দুটোই সমভাবে থাকা অত্যাবশ্যক। 'আহা' সংগীতের প্রাণের সাড়া জাগায় আর 'বাহা' আনে তার সুঠাম মূর্ত্তির উপর অলংকারের নিখুঁত সমাবেশ।

শুধু কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয় জ্ঞাপন এবং রসহীন গানে ও বাজনায় থাকে না সংগীতের সত্যকারের পরিচয়।

পঞ্চকোটে আসার মাস খানেকের মধ্যেই আলতাফ্ খাঁসাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কেন গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। খাঁসাহেব আমাকে কিন্তু খুব স্নেহের চক্ষে দেখতেন। কাছে গেলেই নানান রাগের গান শুনাতেন। আমি তাঁর গায়কী ও গানের বন্দেজ খুব মনযোগ দিয়ে শুনতাম এবং সেগুলো গ্রহণ করতে খুবই প্রচেষ্টা রাখতাম। তিনি বলতে পারতেন না দু' একটা শিখে নেবার জন্য এবং আমিও কর্ত্তব্য বোধে তা চাইতাম না। এই কর্ত্তব্যের মধ্যে আমার যে এক সঙ্কল্প আছে পরম ধর্ম্ম নিয়ে তা'হল যে গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে জ্ঞান লাভ করেছি তিনি ছাড়া আমার জন্য আর কেউ গুরু হবেন না। এবং আর কাউকেই বলতে দেব না—ও আমার কাছেও শিখেছিল। শিষ্যের ব্যাভিচার চলে না। গুরু যেন চিরকালই মনে করেন আমার হাতে গড়া ওই শিষ্যটি চিরকালই আমার থাকবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

গুরুর প্রতিষ্ঠা, সম্মান এবং কৃতবিদ্যতার কথা জেনে বা বুঝেও যে সব ছাত্র বা ছাত্রী মতিচ্ছন্নের পথ ধরে এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে' নূতন নূতন শিক্ষকের পদতলে আছড়ে পড়ে বা পয়সা দিয়ে গান বা গৎ ক্রয় করে তারা ক্রমশঃ নেমেই যায়,—আমি এরূপ বহু প্রত্যক্ষ করেছি।

সুর-তাল ও মাত্রার উপর দখল এবং রাগের রূপসকল পরিচয়ে এসে গেলে, তার সংগে স্বরলিপিতে যথেষ্ট অধিকার লাভ হলে আর কি অভাব থাকে? অন্যের কোন ভালবস্তু গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা এলে শিক্ষা-

সাধনার ওই শক্তিই সাহায্য করবে শুনার মাধ্যমে আহরণ করে নিতে।

বাল্যকাল থেকে ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানে ভ্রমণ করে বহু সাধক শিল্পীর সাধনার গুণ সম্পদের রূপকে মনের মধ্যে স্থাপন করেরাখার প্রবল প্রচেষ্টা আমার একান্তভাবে থেকে এসেছে।

শিক্ষাগুরু দ্রোণকে অর্জ্জুন যেমনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং শিষ্যদের মধ্যে যেমন তিনি দ্রোণের প্রিয়তম হয়েছিলেন সেইভাবে অন্তরকে গড়ে তুললে সঞ্চয়ের সব শক্তিই লাভ হয় শুধু শ্রবণের মাধ্যমেই। গুরুর সম্মানকে ক্ষুন্ন করে আকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই লাভ হয় না। মহাদেব, কুবের, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের কাছে অর্জ্জুন শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বা যাচ্ঞা করে অস্ত্রলাভ করেন নি,—দ্রোণাচার্য্যের এবং তাঁর কাছে শিক্ষার মর্য্যাদা রেখে বীরত্ব দেখিয়ে দেবতাদের মুগ্ধ করে তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছিলেন। এই আদর্শ ও কর্ত্তব্যকে অনুসরণ যদি না করা হয় তাহলে যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠা কোন মতেই লাভ হবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রধান সঙ্কল্পের কথা,—সাধনার আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে সর্বদা চিন্তা রাখতে হবে আমার গমন অব্যাহত হয়ে থাকছে কিনা। এই গমন কথাটির অর্থ হল—ধ্যান চিন্তা রেখে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একাগ্রতা নিয়ে সাধনায় নিযুক্ত হয়ে থাকা। তাহলেই সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এ সম্বন্ধে আরো একটি কথা আছে,—শুধু শাস্ত্রীয়সংগীতই নয় যে কোন অধ্যাত্ম সংগীত অর্থাৎ প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনা করতে হলে জন্মের পর থেকে ধর্ম্মীয় আবহাওয়ায় ও পরিবেশে জীবন গঠিত হওয়ার একান্ত আবশ্যক আছে। এ না হলে এই ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ সন্ধান পাওয়া যাবেনা। তাছাড়া শুধু শিল্পী হতে হলেও তার সৃজনী শক্তি লাভের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। এর অভাবে কেবল চঞ্চলতা আসবে।

এবার আগের সূত্রে ফিরে যাই, পঞ্চকোট রাজধানীতে আসার প্রথম দিনের সেই রাত্রে গান-বাজনার পর কুমারবাহাদুররা তিন ভ্রাতা, সৌরীনবাবু এবং আমি রাজাবাহাদুরের সংগে গিয়ে খাবার ঘরে একসংগে খেতে বসলাম। খাওয়ার আয়োজনের কথা বিশেষ করে বলাই বাহুল্য। রূপোর থালায় এবং সাত-আটটি রূপোর বাটিতে করে প্রত্যেকের কাছে নানা রকমের খাদ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে পুরু কার্পেট আসনের সামনে কোলের কাছে উপস্থিত হল।

রাজাবাহাদুর খেতে খেতে আমাকে জানালেন—চাচা! তোকে আমার বড় ছেলেকে ভাল করে সেতার শেখাতে হবে, সেইজন্য ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছি, আমিও মাঝে মাঝে গান-বাজনা শুনব।

তারপরেই খাওয়া নিয়ে বলতে লাগলেন—ভাল করে খা, এটা খা' ওটা খা' ইত্যাদি। তাঁর এই আদর ভরা মিষ্টি কথায় অন্তর তৃপ্তিতে ভরে গেছল। তবে একথাও মনে হয়েছিল—এতটা দেওয়া কতদিন টিকে থাকবে তা কে জানে? তখন বেশী অভিজ্ঞতা না এলেও যতখানি শুনে ও জেনেছিলাম তাতে এঁদের মত সব বড় ব্যক্তিদের এবং পদাধিকারীদের মধ্যে যাঁরা স্বভাবগত সরলতার উপর কারো প্রতি আকর্ষণ আনেন তখন তা আসে বন্যার মত হয়ে। আবার কিছু দিনের মধ্যেই সেই আবেগ সরে যায় পদ মর্য্যাদার গর্বিত রাজ্যে— যেখানে আর থাকে না স্নেহ-আদর, কর্ত্তব্য ও বিচারের জ্ঞান। এজন্য বিদ্যার উপর যতই কেন না অধিকার থাক, এঁদের কাছে সঙ্কোচ ও আড়ষ্টভাব থাকেই। কারণ ব্যবধান দুস্তর।

যাক্ এ সব কথা—সেই দিন খেতে খেতে অদৃষ্টের ফলভোগের পূর্ব অবস্থার কথা স্মরণ হয়ে গিয়ে মনে হতে লাগল, যে লালগোলায় প্রথমে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে দুঃখ-বেদনা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল সেই লালগোলায় গেলাম সাদর আহ্বান পেয়ে মহারাজার সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে;—আর যেখানে এসে চরম—কষ্টের মধ্যে থেকে কাঙালীদের সংগে একত্রে বসে পিণ্ডসদৃশ অন্ন খেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে চলে যেতে হয়েছিল, সেখানে আজ রাজপ্রাসাদে বসে রাজকুমারদের মত আদর যত্ন লাভ করে এক সংগে রূপোর পাত্রে রাজভোগ খাচ্চি!! অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে কেবল এখন মনে হয় তাঁর উপর কতটা নির্ভর শক্তি আছে তার পরীক্ষার জন্যই বোধ হয় তিনি দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা দিয়ে যাচাই করে নেন—নতুবা এরূপ অঘটন ঘটে কি করে!!

(৫২)

পঞ্চকোটের নাম বহুদিন থেকে কাশীপুর নামে পরিবর্ত্তিত হলেও প্রাচীনের পরিচয় ধরে এখনও পঞ্চকোট নামেই আখ্যাত আছে।

এই বংশের কয়েক পুরুষ আগের রাজারা আদ্রা ষ্টেশনের উত্তর-

পূর্ব্বাঞ্চলে পঞ্চকোট নামে এক বৃহৎ পাহাড়ের উপর প্রাসাদ দুর্গ, গড় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়ে বহুকাল ধরে বসবাস করেছিলেন। এখনও সেখানে নির্ম্মাণাদির অনেক কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

বহু পরে এঁদের এক রাজা পাহাড়ের প্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁদের জমীদারীভুক্ত কাশীপুর গ্রামে যথোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করে সমস্ত পরিজনাদি লোকজনদের নিয়ে চলে আসেন। সেই থেকে এইখানেই স্থায়ীভাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। শুনেছিলাম পাহাড়ে বসবাস করা ক্রমশঃ অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় এবং যুদ্ধ বিদ্রোহাদির আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় সমতল ভূমে চলে আসেন।

এই কাশীপুর রাজধানী পুরুলিয়া জেলার সদর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে এবং বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের শেষ প্রান্তের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আমার দেশ থেকে বেশীদূর নয় বলে স্বভাবতই এখানে থাকার আকর্ষণ এসেছিল।

বড়কুমার শুভদিনে দীক্ষার যথোপযুক্ত আয়োজন করে সেতার শিক্ষা আরম্ভ করলেন। এই প্রথার নিয়ম ইনিই বিশেষ ব্যবস্থার সহিত পালন করেছিলেন।

বড়কুমারের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মেদবহুল শরীরের জন্য বেশীক্ষণ বাজাতে পারতেন না। দু'ভাইকে নিয়ে কিংবা তাদের না পেলে চাকরদের নিয়েই বেশী সময় তাস খেলে সময় কাটাতেন, দাবাও চলত। খেলার মধ্যে আমাকেও ছাড়তেন না, তাঁর সাথী হতে হত। এ জন্য আমার সাধনার খুব ব্যাঘাত ঘটত, যা আমার কাছে ভীষণ কষ্টকর। প্রত্যহ বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেলে তখন প্রায় ঘণ্টা দুই গান সেধে নিতাম। ফাঁক পেলেই গান ও সেতার সাধতে বসতাম। তবে যতটা দরকার ততটা হত না, খেলাতে সময় নষ্ট হত বলে।

বড়কুমার বেড়িয়ে এলে পর বলতেন—আমার ঘোড়াতে চড়ার অভ্যাস করুন। তাঁর একান্ত আগ্রহে সেই সাদা রং এর বড় আকারের ঘোড়াতে এক এক দিন চড়তে হত। ঘোড়া যখন একটু দ্রুত তালে চলতে সুরু করত তখন তার পিঠে শরীরটাকে ঠিক লাগিয়ে রাখতে পারতাম না, ঘোড়ার পা' ফেলার নৃত্যভঙ্গীর তালের সংগে আমার দেহটাও সেই ছন্দে উঠা নামা করত, নিজেই তখন হাসতে থাকতাম। কুমাররাও না হেসে পারতেন না।

ঘোড়ায় চড়ার এই অবস্থার মধ্যে বিশেষ করে লজ্জা দিত ঘোড়া

রক্ষককে আমার সংগে ছুটতে হত বলে।

কয়েকদিন ধরে সওয়ার হবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দেহটাকে ঠিকমত আটতে রাখতে পারলাম না। একজন্ত কুমারবাহাদুরের ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে গেল। তাঁর মনভাবে বুঝতাম যদি চড়ায় রপ্ত হতে পারি তাহলে তাঁর সংগে অন্ত ঘোড়ায় বেড়াতে যেতে পারব।

কুমারবাহাদুর সহিস্‌কে জিজ্ঞেস করতেন—ওস্তাদজী কেমন পারছেন? সে কিছু বলতে পারত না সাহস করে। আমিই উত্তর দিয়েছিলাম—খুব শীগ্‌গীরই মনে হয় রেসে ঘোড়া ছুটাতে পারব।

এখানের অনেকেই আমাকে ওস্তাদজী বলে ডাকতেন। ওই সম্বোধন যোগ্য বয়সেই মানায় ভাল। তবে বোধ হয় যাঁরা সম্পর্ক ও যোগ্যতাকে যথাযথ স্বীকার করে সাদর মর্য্যাদা দেন তাঁদের কাছে বয়সের কোন প্রশ্নই আসে না,—ব্যবহারিক সম্বোধন তাঁরা সেইভাবেই রেখে যান।

এখানে আসার কয়েকদিন পরেই ৺সরস্বতী পূজা এসে গেল। এবং খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে খুব ধুমধামের সহিত দু'দিন ধরে ৺পূজাপর্ব্ব চলল। পূজার দিনে যথাসময়ে পূজাদি এবং পুষ্পাঞ্জলি সমাধার পর চিরাচরিত নিয়মমত গানের আসর বসল। এই উপলক্ষ্যে রাজাবাহাদুর থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেককেই বাসন্তী রং-এর কাপড় জামা পরতে দেখেছিলাম।

খোন্দার কথক বংশের যে কয়েকজন গায়ক-বাদক অবশিষ্ট ছিলেন তাঁরা বরাবরের ব্যবস্থানুযায়ী এই দিনে ওই সময় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা এই আসরে গান গেয়ে নির্দ্ধারণ মত বার্ষিকরূপে টাকা এবং তাঁর সংগে প্রত্যেকে বাসন্তী রং এর ছোপান জামা-কাপড় ও পাগড়ী পেয়ে থাকেন।

ওইগুলি পরিধান করে এবং গলায় গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে সারি দিয়ে রাজাবাহাদুরের সম্মুখভাগে বসলেন। কোলের কাছে প্রত্যেকের এক একটি পেতলের ঘটি ছিল জলে ভর্ত্তি এবং তার উপর দেওয়া ছিল মুকুল সমেত আম্রপল্লব, যবের শীষ ও গাঁদা ফুল। এই দৃশ্য বেশ সুন্দর লেগেছিল।

প্রথমতঃ রাজার আদেশে তাঁরা প্রত্যেকে দু'একখানি করে ধ্রুপদ এবং শেষে একটি করে হোলী ঠুম্‌রী গাইলেন।

এদের ধ্রুপদ গানের কথাগুলো গমকের সজোর ধাক্কায় যেন অলক্ষ্যে ঠিকরে পড়ছিল। গায়কীরীতির এইরকম দুর্দ্দান্ত পরিচয় কোন কোন গায়কের কাছেও পেয়েছি। কোন শ্রেণীর গানেই এই রকমভাবে সুরের

তাণ্ডবক্রিয়া সঙ্গীতধর্মী নয়। রসলালিত্যই সঙ্গীতের সত্যকারের পরিচয়। এই পরিচয় অবশ্য এখন বেশীসংখ্যক গায়ক-বাদকদের কাছেই পাওয়া যায় এবং তাঁরাই করেন সমস্ত শ্রেণীর শ্রোতাদের মনকে আকর্ষণ। ওই রকম ধ্রুপদ বা খেয়াল শুনলে মনে হয় যেন সুর-তালের বক্সিং হচ্ছে।

আগে ধ্রুপদ গাওয়া সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ধারণা নিয়ে অনেকে মনে করতেন যারা গান শিখতে চাইবে তাদের মধ্যে যাদের গলা হেড়ে ও মোটা তারাই ধ্রুপদ গান গাওয়ার ও শেখার উপযুক্ত, আর যার বুদ্ধি মোটা তার ইংরাজী লেখাপড়া হবেনা, তার পক্ষে টোলে গিয়ে সংস্কৃত বিদ্যা শেখাই উপযুক্ত হবে। এই দুই মন্তব্যই একেবারে মূর্খামিতে ও অযুক্তিতে ভরা ও হাস্যকর।

তারপর সেই পূজার দিনের সেই আসরে আমার অনেকক্ষণ ধরে ধ্রুপদ, খেয়াল, হোলীঠুমরী ও সেতার হল।

তারপর মহারাজা সকলকে উঠিয়ে খাবার স্থানে নিয়ে গেলেন। এদিন জনা পঞ্চাশ এবং তারপরের দিন বহু লোক খেয়েছিল। খাওয়ার আয়োজনও ছিল বিভিন্ন প্রকারের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

খাবার আয়োজনের পরিচয় আগেও দিয়েছি। নূতনত্বের উপর জাতিপ্রথামত আর একটি পরিচয় দেওয়ার মত,—ভেলাইডিহার রাজারা উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এঁদের কারো মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধে ওই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের খাওয়ানর প্রধান খাদ্যরূপে থাকে মেঠাই।

আমার থাকার সময়ে রাজাবাহাদুরের মা মারা যান। মৃত্যুর পরের দিন থেকে সমানে ৯ দিন ধরে বহু লোকজনের দ্বারা মেঠাই তৈরী হতে লাগল। সে দৃশ্য এক বিরাট দর্শনযোগ্য মনে হয়েছিল।

দু' হাজারের মত লোকের জন্য খাঁটি ঘি ও চিনি দিয়ে মেঠাই এর সংখ্যা যে কত হওয়া প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। তবে অনুমান আমাদের ধারণায় অনেক তফাৎ হবে। কারণ প্রায় প্রত্যেককেই খেতে দেখেছি বড় বড় মেঠাই অন্ততঃ আট দশ গণ্ডা করে,—তার উপর আছে কৌশলের উপর সংগ্রহ করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া। মেঠাইগুলো প্রত্যেক দিন যেমন তৈরী হত ওমনি সেগুলো বড় বড় মাটির হাড়িতে পুরে তার সংখ্যা উপরে লেখা থাকত।

খাদ্যের এই প্রধান ব্যবস্থা ছাড়াও ছিল প্রচুর ক্ষীর, দৈ এবং যদি কারো ভাত খেতে ইচ্ছে হয় সেজন্য তার ব্যবস্থাতেও প্রচুর মাছের সংগে

অন্যান্য তরিতরকারী ছিল।

শ্রাদ্ধের আয়োজনও ছিল বিরাট। বাঁকুড়া জেলায় যত সংস্কৃত পণ্ডিত তখন ছিলেন—সকলকেই আহ্বান করা হয়েছিল। প্রত্যেক পণ্ডিত একটি করে কাঁশার কলসী, কাঁশার থালা, কাপড় ও টাকা পেয়েছিলেন। শ্রাদ্ধ সমাধার পর দুপুরে এক বিস্তীর্ণ জায়গায় যখন প্রায় দু' হাজারের মত উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তার সংগে কিছু এদেশীয় ব্রাহ্মণ 'খেতে' বসল তার সেই দৃশ্য সত্যই দেখবার মত ছিল। বহু সংখ্যক পরিবেশক মেঠাই এর হাড়ি থেকে পাতে হুড় হুড় করে ঢালতে লাগলেন আর নিমন্ত্রিতেরা গব্‌ গব্‌ করে গোগ্রাসে গলায় চালিয়ে দিতে লাগল। মনে হচ্ছিল মুখ থেকে একেবারে পেটে চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় পরিবেশকদের মেঠাই এর হাড়ি বাঁ হাতে ধরে নিজেরাই অনেকে পাতে ঢেলে সেগুলি গামছায় বেঁধে নিচ্ছিল।

দূর থেকে দেখলাম—এক জায়গায় কতকগুলি লোক জমায়েত হয়েছে। কারণ জানবার জন্য সেখানে গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধের খাওয়া সবাই অবাক হয়ে দেখছে। তিনটে পাতায় ছিল ভর্ত্তি মেঠাই, লুচি, মাছ ইত্যাদি। মাছ বাদে সেগুলো এক সংগে জাপটে দু' হাতে করে মুখে পুরে নিচ্ছে। দেখতে দেখতে সেগুলো সব শেষ করে ফেলল। তারপর মাছগুলো খেয়ে নিয়ে চার কটরা দৈ এবং চার কটরা ক্ষীর খেয়ে সোজা হয়ে বসে পেটে হাত বুলাতে লাগল। রাক্ষসের মতই এই খাওয়াকে মনে হয়েছিল। এত জিনিষ ওই হাড় বেরোন রুগ্ন ও দুর্বল শরীরের উপর বুড়ো বয়সে কি করে পেটে ধরল তাই আশ্চর্য্য।

আগে বহু স্থানে বিরাট আয়োজনের উপর খান্দানী প্রথায় এক সংগে বহু লোককে খাওয়ান যেভাবে অবাক বিস্ময়ে দেখে এসেছি তা এখন গল্প হয়ে দাঁড়াল।

এরপর আবার পঞ্চকোটে থাকার সময়ের কথা আরম্ভ করি। এখানে ৺সরস্বতী পূজার দিন থেকে ৺দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বাহার ও বসন্ত এই দু'টি রাগের ব্যবহার এবং হোলীর গান অপরিহার্য্য রূপে থাকে।

৺দোল উৎসবের ভীষণ কাণ্ড কারখানার কথা লোক মুখে শুনে আগে থাকতে ছুটি নিয়ে দেশে পালিয়ে গেছলাম। কুমারবাহাদুররা ৺দোলের আগের দিনে আসবার জন্য বার বার করে বলেছিলেন।

রাজপরিবারে ৺দোল খেলা সাধারণভাবে পিচকারী নিয়ে রং দেওয়া এবং হাতে করে আবীর দেওয়ার নিয়মে ছিল না। বড় বড় চৌবাচ্চায় রং গুলে তাতে প্রচুর গোলাপজল দিয়ে তার মধ্যে সঙ্গীদের নিক্ষেপ করা, প্রত্যেকেই তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া বা ঠেলা পেয়ে পড়া, হলঘরে ঢেলে রাখা বস্তা বস্তা আবীরের উপর লুটোপুটি খাওয়া,—এই হল বড় রকমের ৺দোল খেলার রাজসিক আনন্দ।

এখানে ১লা চৈত্র থেকে সারা মাস ধরে প্রত্যহ বিকেলে রাজবংশের অনেকেই বনভ্রমণ করে আসেন। সংগে যন্ত্রাদি থাকে গান গাওয়ার জন্য। আমাকেও যেতে হত এঁদের সংগে। কুমারবাহাদুররা এবং আরো কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে যেতেন এবং লালসাহেবরা আমাকে নিয়ে হাতীর উপর হাওদায় চড়ে যেতেন। এঁদের পরিচয় আগেই দিয়েছি।

পাহাড়ী জংগলের প্রবেশের মুখে যাঁরা গাইতে পারতেন তাঁরা একে একে 'চৈতি' গান গেয়ে যেতেন। আমি গাইতাম বাহার ও বসন্ত রাগের গান এবং হোলী ঠুম্‌রী।

জংগলের সেই সময়কার শোভাসৌন্দর্য্য দর্শন করে মনকে পুলকে ভরিয়ে দিত। তখন বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখায় নব নব পল্লবে নানান রং-এ ভরা বিচিত্ররূপ, কোন কোন বৃক্ষের শাখায় বসে মুগ্ধ করা রূপ নিয়ে কোন পাখীর পুচ্ছ দুলিয়ে শিস দেওয়া, কোন কোন পাখী আমাদের দেখতে পেয়ে কণ্ঠে সুমধুর ধ্বনি তুলে পক্ষ বিস্তার করে উড়ে যাওয়া—ইত্যাদির সামগ্রিক রূপ ও পরিবেশ এনে দিত আনন্দের বিহ্বলিত শিহরণ। এই রকম সব ভাবময় সুন্দর সুন্দর বস্তু অবলোকন করতে করতে গান শোনা ও গাওয়ার মনে হত এ এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি—যার প্রয়োজন খুবই আছে সঙ্গীতের চর্চায়।

এখানের আঞ্চলিক আদিবাসীদের (এখন হরিজন সম্প্রদায় ভুক্ত) সুন্দর ও চমকপ্রদ যে একপ্রকার বাদ্য ও নৃত্যের সহিত গান আছে তাকে 'ঝুমুর' গান বলে। পুরুষ-নারী একত্রে মিলে এই গানের সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়ার যে ভাববস্তু প্রকাশিত হয় তার রূপায়ণে প্রধান হয়ে থাকে নারীদের নৃত্যের সময় দেহের সাবলীল ভঙ্গীমার অপূর্ব্ব এক দৃশ্যরূপ এবং এই গানে তাদের গায়কীতে থাকে তার রচনার মধ্যস্থিত ভাবের অভিব্যক্তি।

এর পরিচয়ে 'ঝুমুর' কথার অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে জানি কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ সম্বন্ধে মনে হয় নর্ত্তকীদের পাঁজনীপরা পায়ের

তালে তালে ঝুমুর-ঝুমুর ধ্বনির এক সুন্দর ছন্দ-সমষ্টির যে রূপাকর্ষণ সৃষ্টি করে তাকেই প্রাধান্য দিয়ে ঝুমুর নামে পরিচিত করা হয়েছে। এই সব শ্রেণীর আরো যে সব শ্রেণীগত গান আছে এবং অনেক গ্রাম্যগীতেও, তাতে নৃত্য থাকলেও পায়ে কোন অলঙ্কার পরে শব্দ উত্থাপনের ব্যবস্থা থাকার পরিচয় আমি পাইনি। এই ঝুমুর গানের মধ্যেই আছে ওই পরিধানটি বৈশিষ্ট্য-রূপে। তাই অর্থ সম্বন্ধে ওই কথাই আমার মনে হয়। এদের কাছে এর সঠিক অর্থ কিছু আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করেও আমি পাইনি। ঝুমুর নাম দিয়ে খাঁটি বাংলা কথায় রচিত যে সব গান আমাদের দেশে আগে অনেকে গাইত তা আসল ঝুমুরের চেয়ে অনেক তফাৎ। অর্থাৎ ঝুমুরের সত্যকারের পরিচয় তাতে পাওয়া যায়নি। খাঁটি ঝুমুরে আদিজাতিদের স্বভাবজাত প্রভাব অনেকখানি আছে— বাদ্যে-নৃত্যে এবং সুরের প্রকাশ-ভঙ্গীতে।

মোটের উপর ঝুমুর গানের আদি জন্ম মানভূমেই এবং ওই জাতিদের মধ্যে থেকেই। এদের কথার উচ্চারণে থাকে সাঁওতালী টোন্ (Tone) অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু ও ঝংকার আধিক্য এবং তার সঙ্গে হিন্দী কথাও আছে মিশে। এরা অন্তস্থ 'য়' এর জায়গায় 'হ' এর মত উচ্চারণ করে।

পঞ্চকোট (কাশীপুর) রাজবাটিতে ওদের ঝুমুর গান আমি খুব আগ্রহ ও তন্ময় হয়ে শুনেছি।

ঝুমুর গায়িকাদের গান ও নাচের একত্র মিলনে এবং ভাও (ভাব) বাত্‌লানর মধ্যে দিয়ে যে তালের উৎপত্তি হয় তাকে ধরেই পুরুষরা সঙ্গত করে নাগাড়া নিয়ে। এদের দলে থাকে দু'তিন জন গায়িকা-নর্ত্তকী এবং বাদক ও সহকারীরূপে থাকে ছ'সাত জন।

বেশীর ভাগ এই গানের বিলম্বিত গতি লয়ে থাকে সমষ্টিগত হয়ে বাইশটি মাত্রা এবং ঝুমুর ছন্দের দেহান্দোলনের মধ্যস্থিত বিভাগকে ধরে ঠেকা বাজে। তাল সৃষ্টির প্রথম সময়ে আনন্দের উপর দেহস্থ আন্দোলনে অনেক তালেরই যে সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এদের সুরের মধ্যে একটি গানে সারঙ্গ রাগের খাঁটি সুর পেয়েছি। এই রাগটি আদি জাতিদের স্বভাবগত সুর থেকেই সারঙ্গবাহার নামে প্রচলিত হয়েছে। তার প্রমাণ ওই গানের সুরেই প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। এই রাগের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রামাণিক সত্যের সন্ধান না জানার দরুণ এবং প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের সংগে সম্পর্ক রহিত থাকার জন্যই মনে হয় এর

স্বভাবগত সুরের উপর বিম্নতার সৃষ্টি করে এখন অনেকে অবরোহণে কোমল নিষাদ প্রয়োগ করছেন। এর স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় পাবার জন্য মনকে নিযুক্ত করে একাগ্রভাবে সন্ধান রাখলে ওই ভুল ধরা পড়তে দেরী হবে না। ধ্যান-চিন্তা ও সন্ধান পাওয়ার অভাবে এই রকমভাবে আরো যে সব রাগে কোমল নিষাদের অপপ্রয়োগ ঘটান হয়েছে তারমধ্যে কেদার, আলাইয়া, ছায়ানট এই তিনটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। রামকেলীতে কড়িমধ্যম ব্যবহারও খুবই অনুচিতভাবে এসেছে। প্রকৃতির নির্জ্জন পরিবেশে যে সব প্রাচীন জাতি বসবাস করে সেইস্থানে অর্থাৎ পাহাড় অঞ্চলাদিতে গতায়ত ছিল বলে আমি যে সব রাগের সৃষ্টিপরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে সারঙ্গ, ভূপালী, আদিবিভাস অর্থাৎ কোমলহীন মধ্যমবর্জ্জি বিভাস, পাহাড়ী, সিন্ধু, আলাইয়া, এইগুলিই বিশেষ করে। এই সব রাগের বিস্তারিত পরিচয় আমি আমার প্রণীত "রাগ-অভিজ্ঞান" গ্রন্থে দিয়েছি।

ঝুমুর নর্ত্তকীদের দ্রুত নাচ-গানের সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীমায় যে সুন্দর দৃশ্যশোভা থাকে তাতে মনকে মুগ্ধ করে দেয়।

বিলম্বিতের সময় নর্ত্তকীদের কণ্ঠে ঝুমুরগানের ভেতর সুরের মধ্যস্থিত শ্রুতিগুলির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রকাশের দক্ষতা এবং দরদ মাখান মধুর বিহ্বলিত বিরহানুরাগের সাবলীলতা, তার সংগে আঙ্গিক ক্রিয়ায় যে অভিব্যক্তির তন্ময় রূপ থাকে তা তাদের পক্ষে স্বভাবগত হয়ে হয়ত সহজসাধ্য হয়েছে কিন্তু এই জিনিস সভ্যনারীদের শিখতে হলে বহুদিন শিক্ষা ও সাধনা করতে হবে। আমার বিচারে এ একটি অন্যতম উচ্চস্তরের ক্লাসিকল্ বস্তু। তাই এই ঝুমুর গানের সংক্ষেপে একটু পরিচয় দেওয়ার আগ্রহ এল।

বহুবার এইভাবে এই গান শুনেছি আমি আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে। এখন এই অপূর্ব বস্তুটি বেঁচে আছে কিনা জানিনা। ঝুমুর-গানের সামগ্রিক রূপায়ণের উপর এদের কাছে আকর্ষণীয় যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে করে বেশ বলতে পারা যায় অন্যান্য গ্রাম্যগীতের তুলনায় স্বাতন্ত্র্যতা নিয়ে খুব উচ্চস্তরের। কণ্ঠে শ্রুতির প্রকাশ এদের মত অন্যের পক্ষে আনা খুবই শক্ত।

(৫৩)

পঞ্চকোটে বড়রকমের এক উৎসব দেখেছিলাম সেই সময়ের ১লা আগষ্টে। কোর্ট অবওয়াড়ার্স থেকে রাজত্ব হাতে আসায় ওই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য বছর বছর রাজাবাহাদুর বহু অর্থ ব্যয় করে নানান প্রকারের আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন রাখেন। যেমন—লোকজন খাওয়ান, যাত্রাভিনয়, বড়রকমের গানের আসর, বাজীপুড়ান, লোকগীতি, ঝুমুরগান ইত্যাদি।

সে বছর গানের আসরের জন্য আনা হয়েছিল আগ্রার মাল্‌কাজান বাঈজী এবং ৺কাশীর বিদ্যাধরী বাঈজীকে। উৎসব তিনদিন ধরে চলে। প্রত্যেক দিন রাত্রে আমার গান-বাজনার পর রাজাবাহাদুর এবং অন্যান্য সকলে খাওয়া সেরে বাঈজীদের গান শুনতে বসতেন। তাঁদের গান চলত রাত দুটো পর্য্যন্ত। শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে গভীর অনুরাগী রাজাবাহাদুর সমস্তক্ষণ বসে শুনতেন। এই বাঈজীদের গান শেষের দিনে সকাল পর্য্যন্ত চলেছিল। মাল্‌কাজানের গান আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর কণ্ঠ ছিল যেমনি রসাল ও সুমিষ্ট ও দরদ মাখান তেমনি ছিল সাবলীল তানাদি অলংকরণের ক্রিয়া এবং বিস্তারের ক্রিয়ায় সীমিত ভাবধারা। অর্থাৎ একটা জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেনানর আতিশয্য ছিল না। প্রত্যহ শ্রোতাদের আগ্রহ থাকায় নাম বলে দেওয়া সুরট রাগের দ্রুত একতাল তালে গঠিত 'বীত জাত বরখা ঋতু····'। ২য় "কহুঁ সতীন কী সঙ্গ বিরম রহো····"। এবং ভৈরবী রাগে—'রাত কহাঁ তুম জাগছঁ সৈয়া ···।' এই গান তিনটি গাওয়ায় শুনে শুনে আমার আয়ত্তে এসে গেছল। শেষের দিনের সকালে ভৈরবীর ওই ঠুম্‌রী গানটি গভীর অনুরাগ নিয়ে যখন মাল্‌কাজান গাইলেন তখন মনে হয়েছিল সুর ও ভাবের এই রকম পরিবেশন চিরকাল মনে রাখবার মত। ভৈরবী রাগটি এমন যে ভাল করে মিষ্টি গলায় গাইতে পারলে মনকে মাতাল করে দেবে। মনে হয় যেন সুর স্বর্গের সোমরসে এর রূপভাণ্ড পূর্ণ হয়ে আছে। শাস্ত্রীয়সংগীতের এটি একটি এমন সর্বাঙ্গীন পুষ্টরাগ যে এর গঠনের উপর স্থান বিশেষে বারটি স্বরই ব্যবহার করা যায় মাধুর্য্যকে বাড়িয়ে। এরূপ আর কোন রাগে ব্যবহার করা চলে না এবং করার উপায়ও নেই। উক্ত গান তিনটির

বাণী আমি মাল্‌কাজানকে দেখাতে তিনি বলেন ঠিক আছে। এই উৎসবে সেবারে যাত্রা অভিনয়ের পার্টি এসেছিল 'গণেশ অপেরা' সে যুগের শ্রেষ্ঠ যাত্রা পার্টি। এমন উচ্চ আদর্শসম্মত সর্বাঙ্গীন সুন্দর যাত্রাভিনয় আমি খুব কমই দেখেছি। এই দলের উপেন পাণ্ডা ছিলেন অদ্বিতীয় অভিনেতা। তাঁর বিভিন্ন রসের উপর কুশলী অভিনয় সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে রাখত। এই দলে একজন জুড়ির গানে এককভাবে যথেষ্ট দক্ষতার উপর বাংলা রচনায় ধ্রুপদ গান গাইতেন। যতদূর সম্ভব বিলম্বিত লয়ের উপর তাঁর গায়ন পদ্ধতি ও ছন্দলয়ের ক্রিয়ায় বিশেষ চাতুর্য্যশক্তির প্রকাশ পেত। গানে বাংলা ভাষা থাকায় তার ভাবও সকলের হৃদয়গ্রাহী হত। ইনি আমার বড়কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে নাড়াজোলে অনেকদিন শিক্ষা করেছিলেন। খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে যাত্রায় আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য উক্ত পার্টির স্বত্বাধিকারী তাঁকে সাগ্রহেই গ্রহণ করেছিলেন যথাযথ মর্য্যাদা দিয়ে।

এই দলে আদর্শ বস্তুর সমাবেশ ছিল বলে এই পার্টিকে রাজা, জমীদাররা সাগ্রহে আহ্বান করতেন।

বটকৃষ্ণ বটব্যাল নামে একজন দক্ষ পাখোওয়াজ বাদক ছিলেন। উক্ত ধ্রুপদ গায়ক হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাঁর স্থান পূর্ণ করবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি না পাওয়ায় বটুবাবু কোলকাতায় চলে আসেন, বেতার কেন্দ্রে এবং আমাদের সংগে আসরে বাজাতেন। অবশেষে কোলকাতাতেই দেহ রাখেন। এই দলে একজন আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের মানুষ ছিলেন অভিনেতার পদে। ইনি ভক্তিভাবেরই পাঠ করতেন। ক্রমশঃ তাঁর অন্তর ভগবৎ আরাধনার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং যাত্রার দল ত্যাগ করে এক গুহার মধ্যে বহুকাল ধরে তপস্যায় মগ্ন হয়ে থাকেন। ক্রমে তিনি সিদ্ধ সাধু নামে খ্যাত হন। তাঁর নির্মিত গুহা ছিল আমার শ্বশুর বাড়ী মণিপুর গ্রামের শেষ প্রান্তের নির্জন স্থানে। বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী ও ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা এঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় আশ্রম গড়ে উঠে। সাধু দেবাদিদেবের আরাধনাতে নিযুক্ত ছিলেন বলে শিষ্যরা আশ্রমে মন্দির নির্মাণ করিয়ে আদিনাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সাধু সংগীতে খুব অনুরক্ত ছিলেন বলে আমাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং গেলে গান না শুনে ছাড়তেন না। ইনি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবাদর্শের উপর অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। তার

অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে খুবই শক্ত ছিল। যে সব অমৃতবাণী শুনাতেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম এবং যতটুকু গ্রহণ করতে পারতাম তাতে আমার গন্তব্য পথের সহায়ক হত।

দীর্ঘ বয়সেও তিনি তাঁর গুহাতে প্রহরাধিক সময় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আমাকে একদিন সেই গুহায় নিয়ে গিয়ে নামিয়েছিলেন, নিঃশ্বাসের অভাবে দম্ বন্ধ হয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে মনে হয়েছিল এ রকম গুহায় কি করে এতকাল তপস্যা করে আসছেন!

দেহ রাখবার কিছুকাল আগে থাকতে তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যে, মনে হত তিনি আর এ জগতের মানুষ নন। বসন-ভূষণ খাদ্যাদি সবই দূরে চলে গেছল। এই সব পরিচয় দেবার মূল উদ্দেশ্য হল তখন যাত্রা ইত্যাদিতে কি অপূর্ব আদর্শমূলক অভিনয়ের প্রচার ছিল যার প্রভাবে মনুষ্যত্বে পরিণত করত, আসত চরিত্রে কল্যাণ এবং ওই রকম সাধু-মহাত্মাও গড়ে তুলত। যাত্রায় মহাদেবের পাঠ করে তার প্রভাব থেকেই গদাধর হয়েছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ।

তখন যাত্রার দলের অধিকারীরা জনকল্যাণের জন্য আদর্শমূলক পালাই মনোনীত করতেন। তাছাড়া তখন পালা রচয়িতারাও ছিলেন যথার্থ আদর্শবাদী এবং জাতির কল্যাণকামী।

ঝুমুর গান এবং পল্লীগীত সম্বন্ধে একটা কথা বলবার আছে। এই সব গান যেখানে স্বভাবগত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেইখানেই সত্যকারের প্রভাব মাহাত্ম্য থাকে এবং চিত্তকে মুগ্ধ ও আকর্ষিত করে। আমরা সেখান থেকে এই সব গান যখন সহরে টেনে আনি তখন তার প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে যায়। নানান স্থানের পল্লীগীত যখন রেডিওতে কিংবা সহরের আসরে গাওয়া হয় তখন যাঁদের পল্লীতে পল্লীতে এই সব গান শুনে শুনে সুর ও ভাবের রূপ অন্তরে চিত্রিত হয়ে আছে তাঁদের মনে হবে যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান হচ্ছে কিংবা পল্লীর রূপ কাগজে এঁকে দেখানর মত হচ্ছে। ঝরণার জল কলসীতে ভরে মাথায় করে নিয়ে জংগলের ধার ঘেসে চলতে চলতে হেলতে দুলতে নারীরা যখন তাদের স্বভাব সংগীত গেয়ে যায় তখন সেই বস্তুর সামগ্রিক প্রভাব ও মনহারিত্ব স্বভাবসুন্দর গীত মূর্তিকে সহরে প্রতিষ্ঠিত করলে তার স্বরূপ নির্ণীত হতে পারে কি?

শারদীয়া দুর্গামাতাকে দশ প্রহরিণী আদ্যাশক্তিরূপে দেখার চেয়ে বেশী করে আমরা দেখি গৌরী-উমারূপে পল্লীর সাধারণ মেয়ের মত। তাই

আগমনী গানও পল্লী জননীদের আকুতি নিয়েই যেন সৃষ্টি। আশ্বিনের ভোরবেলার সহরের অট্টালিকার সামনে কোন বৈরাগী যখন আগমনী গানে বলে—"কবে যাবে হে গিরিবর আনিতে আমার উমা ধনে, গত নিশিথে স্বপ্নে উমা ডেকেছে মা-মা সম্বোধনে..."। তখন এই গানের করুণ আকুল ভাব ও আবেগ সেই অট্টালিকার অন্দর মধ্যে মূল্যবান শয্যায় শায়িত নারীর অন্তরে তার প্রভাববেদন কতটুকু স্পর্শ করে জানি না,—তবে বিশেষ রূপে জানি এই গানে তখন পল্লীমাতাদের কি নিদারুণ ভাবে কন্যার জন্য অন্তর আলোড়িত হয়ে মনকে অস্থির করে তুলে। পল্লীর সেই সকল নারীদের দরজার চৌকাঠে জল দেবার সময়, পুকুরে জল আনতে যাবার সময়, মন্দিরে প্রণাম করতে যাবার সময় দেখেছি তখন তাঁদের কাণে ওই গান আসা মাত্র মেয়ের জন্য চোখের জল আঁচলে মুছতে। ৺পূজার কয়েক-দিন আগে থাকতে মেয়েহারা পল্লীর মায়েরা একরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কাঁদতে থাকেন। সেই কান্নায় সমবেদনা নিয়ে কবির একটি রচিত গান অনেকদিন আগে শুনেছিলাম একজন সুকণ্ঠ-ভাবুক গায়কের মুখে। গানটির কথা,—"তার কাছেতে যা মা উমা, যার মেয়ে ঘরে ফিরল না মা। যার মা অঝোর-ঝরে কেঁদে ডাকে আয় মা ঘরে, তুই গিয়ে বল এইচি আমি —গলা ধরে দে-মা চুমা......।" তার আগের বছরে আমার একটি উমারূপা তের বছরের কন্যা পল্লীতে মারা যায়। এই গান শুনে আমাদের উভয়ের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা ভাষায় জানান যায় না। নিজের বাস্তব অবস্থা নিয়ে বুঝেছিলাম বিশেষ করে করুণ রসে অন্তরভরা পল্লীমাতাদের মধ্যে যাদের এই অবস্থা ঘটেছে তাদের আগত পূজার সময় কি সাঙ্ঘাতিক মানসীক অবস্থার সৃষ্টি করে।

তাই বলছিলাম এই সব গানের প্রভাব পল্লীপ্রাণের করুণ সরসতার উপরই বেশী করে আসে এবং পল্লীর গীত পল্লীপ্রাণেরই এক পরিচয় প্রতীক। মানব জীবনের প্রয়োজনে এর যথেষ্ট যে মূল্য আছে সে মূল্য সংগ্রহ করতে হলে তার উদ্ভূত স্থানেই সেইখানের কণ্ঠে ধরে রাখা মানুষের কাছেই সন্ধ্যকারের পাওয়া যাবে।

(৫৪)

পঞ্চকোটে দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছিল কিন্তু প্রয়োজন মত সাধনায় বড় বিঘ্ন হতে লাগল। বড়কুমার সকালে মিনিট দশ-পনর সেতার বাজিয়েই তাস বা দাবা খেলায় টেনে নিয়ে বসতেন এবং খেলা চলতে থাকত বেলা ১২টা পর্যান্ত। সময়ের এই অপব্যয়কে এড়ানর জন্য ঠিক করলাম সেতার বাজিয়ে যখন অন্দরে বড়কুমার জলযোগ করতে যাবেন সেই সময় স্থানান্তরে অর্থাৎ ঘোড়ার আস্তাবলের শেষের খালি ঘরটায় যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে সাধব, সাধনায় আমার একান্ত আগ্রহ দেখে হয়ত বাধা দেবেন না কিন্তু তাতেও নিস্তার পেলাম না—বড়কুমার অস্তাবলের সেই ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেলেন খেলার আসরে।

সাধনায় বিঘ্ন আমার কাছে ভীষণ ক্ষতি ও কষ্টকর। কেবলই মনে হতে লাগল এখান থেকে সরে না পড়লে উন্নতির সব পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ লালগোলায় ফিরে যেতে হবে,—দেশের নিকটে থাকাটাই বড় কথা নয়। অথচ রাজাবাহাদুরের আকাঙ্খার কথা স্মরণ করে মনে হতে লাগল —বড়কুমারকে বাজাবার মত একটু না করে দিয়ে কি করে পালাই। তাঁকে একদিন বললাল—আপনি যদি একটু যত্ন নিয়ে ও পরিশ্রম বেশী করে হাত তৈরীর দিকে মনযোগ না দেন একটু শুনাবার মতও আলাপ ও গৎ বাজাতে না পারেন তাহলে মহারাজ জিজ্ঞেস করলে আমি কি বলব? তিনি যদি শুনতে চান তাহলে আপনিই বা তাঁকে কি বলবেন? আমার এখানে থাকা নিরর্থক হয়ে পড়ছে না কি? এই সব কথা শুনে তারপর থেকে কিছুটা পরিশ্রমের দিকে যত্ন নিয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে ৺দুর্গাপূজা এসে গেল। সকলের অনুরোধে ৺পূজার দেশে যাওয়া হল না। এখানে অধিষ্ঠাত্রী ৺সর্বমঙ্গলা মায়ের ওই পূজা বেশ জাকজমকের সহিতই হয়ে আসছে। মহাষ্টমীর সন্ধীক্ষণে বলিদানের নির্মম বিভৎসতা 'বনপাশ কামার পাড়া' গ্রামের মতই ছিল, বরং বিভিন্ন জীব নিয়ে আরো মর্মান্তিক দৃশ্যের পরিচয় পেয়েছিলাম। সেই গ্রামে ছিল শুধু শতাধিক ছাগ, আর এখানে তার সংগে ছিল মেষ ও মহিষ বেশ কিছু সংখ্যক নিয়ে। ৺মহাষ্টমীর সন্ধীক্ষণের কিছু আগে পুরোহিতের সংগে মহারাজা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। জানলাম—

সোনার থালায় সিঁদুর ভর্ত্তি করে মায়ের চরণ তলে অর্পণ করার পর পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে মহারাজা প্রস্তুত থাকবেন সন্ধী সময়ের মুহূর্ত্তের জন্য। ঠিক সময় হলেই যুপকাষ্ঠে একটি ছাগকে সহস্তে বলি দিয়ে সংগে সংগে বেরিয়ে এসে বাইরের বলির আদেশ দেবেন। ঠিক তাই হল। সেই আগের অভিজ্ঞতায় অমানুষিক কাণ্ড দেখবার আগেই পালিয়ে আসছিলাম, কিন্তু রাজপুত্ররা ধরে রাখলেন।

বলি দেবার জন্য যে দু'জন লোক বৃহৎ খড়্গ হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল মাথায় ঝাকড়া চুল ও কপালে লম্বা সিঁদুরের তিলক পরে তাদের চেহারা দেখে মনে হয়েছিল যেন কালান্তক যমের মত। মহিষ বলির দৃশ্য দেখে বিশেষ করে মনে হয়েছিল আমরা সেই আদি যুগের স্বভাব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি—যতই কেন না শিক্ষা-দীক্ষা থাক। নচেৎ মাতৃপূজায় এ প্রবৃত্তি কোন মতেই আসত না।

বিষ্ণুপুরের মহারাজা বীরহাম্বির তাঁর সমগ্র রাজ্যে বলির প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। পরে দু' এক স্থানের আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষ ৺দুর্গা ও ৺কালীপূজার ছাগ বলির প্রবর্তন করেছিল। সাধক কবি রামপ্রসাদ গানের ভাষায় বলেছেন—"জীবমাত্র মায়ের ছেলে মা তো কারেও পর বাসে না, কি করে তুই তাঁর কাছেরে বলি দিস ছাগল ছানা, মন কেন তোর ভ্রম গেল না ··।" পঞ্চকোটের রাজার সমগ্র রাজত্ব সীমানাকে বলে 'শিখরভূম'। যেমন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার রাজত্বের চতুঃসীমাকে বলে 'মল্লভূম'। একটা প্রবাদ আছে—৺দুর্গাপূজার মহাসন্ধীর সময় মাতৃভক্ত এক মল্লরাজার সম্মুখে দেবী হুঙ্কার দিয়ে তাঁর উপস্থিতি জ্ঞাপন করেছিলেন, তেমনি ঠিক ওইভাবে শিখরভূমের রাজার ওই দেবী সর্ব্বমঙ্গলা সিঁদুরের থালায় পদচিহ্ন রেখেছিলেন এবং নদীয়ার রাজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ওই সময় ভক্ত রাজাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সেই থেকে বিশ্বাস মত লোকে এখনও প্রবাদ বচন ধরে বলে—"মল্লে 'রা', শিখরে 'পা', সাক্ষাৎ দেখবি তো নদের যা।"

এখানে থাকার সময়ে মাঝে মাঝে লালগোলার মহারাজার স্বহস্তে লিখিত পত্র আসত। তাঁর কাছে কখন যেতে পারব এই কথাই বার বার লিখতেন।

পঞ্চকোটের এখানে যথেষ্ট আদর-যত্ন-শ্রদ্ধা-ভক্তি, খাওয়া থাকার উত্তম ব্যবস্থা এবং দেশের নিকটে থাকা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই যথেষ্ট

আকর্ষণ ছিল কিন্তু সাধনার ব্যাঘাতের জন্য এই সমস্ত সুখ বর্জন করার তাগিদ কর্ত্তব্যের প্রেরণায় আসছিল গভীরভাবে। কেবল ভাবতাম এই বন্ধুত্বের পরিবেশ ও উচ্ছল আনন্দ এবং আরাম এগুলো আমার কাছে বড় ও প্রয়োজনের বস্তু নয়, সাধনায় মগ্ন থেকে অগ্রসর হতে হবে এই হল আমার একমাত্র কাম্যবস্তু।

৺পূজার পর এখানে দু' মাস গত হবার পর অগ্রহায়ণ মাসের ২রা ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলাম। সাত দিনের দিন ডাক্তার বললেন— টাইফয়েড হয়েছে। জ্বর দুই থেকে চার-পাঁচ ডিগ্রি উঠা নামা করতে লাগল। সর্ব্বদাই অঘোরে পড়ে থাকার মত হয়ে থাকতাম। এই রোগকে জব্দ করার এখনকার মত তখন তেমন ওষুধ ও চিকিৎসা প্রণালী ছিল না, তাই মৃত্যু ঘটতই বেশী। মায়ের জন্য মন খুব অস্থির হত কিন্তু তাঁর এখানে আসবার উপায় ছিল না, এজন্য কোন খবর দেওয়া হয়নি। কুমারবাহাদুর প্রভৃতি সকলেই যথেষ্ট সতর্কতার সহিত যত্নাদি করতেন। ঘুমোচ্চি মনে করে কেউ যখন না থাকত তখন নিজেই কপালের জলপটি পাল্টে নিতাম। যাই হোক তাঁরই ইচ্ছায় আঠার দিন বাদে জ্বর ছাড়ল। উপযুক্ত মত পথ্যাদি পেতে পেতে ক্রমশঃ সেরে উঠলাম এবং একটু বলও পেতে লাগলাম। মাথাটা নেড়া করে দেওয়া হয়েছিল। চুলের বাহার আমার স্বভাবগতই ভালছিল এবং যত্নও একটু রাখতাম। সেই তার বাহার আয়নার মাধ্যমে চলে যাওয়া দেখে মনে বেশ একটু দুঃখ এসেছিল। চেহারাটি তখন হয়েছিল যেন বিজ্ঞাপনের সালসা সেবনের পূর্বের আঁকা চেহারার মত।

পৌষ মাসের প্রথমেই মেজকাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল, তাতে লেখা ছিল ১লা জানুয়ারী (১৯১৯) ৺কাশীধামে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন' বসবে, তুমি সেখানে গান ও সেতার শুনাবার জন্য যথা সময়ে বর্দ্ধমানে এসে আমার সংগে সেখানে যাবে। আমি সেখানে উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান পত্র পেয়েছি। তোমার কথা জানাতে তাঁরা আমন্ত্রণে সাগ্রহ সম্মতি জানিয়েছেন। এখান হতে আমরা রওনা হব ৩০শে ডিসেম্বর।" মেজকাকাকে পত্রে জানিয়ে দিলাম যথা সময়ে পৌঁছব। শরীর তখনও দুর্বল ছিল, তা সত্ত্বেও প্রত্যহ গান ও সেতার অনেকক্ষণ ধরে সাধতে লাগলাম। যেতে পাওয়ার আনন্দে শরীরের কথা ভুলেই গেছলাম। এই সংবাদের ঠিক দু' দিন পরে রাজাবাহাদুর আমাকে ডেকে

পাঠালেন। আমি যেতেই বললেন—৺কাশীতে সঙ্গীত-সম্মেলন হবে, তার কর্মসচীব চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন—"আপনার কাছে সঙ্গীতজ্ঞ থাকলে আপনার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁকে যদি সম্মেলনে যোগদান ও সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য প্রেরণ করেন তাহলে আমরা খুব সুখী হব, শিল্পী থাকার সম্ভাবনা নিয়ে আমরা সম্ভাষণ পূর্বক আহ্বান জানাচ্ছি। ৺কাশী ষ্টেশনের প্রত্যেক ট্রেণে শিল্পীদের আসার সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সেচ্ছাসেবক এবং এক প্রতিনিধি থাকবেন, কোন অসুবিধা হবে না।"

রাজাবাহাদুর আমাকে বললেন—"চাচা তুই এই শরীর নিয়ে যেতে কি পারবি? যদি মনে করিস পারব এবং সেখানে গান-বাজনা করার মত স্বাভাবিক সক্ষম বোধ করিস তাহলে আমি তাদের যাওয়ার কথা জানিয়ে দেব। তোর সাধনার পুরা ক্ষমতা যদি দেখাবার মত শরীরের জোর না পাস তাহলে বসিস না গাইতে বা বাজাতে। তবে এমনি গেলেও অনেক দেখা শুনার অভিজ্ঞতা আসবে।"

আমি খুব উৎফুল্ল হয়েই বললাম যেতে পারব এবং সে সময় পর্য্যন্ত আমার শরীরের পুরো জোর এসে যাবে মনে হয়। অল্প অল্প করে সাধতে পাচ্ছি। মনে মনে করলাম আমার পক্ষে খুবই ভাল হল। কারণ মেজকাকার ব্যবস্থাপনায় যেতামই এখন নিমন্ত্রণের আহ্বান পেয়ে রাজা-বাহাদুরের তরফ থেকে যাওয়ার সুযোগ ঘটে গেল—রাজগায়কের মর্য্যাদা পেয়ে। যাতায়াত ইত্যাদির টাকা রাজবাহাদুরের কাছ থেকে পেয়ে যথাদিনে বর্দ্ধমানে মেজকাকার সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মেলনের আগের দিন আমরা ৺কাশীতে উপস্থিত হলাম।

অধিবেশনে গানবাজনা শুনার আগ্রহ নিয়ে ৺মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদবাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা মুক্তিপ্রসাদ নন্দে আমাদের সংগে এলেন। তিনি তখন মেজকাকার কাছে গান শিখতেন। মুক্তিবাবু ৺কাশীতে তাঁর সুন্দর থাকার স্থানেই আমাদের রাখলেন।

পরের দিন সকাল ৯টার সময় ৺কাশী মহারাজের সভাপতিত্বে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল। সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা ধরণের বক্তৃতার পর গান আরম্ভ হল। দু'চার জনের গান-বাজনার পর সকালের প্রথম অধিবেশন বেলা ১২॥৹টায় বন্ধ হল।

থাকার স্থানে আসার পথে গেট পেরিয়ে একটু যেতেই দেখা হল পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীর সংগে। তাঁর বক্তৃতার সময়ই তাঁকে

চিনেছিলাম। তিনি মেজকাকাকে কোনদিন দেখেননি, 'সঙ্গীত-চন্দ্রীকা' গ্রন্থে তাঁর ফটো দেখে চিনতে পেরে সাগ্রহে এগিয়ে এসে মেজকাকার পরিচয় নিয়ে হাত ধরে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। মেজকাকাও তাঁকে নিবিড়-ভাবে সম্মান জ্ঞাপন করলেন। আমাদের সংগে একটু ভাল করে আলাপ-আলোচনা করার বাসনা জানিয়ে বললেন—নিকটেই এক বাড়ীতে আমি আছি যদি এই সময় আমার সংগে যেতে অসুবিধা না হয় তাহলে খুব আনন্দিত হব।" মেজকাকা বললেন—এতো আমাদের খুব সুযোগ।

তাঁর বাসার গিয়ে পৌঁছামাত্র জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। তারপর আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে পণ্ডিতজী বলতে লাগলেন—"আপনার প্রণীত 'সঙ্গীত-চন্দ্রীকা' এবং আপনার দাদা রামপ্রসন্নবাবুর প্রণীত 'সংগীত-মঞ্জরী' গ্রন্থ দুটি শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী ও মূল্যবান এবং রাগরূপের ঐতিহ্যবাহী। সঙ্গীতানুরাগী আমার এক বাঙ্গালীবন্ধুর সাহায্যে বই দুটির মধ্যস্থিত গান এবং অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞ বিষয়ক লেখা কিছু কিছু জেনে নিতে পেরেছিলাম বলে আমার এই অভিমত ব্যক্ত করতে পারলাম। শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের প্রধান বস্তু হল ধ্রুপদ গান। আপনাদের গ্রন্থদ্বয়ে বহুসংখ্যক প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে বহু রাগের আদিরূপ সংরক্ষিত হয়ে আছে। শিক্ষার বিস্তৃতি, সংরক্ষণ ও প্রচার কামনায় আপনাদের গ্রন্থ প্রকাশ মহৎ অন্তঃকরণ ও প্রকৃত জ্ঞানী-গুণীর পরিচয় রেখেছে। এই প্রচেষ্টা না থাকলে ধ্রুপদ গানের মত গান সম্পদ ও রাগরূপের পরিচয় ব্যাহত হত।" ভাতখণ্ডেজী তাঁর নিজের ভাষাতেই এই সব কথা বলে গেলেন খুব প্রাঞ্জল-ভাবে। বুঝবার অসুবিধা হলনা।

ভাতখণ্ডেজী এইরূপ স্বীকৃতি দিয়ে মহৎ অন্তঃকরণের ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন গ্রন্থটির উপর মনোনিবেশ সহকারে আগাগোড়া দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলাম এটি চর্চারত ব্যক্তিদের সহজলভ্যের উপর উপকারে আসবে। এই উপকারের পরিচয় বর্ত্তমানের সঙ্গীত শিক্ষক ও গায়কদের মধ্যে বিশেষ করে পাওয়া যায়। বেশ মনে হয় তাঁরা যেন অকূলে কূল পেয়েছেন গ্রন্থের গানগুলি পেয়ে। নচেৎ এদেশের ঘরাণার গান যদি নিতান্ত বাধ্য হয়ে সংগ্রহ করতে ও গাইতে হত তাহলে মর্য্যাদার যে কতখানি ক্ষতি হত তা ভেবে শিউরে উঠি।

তারপর ভাতখণ্ডেজী বললেন—আপনাদের দেশ প্রধানতম আপনাদের ঘরাণা গুণীগণের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থায় ও ব্যাপক প্রচারের

মধ্যে দিয়ে বহু আগে থাকতেই বেশ এগিয়ে গেছে,—এ বিষয়ে পশ্চিম ও উত্তর ভারত খুবই অনগ্রসর, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাদানে কোনই তেমন আগ্রহ নেই। তাই শিক্ষানিকেতন গড়ে তুলা এবং নিয়ম সঙ্গত রূপে ধারাবাহিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয়ে আমি এবং আমার কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু মিলে সবিশেষ চেষ্টা করছি। শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক না থাকলে এখনকার দিনে বিদ্যায়তনে শিক্ষার ব্যবস্থায় একেবারেই চলে না, এজন্য আমি পাঠক্রম অনুযায়ী গ্রন্থ রচনায় ব্রতী আছি। এ বিষয়ে অনেকের কাছেই আমি সাহায্য পাচ্ছি।" ভাতখণ্ডেজী আরো অনেক কথা বলে গেলেন। মেজকাকার কাছেও অনেক বিষয় জেনে নিলেন। মেজকাকা জানালেন—বাংলাদেশে বর্ত্তমানের গানাদির বিধিসঙ্গত নিয়মধারায় শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা। এঁর কাছে তালিম পেয়ে বহু গুণী গায়কের সৃষ্টি হয়েছিল। শতাব্দীর পরিচয়ে প্রায় দেড় শ' বছর হবে। এইসব গুণীদের প্রচেষ্টায় ও শিক্ষকতায় ক্রমশঃ বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।"

তারপর ব্রস্ত হয়ে ভাতখণ্ডেজী বললেন—আপনাদের অনেকখানি সময় আটকে রাখায় খাবার বেলা বেশ বেড়ে গেল।

তখন আমরা পরস্পর হাত জোড় করে নমস্কারের পর উঠে পড়লাম। সেই সময় আমার পরিচয় দেওয়ায় ভাতখণ্ডেজী খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং সম্মতি নিয়ে পরের দিন সকালে আমাদের ধ্রুপদ গান, সন্ধ্যায় আমার সেতার বাদ্যের ব্যবস্থা করার কথা জানালেন। সদর পর্য্যন্ত আমাদের সংগে এলেন। আমাদের দেশের কোন কোন ব্যক্তির মন্তব্যে এবং লিখিতভাবেও এমন উচ্ছ্বাস থাকে যে তাঁরা বলেন ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থের সাহায্যেই আমাদের দেশে সঙ্গীতের পরিচয় ও চর্চা এসেছে ভাতখণ্ডেজী সঙ্গীতের জনক।"

আশ্চর্য্য হই,—এ রকম মন্তব্যের পূর্বে নিজেদের দেশের প্রচার পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি কেন এত অন্ধকারাচ্ছন্ন!

এ বিষয়ে এই দেশের কত বড় যে গৌরব আছে সেই গৌরবের আলোকোজ্জ্বল তাঁদের মনকে অর্গলবদ্ধ করে রেখে সেখানে পৌছতে না দেওয়ার কারণ কিছু খুঁজে পাই না। বহুকাল ধরে যাঁরা সাধনায় যাঁরা জ্ঞানী-গুণী হয়ে অকাতরে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, সঙ্গীতকে স্থায়ীভাবে

বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্যাপক প্রচারের বাসনায় ভাতখণ্ডেজীর বহু আগেই বহু গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা শত শত ধ্রুপদ-খেয়াল ইত্যাদি গান সংরক্ষিত করেছেন এবং ভাতখণ্ডেজীর পরিচয়ের বহু বহু আগে থাকতে এই দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের শত শত সন্তানরা শিক্ষা পেয়ে এসেছেন; শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গান যে দেশে প্রধান স্থান অধিকার করে জনগণের চিত্তকে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে সেই বাংলাদেশের বাঙালী হয়ে ওই রকম অযৌক্তিক উক্তি খুবই আপত্তিকর ও নিন্দার্হ। নিজের দেশের গৌরবকে তুলে ধরাই মনুষ্যত্বের এক পরিচয়। শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে জনক বলা যেতে পারে এ রকম ব্যক্তির কোন প্রামাণিক পরিচয় আছে কি? শাস্ত্রে মহাদেবকে সঙ্গীত-স্রষ্টা বলা হয়েছে এবং লিখিত আছে তাঁর পাঁচ শিষ্য যথা—নারদ, ভরত, তম্বুর, হুহু, রম্ভা, এই এঁদের মধ্যে ভরত ভারতবর্ষে শাস্ত্রীয়সংগীত প্রচার করেন, রম্ভা করেন স্বর্গে, হুহু করেন গন্ধর্বলোকে, নারদ ত্রিভুবনে প্রচার করেন এবং তম্বুর মুণি একে ধরে তপস্যায় রত হন।

যাই হোক মোটের উপর কোন ব্যক্তির উপর সংগীতের জনক বলা মূর্খতারই পরিচায়ক। অনেকখানি বা বিশেষরূপে অবদান বলা যেতে পারে। সেই অবদানের স্বীকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই পাবার আবশ্যক থাকে।

এই প্রসঙ্গে যারা বাহিকতায় উপর বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার বিষ্ণুপুর ঘরাণার মাধ্যমে এবং অন্যান্য গায়ক-বাদকদের দ্বারা ও তাঁদের শিষ্য কর্তৃক কত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করে এসেছে বাইরের কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থকে অনুসরণ না করে তার দু' একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয়:—

১) পঁয়ত্রিশ বছর আগে চট্টগ্রামের আর্য্য সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক আহূত হয়ে যখন সেখানে গেছলাম তখন সেখানের বহু ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে আমাদের ঘরের গ্রন্থ হতে ধ্রুপদ-খেয়াল শুনে তৃপ্তিতে মন ভরে গেছল তাদের গায়কীতে এবং রাগ বিস্তারাদিতে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কৃতিত্ব খুবই প্রসংসার যোগ্য ছিল। এঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন আপনাদের ঘরাণাকেই একমাত্র অবলম্বন করে চর্চায় ও শিক্ষায় রেখেছি। পাকিস্থান হতেই এঁদের এত বড় প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেল।

২) ১৯৩৩ সালে আমার গুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রমুখ বিচারকগণের দ্বারা এদেশে সর্বপ্রথম বড় আকারে লিলুয়া রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়েছিল

আমার অগ্রজ শ্রীরামসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। তখন তাতে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গানে এবং বাদ্যযন্ত্রে অংশ-গ্রহণ করে' যথাযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মনে হয়, তার পরেই হবে—যখন নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সুরু হয় তার প্রথম বর্ষ হতেই বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে দেখিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে সংগীতের প্রচার-পরিচয় কিরূপ বিপুল। এই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগুরুদের মধ্যে তখন প্রায় শেষ সীমাসংখ্যকই ভাতখণ্ডেজীর পুস্তকাবলম্বী গায়ক, শিক্ষক ছিলেন না,—এখানের গায়ক, গুণীদের কাছেই তাঁদের শিক্ষা ছিল। এ সব বাস্তব পরিচয় যাঁদের বয়স হয়েছে তাঁদের হয়ত নিশ্চয়ই জানা আছে।

ভাতখণ্ডেজী বিষ্ণুপুর ঘরাণার অবদান বিষয়ে শ্রদ্ধার সহিত যে সব কথা বলেছিলেন তার কথা আগেই জানিয়েছি। তাছাড়া ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত-সঙ্গীত সম্মেলনের সময় এক ঘরওয়া বৈঠকে, রাধিকাপ্রসাদ, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের সংগে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কথাপ্রসঙ্গের মধ্যে ভাতখণ্ডেজী বলেছিলেন—আপনারা বিশুদ্ধ সংগীতের সংরক্ষক অর্থাৎ প্রাচীন ধ্রুপদসমূহ একমাত্র এখন আপনাদের ঘরাণা ভাণ্ডারেই পরিপূর্ণ হয়ে আছে,—আমার একান্ত ইচ্ছে আছে কিছুকাল কোলকাতায় থেকে আপনাদের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করে আসব, —বাংলা ভাষায় অধিকার নেই বলে আপনাদের গ্রন্থের স্বরলিপিযুক্ত গান আমি উদ্ধার করতে না পারায় আমার গ্রন্থে আপনাদের গ্রন্থের রাগরূপের প্রামাণিক পরিচয়কে আনতে পারিনি………।" উদার হৃদয়, মহৎ অন্তঃকরণ এবং সঙ্গীতকে প্রকৃতভাবে বুঝবার সামর্থ না থাকলে এ রকম অভিমত ব্যক্ত হয় না।

কয়েক বছর আগে 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় এক নিবন্ধে গৌরীপুরের (মৈমনসিং জেলা) রাজা—সঙ্গীতবিদগ্ধ স্বর্গত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় লিখেছিলেন—বিশুদ্ধ সংগীতের পরিচয় এখন পেতে হলে একমাত্র বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণীদের সংস্পর্শে আসতে হবে কিংবা তাঁদের গ্রন্থকে অবলম্বন করতে হবে।"

এইসব উদ্ধৃত পরিচয় দেশের শিক্ষার্থীদেরও বিষ্ণুপুর ঘরণা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা আসবে।

এবার ৺কাশীর সেই সম্মেলনের পরিচয়ে আসি—উক্ত সম্মেলনে

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন পূর্ব পরিচিত ৺কাশীর বিখ্যাত জমীদার বংশের প্রসিদ্ধ বীণবাদক শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু। পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ভাতখণ্ডেজী, রায় উমানাথবালি, নবাব আলি সাহেব এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রায় সকলস্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক ও যন্ত্রীগণ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার সংগে রাজা, মহারাজা, জমীদার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও শ্রোতারূপে। নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলন বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ তার অর্থবহ নামের পরিচয় ও সম্মানকে যথাযথভাবে রক্ষা ক'রে উক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সুসম্পন্ন করেছিলেন।

গায়ক ও যন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই রাজদরবার থেকে এসেছিলেন। তার মধ্যে অধিক সংখ্যক ছিলেন রামপুর ও বরোদা ষ্টেটের। প্রথম দিনের বৈকালীক অধিবেশনে কয়েকজন বক্তা সঙ্গীত সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করলেন। এঁদের বক্তব্যে বিশেষ করে ছিল শিক্ষার বিস্তৃতি ও প্রচার সম্বন্ধে।

ওই দিন রাত ৯টা থেকে ১২টা পর্যান্ত গান ও যন্ত্র পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালে প্রথমে দু'জন গায়ক-বাদকের সংগীত পরিবেশনের পর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী মেজকাকা আলাইয়া রাগে আলাপ, ধ্রুপদঅঙ্গের চৌতাল, ধামার গাইবার পর আমি বসলাম ষ্টেজে গাইতে। জৌনপুরি রাগে আলাপ, চৌতাল ও ধামার এবং তার মধ্যে দুন, ত্রিদুন, চৌদুন, দেড়দুন, অতীত, অনাঘাত বাঁটে বিবিধ ছন্দের ক্রিয়া দেখিয়ে শেষ করলাম। ওই দিনই রাত্রে আমার সেতার বাজান হল। মিনিট কুড়ি আলাপ বাজাবার পর গৎ বাজিয়ে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান তারটা কেটে যাওয়ায় এবং পাল্টাবার তার সংগে রাখতে ভুলে যাওয়ায় উঠে পড়তে হল খুব ক্ষুণ্ণ মনে। তবে সমস্তলোকের খুসী ভাব দেখে মনে হয়েছিল ওইটুকু সময় বাজানর মধ্যেই সকালের গানের মতই অনেকটা ফললাভ হয়েছে।

সেই মুহূর্ত্তে আশীর্ব্বাদ লাভ করলাম বিখ্যাত যন্ত্রী ইম্‌দাদ্ খাঁ এর কাছ থেকে। খাঁ সাহেব উঠে এসে আমার পিঠে স্নেহের স্পর্শ দিয়ে খুব উৎসাহ প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, বীণের কায়দায় ধ্রুপদী-পদ্ধতির বাদন আমাকে খুব খুসী করেছে। ইনি বিখ্যাত যন্ত্রী ৺ইনায়েত খাঁ এর পিতা এবং বিলায়েতের পিতামহ। এই সম্মেলনে বড় বড়

গায়কদের খেয়াল গান, শরোদ বাদকদের এবং বীণকারদের বাদনক্রিয়া মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ইনায়েত খাঁ এর সেতার বাদ্যও খুব ভাল হয়েছিল।

তখনকার যে সমস্ত গায়ক-বাদকদের গীত-বাদ্য শুনেছি তারমধ্যে অনেকেরই সাধনার পরিচয়ে যে উন্নত মান ছিল তাতে মনে হত কত সাধনা করলে তবে এতটা উচ্চে ওঠা যায়। এই কন্‌ফারেন্সে সবচেয়ে গান শুনে বেশী আনন্দ এসেছিল যেদিন রাত্রে এক হিন্দু গৌরবর্ণ বৃদ্ধ গুণী গায়ক ডানপাশে পুত্র এবং বামপাশে নাতিকে নিয়ে গাইতে লাগলেন ছায়ানট রাগে খেয়াল। তৈরিতে তিনজনই যেন সমান মনে হচ্ছিল। পর পর ছাড় ধরতাই এর উপর সুন্দর বিস্তার এবং নানান ছন্দের তান ও দ্রুত তানে আসর উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এঁদের প্রত্যেকের তানের শেষে সমে ফেলার পদ্ধতিটি ভারি চমৎকার লাগছিল। এখনকার শ্রোতারা এবং চর্চারত ব্যক্তিরা যদি ওইরকম খেয়াল গান শুনতেন তাহলে বুঝতে পারতেন আগে কিরকম উচ্চস্তরের সব গায়ক ছিল। যন্ত্রীদের সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। সেতার ছাড়া সুরবাহার, বীণ এবং শরোদ যখন শুনি তখন সেই আগের শুনার কত অভাব অনুভূত হয়।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর এই অধিবেশনে যোগদান করে তিনি শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধেই কিছু বললেন। বক্তৃতায় জানালেন—প্রকাশ্যস্থানে টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থার উপর বহু সাধারণ ব্যক্তির সমক্ষে বড় বড় গায়ক-বাদকদের সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা আমার মতে সমীচীন নয়। কারণ, এই নজিরের পরিণামে হয়ত সম্মেলন ব্যবসার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন টিকিট ক্রয়কারী বহু সংখ্যক শ্রোতাদের রুচি অনুযায়ী বা মনঃতুষ্টির জন্য শিল্পীদের প্রকৃত সাধনার উপর যে বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় থাকে তার মান নেমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। তাছাড়া জ্ঞানী-গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের যথাযথ সম্মান-সমাদর থাকবে কিনা সে কথাও ভাববার আছে। এজন্য আমি মনে করি অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য থাকুক শিক্ষার বিশুদ্ধ বিস্তৃতি এবং তার নিয়মিত পাঠক্রমের পদ্ধতি গঠন প্রভৃতি বিষয়ের প্রস্তুতি এবং শিক্ষার জন্য আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা এবং কি উপায়ে তা কার্যাকরী হবে তারই একান্ত প্রচেষ্টা। পরে শিক্ষাশ্রম সমূহে শিক্ষার শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হলে তখন তাদের জন্য প্রকৃতভাবে সঙ্গীত সম্মেলন করার আবশ্যক হবে। আমার মতে এইভাবেই সত্যকারের

প্রচার বিস্তৃতি এবং শিক্ষা-সাধনায় সাফল্য এসে দেশে গুণী-সঙ্গীতজ্ঞের সৃষ্টি করবে। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্ট বোধজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালক সমিতি গঠিত হওয়ার প্রয়োজন থাকবে……।" বিষ্ণুদিগম্বরজী তাঁর ভাষণের মাধ্যমে যে মন্তব্য প্রদান করেছিলেন তা খুবই যুক্তি-যুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কাই এখন বাস্তবে পরিণত হয়ে নাচ-গান ও বাজনার জলসায় এসে গেছে। শুধু তাই নয় দলাদলি, বিপক্ষ মনোভাব নিয়ে গুণী উপেক্ষা, হতাদর ইত্যাদি এবং শিল্পীদের রাগরূপ পরিবেশনায় ভেজাল রাগের আধিক্য প্রভৃতি।

শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গান এইসব সম্মেলনে না থাকারই মত।

এই সম্মেলনে ক'দিন ধরে বহু সাধকের ধ্রুপদী ভাবধারার কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের উপর সাধনায় উচ্চ কৃতিত্বের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে আমার আদর্শের লক্ষ্যে পৌঁছবার শক্তি সঞ্চার করেছিল।

পরে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মজঃফরপুর এবং দ্বিতীয়বার কাশীতে 'নিখিল-ভারত-সংগীত-সম্মেলন' অনুষ্ঠিত যখন হয়েছিল তখন সেগুলিতেও নিমন্ত্রিত হয়ে সংগীত পরিবেশন করেছিলাম। এগুলিতে অধিবেশনের নিয়মানুযায়ী যথারীতি ব্যবস্থা থাকলেও তার কৌলীন্য রক্ষায় কিছু শৈথিল্য এসে গেছল। মনে হয়েছিল ক্রমশঃ টিকিট বিক্রয়ের সংখ্যাধিক্যই এর কারণ। তবে উক্ত সম্মেলনের আদর্শ নীতি-ধারার কয়েকটি এই গুলিতেও অক্ষুণ্ণ ছিল যেমন গানের সময় শুধু তম্বুরার ব্যবহার, গীত-বাদ্যের জন্যই শুধু তব্‌লায় সঙ্গত, নৃত্যে কেবলমাত্র কথকী এবং ভরত নাট্যের উপর নৃত্য।

ইং ১৯২৪ সালে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সেই ব্যতিক্রম হিসেবে দেখেছিলাম ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানে হার্মোনীয়মের সহযোগিতা থাকতে। ১৯১৯ সালের ৺কাশীর ওই সম্মেলনে আলোওয়ার ষ্টেটের বিখ্যাত ধ্রুপদী- আলাবন্দ খাঁ সাহেব সম্মেলনের নানান শ্রোতার সমক্ষে গাইতে নারাজ হওয়ায় সম্মেলন সমাধার পর যেদিন রাজা মতিচাঁদের বাগান প্রাসাদে সঙ্গীতজ্ঞদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন হয় সেইদিন ওই প্রাসাদ হলে খাঁ সাহেবের গান হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র নসীরুদ্দীন খাঁকে সংগে নিয়ে গাইতে বসলেন। শ্রোতারূপে সঙ্গীতজ্ঞরা এবং ভাতখণ্ডেজী, শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু, নবাব আলি সাহেব, রায় উমানাথবালি বাহাদুর প্রভৃতি ধুরন্ধর সংগীতজ্ঞ ও সঙ্গীত বোদ্ধারা আসরে উপবিষ্ট হয়ে একাগ্র সহকারে

খাঁ সাহেবের অপূর্ব্ব সঙ্গীত পরিবেশন উপভোগ করতে লাগলেন।

তাঁর আলাপচারী সত্যই তৈরিতে অদ্ভুত লেগেছিল। দ্রুতগতির সময় আলাপের অক্ষরগুলোকে ধরে এমনভাবে গমকের উপর হলকের ঢেউ তুলছিলেন—যেন মনে হচ্ছিল হৃদপিণ্ডের ভেতর থেকে বীণার সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। এই রকম দুরূহ সাধনার বস্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে পরিবেশন করার উপযুক্ত স্থান যে নয় তা অতি যুক্তিসঙ্গত। এই রকম সাধনার বস্তুকে বুঝতে পারার ক্ষমতা থাকে বড় বড় শিল্পীদেরই প্রকৃতভাবে এবং বিরাট বোধজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেকখানি। খাঁ সাহেবের রাগরূপ পরিবেশনায় সকলেই খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ওই পুত্রও তখন সাধনায় বেশ অগ্রসর।

এঁদের ধ্রুপদ গাওয়া সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে,—যে সমস্ত নিয়ম প্রকরণের মাধ্যমে ধ্রুপদ গানের নীতিধারার উপর তার পূর্ণাঙ্গরূপ থাকে তা এঁদের এবং এঁদের পরের পর ঘরাণার বাহকদের অনেকখানিই অনুপস্থিত দেখা যায়। আলাপচারীর কৃতিত্ব প্রদর্শনই এঁদের মুখ্যত প্রধান হয়ে থাকে। ধ্রুপদ যেন একান্ত গৌণ। ধ্রুপদের অর্দ্ধেকটা অর্থাৎ অস্থায়ী-অন্তরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অল্পক্ষণেই গাওয়া সমাধা হয়ে যায়। এজন্য বহু বিখ্যাত নীতিসঙ্গত ধারার ধ্রুপদ গায়কদের মন্তব্যে থাকে এঁদের ঘরাণা প্রকৃতপক্ষে আলাপেরই। চারপদী ধ্রুপদ ছাড়া দু'পদী ধ্রুপদকে পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ বলা যায় না। এঁদের গানে কিন্তু চারপদী ধ্রুপদ আমি শুনিনি। নায়ক গোপাল, বৈজু, তানসেন প্রভৃতি যে সমস্ত চিরস্মরণীয় ভারত বিখ্যাত গায়করা ধ্রুপদ রচনা করে গেছেন এবং যাঁদের দ্বারাতেই ধ্রুপদের মাধ্যমে রাগরূপের শাশ্বত নীতিধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে নানান তালে সমৃদ্ধ হয়ে সেই সমস্ত ধ্রুপদের প্রায় সমস্তই নির্দ্ধারিত বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী চারপদ অর্থাৎ অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ বিশিষ্ট। ধ্রুপদ রচনার ভাবোদ্দেশ্য এবং তার অর্থসঙ্গত নিয়মনীতিকে রক্ষা হেতু অবধারিত হয়ে থাকার জন্যই চারটি পদের ওই নামকরণ হয়েছিল কেবল ধ্রুপদের জন্যই বিশেষ করে। শুধু তাই নয় এই শ্রেণীর গানের শেষ পদেই থাকে রচয়িতার নাম, যারজন্য আমরা তাঁদের সুর ও বাক্য রচনার কৃতিত্বকে বুঝতে পারছি এবং একমাত্র এই জন্যই তাঁরা বিশেষ করে আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে বরণীয় হয়ে আছেন। তাহলে এই প্রমাণিত হয় যে দ্বিপদী ধ্রুপদ মোটেই প্রাচীন নয়, তাছাড়া ধ্রুপদ নামের স্বরূপ স্বীকৃতি পাবার

সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিনা তাও বিচার্য্য। দ্বিপদী ধ্রুপদকে হয়ত খেয়াল অনুসৃত ধ্রুপদও লোক বলতে পারেন।

কোন কোন গায়ক ধ্রুপদ গানের সামগ্রিকভাব মহিমার স্ফুরণ না করেই তার প্রথম অংশ নিয়ে ছন্দ-সুরের গড়া-পেটা করতে থাকেন। চৌতাল তালের ধ্রুপদ এক অন্য বস্তু—এতে সুরের এবং ছন্দের লাফ-ঝাঁপের অধিক্য থাকলে তার সমস্ত ভাব ঐশ্বর্য্য উধাও হয়ে যায়। ছন্দাদি ক্রিয়া ধামারের মধ্যেই ধরা হয়ে এসেছে। ওই সব ক্রিয়ার সুযোগ দানের জন্যই ধামার গানের সৃষ্টি।

খুব বিস্মিত ও লজ্জিত হতে হয় যখন দেখি ধ্রুপদ গানে স্বরগ্রামের উপস্থাপনা এবং হার্পযন্ত্র ধরে গাইতে।

ধ্রুপদ গান হল শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ মহিমান্বিত ভগবৎ আরাধনার এক বিরাট সাত্বিক বস্তু। এই বস্তু নারায়ণ পূজার মত—অন্তরের নিভৃত দেবতাকে সুরে প্রতিষ্ঠিত করে ভাষার ভাবে আরাধনা করার জিনিষ এবং সুরের সৌন্দর্য্যবোধকে আয়ত্তে আনার সন্ধান স্বরূপের মত॥

(৫৮)

পুনর্বার লালগোলায়,—

৺কাশীর সম্মেলন সমাধা হবার পর আমি বর্দ্ধমান হয়ে লালগোলায় চলে এলাম। এই সিদ্ধান্ত আগেই স্থির করে যন্ত্রপাতি, সব কিছু কাশীপুর হতে সংগে নিয়ে বর্দ্ধমানে রেখে গেছলাম। মহারাজা আমাকে পেয়ে খুব খুসী হলেন এবং চল্লিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

সাধনার ব্যাঘাতের কথা সবিস্তারে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে কাশীপুরের মহারাজাকে বিদায় প্রার্থনা করলাম।

ওখানে প্রত্যেকের কাছেই আপন জনের মত ব্যবহার পেয়েছিলাম,—বিশেষ করে মহারাজের কাছে।

লালগোলায় দিনগুলি পূর্বের মতই প্রায় সর্বক্ষণই সাধনার মধ্যে দিয়ে তরতর্ করে এগিয়ে যেতে লাগল। এবার আসার কয়েক দিন পরেই অনাথবাবু গৃহ শিক্ষকের পদ ত্যাগ করে কৃষ্ণনগরে (নদীয়ায়) আইন

ব্যবসায় নিযুক্ত হবেন বলে চলে গেলেন। একজন তাঁর অভাব আমাকে খুব ব্যথা কাতর করে দিয়েছিল। তাঁর সাহচর্য্য থাকলে অনেক বিষয়েই আমার আরো উপকার হত। তিনি সত্যই আদর্শ ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন।

অনাথবাবু চলে যাওয়ায় এত বড় লালকুঠির অট্টালিকায় একা থাকা আমার পক্ষে মুস্কিল হবে বুঝে মহারাজা অল্পদূরে একটি ছোট মত পৃথক গৃহে রাজবাড়ীর পশ্চিম সীমানার অপর প্রান্তে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ব্যবস্থা অনেকখানি স্বাধীনভাবে থাকার মত হওয়ায় মনের পক্ষে ভালই হয়েছিল। দু' চারজন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিদের এবং দু' একজন ছাত্রদের নির্ভয়ে যাওয়া আসার সুযোগ এল। এই গৃহসংলগ্ন স্থানটি ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এর একেবারে সন্নিকটে হওয়ায় বেশ জমজমাটি লাগত।

ক্ষুদিরাম নামে একজন সংসার ত্যাগী আধ্যাত্মিক ভাবুকের মত নির্মলচিত্ত মানুষ আমার সংগহীনের দোসর রূপে আবির্ভূত হল। লোকটি সেই স্থানের অধিবাসী ছিল। দু' বেলা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এর প্রসাদ পেত। অথচ কামনাশূন্য হয়ে পরম নিষ্ঠার সহিত আমার রান্না ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা নিজ হাতে করে দিত। আমার নিষেধ কোন মতেই মানতে চাইত না। মনে এই ধারণাই করে নিয়েছিলাম—সে যেন পূর্ব জন্মের সেবার দেনা শোধ করবার জন্যই আমার কাছে এসেছে নিঃস্বার্থ-ভাবে। তবে সময় সময় তাকে আমার ভয়ও করতে হত। কারণ বিতর্ক-মূলক কোন কিছু বলার সময় উপদেশের ভঙ্গীতে তান্ত্রীক সাধকদের মত চোখের তারা উপরের পাতার তলায় প্রবেশ করিয়ে এমন বচন বিন্যাস রুদ্রভাবে উত্থিত করত যে, তখন তার প্রতিবাদ তারসপ্তকও করা চলত না, গম্ হয়ে থাকতাম। এই কর্মকাণ্ড তার গঞ্জিকার প্রভাব বেশী হলেই হয়ে পড়ত। ক্ষুদিরাম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সলজ্জে বলে উঠত—বাবু—ভয় পেলেন না কি ?

আমি সাহস পেয়ে তখন বলতাম—তোমার ওই রকম উগ্রমূর্ত্তি দেখে 'কপালকুণ্ডলার' কাপালীকের কথা মনে পড়ে যায়। তখন তার দাড়ি-গোঁফের মধ্যে দিয়ে দন্তবিকশিত হয়ে পড়ত।

মানুষটির উপরটা বদমেজাজের মত ছিল কিন্তু ভেতরটা ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত। এরকম অন্তর্মুখী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। তার সেই অনাবিল কামনাশূন্য মূর্তিটি এখনও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠে।

বাসস্থান পরিবর্ত্তনের পর এই গৃহে খাজাঞ্চিবাবুর বড় ছেলে দুলুর সংগে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান ও লেখা-পড়ায় খুব ভাল ছিল। একদিন কথায় কথায় তাকে বললাম—ইংরেজী ভাষায় আমার কিছুই তেমন অধিকার নেই—তুমি যদি সময় মত আমাকে একটু করে পড়াতে পার তাহলে বড় ভাল হয়। সে একথা শুনে খুব আগ্রহের সহিত আমার পড়ার উপযোগী বই এনে প্রত্যহ দু' ঘণ্টা করে পড়াতে লাগল। আমার অদম্য নিষ্ঠায় অল্প দিনের মধ্যে ওই ভাষায় কিছু দখল হয়েছে বুঝে দুলু বলল—এর পর থেকে আমাদের যা কিছু কথাবার্ত্তা হবে তা সমস্তই ইংরেজীতে। এই ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা রপ্ত হয়েছি দেখে ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় খুসী হয়ে একেবারে বিয়ে পাশ করিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন (১৯২১ সালে)। আমাদের দেশে আগে পুরুষের বিবাহ হত চৌদ্দ থেকে বড় জোর সতের—এই বয়সের মধ্যে। আমার বয়স প্রায় একুশের কাছাকাছি এসে যাওয়ায় মা প্রভৃতির ভাবনার অন্ত ছিল না। তাঁদের ধারণা এসে গেছল বোধ হয় আমি আর বিয়ে করব না,—ভীষ্ম হয়ে থাকব।

আমার সঙ্কল্প ছিল যতদিন না উপযুক্ত হচ্ছি সব বিষয়ে ততদিনের পূর্বে ওই বন্ধনে আবদ্ধ হব না। তাছাড়া বিয়ের প্রয়োজনের কথা তখন পর্য্যন্ত কোন দিনই মনে উদয় হয়নি এবং উদিত করার সময়ও ছিল না। কারণ,—জীবনের গতি এক পথ ধরে চলতে পারনি,—অদৃষ্ট তাকে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করে চালনা করেছে। এ সব অবস্থার কথা ছাড়াও আগের মত কম বয়সে বিবাহ করা আমার কাছে অন্যায় বলে মনে হত।

তখন বিবাহের ব্যাপারে কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের বিশেষ কিছু দুশ্চিন্তা ছিল না। তার প্রধান কারণ দেনা-পাওনার দাবি-দাওয়া না থাকা এবং পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দারুণ সমস্যা না থাকা। পাত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত ছিল—পুরুষ হয়ে জন্মেছে যখন তখন যেমন করেই হোক্ সংসার চালিয়ে যাবেই—সামান্য কিছু জমি-জমা থাকলেই যথেষ্ট এবং তাঁরা মনে করতেন মেয়ে মোটামুটি খেতে পরতে পেলেই যথেষ্ট। উভয়পক্ষে বংশ ভাল কিনা এটার উপরই গুরুত্ব দিয়ে তার সন্ধানাদি বিশেষ করে সংগ্রহ করতেন। এজন্য নির্বাচনাদি পাকাপাকি হয়ে গেলেও অনেক স্থানে বিবাহ অনুষ্ঠান অনেক বিলম্বে সমাধা হত। আমার পিতার সময় ওই নিয়মে দু'বছর ধরে অনুসন্ধানের কাজ চলেছিল।

আমার মতে এই ব্যবস্থা তখন খুবই উপযুক্ত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে উভয়-পক্ষের আচার-বিচার-মন-হৃদয়-মনুষ্যত্ব-ব্যবহার ইত্যাদি কেমন এবং বংশগত সংক্রামক ব্যাধি কোন আছে কিনা, এই সব পরিচয় সংগ্রহের জন্যই বিলম্ব ঘটত।

পাত্র নির্দ্ধারণ করা সম্বন্ধে অনেকেই আমি অবিবাহিত জানতে পেরে পিতামহের কাছে অনেকেই তদ্‌বির করতে আসেন কিন্তু তিনি আমার অনিচ্ছা দেখে কাউকেই আশা দিতে পারেননি। রাজ-গায়ক এবং তখনকার দিনে মাইনে হিসেবে মাসিক অতগুলি টাকা, তাছাড়া আমাদের দেশে সঙ্গীতের উপর অধিকার ও নাম পরিচয়ও বহু আগে থাকার দরুণ বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও দাদুর কাছে আসা যাওয়া করতেন আমাকে পাত্ররূপে পেতে। ক্রমশঃ আমার নিস্পৃহ অবস্থা দেখে মা তাঁর পিতাকে ধরলেন—যোগাযোগের সত্বর ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। মাতামহ কোমর-বেঁধে লেগে পড়লেন এবং অচিরেই এক কন্যার পিতার একান্ত অনুরোধে তাঁকে কথা দিয়ে ফেললেন মেয়ে না দেখেই। এঁর সংগে দাদামশায়ের বহুদিনের পরিচয় থাকায় উভয়েরই বংশ পরিচয় বিশেষভাবেই জানা ছিল। সুতরাং আসলেই যখন মিল তখন অমতের আর কি থাকতে পারে?

দাদামশায় আমার দাদুকে যোটক সংবাদ সবিস্তারে জানালেন পত্রের মাধ্যমে,—কথা দিয়েছেন এই বলে নির্দ্বিধায়। তখন অধিকাংশ বংশে অর্থাৎ মানুষের বংশে বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে পাত্রের পিতা-পিতামহ প্রভৃতির চেয়ে কন্যার পিতা-পিতামহ প্রভৃতির মূল্যমান ও মর্য্যাদা নিম্নে ছিল না, সমঅধিকার সম্পন্নমতই ছিল। সুতরাং দাদামহাশয়ের কথার নড়্‌চড়্‌ হতে পেল না।

ঠাকুরদা' সমস্ত বিষয় লিখে আমাকে শীগ্‌গীর দেশে আসবার জন্য জানালেন। কারণ পাত্রীপক্ষের লোকেরা পাকা দেখার নিয়ম পালন করে যাবেন।

দাদুর চিঠিটি পড়ে চকচকিয়ে গেলাম—কিংকর্ত্তব্য নিয়ে ভাববার আর উপায় রইল না—কারণ দাদামহাশয় কথা দিয়েছেন পাত্রীর পিতাকে। ঠাকুরদা'র জরুরী আহ্বানের বিষয় মহারাজকে জানিয়ে পনর দিনের ছুটি চাইলাম—আসল কথা কিছুই জানালাম না।

ওইদিন এল মেজকাকার এক চিঠি। তিনি খুব আনন্দ সহকারে লিখেছেন ৺কাশীর সম্মেলনে গীতবাদ্য পরিবেশনের দরুণ উপযুক্ত সম্মানসূচক

পদক (মেডেল) লাভ করেছ, সেখানের সেক্রেটারী শীঘ্রই তোমার ঠিকানায় ওটি পাঠাবেন। আমি তাঁকে লালগোলার ঠিকানা জানিয়েছি……।"

তখন সম্মেলনে গায়ক-বাদকদের সম্মানস্বরূপ মেডেল দেওয়া হত যোগ্যব্যক্তিদের। সঙ্গীতজ্ঞদের কাউকেই টাকা দেওয়া হত না, এবং তাঁরাও টাকার দাবী করতেন না,—নিজের সাধনার পরিচয় প্রদান এবং সম্মেলনে আসা বিশেষ কর্ত্তব্যবোধেই আসতেন। অধিকাংশ গায়ক-বাদকই তখন রাজদরবারে থাকতেন এবং আসা-যাওয়ার ব্যয়ভার রাজারাই বহন করতেন। যাঁরা সেসব স্থানে থাকার সুযোগ পেতেন না তাঁদের যাতায়াতের ব্যয়ভার সম্মেলন কর্তৃপক্ষ বহন করতেন।

এখন সম্মেলনে অর্থাৎ জলসায় প্রচুর টাকা দিয়ে বহিরাগত শিল্পীদের আনা হয় আর স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীদের প্রায় সকলেই 'সে রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস' হন। সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখবেন, প্রচার বিস্তৃতি ঘটাবেন, শিল্পী তৈরী করবেন, শ্রোতা তৈরী করবেন, নিজেরা সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছবেন আর বিপুল অর্থের দ্বারা পূজার্ঘ দেওয়া হতে থাকবে অন্যদের। এ না হলে আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে কৈ? আর একটা দিক,—যে গান গুরুমুখী হয়ে শিখতে হয় না, আজীবন ধরে সাধনা করতে হয় না, জন্মগত একটু ভাল গলা ও সুর-তালে একটু বোধ থাকলেই যথেষ্ট সেই সহজলভ্য ও মনের অস্বাস্থ্যকর গানের গায়করা পায় প্রচুর অর্থ। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বিচারবোধ-হীনতা আর কি আছে?

যাক্ এসব কথা,—সেই সূত্রে, তারপর মেজকাকার পত্রটি মহারাজাকে দেখাতে তিনি পাঠ করে খুব খুসী হলেন। আমার মনও উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে গেল। দু'চার দিনের মধ্যেই ডাকযোগে মেডেলটি এসে পৌঁছল। মহারাজা নিজেই সকলকে দেখালেন।

অতি বড় রোগ থেকে আরোগ্যলাভের কয়েকদিন পরেই ৺কাশীর নিখিল-ভারত-সম্মেলনে বিখ্যাত বিখ্যাত গুণীদের গান-বাজনার উচ্চস্থানে আমার সামান্য যোগ্যতার যে একটা মূল্য থাকবে এ আমি ধারণাই করতে পারিনি।

শাস্ত্রীয়সংগীতের এবং তার সাধকদের জন্য ভাতখণ্ডেজী এবং তাঁর সহযোগীদের মত সূক্ষ্ম দৃষ্টিবান, নিরপেক্ষ ও উচ্চমনা ব্যক্তির যে এখন একান্ত অভাব হয়ে পড়েছে তা বিশেষ করে বলার আবশ্যক করেনা।

(৫৬)

মহারাজের কাছে ছুটি পেয়ে দেশে এলাম মাঘ মাসের প্রথম দিকে। দাদু বললেন,—তাঁরা চিঠি দিয়েছেন অমুক তারিখে পাকা দেখার আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন। তারিখটা হিসেব করতে দেখলাম দশদিন সময় আছে। ঠিক করলাম ভেলাইডিহার রাজার কাছে গিয়ে তাদের ওই ক'দিন শিখিয়ে আসি। গো-গাড়ীতে রওনা হয়ে গেলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সেখানে পৌছতেই সকলে খুব হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

রাজাবাহাদুর সকলকে বললেন—"আমার এই যুবক ওস্তাদজীটি এক স্বতন্ত্র মানুষ, কারো সঙ্গে উপমা দেব তা খুজে পাইনা। এমনভাবে কেউ কথা রাখতে পারে ?" আমি বললাম—এটা কথা রাখা শুধু নয়,—কর্তব্য ও শিক্ষকের ধর্ম, এতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। কথা দিয়ে যদি কথা না রাখি তাহলে ক্ষতি আমারই হবে, অর্থাৎ পরিচয়ে কোন মূল্য থাকবে না। একজন হিন্দুস্থানী প্রবীণ পণ্ডিত ও সঙ্গীতবোধজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে কথা দিয়েছিলেন আমার কাছে আসার আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি কৃতজ্ঞ হয়ে বলেছিলাম আপনার বাক্য দান থাকবে তো ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"দেখিয়ে বাবু ! যার কথার ঠিক নেই—তার জাতের ঠিক নাই।" আমার এই সব মন্তব্য শুনে রাজাবাহাদুরের খুড়ো মহাশয় আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি।

ছুটিতে এসে এখানের ছাত্রদের বেশী করে শিখিয়ে যাবার প্রেরণায় প্রত্যেকদিন ছ' সাত ঘণ্টা ধরে সাগ্রহে পরিশ্রম করে যেতাম। কম বয়স থেকে শিক্ষার ভার পেয়ে অবধি এই কথাই জানি এর দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে হয়। কারণ এর মধ্যে থাকে শিক্ষকের ধর্ম্ম রক্ষা হয়ে এক বিরাট কর্ত্তব্য, তাছাড়া নিজের লাভ হয় বিদ্যার উপর প্রকৃত জ্ঞান ও বোধশক্তি।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে প্রচুর শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিভা আছে কিনা তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণকে ধরেই তাদের গ্রহণ করব এরূপ মনোভাব আমি রাখতে পারি না। আমার অভিজ্ঞতায় এই বলে সঙ্গীত-শিক্ষার মত বুদ্ধি-প্রতিভা প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আছেই, উন্মেষের সুযোগ পাওয়ার অভাবে কারো কারো চাপা পড়ে থাকে। যেমন প্রায় সর্বত্রই মাটির নীচে

জল আছেই, তবে কোথাও অল্প খুঁড়লেই পাওয়া যায়—আবার কোথাও অনেক দূর পর্য্যন্ত নীচে খুঁড়ে গেলে তবে পাওয়া যায়। খুঁড়তে খুঁড়তে পাথর বেরিয়ে পড়লে ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে ছেড়ে না দিয়ে যদি অদম্য উৎসাহ, শক্তি ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে পাথরকে কেটে তুলে ফেলা যায় তাহলে পরে তার তলদেশে সুপানীয় উৎকৃষ্ট জল পাবারই সম্ভাবনা থাকবে। তেমনি সব কিছু শিক্ষা-সাধনার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফলতা আছেই।

আমি এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী পেয়েছি যাদের গলায় সা-রে-গা-মা—আসতে চায় না কিন্তু তাদের ধৈর্য্য থাকায় এবং আমার শিক্ষা দেওয়ার কৌশল সম্বলিত পদ্ধতির উপর অনুসরণ করে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রাখায় তারা কয়েক মাসের মধ্যে তানপুরা বাজিয়ে ঠিক সুর মিলিয়ে গাইতে পেরেছে। সুতরাং কারো হবে না এ কথা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করি না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা,—একেবারে উচুস্তর থেকে শেখাতে পাওয়ার মত ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাব এ মনোভাব আমার কাছে সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় না। কারণ সে কথা সকলেই বলতে পারে। তাহলে প্রথম শিক্ষার্থীদের যোগ্য গুরু পাবার উপায় কি হবে? যাঁরা একথা বলবেন তাঁদের কি শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি নিতে হয় নি? সা-রে-গা-মা, র হাতে খড়ি থেকে শেখান আর গাইতে বাজাতে পারার ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানর মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তা যেন প্রথমটি নারীর গর্ভজাত সন্তানকে মানুষ করা এবং দ্বিতীয়টি যেন পোষ্যপুত্রকে পালন করার মত। পোষ্যপুত্র যেমন সেই নারীকে নিজের মা বলে স্বীকার করে নিতে কখনই পারেনা— তা সেখানে যতই বিদ্যালাভ করুক এবং ধন-সম্পত্তির অধিকারীই হোক্। তেমনি নারীও জানে ওছেলে আমার সত্যকারের ছেলে নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধেও আমার এই কথাই মনে হয়। প্রথম থেকে সুরের জন্ম দিয়ে তাকে গড়ে তুলার মধ্যে সত্যকারের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনাই বেশী থাকে, অর্থাৎ গুরুমারা বিদ্যায় তারা বড় একটা যায় না, এবং তাদের সর্ব্বদাই মনে রাখতে হয় আমার যা কিছু সবই ওইখান থেকেই, অবশ্য এখানেও যে ব্যতিক্রম থাকেনা তা নয়; —যেমন কোন কোন ছেলে পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে। তবে তার নিজ পরিচয়ের বৃত্তান্ত কোন দিনই মন থেকে সরাবার উপায় থাকে না এবং সুখ-শান্তি কল্যাণ সবই চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যাদাতা এবং শিল্পীকরে গড়ে-

তুল্য গুরুকে ত্যাগ করলেও ওই রকমই হয়। বিশ্বাসঘাতকতার মত পাপ আর নেই।

সঙ্গীতেও চক্ষুদান গুরুমাত্র একজনই হন। এখানে সেখানে সামান্য কিছু শিখে পরে যদি যোগ্য গুরু লাভ হয়ে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় তাহলে আগের তাঁরা সাধারণ শিক্ষকরূপেই গণ্য হবেন। গুরু হবেন না। তবে তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞচিত্তে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখে যেতে হয়।

গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ এখন খুবই কমে গেছে। যেন ক্রেতা-বিক্রেতার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করেন টাকা দিয়ে যখন গান-বাজনা কিনছি তখন আর কোন কর্তব্য নেই। এই মনোভাবে তাদের যে ফল লাভ হয় তা মাকাল ফলের মতই। অর্থাৎ উপরটি দর্শনীয় হলেও ভেতরে বিদ্যার অমৃত রসের পরিবর্তে সেখানে গরলই জন্মে।

(৫৭)

গাকা দেখার সূত্র,—

ভেলাইডিহায় কয়েক দিন থেকে দিন গণনায় বাড়ী ফেরবার সময় হয়েছে বুঝে আগের দিনের রাত্রিকালে গো-যানে রওনা হলাম। বিকেলে রাজাবাহাদুর জেলেদের ডাকিয়ে এনে নিজে সংগে করে তাদের নিয়ে গেলেন নদীর হ্রদে মাছ ধরিয়ে আমার সংগে দেবেন বলে। অল্প সময়ের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড কাত্‌লা মাছ ধরিয়ে নিয়ে এলেন। মাছটার ওজন তের-চোদ্দ সেরের মত হবে। রাজাবাহাদুর বললেন—প্রথম নিক্ষেপেই মাছটা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ওই মাছ এবং অন্যান্য দ্রব্য ও কিছু টাকা আমাকে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে যতবারই দেশে এসেছি ততবারই মনে হয়েছে আমি যেন আমার জমীদারী পরিদর্শনে গেছি আর প্রজারা আমাকে বিবিধ উপঢৌকন প্রদান করে পরিতুষ্ট করার আগ্রহ দেখিয়েছে। বিশেষ করে রাজার মত ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষাগুরুর প্রতি এরকম উচ্চ মন নিয়ে আদর্শ শিষ্যের পরিচয় প্রদান সত্যই যেন অচিন্তনীয়।

গান-বাজনা সেরে সেদিন রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন বেলা ১১টার সময় বাড়ীতে পৌছলাম। দেখলাম বৈঠকখানায় ঠাকুরদা,' দাদামশায় এবং আরো দু' তিনজন বসে আছেন। সকলেই উঠে এসে জানালেন—আমরা চিন্তামুক্ত হলাম।

সেই তিনজন ভদ্রলোকের কাছে অনুমতি নিয়ে দাদু ও দাদামশায় আমার সংগে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

সেদিন সেই বৃহৎ মৎস্যটিকে কর্ত্তন করার ব্যাপারে বেশ সমস্যা এল। বৃহৎ অর্থাৎ বড় হলেই নানান দিক দিয়ে বাধা-বিপত্তি থাকে,—বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। ছোট হলে কোন সমস্যা নেই,—হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি কিছুই থাকে না,—মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে।

পাক ক্রিয়ায় সুনামে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এক পরিচিত ব্যক্তিকে রন্ধন কার্য্যের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। তিনি নিজেই কুড়োল দিয়ে মৎস্যের মস্তক ছেদন করে নিয়ে তারপর খুব কায়দা করে বাকী অংশ খণ্ড খণ্ড করে নিলেন। সেই মৎস্যের দ্বারা দু'তিন রকমের উপাদেয় রান্না করেছিলেন।

প্রথানুযায়ী পাকা দেখা উপলক্ষ্যে পাড়ার সকলকেই মধ্যাহ্নে আহারাদির নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিকেলে দর্শনপর্ব সমাধা হল। রাত্রে হল গান-বাজনার আসর। বড়কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাজালেন সুরবাহার ও সেতার, আমারও বাদ গেল না—গান, সেতার দুই-ই হল। আঠার ক্রোশ অর্থাৎ ছত্রিশ মাইল গো-গাড়ীর মধ্যে বসে আসা, তারপর বাড়ীতে এসে অবধি বিশ্রামেরও সময় পাইনি, শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কেউ শুনতে চাইলে গাইতে-বাজাতে পারব না এ কথা আমি কোনদিনই বলতে পারি না। বরাবরই একে খুব কর্ত্তব্য ও পরিচয় রক্ষার প্রয়োজন মনে করি। বিবাহের পাকাপাকি দিন স্থির হয়ে গেল সেই সামনের ২৩শে ফাল্গুন (ইং ১৯২১)। দেনা-পাওনা ইত্যাদির কোন প্রশ্নই নেই—শুধু শাঁখা-শাড়ী। সুতরাং তাঁরা হৃষ্টচিত্তে পরের দিন প্রাতঃকালে জলযোগ সমাধা করে রওনা হয়ে গেলেন। আমি দু'দিন পরেই লালগোলায় চলে এলাম।

ঠাকুরদা'র ইচ্ছাক্রমে মেজকাকা যথাসময়ে লালগোলার মহারাজকে চিঠি লিখে জানালেন আমার বিবাহ ও তার দিন স্থিরের কথা। চিঠি পেয়ে মহারাজা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—কি! এবার চতুষ্পদ হতে চললে?

চুপ করে থেকে মনের মধ্যে তখন এই কথাই এসেছিল চতুষ্পদ হওয়া তো ভালই—চলার পথে দ্বিগুণ শক্তি পাওয়া যাবে, পরক্ষণেই আবার একথাও মনে হয়েছিল এই চতুষ্পদ সত্যই কি তাই ? না যে দুটো আছে সে দু'টোরও পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি হবে ? যাই হোক্—বিবাহের ব্যাপারে মহারাজা খুসী হলেন বলে মনে হল না। কি জানি তিনি হয়ত এই মনে করলেন এবার আমি ঘন ঘন দেশে পালাব, তারপর হয়ত বাসা চাইব, গান-বাজনার সাধনায় ভাটা পড়বে।

ফাল্গুনের ২০শে তারিখে দেশে এলাম। বাড়ীতে তখন উদ্‌যোগপর্ব পুরাদমে চলছে।

বিয়ের দু'তিন দিন আগে থাকতে আত্মীয় কুটুম্বজনে ঘর ভরে গেছল। বিয়ের দিন ভোর থেকে সাঁনাইএ ললিতরাগ থেকে রাগ পরিবর্ত্তন হয়ে বাজতে লাগল।

বর পিতৃহীন বলে বড়কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই নান্দিমুখ শ্রাদ্ধাদির কাজ সমাধা করলেন।

বেলা ৯টার সময় জনা তিরিশ বরযাত্রী আহারাদি করে নিয়ে দশটি গো-গাড়ীতে রওনা হয়ে গেলেন এবং বরকর্তারূপে বড়কাকা তাঁর নিজস্ব গো-গাড়ীতে চড়ে সংগে গেলেন। তখন পাল্কী এবং গো-গাড়ী ছাড়া আর কোন যাতায়াতের যানবাহন ছিলনা।

বাড়ীর তত্ত্বাবধান এবং বর-কনে আসার দিনে পাকস্পর্শ উপলক্ষ্যে লোকজন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবার জন্য দাদুকে বাড়ীতে থাকতে হল।

পাত্রীর গ্রামের দূরত্ব বিষ্ণুপুর হতে প্রায় ২৪ মাইলের মত। তখনকার দিনে আমাদের দেশে বরেরা যে রকম পোষাক পরে বিবাহ করতে যেত আমিও তাকেই যথোপযুক্ত মনে করে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলাম। এখনকার দিনে তার বিবরণটি খুবই কৌতুককর মনে হয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করবে। তাহলেও জানাই—মেদনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা নামক স্থানের তৈরি তাঁতের কোরা নক্সা পাড় কাপড়ই তখন বরের পরিধানের জন্য ক্রয় হত। তার দাম এক টাকা দশ আনা ছিল। সেই কাপড় পরে এবং ছ'টি পকেট যুক্ত অর্দ্ধশিল্কের কোট গায়ে চড়িয়ে, ফিতে বাঁধা উর্দ্ধ গোড়ালি-যুক্ত বুটাকারের চর্মপাদুকা এবং ইষ্টকিন (মোজা) পরিধান করে, তার সংগে ফুলের মালা এবং টোপর এই দুটি যথাস্থানে স্থাপন করে বরের মূর্ত্তি ধারণ করেছিলাম।

তারপর সেদিন বেলা ১২টার সময় প্রায় ছ' ফুট লম্বা বরকে কুলদেবতা ৺গোপীনাথকে প্রণাম করে এবং সমস্ত গুরুজনদের প্রণাম সেরে পাল্কীতে কুব্জাকারে প্রবেশ করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসতে হল। সোজা হয়ে লম্বা মানুষের বসা চলে না, হাত মাথায় ঠেকে। দু' পাশে শিশু ও নারীরা ভিড় করে দাঁড়াল।

বরের গলায় হার নেই দেখে নূতন কাকীমা (বড় কাকার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) সংগে সংগে তাঁর গলায় কামরাঙ্গা গড়নের হারটি খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন পর। অপরিহার্য্য যা তাই করে দিলেন।

বিবাহে কুটুম্বজন আসবে তাই পুরাতন অব্যবহার্য্য হারকে ভেঙ্গে নূতন করে বড়কাকা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কাকীমার গলায় বেশীক্ষণ স্থান পেল না। এই কাকীমার চরিত্রের সরলতা, কর্ত্তব্যে তৎপরতা, সকলকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা নজিরস্বরূপ ছিল। সর্বোপরি আমার মনে এঁকে রেখেছে সেদিন তাঁর তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করার সেই মূর্ত্তিটি। সেই মাতৃসমা দেবীকে যখনই মনে হয় তখনই ভক্তি-শ্রদ্ধায় হৃদয় অলোড়িত হয়ে যায় এবং অভাবের শূন্যতা এনে দেয়।

নূতন কাকীমা আমার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি আনতে যাচ্ছ?

এর যথাযথ যে উত্তর আছে কর্তব্য ও ধর্মানুযায়ী তাতে বলতে হয় মায়ের দাসী আনতে যাচ্ছি।

আজকাল আর এইরূপ উত্তর পাবার জন্য ওরকমভাবে জিজ্ঞেস করার কথা বোধহয় মনে আর উদয় হতে চাইবে না। সর্বসমক্ষে এই জিজ্ঞাসার এই উত্তর দেওয়া যখন থেকে প্রচলিত হয়েছিল তখন পুত্রের সর্বদা ধর্ম ও কর্তব্যের বাঁধনে যুক্তহয়ে থাকার একান্ত প্রয়োজন বোধেই হয়েছিল।

যে মা দশ মাস জঠোরে ধারণ করে কত নিষ্ঠা, সংযম, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ নিয়ে এবং জীবন সংশয়ের সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে সন্তানকে পৃথিবীতে আনলেন, তারপর থেকে তাকে বড় করে তুলতে কত দিন প্রয়োজনে উপবাস, কত সেবা, যত্ন, লালন-পালন ইত্যাদির সংগে শিক্ষিত করার প্রয়াস নিলেন সর্ব্বপ্রযত্নে, এমন কি কোন কোন মাতা সেই সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়ে কাছ-ছাড়া করার গভীর বেদনা ও অভাব বিরাট ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করে

রইলেন, সেই মায়ের সেবা-যত্নের জন্য বিবাহগমনে যাত্রাকালীন 'তাঁর দাসী আনতে যাচ্ছি' একথা বলা তো মস্ত বড় কর্ত্তব্য ও ধর্মেরই কথা এবং প্রকৃত মানুষেরই কথা। আমরা যদি এই বাক্যের ধর্ম পালন করি তাহলে শুধু প্রকৃত মানুষ বলেই পরিচিত হবনা—জীবনের সবদিকেই সাফল্যের উজ্জ্বলতায় এবং সার্থকতায় ভরে উঠবে।

উলু ও শঙ্খধ্বনির ঘটার মধ্যে দিয়ে পাল্কী চলতে শুরু করল এবং ঢোল, কাঁসি, জগঝম্প বাদ্যের বাদকরা তুমুল রবে সুরু করে দিল তাদের বাদ্য।

সহর অতিক্রম করার শেষ পর্য্যন্ত ওই রকমভাবে বাজিয়ে গেল পাল্কীর দ্রুতগমনের সংগে পদচালনা করে। আমি ছোট তাকিয়াটিতে মুরুব্বিদের মত হেলান দিয়ে আসমানে ভেসে যাওয়ার মত যেতে লাগলাম। তারপর গন্তব্যের রাস্তা অতিক্রম করার সময় মাঝে মাঝে পাকা রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র সহরের মত স্থানে বাহকরা বিশ্রাম করার জন্য পাল্কী নামাবার সংগে সংগে বাদ্যকাররা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বাজনা আরম্ভ করতেই চতুর্দিক থেকে মেয়েছেলে বাড়ীর বৌ প্রভৃতি পাল্কীর কাছে এসে জড় হতে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বল্প উচ্চে বলতে লাগল—শুধু বরটা যাচ্ছে বিয়া করতে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কোন কোন মহিলা বলল—বিয়ার বয়েস পেরিয়ে গেছে—ধেড়্যা বর। কেউ বলল—ওর বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিয়া হচ্ছে—দ্রোজ বর, "মচ বেরান বর আবার কখনও প্রথম পক্ষের হয় ?"

এখনকার প্রথমপক্ষের অনেক বরকে যদি তখনকার ওরা দেখত তাহলে বলত—চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পক্ষের বর হয়ে যাচ্ছে এবং অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবত আহা বেচারী বৌটার ভাগ্যে কি হবে ? কিন্তু ব্যাপারটা তা মোটেই নয়,—বর-কনের বয়সের নিয়মসমতা ঠিকমত হিসাব ধরেই চলছে। অর্থাৎ এখনকার দিনে বিয়ে করবনা করবনা করে ষাট বছর বয়সে বিয়ে করার যদি কারো খেয়াল হয় তাহলে সঙ্গত মানানের উপর কনেও জুটে যাবে পঞ্চান্ন থেকে। সুতরাং আগেকার সেই মন্তব্যকারিণী নারীদের এখনকার দিনে মোটেই অবাক হতে হবে না।

একটু পরেই বেহারারা পাল্কী তুলল। কিছুক্ষণের জন্য এইসব স্থানের শিশু, নারীদের স্বভাব সুন্দর পরিবেশ এবং সহজ-সরল স্পষ্ট বাক্য বেশ উপভোগ্য হয়েছিল হাসির খোরাক নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খানিকটা

সহরের মত ওন্দা নামক গ্রামে আসতেই আগের মত বর দেখতে আসার ধুম পড়ে গেল। বহুরকম মুখের বহুরকম কৌতূহল দৃষ্টি আমার উপর পতিত হতে লাগল। বর সেজে পাল্কীতে চড়ে যাওয়ার মাধ্যমে এইসব দৃশ্য মনে বেশ আনন্দ জাগিয়েছিল। সন্ধ্যার একটু আগে পাল্কী গিয়ে পৌঁছল জামজুড়ি নামক এক গ্রামকে অতিক্রম করেই তার বিস্তৃত প্রান্তরের শেষ সীমার একটি ছোট নদীর কাছে। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম বরযাত্রীরা সকলে জমায়েত হয়ে স্থানটিকে সরগোল করে রেখেছেন। তাঁরা জলযোগ সমাধা করে আমার আসার অপেক্ষায় ছিলেন একসংগে সেখান থেকে যাওয়া হবে বলে। পাল্কী থেকে নেমে বড়কাকার কাছে যেতেই তিনি সন্দেশ ও রসগোল্লা দিয়ে জলযোগ করালেন। জলযোগের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল আমার অগ্রজের গাড়ীতে।

আমাদের দেশের এইসব স্থান একেবারেই উদাস-নিঝুমের মত। স্থানটির পূর্ব্ব অংশের কিছু দূরে গ্রাম, উত্তরে শালের জংগল, পশ্চিমে মহুয়াদি বৃক্ষের বড় বাগান। তার নিকটেই খানিকটা জায়গা নিয়ে ঘেরা আকারে আঁটারী ও ফণীমনসার কাঁটা গাছের বেড়া। তার মাঝখানে হরিজন জাতিদের মনসাদেবীর থান (স্থান)। এইসব নির্জন ঠাকুর থানে এলে সীমার মাঝে অসীমকেই মনে হয়ে যায়।

পাঁচ বছর বয়স থেকে দাদামশায়ের গ্রাম থেকে পা'এ হেঁটে অনেকবার দেশে যাওয়া আসার সময় গন্তব্য পথের এই ঠাকুর থানের সামনেও মাথা নামিয়ে প্রণাম করে মানত করে বলেছি যেন ভাল গায়ক-বাদক হতে পারি। সেই তখন থেকেই বহু জায়গায় এইরকম ঠাকুর থানে ওই রকমভাবে মানত করেছিলাম কিন্তু মানত শোধ করার সৌভাগ্য হয়ে উঠল না। কারণ জানতেই পারলাম না ভাল গায়ক-বাদক হতে পেরেছি কিনা। সেই দেব-দেবীরা যদি জানিয়ে দিতেন সংগীতে উপযুক্ত হয়েছি তাহলে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হয়ে মানত শোধ করতে বিলম্ব হতনা। কিন্তু তাঁরা কৃপা করে সেই স্থানে পৌঁছে দেওয়ার ভার নিলেনও না আর আমারও মানতের সংখ্যা জমা হয়েই থেকে গেল। বুঝলাম এরকম মানতে তাঁরা কর্ণপাত করেন না। বুঝতে পেরেছি সফল আশীর্ব্বাদ পেতে হলে ধ্রুব, প্রহ্লাদের ভগবানকে ডাকার মত তেমনিভাবে সঙ্গীতকে ধরে তাঁকে প্রত্যেকটি সুরে সুরে ডেকে ওর মধ্যে দিয়ে তাঁর বিশ্বব্যাপীরূপ এঁকে যেতে হবে॥

(৫৮)

কনের দেশে,—

তারপর গন্তব্য পথে যাত্রা সুরু হল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় পাল্কী-মন্থরগতিতে গো-গাড়ীর সংগে চলতে লাগল। কাছা-কাছি এক একটা গ্রামে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল মণিপুর আর কদ্দুর? দু' তিন জায়গায় একই উত্তর পাওয়া গেল, পুরা পাঁচেক হবেক, মানে সোওয়া দু' মাইল। অবশেষে সত্যাই এসে পড়া গেল রাত ন'টার সময় গ্রামের সীমানায়। ভাঙ্গা গলায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে কণ্ঠের স্বর প্রকাশ করার চেষ্টার মত সানাই বাদক সানাইএ কানড়া রাগকে টানতে লাগল আর বাদকেরা তুমুল শব্দে বাদ্য আরম্ভ করে দিল। সেই শব্দে গ্রামের ছেলে-মেয়ে প্রভৃতি দৌড়ে এসে পাল্কীর চতুর্দিকে এমন ভীড় করে ফেলল যে, তাতে পাল্কী এগিয়ে যাওয়া মুস্কিল হতে লাগল। রাত্রির অন্ধকারে মশালের আলো, বাজনার তুমুল শব্দ ও জনকোলাহল—সব মিলিয়ে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যেন মনে হতে লাগল আমি এক অঘটন ঘটাতে যাচ্ছি। গ্রামে প্রবেশ করে কর্মকর্ত্তাদের নির্দেশ মত পাল্কী যেখানে নামল সেখান হতে দেখতে পেলাম একটি খোড়ো ঘরের মধ্যে প্রশস্ত জায়গায় বরাসন হয়েছে, আর তার চার পাশে বরযাত্রীরা বসে জলযোগ করছেন এঁরা ভীড় দেখে গাড়ী থেকে নেমে আগেই চলে এসেছিলেন।

সেই ঘরের সামনে শালডালে তৈরী বৃহৎ ছাদলা, তার তলায় সত্‌রঞ্চির উপর বসে বহু লোক। যেন যাত্রাভিনয়ের আসরের মত। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলাম উঁচু লম্বা রোয়াকের উপর সারিবদ্ধ হয়ে গ্রামের বোধ হয় যত মহিলা ছিল সবাই বর দেখার আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চারিদিকেই লোকে-লোকারণ্য।

তখনকার দিনে পাল্কী থেকে বরকে নামানর এক বিশেষ প্রথা ছিল। এখনও মনে হয় অন্ততঃ পাল্কীতে আছে।

প্রথাটা এই,—কন্যাপক্ষের কোন আত্মীয়ের দ্বারা বরকে পাল্কী থেকে কোলে করে তুলে বরাসনে নিয়ে গিয়ে বসান হয়ে থাকে। বহু আগে এবং আমার সময়েও বর খুব ছোট বয়সের হত বলে আদর করে এই নামান

প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং যে কেউ সহজেই পারত এই কাজটি সমাধা করতে। কোন গতিকে বরের বয়স বেশী হয়ে পড়লে পাল্কী থেকে নামাবার জন্য একজন শক্ত-পোক্ত অস্থিসমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে থাকেন। বয়স্ক বরেদের এই প্রথার লজ্জাকর ব্যাপারে খুবই আপত্তি থাকলেও প্রথাটি করনীয় কর্ত্তব্যের আওতায় এসে পড়ায় কোন আপত্তি টিকে না। কন্যা-পক্ষের লোকেরা মনে করেন বহু ভাগ্যের এই বর-বস্তুটিকে পাওয়ার জন্য চরম আদর দেখান কর্তব্য তাই এই নিয়ম পালিত হয়ে এসেছে। আমার পক্ষে এই নিয়ম বিড়ম্বনার মত হয়ে খুব বিব্রত ও লজ্জিত করেছিল। অবশেষে কচি খোকা সাজতেই হল। পাল্কী থেকে একজনের কোমরের সুতীক্ষ্ণ অস্থির উপর চেপে যেতে যেতে মনে হয়েছিল যেন জ্বালানী কাঠের উপর চেপে যাচ্ছি। বরাসনে বসেই বুঝতে পারলাম সেই গৃহটিতে ৺দুর্গাপূজা হয়। একটু পরেই কন্যাপক্ষের এক ব্যক্তি বড়কাকাকে বললেন—গায়ক হিসেবে বরের খুব নাম-ডাক আছে বলে শুধু ধারে-পাশের নয় দূরের গ্রাম থেকেও অনেকে এসেছেন, তাই এত লোকের সমাগম হয়েছে এবং তাদের একান্ত বাসনা আছে একটু গান শুনবারও।" আমি তো এই কথা শুনে স্তম্ভিত। ভেবেই পেলামনা বর হয়ে এসে আজকের এই দিনে তাঁদের ইচ্ছে কি করে পূরণ হতে পারে! আমার অনিচ্ছার ভাব দেখে দাদামশায় এসে আমাকে বললেন—অনেক দূর থেকে বহু লোক এসেচে গান শুনার আশা-আগ্রহ নিয়ে দু'একখানা গান না শুনালে কি চলে? বেশ বুঝলাম এঁদের আগ্রহে উৎসাহ দিয়ে আগে থাকতেই দাদামশায় কথা দিয়ে রেখেছিলেন। ছোট থেকে গাইতে পারার জন্য লোককে শুনানর অত্যধিক আগ্রহ ছিল দাদামশায়ের। গান শুনার এত ভক্ত খুব কম দেখেছি।

বড়কাকা বিনয়ের সহিত দাদামশায়কে তাঁদের বলতে বললেন—সমস্ত দিনটা পাল্কীতে বসে আসতে হয়েছে, শরীর খুবই ক্লান্ত হবারই কথা, খাওয়াও না হওয়ার মত, তাছাড়া আজ সে বর সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে আজ ওকে রেহাই দিতে। এখানে যখন শ্বশুরবাড়ী হল তখন তাঁরা সুবিধামত শুনার ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।" অনেকেই আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—তাঁরা এই কথা শুনেও খুব বেশী অনুরোধ করাতে বড়কাকা হাসতে হাসতে বললেন—এঁদের এত আশা-আগ্রহ যখন তখন দু'একটা শুনিয়ে দাও। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বিয়ের লগ্ন এইজন্যই বেশী রাত্রে

করা হয়েছে। আমিও দেখলাম এরকম আগ্রহে আর না করা চলে না। আগেই একস্থানে জানিয়েছি—তখন যে কোন সম্ভ্রান্ত গ্রামে তানপুরা, পাখোওয়াজ ও তব্‌লা থাকতই।

ঘণ্টাখানেক ধরে বাঙ্‌লা খেয়াল, ভজন ও ঠুম্‌রী শুনালাম। সকলের অনুরোধে একখানি ধ্রুপদও গাইতে হল। গান শেষ হবার পর দেখলাম তাঁরা খুব খুসী হয়ে সমঝদারের মত মন্তব্য প্রকাশ করে সকলের কাছে বিনয় সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে পরিচয় লাভ হয়েছিল তাতে সত্যই মনে খুব গর্ব্ব ও আনন্দ এসেছিল। কারণ, তখন আমাদের দেশের মানুষদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি কিরূপ গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল, এই ঘটনার চিত্ররূপটি তারই সুন্দর এক সাক্ষ্যস্বরূপ হয়েছিল।

এই অপূর্ব পরিচয়টির বয়স কতই বা হবে? কিন্তু এখন সিনেমা ও আধুনিক গান এসে আসলের দশা কি হয়ে গেল!

আগে দেশের রাজা-জমীদারদের শত শত বৎসর ধরে বংশপরম্পরায় গায়ক-বাদক থাকার দরুণ তাঁদের কাছে গতায়তের সুযোগ ও শিক্ষা পেয়ে জনসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ বেড়েছিল এবং প্রচার বিস্তৃতি ঘটেছিল চর্চারত ব্যক্তিদের দ্বারা। শ্রোতাদের ধ্রুপদ গানের প্রতিই আগ্রহ বিশেষ করে ছিল। তরল গান সাধারণে পছন্দ করত না। সেদিন গানের পর শ্বশুর মহাশয় বলেছিলেন—গায়ক সত্যকিঙ্করের সংগে আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে এ কথা লোক পরম্পরা শুনে দূর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে সাড়া পড়ে গেছল এবং সকলেই শুভদিনটির আগ্রহ প্রতিক্ষায় ছিল।" এই কথা শুনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নেমে এসেছিল।

রাত ১২টার পর বিবাহের সম্প্রদান এবং পরে খাওয়া দাওয়া চুকে যাবার পর প্রমিলাদের রাণী অন্তঃপুরে কুমারী সৈনিকরা এসে বন্দী করে নিয়ে গেল। আতঙ্ক নিয়ে গেলাম সেখানে। শুনেছিলাম সেখানে যে রকম রং তামাসার রসের বন্যা বয় তাতে তার ধাক্কায় বরকে হাবুডুবু খেতে হয়। তাছাড়া নানানভাবে কথার হেঁয়ালী প্রয়োগ করে বরকে পদে পদে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র থাকে। বর সদুত্তর দিতে না পারলে হাসির হিল্লোল বয়ে যায়। কিন্তু আমি সেই বাসর দরবারে যা পেয়েছিলাম তার সবটাই ছিল উপভোগ্য ও তৃপ্তিকর।

বাসর ঘর সম্বন্ধে যে বিরূপ সমালোচনা থাকে তার কোন পরিচয়ই

আমি পাইনি। এই রসসমৃদ্ধ তৃপ্তিকর বস্তুর প্রকৃত রূপ এখনকার সভ্য সমাজে আছে কি না জানি না।

সেদিন বাসর ঘরের সমস্ত সময়টাই একরকম গানের ফর্‌মাসেই কেটে গেছল। " একটি প্রৌঢ়া মহিলার ফর্‌মাসে বিস্মিত ও আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। তিনি বললেন—একটি নিধুবাবু টপ্পা শুনব। আমি গেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এই গানের নাম কি করে জানলেন? তিনি বললেন—আমার কর্ত্তার কাছে। শুনতে কি রকম লাগল?

বল্‌লেন—আগের গুলির চেয়ে বেশী ভাল লাগল—কথায় কথায় সুরের ঢেউগুলি কেমন সুন্দর লাগছিল। সেদিন সবচেয়ে খুব ভাল লেগেছিল নবীনারা বা কেউই তরল গানের ফর্‌মাস করেন নি। সিনেমা ও আধুনিক গানের তখন সৃষ্টি হয়ে প্রচার বিস্তৃতি ঘটেনি বলেই রুচি-সুরুচিপূর্ণ ছিল। সময়ের উপযোগী করে কনের বৌদি'রা কনেকে একটি গান শিখিয়ে রেখেছিলেন বোধ হয় বর গায়ক বলে তাকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে। সে কথা একদিন বধুর মুখেই শুনেছিলাম। তিনি একথাও বলেছিলেন সম্বন্ধ পাকা হবার পর থেকে তোমার নাম-ডাক শুনে বৌদি'রা এবং গ্রামের মহিলারা কত রকমভাবে যে আমাকে তোমার উপযুক্ত করে তুলবার জন্য তালিম দিয়েছিলেন সে কথা মনে হলেই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়। দিন যতই নিকটে এগিয়ে আসতে লাগল ততই দেখতাম তাঁদের হাসিমুখের উপর বিচ্ছেদ কাতরতার সজল করুণ দৃষ্টির এক অপূর্ব মায়াময় রূপ। শ্বশুরবাড়ী যাত্রার শেষ সময়েও তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে কত উপদেশ দিয়েছিলেন।" আদর্শমূলক এই সব কথা শুনে আমি তাঁকে বলেছিলাম—এইরূপ তালিমই সত্যকারের তালিম। এই তালিম না থাকলে সংসারে এসে সুখী করতে পারে না।

তুমি এইসব মূল্যবান তামিল পেয়ে এসেছিলে বলেই এবং তোমার বংশ ও জন্মগত পাওয়া সরল স্বভাবের উপর স্বচ্ছ অন্তরে সেগুলি গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলে এবং সেইজন্যই তুমি ১২ বছর বয়সে এসে সেই তখন থেকেই সংসারের কর্ত্তব্য পালনে যত্ন নিয়ে এসেছ। শুধু তাই নয় সময় সময় অহেতুক ব্যবহারও অনেক সহ্য করে এসেছ এবং সেইসব কথা আমাকে কোনদিনই না জানিয়ে অসীম ধৈর্য্যের সহিত চুপ করে সহ্য করে এসেছ।

এর উত্তরে বলেছিলেন—আমার ক্ষতি কিছুই হয়নি বরং ভগবান

লাভের অঙ্কই বাড়িয়ে গেছেন। রূঢ়কথা সহ্য করবার শক্তি না থাকলে ঘর ভেঙ্গে যায়, আসবার সময় মা বলে দিয়েছিলেন—'যে সয় সে রয়,—যে না সয় সে নাশ হয়।'

তাঁর কাছে এইসব কথা শুনে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। তারপর বালিকা-বধূ সেদিন স্বামীর উদ্দেশ্যে গভীর আবেদন মূলক ও নিবিড় ভাব-তাৎপর্য্যের উপর শেখান গানটি যেভাবে সঠিক সুর রেখে স্নিগ্ধতার উপর গেয়েছিলেন তাতে আমি সহর্ষে বিস্মিত হয়েছিলাম, তার সংগে বৌদি'দের শেখানর তালিম দেখে তারিফ করেছিলাম। বিপুলভাবে সঙ্গীত চর্চার প্রভাবই এই সামর্থের কারণ।

বহু আগের সময় থেকে এখনও বিশেষ করে পল্লীর ললনারাই বাসর-ঘরে উপস্থিত হয়ে অনাবিল রঙ্গ-তামাসায় উচ্ছল আনন্দ উপভোগ করে থাকেন একান্ত সরল ও প্রীতি-সমৃদ্ধ মন নিয়ে। নিজের অন্তরের মত ভেবে বর-কনেকে তাঁরা পরম তৃপ্তির সহিত প্রীতি-ভালবাসায় ভরে দেন। দেখেছি কত রকমের আনন্দ করার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতার লেশমাত্র থাকে না। আর একটা লক্ষণীয় ছিল বিচারবোধ নিয়ে কাণ্ডজ্ঞান রক্ষা করে কোন পুরুষ বাসর-ঘরে যেত না। আগে বিবাহের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত প্রায় সকল গ্রাম ও সহরে জামাতা শ্বশুরগৃহে এলে বাসর-ঘরের মতই জামাইকে নিয়ে উপযুক্ত সম্পর্কের মহিলারা বিকেলে বা সন্ধ্যার পর উভয়কে নিয়ে নানানভাবে রসস্নিগ্ধ আনন্দ করতেন। কিন্তু এখনকার মানুষ যতবেশী নকল সভ্যতাকে গ্রহণ করছে ততই মনের আদান-প্রদানের তৃপ্তিকর মাধুর্য্যটি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মনে হয় যেন সবই কৃত্রিম। তাই অন্তর খুঁজতে গিয়ে বা আছে মনে করে ঠক্‌তে হয় বেশীই।

(৫৯)

আমাদের দেশে এবং বোধ হয় অনেক স্থানেই বিবাহের পরের দিন কুশণ্ডিকার অনুষ্ঠান সমাধা হয়। এই কুশণ্ডিকায় বহুক্ষণ ধরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপর বরকে বিবাহের ধর্মরক্ষা ইত্যাদি বহুরকমের নিয়ম পালনের জন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি দিতে হয়। এই সময় কনে বরের বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকে এবং এক এক সময় উক্ত ক্রিয়ার নিয়ম ধারায় যথাসময়ে বরকে কনের পাণিগ্রহণ করে সম্মুখভাগে রেখে

শপথমূলক বেদমন্ত্র পাঠ করতে হয় অগ্নির সমক্ষে এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে। হৃদয় তখন এক মহান প্রেরণায় আপ্লুত হয়ে যায়।

দুই দিনেরই মন্ত্রসমূহ এবং যোজ্ঞাগ্নির উপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে নানান প্রার্থনামূলক মন্ত্রের দ্বারা ঘৃতাহুতির মধ্যে যে তেজস্কর শক্তির প্রভাব নিহিত থাকে এবং তার সংগে কর্তব্যের নানান শপথ বাক্য; সেই সমস্ত বস্তুর প্রভাব উভয়ের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে উভয়কে কর্ত্তব্যে ও ধর্মের বাঁধনে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে রাখবে এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই আমাদের এই বিবাহপ্রথানুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল মুণি-ঋষিদের দ্বারা। তাঁরা নিশ্চয়ই বাস্তবজ্ঞানে বুঝেছিলেন বিবাহের জন্য এইরকম আনুষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থাই মিলনের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর হবে।

বেদমন্ত্র সমূহের অর্থ বুঝে নেবার যদি ইচ্ছে রাখা হয় তাহলে মেনে নিতে বিলম্ব হবে না যে, এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠানই যথার্থতায় শ্রেষ্ঠ ও সঙ্গত।

মহা মহা জ্ঞানী মুণিদের এই সৃষ্ট ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে চাইলে এত বড় সঙ্গত ক্রিয়ানুষ্ঠানের পরম সত্যকে ও তার কল্যাণকর স্বরূপকে হারাণ হবে।

বিবাহের পরের দিন রাত্রে বরযাত্রী প্রভৃতি সকলের খাওয়া দাওয়া সমাধার পর গৃহাভিমুখে রওনার জন্য আমরা প্রস্তুত হলাম। রাত্রে পাল্কীতে কনের পক্ষে একা যাওয়া নিরাপদ নয় বলে তাঁকে দাদামহাশয়ের গাড়ীতে যেতে হল।

কনেকে বিদায় দেবার দৃশ্য চোখে দেখা বড়ই কষ্টকর। সে দৃশ্য বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। তাতে বরকেও খুব ব্যথা-কাতর করে দিয়ে সেই বাড়ীর প্রত্যেকের উপর মমতায় মন ভরিয়ে দেয় এবং আকর্ষণের ভিত্তি চিরতরের জন্য শক্ত করে গেঁথে দেয়। কনে ও তার মায়ের এবং আরো অনেকের অবিশ্রান্ত চোখের জল পড়তে দেখে বড় কাতর করে দেয়। তখন চোখ ছল্ ছল্ করে উঠে, মনে মনে এই কথাই উদয় হয়—আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে মন্ত্রে অঙ্গীকার করেছি আপনাদেরটিকে আমি আজীবন যথাসাধ্য যত্নে, সুখে ও তৃপ্তিতে রাখব।

আমার মনে হয় যারা পীড়ন করে' দাবি দাওয়া আদায় করে তাদের বর এই সময়ের করুণ দৃশ্য দেখে এবং পরম আদরে লালিত-পালিত প্রাণসমা বস্তুটিকে আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্বত্ব হওয়ার কথা ভেবে নিশ্চয়ই খুব লজ্জিত ও বিচলিত হয়। এত বড় বস্তুকে যেখান থেকে

লাভ হচ্ছে সেখানে কোন পাওনার লোভ থাকা অমানুষিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা দাবি-দাওয়ার উপর চামার বৃত্তির পরিচয় দেয় তাদের ঘরে মেয়েকে পাঠানর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেখানে মেয়ে দিলে প্রকৃত সুখ ও মর্য্যাদা পায় না।

তারপর সেই বিদায়ের সময় কনের ছোট ছোট ভাই বোনদের আকুল কান্না দেখে মনকে ভীষণ অস্থির করে তুলেছিল। সত্যই ত—যে দিদি তাদের বুকে-কোলে মানুষ করেছে, কত আবদার কত দুরন্তপাণা সহ্য করেছে, আবার স্নেহের রসে ধমকও দিয়েছে, কত আদর, কত সেবা-শুশ্রুষা করেছে—সেই দিদি তাদের ছেড়ে দিয়ে আজ চলে যাবে বিধির বিধান মেনে! তাদের জন্য তো আর কোন বিধানই থাকবে না দিদির কাছে! কেবল দয়া করে তাঁরা যখন পাঠাবেন তখন পাবে দিদিকে দেখে তৃপ্তি কিন্তু সে পাওয়ার মধ্যে তো থাকবে কেবল দিদিকেই যত্ন আত্তি করা, —আবার মন কেমনের ভেতর শূন্যতা নিয়ে থাকা।

খানিকটা পথ অতিক্রম করার পরও শিশুদের কান্না কাণে শুনা যাচ্ছিল। তখন অন্তরটা আরো বেশী করে আলোড়িত হয়ে এই কথাই মনে এসে গেছল প্রত্যেক গোষ্ঠীভুক্ত জ্ঞাতির মধ্যে মিলনে যুক্ত হয়ে থাকার নিয়ম থাকলেই ভাল হত।

আমার পাল্কী যখন ওন্দা গ্রামে এসে পৌছল তখন ভোর হয়ে এসেছে। একটু পরেই দেখা হয়ে গেল ভেলাইডিহার রাজাবাহাদুরের নিজস্ব গোশকট। গাড়ী ভর্ত্তি বোঝাই করে বড় বড় মাছ পাঠিয়েছেন বৌভাতের জন্য। গাড়ী থামল না, তাড়াঁতাড়ি চলে গেল মাছগুলো শীগ্‌গীর পৌছনর জন্য। সেই মাছ প্রচুরভাবে নিমন্ত্রিত বহু ভদ্র ও হরিজনদের দিতে পারা গেছল।

বর-কনে একজোড় হয়ে গৃহে প্রবেশ করতে হয় বলে সেজন্য যতক্ষণ না দাদামশায়ের গাড়ী এসে পৌছল ততক্ষণ বেহারারা বিষ্ণুপুর সহরের মুখে পাল্কী নামিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী এসে পড়তেই দাদামশায় পাল্কীর মধ্যে আমার সামনে কনেকে বসিয়ে দিলেন।

বাদকেরাও এসে পড়ল। সানাইএর সুরের সংগে ঢোলাদি বাদ্যের তুমুল শব্দ পার্শ্ববর্ত্তী লোকজনদের আকর্ষণ করে পাল্কীর কাছে টেনে আনল।

পাল্কী মন্থরগতিতে সহর অতিক্রম করবার সময় এক একস্থানে বিশেষ পরিচিত গৃহের মহিলারা পাল্কী থামিয়ে বর ও কনেকে দৈ, মিষ্টি খাইয়ে

মঙ্গল কামনা জানাতে লাগলেন।

বেলা প্রায় ১০টার সময় বাড়ীর সামনে পাল্কী এসে থামল। তার চতুর্দিকেই তখন লোকে লোকারণ্য।

সেই নূতন কাকীমা কনের মুখ দেখে হাতে টাকা দিয়ে হাসিতে মুখ ভরিয়ে পাল্কী থেকে কনেকে কোলে করে নামালেন। তখনকার তাঁর সেই তৃপ্তি ভাবময় মূর্ত্তি অপূর্ব লেগেছিল।

তারপর কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীগোপীনাথকে উভয়ে প্রণাম করে অন্যান্য গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার পর নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধা হল।

এই সময়ে আমাদের দেশে বেশ একটি আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত প্রথা ছিল, এখন আছে কিনা জানিনা।

প্রথাটি হচ্ছে বর-কনে গৃহে প্রবেশের পর কুলাচার ও মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাধা করে তারপর নাতি ও ভাই সম্পর্কের ব্যক্তিরা বরকে কোলে করে ছাঁদলা তলায় নাচাতে থাকেন—বাদ্যকারদের বিশেষ এক ছন্দ বোলের তালে তালে পা ফেলে। যিনি যখন নাচাতে সুরু করেন তখন তাঁর স্ত্রী কনেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনা থেকেই তাঁর একটি পায়ের পাতা সেই ছন্দে ছন্দে উঠা নামা করতে থাকায় তার মধ্যে দিয়ে শরীরের উপর নাচের এমন একটি সুন্দর চিত্ররূপ ফুটে উঠে যে তদ্দর্শনে সকলকে আরো বেশী করে আনন্দে ও হাস্যরসে মাতিয়ে দেয়।

এই নৃত্যানুষ্ঠানে প্রত্যেক নর্ত্তকদের কাছে সানাই ও ঢুলি ইত্যাদি বাদ্যকরদের বক্‌শিস্ প্রাপ্য হয়।

এই রকম একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রথার সৃষ্টির মূলে যে পরিচয় আছে তা হল তখন বর ও কনের বয়স খুব কম থাকত বলে তাদের তখনকার সেই মিলন-মধুর কচিরূপ প্রত্যক্ষ করে স্নেহের এত বেশী আকর্ষণ ও আনন্দ এসে যেত যে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে তাকে উপভোগ করার বাসনা আসত। গীত-বাদ্য ও নৃত্যের প্রভাব শক্তি মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হলে এইরকম আনন্দোজ্জ্বল মনের সৃষ্টি হয়।

যাই হোক্,—সেদিন আমাকে নিয়ে অর্থাৎ বয়স্ক বরকে নিয়ে নাচান হবে একথা শুনে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম এবং লজ্জায় মুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কোন রকমেই ছাড়ান পেলাম না, বিশেষ করে দাদু সম্পর্কের ব্যক্তিদের কাছে। বেশী জোরজবস্তি করে তাঁদের প্রবল

বাসনাকে নিরাশ করতে পারলাম না।

আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দাদামশায়ের নৃত্যের সাবলীল ভঙ্গীটি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে এঁকে আছে—ভারি চমৎকার তিনি নেচেছিলেন। দিদিমা কনেকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলেন হাসির হিল্লোল বইয়ে।

এই ব্যাপারের সমালোচনায় যাই থাক না কেন বরের পক্ষে এই রকম উপভোগ্য স্নেহাদর পাওয়া খুবই ভাগ্য বলে আমি মনে করি। এখনও সেইদিনের দাদু ও দিদার সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখ যখনই মনে পড়ে তখন চোখে জল চলে আসে। কি স্নেহ ও আদরই না দিতে জানতেন তখনকার এঁরা সব। তারপর সেদিন বৌভাতের খাওয়ান (এখন বৌভাত প্রায় উঠে গেছে বৌ লুচি হয়েছে) বেলা ১টার মধ্যেই সব স্তরের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সমাধা হল।

নিজের স্বাধিকারের উপর বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানে যতবারই লোকজন খাইয়েছি ততবারই মধ্যাহ্নের নিমন্ত্রণ মধ্যাহ্নেই সমাধা করে এসেছিলাম। আমি মনে করি যথা সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়াতে না পারলে তাঁদের কষ্ট দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানের দু' একদিন পরেই আত্মীয়-কুটুম্বজন যে যার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

এর পাঁচ-ছ' দিন পরেই ডাকযোগে লালগোলার মহারাজার স্বহস্তে লিখিত এক পত্র পেয়ে এবং সেই সংগে মাসকাবারের আগেই এক মাসের মাইনে পেয়ে সবিস্ময়ে খামের চিঠিটি খুলে পড়লাম। লিখেছেন—

"ভগবৎ নির্দ্দেশে এখন সংগীত শ্রবণ নিষিদ্ধ বিধায় একক জীবন যাপনে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি তোমার যন্ত্রাদি অবসরমত আসিয়া লইয়া যাইও।

আশা করি ভগবৎ কৃপায় কুশলে আছ। এখন আমি জীবন সায়াহ্নে উপনীত,—ভগবৎ কৃপার ভরসায় আছি। ইতি - শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া বড় বড় রাজা-জমীদারদের মতিগতির ও স্বভাবের অজানা স্বরূপ অনেকখানি উপলব্ধিতে আসিয়া যাইল।

যাহাই হোক—বিবাহরূপ বন্ধনকার্য্যের পরক্ষণেই ভগবৎ নিগ্রহে উপার্জ্জনের সরণী রুদ্ধ হইয়া যাইল দেখিয়া এতদ্দর্শনে দুশ্চিন্তায় পতিত হইলাম। ভগবৎ নির্দ্দেশে বিবাহকার্য্যে অলংকারাদি সমস্ত দ্রব্যই ক্রয়

করিতে হইয়াছিল বলিয়া ঋণগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। ইহার জন্যই বিশেষ করিয়া এই পত্রের মাধ্যমে ভগবৎ বিধানের উপর ভীষণ মুস্কিলে পড়িতে হইল। চতুষ্পদ প্রাপ্তির প্রথম পদক্ষেপেই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া যাইবে ইহা আমার জীবনে আশ্চর্য্যের কিছু নহে ইহাই মনে করিয়া ভগবৎএর উপর নির্ভর করিয়া থাকা ব্যতিরেকে তখন আর কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলাম না,—মস্তিষ্ক গুলাইয়া যাইল।

এই পত্রটি লেখার সময় মহারাজার বয়স সত্তোরের বেশী হবে। পরে আর একবার যখন আমি তাঁর নাতি রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের মেয়ের বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই তখন মহারাজার বয়স ছিল নব্বই-এর কাছাকাছি। মহারাজ অনেকক্ষণ ধরে আমার গান শুনেছিলেন—বোধ হয় আমার ভাগ্যগুণে ভগবৎ নির্দেশে।

আমার এই বিশ্বাস এসেছিল বিবাহের সংবাদ তাঁর কাছে যে মোটেই সুখকর হয়নি তারই ফলশ্রুতি সেই চিঠির মধ্যে ছিল। তবে পরে বুঝে-ছিলাম ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই—যদি তাঁর উপর সব নির্ভরকরে কর্ত্তব্য ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে বজায় রেখে যাওয়া যায়।

(৬০)

উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বিবাহের যে আনন্দ থাকে তা যেন অভাবের ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার মত উড়ে গেল। চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় যাওয়া যায়। ভেলাইডিহার রাজার কাছে যেতে পারতাম—তাঁর স্বাগত সম্বর্দ্ধনার দ্বার আমার জন্য সর্বদাই সাগ্রহে ও সমাদরে উন্মুক্ত ছিল কিন্তু লালগোলায় থাকা বন্ধ হয়ে গেছে এই সংবাদ শুনিয়ে সেখানে যেতে পারলাম না। পরে যখন একসময় রাজাবাহাদুর এই সংবাদ শুনে-ছিলেন তখন তিনি খুব বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন "বড় বড়রা যে এত বেশী খেয়াল-খুসীতে চলেন তা জানতাম না— ভেবেছিলাম আপনাকে পেয়ে তিনি বরাবরের জন্য যোগ্যসমাদরে রেখে দেবেন। তবে আপনার কোলকাতায় আসার সুযোগে অল্পদিনেই সুনামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেরূপ ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে সেরূপ এক জায়গায় থেকে অন্য কোথাও হত না, সুতরাং ভগবান আপনাকে উপযুক্ত স্থানেই এনেছেন,—কেবল সময় অপেক্ষা করছিল।"

উত্তরে বলেছিলাম—দু'চার জায়গায় আপনাদের মত ব্যক্তিদের কাছে

থাকতে পেয়ে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা, বিবিধ যন্ত্রে দখল এবং সাধনার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি। এও ভগবানের অশেষ কৃপায় সম্ভব হয়েছে। এই বিষয়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহ সাহায্য ও সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী হয়েই থাকব শ্রদ্ধান্তঃকরণে।

কোথায় যাব সেই চিন্তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ভগবান স্মরণ করিয়ে দিলেন এক সময় বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত পানাগড়ের সন্নিকট গোপালপুর গ্রামের জমীদার নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শেখাবার জন্য বিশেষ করে আমাকে আহ্বান জানিয়েছিল। তাঁকে আমার যাবার ইচ্ছে জানিয়ে চিঠি দিলাম। খুব শীগ্‌গীরই সমাদরে আহ্বানপূর্ব্বক চিঠি এল খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বাদে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ধার্য্য হয়ে।

দাদুর দেখে দেওয়া শুভদিনে সেখানে রওনা হয়ে গেলাম। নরেনবাবু অতি সমাদরে ও সসম্মানে আমাকে গ্রহণ করলেন। তাঁর ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্র বর্দ্ধমানে মাসে একবার করে গিয়ে মেজকাকার কাছে সেতার শিখে আসত। শিক্ষায় অগ্রসর তেমন কিছু হচ্ছিল না, তাই আমাকে রাখতে খুব আগ্রহী হয়েছিলেন। নরেনবাবু মানুষটি খুবই ভাল ছিলেন, তাছাড়া শাস্ত্রীয়সংগীতের যেমন সমঝ্‌দার ছিলেন তেমনি শিল্পীদের সম্মান-খাতিরও করতেন যথেষ্ট। ছোট ভাই জ্ঞানচন্দ্র সেতারে তালিম নিতে লাগল। রাত্রে প্রত্যেক দিনই গানের আসর চলত।

এই গোপালপুর গ্রামটি যেমনি বৃহৎ তেমনি বহু বর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত লোকের বসবাস আছে। এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ ভাল লাগত। মাইল দুই দূরে জংগলের মধ্যে পুরাকালের তৈরী প্রস্তরনির্মিত এক মন্দির মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। সেখানে গিয়ে মন্দিরের সামনে বসে প্রায়ই আমি বাবা মহাদেবকে গান শুনিয়ে আসতাম। এক একদিন সেতারও সংগে নিয়ে যেতাম। সেখানের পরিবেশ আত্মোন্নতির পক্ষে খুব সহায়ক বলে মনে হত। মন্দিরের সামনে গিয়ে কেবল এই কথাই মনে হত বহু আগে থাকতে বাবা মহেশ্বর যদি এই রকম স্থানে সাধন-ভজন করবার জন্য মনের উপর বৈরাগ্যশক্তি প্রদান করতেন তাহলে হয়ত সঙ্গীতকে ধরার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হত। এই স্থানটির পরমতৃপ্তি ও মুগ্ধকর আকর্ষণ বরাবরই আমার অন্তরে নিবিড় হয়ে আছে। তাই আমার রচিত 'সঙ্গীত ও কাহিনী' গ্রন্থে এইরকম স্থানে আমার মনকে সন্ত্রীসাধুরূপে গড়ে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার বাসনা প্রকাশ করেছি বাস্তব সত্যের পরিচয় রেখে।

গোপালপুরে মাস দুই থাকার পর জ্যৈষ্ঠ মাসে নরেনবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর খাস জমিদারী এলাকার কাছারী ও বাসবাড়ীযুক্ত এক গ্রামে। গ্রামটির নাম 'মহিষথাপুরী'। এই গ্রামটির দক্ষিণ পার্শ্বের অতি সন্নিকটেও শালবৃক্ষের বিরাট জংগল আছে। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি কৃষিজীবিদের বাস।

নরেনবাবুর ছোট ভাই অর্থাৎ আমার ছাত্রটির এইখানের জমীদারীর তত্বাবধানের জন্ত বেশ কিছুদিন থাকতে হবে তাই আমাকে এখানে থেকে শেখাতে হবে বলে আসতে হয়েছিল।

ছাত্রটির কিন্তু প্রথম প্রথম শিক্ষায় ও সাধনায় যেরূপ উদ্দীপনা ছিল তা যেন ক্রমশই শিথিল হতে লাগল। অনেকবার বললে তবে দিনান্তে একবার করে সেতার নিয়ে বসে বাজাত, তাও খুব মনোযোগ নিয়ে নয়। তার এই শৈথিল্যতার মনোভাব দেখে মনে হতে লাগল শীগ্গীরই আমাকে এখানের পাততাড়ি গুটোতে হবে।

ব্যতিক্রম না দেখিয়ে ছাত্রটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধনী ছাত্রদের মতই খেয়ালী চরিত্রের পরিচয় দিতে লাগল। কিন্তু ভাইটি যাতে ভাল বাজাতে পারে তারজন্ত নরেনবাবুর চেষ্টার অন্ত ছিল না এবং আমার ত ছিলই না।

এখানে কয়েকদিন থাকার পর গ্রামবাসীদের উদ্‌যোগে এবং নরেন-বাবুর সাহায্যে তাঁর উন্মুক্ত বৃহৎ প্রাঙ্গনে তিন দিন ধরে অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন হল। সে সময় গ্রামটি খুবই জম্‌জমাট হয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে নানাবিধ দ্রব্যের বহু দোকান বসায় লোকজনে সর্ব্বদা ভরে থাকত।

এখানে নাম সংকীর্তনের পরিবেশনে বেশ এক উন্নত প্রথায় দেখে-ছিলাম। মূল গায়ক দাঁড়িয়ে পালা কীর্ত্তনের পদাবলীর রচনা বস্তু নিয়ে গাইতেন, আর তাঁর দু' পাশে দু' জন দোয়ারী এবং দু' দিকে খোল বাদক থাকত। গায়কের তালযুক্ত সুকণ্ঠ ও পদাবলীর ভাব মাধুর্য্য এবং তার সংগে খোল-বাদকদের কৃতিত্বপূর্ণ বাদন খুবই উচ্চাঙ্গের ও মুগ্ধকর হত। এই রকম মনকে আকৃষ্ট করে রাখা সুন্দর নিয়মে হরিনাম সংকীর্তন আমি কেবলমাত্র কোলকাতার ৺পরেশনাথের মন্দিরের কাছে এক জায়গায় শুনেছিলাম। সেখানের নাম গানে সুরের বিস্তার ও তালের কাজ আরো উত্তম লেগেছিল। মনে হয়েছিল এই রকম নাম-সংকীর্তন সত্যই শুনবার জিনিস। না শুনলে ধারণায় আসত না এর মধ্যেও কি সুন্দর তৈরি গলায় রাগরূপ ও তালের ক্রিয়া দেখাল গায়করা। আমরা পশ্চিম দিকেই

কেবল তাকিয়ে থাকি মোহে মুগ্ধ হয়ে, নিজেদের মধ্যে যে কত কৃতি মানুষ ও কত সম্পদ আছে সেদিকে তাকাই না।

ওই মোহিষথাপুরি গ্রামে সেই উৎসবে যে সব কীর্ত্তনীয়ারা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই বাঁকুড়া জেলার উত্তর অংশের বিশেষ পরিচিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে।

এখানে উৎসব সমাধা হবার পর কীর্ত্তনগায়ক সম্প্রদায়রা একান্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় রাত্রে আমার গান-বাজনা হল। তাঁরা প্রত্যেকেই খুব দরদী সমঝ্দারের পরিচয় দিয়েছিলেন। আগে থাকতে আমার নাম জানতেন বলে সময় সুযোগে তাঁরা আমার কাছে এসে সংগীত সম্বন্ধের তত্ত্ব বিষয়ক অনেক কথা জিজ্ঞেস করতেন।

এই উৎসবের দু' চার দিন পরে ওখান হতে তিন চার মাইল দূরে নরেনবাবু তাঁর ভগিনীর শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। গ্রামটি দামোদর নদের সন্নিকটবর্ত্তী। পূর্বাহ্নেই পরিচয়ে জেনেছিলাম নরেনবাবুর যিনি ভগিনীপতি তাঁরা সাত ভাই, একাত্মরূপে একান্নবর্ত্তী, বিরাট ধনী এবং প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও কয়েকজন গর্ভমেণ্টের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত।

এই বৃহৎ পরিবারের আদর্শমূলক জীবনযাত্রার প্রণালী প্রত্যক্ষ করে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই সাত ভাই এর সন্তানাদি তখন প্রায় জনা চল্লিশের মত হবে। প্রত্যেক ভাই-এর স্ত্রীদের শ্বশুর গৃহেই থাকতে হয় গার্হস্থ্য ধর্মের সব কিছু গৌরবকে সযত্নে রক্ষা করে যাবার জন্য। ভাইদের অভিমত ছিল, নিজের স্বার্থকে বড় করে ধরে তাকে প্রশ্রয় দিলে একান্নবর্ত্তীর দৃঢ়সৌধে এবং তার কর্ত্তব্য ধর্মে চিড় খেতে খেতে ক্রমশঃ সব ঐতিহ্য ও গৌরব নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, স্বার্থকে সর্বস্ব ভাবলে সন্তানরাও প্রকৃত মানুষ হয় না। আমরা যে সময় গেছলাম তখন সাত ভাইই বাড়ীতে ছিলেন। এঁদের পিতা-মাতাও তখন বেশ সুস্থ শরীরে ও মনের পরিপূর্ণ আনন্দে বর্ত্তমান। বয়স উভয়ের তখন নব্বই ও পঁচাশী।

উঁচু পাঁচিরে ঘেরা বৈঠকখানার সামনের দু'পাশে ফুলের টব্ ও ঝাউ গাছের পরিবর্ত্তে সারিবন্দী হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধানের বড় বড় মরাই (খড় ও খড়ের মোটা দড়ি দিয়ে বৃহৎ আকারের তৈরী ধান রাখার পাত্র) সাজান ছিল তা প্রায় শ'খানেক হবে। বৃহৎ এক গোশালায় কুড়িটি লাঙলের জন্য চল্লিশটি বলদ এবং দুগ্ধবতী গাভী গোটা তিরিশ ছিল। প্রত্যহ দুধ প্রায় মণখানেক করে হত। চার পাঁচটি বড় বড় পুকুর এবং

তরিতরকারির ক্ষেতও যথেষ্ট ছিল। নরেনবাবু এবং তাঁর ভগিনীপতি আমাকে সমস্ত দেখাতে লাগলেন। এইসব উৎপাদিত বস্তুর বিপুল সম্ভার মনকে পুলকিত করে দিয়েছিল। অত মরাইএ যত ধান ছিল তা বর্ত্তমানের হিসেবে কয়েক লক্ষ কুইন্টাল হবে।

নরেনবাবু বললেন, এই সাত ভাইএর যৌথ সংসার খুবই নিয়মশৃঙ্খলা ও দায়িত্বের উপর চলে আসছে। ছেলেরা একসংগে খেতে বসে, দুই বধূ তত্ত্বাবধান করেন, অন্য দুই বধূ পরিবেশনে নিযুক্ত থাকেন, আর দুই বধূ রন্ধনশালায় তদারক করেন এবং একজন থাকেন সর্বদা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাযত্নাদির জন্য। এই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজ পালা করে পরিবর্ত্তিত হয়।

খাবার সময় সন্তানরা চুপচাপ দিয়ে খেয়ে যায়,—এটা আরো দাও, ওটা আরো দাও—এইসব ধরণের আবদার করা চলেনা এবং কেউ করেও না। খাওয়া সারা হলেই যে যার স্কুলে ও কলেজে চলে যায়। কলেজে যারা যায় তারা সাইকেলে চড়ে নিকটবর্ত্তী কলেজে।

সাত ভাই খেতে বসেন এক সংগে—যখন সকলে গৃহে থাকেন। সে সময় বড় বধূই তাঁদের তত্ত্বাবধান করেন।

বিদেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা মাইনের টাকার মিতব্যয়িতার উপর চালিয়ে বাকী সমস্ত টাকা পিতার নামে পাঠিয়ে দেন।

এঁদের বিষয়ে আরো অনেক কিছু আদর্শমূলক পরিচয় পেয়েছিলাম। রাত্রে আমার গান-বাজনা শুনবার জন্য যখন সাত ভাই এক একটি তাকিয়ার সামনে বসলেন তখন মনে হয়েছিল এই দৃশ্যরূপ সকলেরই দেখবার মত। সাতটি ভাই যেন একসূত্রে গাঁথা পারিজাত পুষ্পের মত। যতক্ষণ গান-বাজনা শুনালাম ততক্ষণ কেউই একটি কথা বলেন নি, মনে হয়েছিল সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। কিন্তু বহু আসরে এই রকম সংযম ও নিয়ম-নীতির পরিচয় খুব কম পাওয়া যায়। ভদ্র নামের কোন কোন ব্যক্তি যখন গীত-বাদ্যের সময় হুড় হুড় করে এসে বসে পড়েন এবং তাঁকে আসুন আসুন বলে অভ্যর্থনা করতে থাকা হয়, এবং কোন কোন ব্যক্তি ওই সময় যখন উঠে পড়েন তখন মনে হয় এঁদের যখন এটুকু বোধ শক্তি নেই,—গানের বা বাদ্যের সময় শিল্পীর সৃষ্টি চিন্তায় ও পরিবেশনের ধ্যানে ব্যাঘাত এনে অন্যমনস্ক করে দেওয়া এবং শিল্পীর ও সঙ্গীতের সম্মান রক্ষায় ঘোরতর অন্যায় তখন তাঁরা কেন আসেন আসরে বিচারবোধের এত অভাব নিয়ে? যাই হোক্ এই পরিবারের এই রকম দৃষ্টান্তের মত আগে আদর্শ যৌথ-

পরিবার আমাদের দেশের গার্হস্থ্য জীবনে বহু ছিল। উপস্থিত যেখানের পরিচয় দিলাম সেখানের মত অমন নয়ন মন তৃপ্ত করা বাঙালী পরিবারের চিত্ররূপ বোধ হয় আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। তবে সম্প্রতি এক পরিচয়ের মাধ্যমে অনেকটা এই রকম আদর্শমূলক ব্যবস্থার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি আমার এক এসরাজ ছাত্রের কাছে। ছাত্রটি এখন চন্দননগর (হুগলী জেলা) গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইকনমিকস্ এর অধ্যাপক। কোলকাতায় ছাত্রাবস্থায় এসরাজ শিখতে আরম্ভ করে, তারপর এম্, এ পাশ করার সংগে সংগেই শিউড়ি (বীরভূম) কলেজে অধ্যাপকের পদ পেয়ে সেখান থেকেও আমার কাছে এসে শিখে যেতেন। এঁরা চার ভাই, প্রত্যেক ভাই তাঁদের স্ত্রীকে শিউড়ীর সন্নিকট গ্রামে পিতা-মাতার সেবা-যত্নাদির জন্য বছরে তিন মাস করে তাঁদের কাছে রেখে দেন। নিজেরা তখন বাসায় একা থাকেন ঠাকুর চাকর নিয়ে কেউ বা নিজের কাজ নিজেই করে নেন। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সেই তিন মাস সংক্ষেপের উপর খরচ করে বাকী উপার্জ্জনের টাকার সমস্তই এঁদের পিতার নামে পাঠিয়ে দেন।

ওই ছাত্রটি এখনও শিখতে আসেন। এসরাজে অদ্ভুত হাত তৈরী হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ইংরেজীতে বি-এ অনার্স উচ্চসম্মানে পাশ। সংসারের সেবা যত্ন নিয়েই যে থাকেন তা বলাই বাহুল্য। তিনিও গান শিখেছেন। দু'জনে তাঁদের শিশু সন্তানটি সহ ওই অতদুর থেকে এসে শেখা যেমন নিষ্ঠার পরিচয় তেমনি দেখে আনন্দ আসে। এই ছাত্রটির অন্য তিন ভাই খুব বড় বড় পদে প্রতিষ্ঠিত।

(৬১)

নরেনবাবুর ভগিনীপতির দেশ থেকে মহিষখাপুরি গ্রামে ফিরে এসে পিতামহের এক পত্রে আমাকে বাড়ী যাবার বিশেষ নির্দেশ থাকায় নরেন-বাবুর কাছে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে দেশে এলাম।

দাদু বললেন—তোর খুড়শ্বশুর তোকে নিয়ে যাবার জন্য আসবেন তাই আসতে লিখেছিলাম, শ্বশুরের খুব অনুরোধ করে চিঠি এসেছিল।

বাড়ীতে আসার একদিন পরেই খুড়শ্বশুর এলেন গো-গাড়ী নিয়ে।

মনে মনে স্থির করলাম সেখানে দিন দুই থেকে ভেলাইডিহায় গিয়ে রাজা বাহাদুরকে ও ছাত্রদের শিখিয়ে আসব ছুটির শেষ মেয়াদ পর্য্যন্ত।

বিষ্ণুপুর হতে রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন বেলা ৮টার সময় শ্বশুর-বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। বিয়ের পর সেই প্রথম আসা হল। যত্নাদির ঘটা বেশ ভাল রকমই অনুভব করতে লাগলাম। নানান সম্পর্কের শালিকারা প্রায় সর্বক্ষণই ঘিরে রইলেন এবং মাঝে মাঝে ঠান্‌দি' ও বৌদি'রাও এসে জুটতেন। তাঁদের আবেগময় প্রীতিবদ্ধ ব্যবহার সর্বদাই মনকে ভরিয়ে রাখত।

অল্প রাত্রে আমাকে দিয়ে সকলে আসর করবেন বলে সন্ধ্যার কিছু পরই ঠান্‌দি'রা খাওয়ানোর কাজ সারিয়ে নিতেন।

তাঁদের সেই রসাল আসরে নানানভাবে প্রীতিসমৃদ্ধ কথাবার্ত্তায় আমাকে আনন্দ দেওয়া এবং গান শুনার আগ্রহই থাকত আন্তরিক প্রেরণা নিয়ে। এতগুলি নারীর কাছে অধিকাংশ সময়ই যেরূপ আদর, যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছিলাম তার তৃপ্তিকর স্মৃতি কোনদিনই ভুলবার নয়। অভিজ্ঞতায় জানি এইভাবে পল্লীনারীরা জামাতাকে পেয়ে পরম আনন্দ উপভোগ করে এসেছেন।

এখনকার মানসিক শুষ্ক ও নকল পরিবেশে জামাতারা ওইরূপ রসাল আনন্দ ও তৃপ্তি পান কিনা জানিনা। তারপর একদিন বালিকা-বধূর মুখে শুনেছিলাম তাঁর একমাত্র দিদি আসর ভাঙ্গার পর আমাদের শয়ন গৃহের জানালার ফাঁকে কান রেখে উৎসুক অন্তরে অনেক রাত পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন— তাঁর বোনটি কি রকম সোহাগমূলক কথায় আদর পাচ্ছে সেই শুনার আশায়। বোনটির জন্য যে কামনা সর্বদা জাগ্রত হয়ে থাকত তা সার্থক হল কিনা তা জানবার জন্যই তাঁর অন্তরকে টেনে আনত সেখানে। শুধু এঁরই নয় এইরকম আগ্রহ তখন প্রায় সকলস্থানের বোনেদের সখিদের এবং ঠান্‌দি'দের ছিল। তাঁদের সর্বদাই ভাবনা হত মিলনের কলম ঠিক-ভাবে জোড়া লাগল কি-না।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রে বালিকা-বধূকে তার বয়সের অনুপাতে যদিও নয় তবুও কৌতূহলী হয়ে দু'চারটি প্রশ্ন করেছিলাম স্বভাবগত বুদ্ধি ও বিবেচনা-বোধ এবং সংসার সম্বন্ধে ধারণা কিছু আছে কিনা তা জানবার জন্য।

প্রশ্ন :—এই বয়সে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারবে? খুব মনকেমন করবে না?

উঃ—মা এই শিখিয়ে এসেছেন শ্বশুরবাড়ীই আমাদের বাড়ী। মনকেমন জিনিসটা কি তা এখনও খুব বেশী রকম জানিনা। তবে দিদি শ্বশুরবাড়ীতে থাকার সময় তার জন্য মনকেমন করে এবং তোমার জন্যও, মনে হয় সর্বদা যেন কি একটা মায়ার ঘোরে রেখেছে।

প্রঃ—সেখানে গিয়ে কাজকর্ম করবে তো?

উঃ—তোমরা বলে দিবে কি কাজ করতে হবে আমি তাই মন দিয়ে করব।

প্রঃ—যদি ভুলভ্রান্তি হয়, বকুনি খাও তাহলে?

উঃ—ভুল ত হবেই, আর বকুনি না খেলে শিখব কি করে।

প্রঃ—আমি যদি বলি তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু সেজেগুজে থাকবে তাহলে?

উঃ—তাই যদি তোমার ভাল লাগত তাহলে তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করতে না। কাজকর্ম করা মেয়ে তোমার ভাল লাগে বলেই আমাকে তুমি বৌ করে নিয়ে যাচ্ছ। শুনেছি সহরের মেয়েরা খুব বাবু।

প্রঃ—যতই বড় হবে ততই সংসারের কাজ খুব বেড়ে যাবে, সেগুলো সামলাতে পারবে?

উঃ—কেন পারব না, সবাই পারে, তাছাড়া মাকে দেখে আসছি সবই তিনি পেরে আসছেন, আমি ত তাঁরই মেয়ে।

সব প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর পেয়ে খুসীতে মন ভরে গেছল। মনে হতে লাগল ভগবান যদি মনের মধ্যে প্রকৃত বস্তু দিয়ে তার সংগে কিছু বুদ্ধি মিশিয়ে সংসারে পাঠান তাহলে তার প্রকাশ বয়সের ও লেখাপড়া শিক্ষার অপেক্ষায় থাকে না। নিরক্ষর ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলেই এই রকম প্রশ্ন করার সাহস এসেছিল। যাই হোক্—সেদিন বালিকাবধূর মন পরীক্ষা করে খুব নিশ্চিন্ত ও নির্ভরতা এসে গেছল। বেশ ভাবনা ছিল কিরকম ধাতের হবে, যৌথ সংসারের উপযোগী হবে কিনা। অবশ্য এইসব বিষয়ের কর্তব্য পালন স্ত্রীর উপরই শুধু নির্ভর করেনা সব কিছু। একান্তভাবে স্বামীর নির্দ্দেশ ও সহায়তা না থাকলে সম্ভব হয় না আদর্শ ও কর্ত্তব্যকে ধরে রাখা।

সেই বার বছর বয়স থেকে বালিকা-বধূটি শ্বশুরগৃহে এসে সেদিনের

সেই প্রশ্নগুলির উত্তরের সবই পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করে আসছেন অসীম ধৈর্য্য ও সহ্যের দ্বারা এই ছেষট্টি বছর বয়সেও সমানে তাল রেখে প্রত্যহ ভোর পাঁচটায় এবং গ্রীষ্মকালে চারটায় উঠে রাত ১১টা পর্য্যন্ত। দ্বিরাগমনের সময় এসে একাদিক্রমে আট মাস ছিলেন কিন্তু তার মধ্যে কোন দিনই জানান নি যে আমার খুব মনকেমন করছে মা, বাপ, ভাইবোনদের জন্য,—একবার পাঠিয়ে দাও সেখানে।

ধৈর্য্য ও সহ্য পরীক্ষার সব বিষয়েই পুরো নম্বর পাবার যোগ্যতা দেখিয়ে এসেছেন। প্রথম অবস্থায় নিরক্ষর হয়ে আসা নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের এই নারীটির সন্তানগুলির প্রতি তাকিয়ে অনেকে বলেন—সন্তানভাগ্য খুব ভাল। একদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিত্মালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ রমা চৌধুরী আমার বাসায় এসে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—আপনি রত্নগর্ভা।"

যোল বছর বয়সে প্রথম কন্যা সন্তান হয়, তারপর আরো পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার মা' হয়ে সবগুলিকে একাই মানুষ করেছেন। এর মধ্যে দুটি কন্যা অকালে পাঁচ ও তের বছর বয়েসে ছেড়ে চলে যায়। নার্শিং-হোম বা হাসপাতালে পাঠানর পক্ষপাতি আমি ছিলাম না। গৃহেই ভূমিষ্ট হয়েছে। ন'দিন পরেই তিনি সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন। স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হয়নি। আরামকে হারাম ভাবলে সবই ঠিক থাকে।

তারপর সেবারে শ্বশুরবাড়ীতে দু'দিন থেকে ভালাইডিহায় গেলাম। সেখানে শিখিয়ে ছুটি ফুরোবার মুখে নরেনবাবুর কাছে সেই মহিষখাপুরি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এসে শুনলাম জ্ঞানচন্দ্র সেতারকে দণ্ডবৎ করে উয়াড় পরিয়ে চিরতরের জন্য তুলে দিয়েছে। সেতার শিক্ষার উচ্ছ্বাস ও সখের পরিসমাপ্তি ঘটল দেখে নরেনবাবু খুব দুঃখ করে বললেন—"এই দুই তিন মাসেই আপনার অদ্ভুত তালিম দক্ষতায় বেশ একটু বাজাতে পারছিল, কিন্তু ওর ভাগ্যে নেই—কি আর করা যাবে; সব বিষয়েই ও ওই রকম ধরণের। আপনি এখন বাড়ী যান এ কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।"

আমি বললাম দেশে যাব না, রাত ১২টার ট্রেনে কোলকাতা যাব। নরেনবাবু এক মাসের মাইনে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য গো-গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিলেন। দুর্গাপুর ষ্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ে সকালে হাওড়ায় নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে সুরিলেনে মেজকাকার বাসায় উঠলাম।

(৬২)

থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা,—

কোলকাতায় এসে পড়ায় মনে হয়েছিল ভগবানই অন্তরের মধ্যে জানিয়ে দিলেন, তোর নানান স্থানে থেকে নানান অভিজ্ঞতা এবং বিবিধ বস্তুর উপর অধিকার লাভের দরকার যতখানি ছিল তার অনেকখানি পাওয়া হয়েছে বুঝে এখন স্থায়ীভাবে এখানে এনে রাখলাম। আমার আসাতে মেজকাকা খুব খুসী হয়ে বললেন তোমাকে বিশেষ প্রয়োজন মনে করছিলাম।

মিসেস বি, এল, চৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত সম্মিলনী' নামক শিক্ষা-নিকেতন তখন সম্ভ্রান্তবংশের মহিলাদের শাস্ত্রীয়সঙ্গীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত ছিল। সেজকাকা তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁরই শিক্ষাদানের একান্ত প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষা নিকেতনে আমি চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষকতার পদ পেলাম মাসিক পনর টাকা ধার্য্যের উপর। প্রত্যেক রবিবার ক্লাস হত। মাস ছয় পরে আমার শিক্ষকতার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হয়ে পরিচালকবৃন্দও প্রধান শিক্ষক আমাকে উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষার ভার দিলেন। শিক্ষা নিকেতনের পাঠক্রম ছ'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আমারই ঐকান্তিক আগ্রহে কিছুদিন পরে ছাত্রদের জন্য পৃথক একদিন শিক্ষা দানের ব্যবস্থায় আমাকেই শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়। দুই দিনে মাইনে ধার্য্য হল পঞ্চাশ টাকা।

ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা প্রথম শিখতে এলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা উঁচুস্তরের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়েছিলেন ☞ তাঁদের নাম, যথা,—ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বর্গত হুমায়ুন কবির, ৺কবি গোলাম মুস্তাফা, রহিমুদ্দিন আই, সি, এস, —স্বনামধন্য বিপিন পালের দৌহিত্র সুশীল দে আই, সি, এস। এঁরা তিন চার বছর ধরে নিয়মিতভাবে শিখেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থায়।

কোলকাতায় এসে প্রথম ওই স্কুলে কাজ পাবার পর গৃহ শিক্ষকের

পদ পেলাম সাধারণ ব্রহ্ম সমাজের সমাজ পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে। এখানের বাসিন্দা বিখ্যাত বিদুষী শকুন্তলা রাওও কিছুদিন শিখেছিলেন। মাসখানেক পরেই শিক্ষকতার কাজ পেলাম তখনকার সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক মনীষী উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে। তাঁর পুত্রবধূদের মধ্যে সিনেমা জগতের বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের মাতা এবং অন্যান্যরা, উপেনবাবুর দুই কন্যা, রবীন্দ্র সংগীতে পরিচিতা কনক দাস (অধিকারী), অধ্যাপিকা কল্যাণী চক্রবর্ত্তী পি, আর, এস, এঁরা কয়েক বছর ধরে শিখেছিলেন।

তারপর পেলাম শেখানর ভার বিখ্যাত চিকিৎসক অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তীর দুই কন্যাকে।

এখানে আসার খুব অল্প দিনেই আয় মোটামুটি বেশ ভালই দাঁড়িয়ে গেল। তখনকার দিনে সপ্তাহে একদিন করে এক মাস শেখানর টাকার যা অঙ্ক ছিল তার মূল্যের তুলনায় এখন তার সিকি ভাগও পাওয়া যায় না। যে স্বচ্ছলতার উপর ছিলাম, এখন তার কাছে কিছুই নয় মনে হয়। তখন প্রত্যহ খেয়েছি বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী, আর এখন খেতে হচ্ছে হীম্‌সীম্‌। কোলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকার মাস তিনেক পরই ৺দুর্গাপূজার ছুটি পড়ে গেল। বাড়ীর প্রত্যেকের জন্য বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্য এবং মায়ের পাঠান ফর্দ্দ মত বিবাহের প্রথম বর্ষে ৺পূজার তত্ত্বসামগ্রী ক্রয়ের জন্য নেওয়া হল বার টাকা দামের ঢাকাই সাড়ী, তার উপযুক্ত হাত আওলা ব্লাউজ ইত্যাদি এবং নানাবিধ আরো দ্রব্য।

পাঁচ মাস পরে দেশে আসার সময় খুব আনন্দ নিয়ে এসেছিলাম— কোলকাতার মত বিরাট নগরীতে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকখানি পরিচয় লাভ করতে পেরেছি বলে। কিন্তু বাড়ীতে এসেই দাদুর শরীরের অবস্থা দেখে মন খুব মুসড়ে গেল। দেখলাম দাদুর স্বাস্থ্য-সামর্থ্য যেন খুবই কমে গেছে। দেশের বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক ঋষিকেশ কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে এনে তাঁর চিকিৎসায় রাখলাম এবং ভাল ভাল খাদ্যাদির ব্যবস্থা করে সেবা-শুশ্রূষায় যত্ন নেওয়া হল। দাদুর শরীরের এই অবস্থার জন্য ৺পূজায় মোটেই আনন্দ এল না।

সঙ্কল্পমত এবারে ভালাইডিহা যাওয়ার কথা মনে আনতে পারলাম না। আট-দশদিন পরে দাদু বললেন,—আমি এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি, তুই শ্বশুরবাড়ী হয়ে ভালাইডিহায় দিন দশ থেকে শিখিয়ে আয়, বিশেষ

বাধা না এলে স্বীকৃতি পালন মানুষের একটি ধর্ম এবং মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আমার জন্য কোন ভাবনা রেখো না, আমি সব দিক দিয়েই এখন নিশ্চিন্ত। ৺গোপীনাথ তোমাকে স্থায়ীভাবে বিরাট পরিচয়ের স্থানে রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন, তোমার টাকায় এখন যথেষ্ট স্বচ্ছলতা এসেছে, এরপর ৺গোপীনাথ কৃপা করলে তাঁর নাম স্মরণ করে হাসি মুখে চলে যাব।” দাদুর শেষের কথা শুনে চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। তারপর আবার যখন বললেন—বিদেশ থেকে বাড়ীতে এলে কথা দেওয়ার কর্ত্তব্য পালনের জন্য বাড়ীতে আমাদের কাছে তোমার থাকাই হয় না, এজন্য মনের ভেতরটায় কি রকম করতে থাকে, আর ছোট থেকে ক'দিনই বা থাকতে পেরেছ! তোমার কর্ত্তব্য পালনের উপর নিষ্ঠা, ভক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে ৺গোপীনাথের কাছে সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করি, —সুনাম ও সুযশে দীর্ঘজীবি হয়ে সুখে থাক…।” আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না,—তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে দ্রুতপদে চলে এলাম।

(৬৩)

দাদুর নির্দ্দেশ পালনের উপর কর্ত্তব্য রেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোরুর গাড়ীতে করে শ্বশুরবাড়ীতে এসে দু'দিন থেকেই সেই গাড়ীতেই ভেলাইডিহায় চলে এলাম। সর্বদাই চিন্তা নিয়ে পিতামহের শরীরের কথা মনে হতে লাগল।

ওখানে সাত-আট দিন থাকার পর বিকেলে বেড়িয়ে এসে হঠাৎ দেখি দেশের বৃদ্ধ সুচাঁদ লোহার বৈঠকখানার রোওয়াকে বসে আছে। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম কি খবর শীগ্‌গীর বল? বল্‌ল,—সিমলাপালের রাজ-বাড়ীতে গোঁসাইরা পাঠিয়েছিলেন, আপনার মায়ের সংগে আসবার সময় দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন আপনার সংগে দেখা করে বলতে শীগ্‌গীর বাড়ী যাবার জন্য—কি যেন খুব দরকার আছে। বললাম—মিথ্যা করে বল্‌ছ না ত? সত্যি করে বল অন্য কোন খবর আছে কিনা?

সত্যই বলছি, আপনাকে শুধু তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। মনে হতে লাগল সুচাঁদের কথার মধ্যে কি একটা লুকান আছে। স্থির করলাম রাজাবাহাদুরকে বলে আজ রাত্রেই রওনা হ'তে হবে। এই অভিপ্রায়

জানাতে তিনি বললেন—আচ্ছা।

রাত্রে গান বাজনায় মন বসল না। রাজাবাহাদুরও তাঁর শরীরটা ভাল নেই বলে উঠে গেলেন। ঠাকুর আমাকে ডেকে নিয়ে গেল আহারের জন্য। খেতে বসে খাবার গলা দিয়ে পেরল না—উঠে পড়লাম।

গাড়ীর অপেক্ষায় ঘরের তক্তপোষের উপর চুপটি করে বসে ভাবছি—তখন রাজাবাহাদুর এসে সুচাঁদের চিঠিটি আমার হাতে দিলেন, পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। সবাই ছুটে এল। দাদু যে আমার কি বস্তু তা তারা ভালভাবেই জানত। তারা এই দুঃসংবাদ আগেই শুনে খুব চেপে গেছল, মনের ভাবে কিছু জানতে দেয়নি। প্রত্যেকেই আমাকে গভীর সমবেদনা জানাতে লাগল। রাজাবাহাদুর অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন। আমার এ আঘাত যে কত বড় তা তিনি খুবই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

মায়ের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সুচাঁদ লোহার কয়েকবারই ভালাইডিহায় এসেছিল। ওই দিন তার আসার মুহূর্তে রাজাবাহাদুরই তাকে প্রথম দেখতে পেয়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন, সে তখন মায়ের দেওয়া চিঠিটি তাঁর হাতে দেয়। পড়ে রাজাবাহাদুর সুচাঁদকে বিশেষ করে বলেছেন আমাকে যেন ওইরূপভাবে কথা বলে আসার কারণ জানায়। চিঠিটি নিজের কাছে রেখে দিয়ে ভেতরে ভেতরে আমার যাবার সব ব্যবস্থা করতে থাকেন।

রাত দশটায় রওনা হলাম। জিনিসপত্রে গাড়ী বোঝাই হয়ে গেল। হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে রাজাবাহাদুর দ্রুতপদে সরে গেলেন। অন্যান্য সকলেই খুব বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চোখ কেবল আমার জলে ভরে আসতে ছিল—কারোর দিকেই আর তাকাতে পারলাম না।

গাড়ী চলতে লাগল, সুচাঁদ গাড়ীর পেছনে বসল। বার বার চোখ মুছতে মুছতে কেবল মনে হতে লাগল—আমার অমন দাদু—যিনি ছিলেন আমার কাছে সাক্ষাৎ দেবতার মত এবং জীবনের ধ্রুবতারা, সেই দাদু এমনভাবে হঠাৎ চলে গেলেন, মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকতে পারলাম না, চরণ স্পর্শ হল না—এইসব আফ্‌সোসে ও নিদারুণ দুঃখে মনকে অস্থির করে তুলতে লাগল।

বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম বেলা দশটার সময়। প্রায় প্রত্যেকবারই

বাড়ীতে এলে সর্বাগ্রে দাদুকে দর্শন করতে পেতাম— সেদিন সেই পুণ্য ও পরম তৃপ্তি লাভ করা আর ভাগ্যে এল না, তার চির সমাপ্তি ঘটে গেল।

বাড়ীতে প্রবেশ করতেই মা, বুড়োদি কেঁদে উঠলেন। দাদু যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই জায়গাটিতে বসে সজল চোখে মনে হতে লাগল যেন সব শূন্য।

বাড়ীর সকলেই বলতে লাগলেন—মৃত্যু যেন হঠাৎ এসে পরম শান্তির কোলে তুলে দেবার জন্য নিয়ে গেল। শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগের পূর্বেও ৺গোপীনাথকে ডেকেছিলেন এবং কিছু আগে থাকতে গীতার শ্লোক আওড়ে ছিলেন। মা বললেন—একবার তোর নাম করে বলেছিলেন তার সংগে দেখা হল না, আমিই তাকে জোর করে পাঠিয়েছিলাম।

পারলৌকিক ক্রিয়ার দিনে সমাগত ব্যক্তিরা বলে গেলেন—তোমাদের বংশের একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তির তিরোধান হয়ে গেল।

কেবলি মনে হতে লাগল,—যে গৃহটি এতদিন বশিষ্ঠের গার্হস্থ্য আশ্রমের মত ছিল, বাড়ীর সম্মুখে ৺গোপীনাথের মন্দিরে কত সময় যাঁর কণ্ঠ বেদপাঠে ও পূজার মন্ত্রোচ্চারণে সংগীতের রাগরূপ উত্থিত হয়ে স্থানটিকে মুখরিত করে রাখত, সেই স্বর্গীয় ভাবধারা ও তপোবনের সামবেদীয় পরিবেশ যেন সব শূন্য ও স্তব্ধ হয়ে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল দাদুর চলে যাওয়ার সংগে সংগেই।

যে বংশে এত বড় দয়াবান, সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে বংশ চিরতরের জন্য ধন্য হয়ে থাকে এবং প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে ওঠার আদর্শ স্থাপিত হয়। এই সব মহাত্মা ব্যক্তিদের কাছে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়—সভ্য শিক্ষিত হওয়া এবং নাম, ডাক ও অর্থের প্রাচুর্য্যই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়।

কোলকাতার স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে এল। বৎসরের নিয়মিত সময়ে ছুটী হওয়া ও ফুরিয়ে যাওয়া আমার জীবনে সবেমাত্র বাঁধা নিয়মের পথে সুরু হওয়ার মুখেই দাদু এমনভাবে ছুটি নিয়ে যে চলে যাবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

দেশ থেকে যেদিন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কোলকাতায় রওনা হলাম সেদিন বিষ্ণুপুরে আগে আসবার সময় আসার দিনে দাদু আমার জন্য যে যে জায়গায় প্রতিক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন অন্ততঃ কিছুও আগে আমাকে দেখতে পাবেন বলে—সেই সেই জায়গাগুলোর দিকে সজল ঝাপসা চোখে

তাকিয়ে মনে হতে লাগল হরিনামের মালা হাতে সেই স্নেহের আধার দরদী দেবতাটিকে আর কোনদিনই এই জায়গাগুলিতে দর্শন পাব না। এখনও ওই স্থানগুলির স্মৃতি তীর্থস্থানের মত আমার মানসপটে আঁকা আছে।

রিক্ততার ভীষণ ব্যথা নিয়ে এলাম কোলকাতায়।

(৬৪)

ছুটির পর কোলকাতায় এসে জানুয়ারী মাসে (১৯২২ সাল) গোখেল মেমোরিয়ল স্কুলে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সপ্তাহে দু'দিন দু'ঘণ্টা করে শেখানর জন্য নিযুক্ত হলাম এবং আরো দু'তিন জায়গায় শেখানর কাজ পেলাম।

পিতামহের শ্রাদ্ধে যত দেনা হয়েছিল সমস্তই শোধ করে দিতে পারলাম খুব শীগ্‌গীরই।

ভগবানের কৃপায় ক্রমশই প্রচার প্রতিপত্তি বেড়ে যেতে লাগল। ফেব্রুয়ারী মাসে 'সঙ্গীত সম্মেলনে'র বাৎসরিক উৎসব সমাধা হল কোলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। সভাপতি হয়েছিলেন তখনকার লাটসাহেব। এই উৎসবে কোলকাতায় অবস্থিত বহু রাজা, মহারাজা, জমীদার, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিতে সমস্ত স্থল ভরে গেছল। সে এক দেখবার জিনিস। সঙ্গীত অনুষ্ঠানের বিবিধ বিষয়ের পরিবেশন ব্যবস্থায় আমার ছাত্রীরা যখন সাতজনে সাতটি তানপুরা নিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আলাপ, ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইবার জন্য বসল তখন তদ্দর্শনে সমস্ত ব্যক্তি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মেয়েদের তানপুরা নিয়ে আসরে গাওয়া সেই প্রথম। তারপর তাদের কণ্ঠে আলাপ এবং ধ্রুপদে নানান সুরের ক্রিয়া বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশের সামর্থ্য দেখে এবং খেয়াল গানে তানাদি এবং বাঁটের ক্রিয়ার উপর ছাড়-ধরতাই করে পরিপাটিভাবে গাওয়া দেখে, তার সমাপ্তির পর সহর্ষ হাততালিতে সভাঘর ভরে গেল। অনুষ্ঠান সমাধার পর ওই মেয়েদের আমিই শিক্ষক জেনে যাবার সময় লাটসাহেব ও তাঁর পত্নী আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করে গেলেন। তখনকার দিনে এ এক বিরাট সম্মান বলে অনেকে জানালেন।

বিশেষ করে এই উৎসবের পর থেকে বড় বড় ব্যক্তিরা তাঁদের বাড়ীতে শিক্ষক পদে নিযুক্ত করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাঁদের নাম তাঁরা হলেন, স্যর বি, এল, মিত্র, (ইনি স্বাধীন ভারতের বাংলার

রাজ্যপাল হয়েছিলেন) এঁর পুত্র কন্যা শিখতেন ; নাড়াইলের জমীদার ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় (এঁর কন্যারা) ; ম্যাজিষ্ট্রেট বি, দে, এঁর কন্যা ; হাইকোর্টের বিচারপতি এস, কে, ঘোষ আই, সি, এস, এঁর পুত্র কন্যা ; সি, সি, দত্ত, আই-সি-এস, (বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি) এঁর নাতনী ; এস, কে, হালদার—আই-সি-এস, এঁর কন্যা ; সন্তোষের মহারাজা, এঁর পুত্রবধূ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়,—এঁর গৃহে এঁর ভগিনীর পুত্র কন্যা ; রাজা সুবোধ মল্লিক, এঁর পুত্র ; কর্ণ,-কণ্ঠ-ও নাসিকা বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে, কে, দত্ত, এফ-আর-সি এস, এঁর স্ত্রী ; বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র, এঁর পুত্র-কন্যা ; চর্ম্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঞ্জা, এঁর কন্যারা ; বিখ্যাত ক্যোনসার চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র, এঁর স্ত্রী ও কন্যা ; বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়,—এঁর কন্যা ও পুত্রবধূরা ; ইত্যাদি আরো অনেকের পুত্র, কন্যা ও বধূরা শিখতেন।

তারপর সেণ্টমার্গারেট স্কুলে, ডায়সেসন্ স্কুলে, ইউনাইটেড হাই স্কুলে প্রায় ৩২ বছর ধরে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলাম। কয়েক জন উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন ইংরেজ এবং ভারতীয় মিশনের সেক্রেটারী ও দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের গ্রন্থকার মিঃ পপ্‌লি আমার কাছে দীর্ঘ দিন ধরে শিখেছিলেন। ১৯২১ সাল হতে অর্থাৎ আমার ওই বয়স থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে একাধিপত্তের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এসেছিলাম শিক্ষকতায় ও সঙ্গীত সাধনার পরিচয়ের উপর।

সেই সময়ের মধ্যে রাজা মহারাজা, বড় বড় দেশ নেতা, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক বিরাট আভিজাত্য সমাজের বিদগ্ধগণের সংগে এবং কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ও পরিচয় লাভের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তার সংগে সমাদর ও সাধনার যথাযোগ্য স্বীকৃতি ; উৎসাহ প্রভৃতি। তখন প্রত্যেকটি সংগীতের আসরে তার অনুষ্ঠাতারা বিশেষ আগ্রহের উপর আমাকে সমাদরে নিয়ে গিয়ে গাওয়াতেন॥

(৬৫)

ঠাকুর রাজদরবারে,—

১৯২৩ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর কোলকাতায় আগমন উপলক্ষ্যে গড়ের মাঠে যে বিরাট দরবার সভায়

ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁকে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য, তার অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ছয় রাগের মূর্ত্তি দেখানর সংগে প্রত্যেক রাগের সুরও পরিবেশিত হবে।

এই ব্যবস্থাপনায় যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন—মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর, রাজা প্রফুল্লকুমার ঠাকুর, নাটোরের মহারাজা, মহারাজা কৃষ্ণনগর, মহারাজা সন্তোষ, জমীদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি। এঁরা সবিশেষ ব্যবস্থার উপর রাগ পরিবেশনের জন্য নির্বাচন করে যে যে সঙ্গীতজ্ঞদের নিযুক্ত করেছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন পশ্চিম ভারতের তিনজন এবং বাংলার তিনজন। যথা, ফিডাহুসেন খাঁ, হাফিজআলি, মজিদ খাঁ, বাংলার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ষষ্ঠ সংখ্যায় আমি। আমার উপর মেঘ রাগ পরিবেশনের ভার ছিল। ছয় রাগের প্রতিটি মূর্ত্তি যুবরাজের সামনে দিয়ে ধীর গতিতে যেতে যেতে যতটুকু সময় থাকছিল, সেই সময়টুকুর মধ্যেই এক একজনকে সেই রাগরূপ দৃশ্যের সংগে সমতা রেখে সেই রাগের রূপ পরিবেশন ও শেষ হয়ে যাচ্ছিল। দু' মিনিটের বেশী সময় থাকছিল না। থাকাটাও অহেতুক হত। এই দরবারে আমাদেরও চোগা, চাপকান্, বাঁধা পাগড়ী পরে যেতে হয়েছিল। চেহারার সেই দৃশ্যরূপ দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল এবং তার সংগে এ-ও মনে হচ্ছিল এইরকমভাবে বড়দের কাছে যেতে হলে নিজের বড় জিনিসটির বড়ত্ব থাকবে না, নিজের ঢাকের লালসায় তার ক্ষতি দারুণ। বাঙালীর ছেলে ধুতী, জামা পরে যাওয়া চলবে না এই নিষেধ থাকা অত্যন্ত দুঃখের ও অমর্য্যাদাকর।

ইংরেজরা যখন বাদশাদের চরণে কুর্ণিশ করতে আসত তখন ত তারা চোগা-চাপকান্, পাগড়ি পরে আসত না।

দরবার অনুষ্ঠানের পরই মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর আমাকে তাঁর কাছে সঙ্গীতজ্ঞরূপে থাকবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি সম্মত হয়ে যাই। তাঁর রাজবাড়ীর মধ্যেই (১২নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা) আমার থাকা খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা হয়।

এখানে থাকায় আমার অন্যান্য স্থানে শিক্ষকতায় বিঘ্ন এল না। মহারাজা উপার্জনের ক্ষেত্রসমূহের পরিচয় পেয়ে খুব খুসী হয়ে জানালেন—সব কাজই তোমার বজায় থাকবে, রাত্রে যেদিন শিখিয়ে সকাল সকাল ফিরবে সেই সেই দিন আমাকে গান-বাজনা শুনাবে। আর একটি কাজের

ভার দিয়ে বললেন—আমার প্রপিতামহ গোপীমোহন ঠাকুরের রচিত অনেকগুলি রাগের বাংলা খেয়াল আছে, তার কথা ও সুর নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জানা আছে, তাঁকে বলে দেবো তিনি তোমার কাছে আসবেন—তুমি স্বরলিপি করে আমাকে দেবে—আমি ছাপাব।" বিভিন্ন-রাগে প্রায় পঞ্চাশটি বাংলা খেয়াল স্বরলিপি করে মহারাজকে দিয়েছিলাম। ছাপাব ছাপাব করে শেষ পর্যন্ত ছাপানই হল না, ৺কাশীতে মহারাজ মারা গেলেন। স্বরলিপির পাণ্ডুলিপিটি পেলে আমিই ছাপাতাম কিন্তু রাজবাড়ীতে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটি উদ্ধার করতে পারিনি। মহারাজার কাছে কয়েকটি খুব প্রাচীনকালের রচিত শাস্ত্রীয়-সংগীতের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল, সেই গ্রন্থগুলি মহারাজার সর্বদা নিজের কাছে থাকা আলমারিতে থাকত, তারও কোন সন্ধান পেলাম না। এই গ্রন্থ কয়েকটির মধ্যে একটি খুবই মূল্যবান সংরক্ষণীয় বস্তু ছিল, তাতে ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী সহ ফটো অঙ্কিত ছিল। এটি জার্মেনদের হস্তগত হয়—তারপর তারা বোধ হয় ছাপিয়ে বহুকাল পরে আসলটি বিক্রির মনস্থ করে' ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় জানায়, মহারাজা বারশ' টাকায় সেটি আনিয়ে নেন। আমাকে বলেছিলেন তোমাকে দেখাব কিন্তু তারপরই মারা গেলেন। ভারতীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের আসল পরিচয়মূলক যে সব পুস্তক ছিল তারমধ্যে এইরকমভাবে অনেকই নষ্ট হয়ে গেছে তার অভাব আর পূরণ হবার নয়।

গোপীমোহন ঠাকুরের বাংলা খেয়ালগুলির সুর সবই হিন্দী খেয়ালের অনুরূপ। বিলম্বিত ও দ্রুত এই দুই তালেই নিবদ্ধ ছিল। এর সময়কাল প্রায় দু'শ বছর হতে চলল। বিষ্ণুপুরে আরো আগে থাকতে বাংলা খেয়ালের প্রচলন ছিল। পরে আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, তারপরে রামপ্রসন্ন, অম্বিকাচরণ প্রভৃতি গুণী সঙ্গীতজ্ঞরা খেয়াল প্রভৃতি যে সব গান রচনা করেন সেগুলির সবই বাংলায় রচিত হয়েছিল। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি রাগের অনেকগুলি বাংলা খেয়াল হুবহু খেয়ালের মত করে রচনা করেন এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের বাসনা রেখে-ছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নানান অসুবিধায় ছাপাতে পারেন নি—পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়ে আছে। শাস্ত্রীয়-সংগীতের শ্রেণীগত গান আমাদের নিজের ভাষায় গাওয়ারও যে একান্ত প্রয়োজন আছে—শাস্ত্রীয়-সংগীতের প্রচারকে সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করা এবং উপভোগ্য করার জন্য সে কথা আমরাই

শুধু বলছি না, জানিয়ে গেছেন ওই সব বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরাও। হিন্দী ছাড়া শাস্ত্রীয়-সংগীতের শ্রেণীগত গান হবে না এই যুক্তিহীন ধারণা তাঁদের মত ব্যক্তিদের থাকবে কেন ?

বাংলা খেয়ালের নাম শুনে যাঁরা উন্নাসিকতা প্রকাশ করেন তাঁরা বাঙালী হয়ে কি করে করেন তা ভেবে খুবই দুঃখ আসে। আমার ধারণা এঁরা হয়ত অন্ধ গোঁড়া কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ নন। সবচেয়ে বেশী মর্মাহত ও স্তম্ভিত হয়েছি একটি বহু প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রে একজনের বাংলা খেয়াল সম্বন্ধে মন্তব্য পড়ে। তিনি লিখেছেন—"বাংলা ভাষায় খেয়ালের চেহারা হবে গর্দ্ধভের ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানের মত।" বাঙালী হয়ে বাংলাভাষার উপর এই হীন উপমা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিরা শুনলেও শিউরে উঠবে। আশ্চর্য্য হই—এতবড় অপরাধজনক মন্তব্য এবং যে সব সাধকরা এর অকুণ্ঠ সমর্থন করছেন এবং নিজের ভাষায় গাচ্ছেন তাঁদের যে অপমান করা হল এর জন্য অতবড় সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক একটুও বিচলিত হলেন না, সেই ব্যক্তি দিব্য বাহালতবিয়তে সঙ্গীতের সমালোচক গদিতে আরূঢ় হয়ে আছেন।

আমি এখন প্রত্যেক আসরেই বাংলা খেয়াল, ঠুমরী, ভজন ইত্যাদি গাই। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে পরিদর্শক অধ্যাপকের পদ পেয়ে তিন মাসের জন্য যখন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে যাই তখন শুধু আমার জন্য দ্বিতীয় দিনের আসরে আড়াই ঘণ্টা ধরে বাংলা খেয়ালই গেয়েছিলাম। হিন্দুস্থানী অধ্যাপকদের জিজ্ঞেস করি খেয়ালের যথাযথ পরিবেশনায় কোন ত্রুটি হ'ল কিনা ? তাঁরা সমস্বরে বলেন—"আমাদের অপূর্ব লেগেছে। বাংলার মত এতবড় ভাষায় খেয়াল ইত্যাদি গান গাওয়া হবেনা কেন ?

(৬৬)

লক্ষ্ণৌ-এ গমন,-

ইং ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌএ 'নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

তাতে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমার কাছে নিমন্ত্রণলিপি আসে। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর অর্থাদি দিয়ে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দেন। সম্মেলনের আগের দিন আমি সেখানে গিয়ে পৌছলাম। আমার মেজ-কাকাও ওইভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে এক সংগে গেলেন।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা আমাদের অভ্যর্থনা সহকারে নিয়ে গেলেন সেন্ট্রাল হোটেলে। সেখানে থাকা ও খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা ছিল খুবই উচ্চস্তরের।

পরেরদিন সকালে নবাব বাড়ীর সামনে এক বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর মরিস্ সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন আরম্ভ হয়।

বড় বড় ষ্টেট রাজ্য হতে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ভারতের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত গায়ক-বাদক উপস্থিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

রাজা, মহারাজা, জমীদার নবাব ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সভামণ্ডপ ভরে থাকত।

সেই আগেকার বড় বড় ব্যক্তিরাই পরিচালক ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 'নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলন' বলতে যা বুঝায় প্রকৃত পক্ষে তা এঁদের সময়েই হয়েছিল।

প্রথম দিনের প্রাতঃকালে অধিবেশনে মরিস্ সাহেবের সমক্ষে লক্ষ্ণৌতে সঙ্গীতের কলেজ স্থাপনের কথা উত্থাপিত হয়। তাতে উক্ত গভর্ণর বিশেষভাবে অনুমোদন করেন এবং অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তাঁরই নামে মরিস কলেজ স্থাপিত হয়। ছ'টি বর্ষের পাঠক্রমে মেজকাকার প্রণীত 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষাসূচীর মধ্যে ধরা হয়েছিল। তবে ওই পর্য্যন্তই, বিষ্ণুপুরের গুণীদের গ্রন্থকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজেই যখন শিক্ষাদানের ইচ্ছে থাকে না তখন পশ্চিমে থাকবে সে আশা করা আকাশ-কুসুমের মতই। যাই হোক্—ওই দিন অধিবেশন সমাপ্তির পর বেলা ১২টার সময় গেলাম যে বাড়ীতে গায়ক-বাদকদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে। বাড়ীটি নবাব আমলের একটি বৃহৎ প্রাসাদ বাড়ী।

আমার সেখানে যাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল গায়ক-বাদকদের সংগে পরিচয় লাভের আশা এবং আমাদের ঘরাণার সংগে প্রাচীন গুণীদের শাস্ত্রীয় রাগাদির মিল আছে কিনা তা জানার চেষ্টা, তাছাড়া সঙ্গীত সম্বন্ধে নূতন

তথ্য কিছু পাওয়া যায় কিনা তারও প্রত্যাশা রেখে। প্রথমেই দু' তার্লার বৃহৎ হল ঘরে প্রবেশ করে যাঁদের সাক্ষাৎ পেলাম তারা সকলেই বীণকার। সংখ্যায় দশ বারজন হবে। তার মধ্যে পাঁচ-ছ'জন বৃদ্ধ বয়সের। প্রত্যেকের কাছে বিনীত নমস্কার জানিয়ে আমার পরিচয় দিতে তাঁরা অতি সমাদরে তাঁদের খাটিয়ার পাশে বসালেন। তাঁদের সুমধুর ব্যবহারে মন তৃপ্তিতে ভরে গেছল।

সঙ্গীত সম্বন্ধে নানান প্রসঙ্গের কথা তুলে এবং সন্ধান জানার প্রয়োজনে কয়েকটি রাগের রূপ পরিচয় জানতে চাওয়ায় তাঁরা যতটুকু উত্তর দিয়েছিলেন তাতে খুশী হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের ঘরাণার সংগে সমস্তই মিল রয়েছে। তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এসে সন্ধান নিয়ে দু'চার জন প্রবীন ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়কের সংগে দেখা করে তাঁদের কাছেও ওই রকম মধুর ব্যবহার পেয়ে এবং তার সংগে প্রশ্নোত্তরে ঘরাণা মিল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে বেলা প্রায় তিনটার সময় ফিরে এসে আহারাদি করে বিশ্রাম নিই।

১৯১৯ সালে ৺কাশীর সংগীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে, তারপর ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌ এর চতুর্থ অধিবেশনে, পরে আবার ৺কাশীর পঞ্চম সম্মেলনে এবং মজঃফরপুর ও এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিতির মাধ্যমে বহুসংখ্যক গায়ক-বাদকদের বিভিন্ন গায়কী ধারায় সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ পেয়ে এবং বাল্যকাল থেকে আরো বহু সঙ্গীতজ্ঞের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুরাঙ্কনের উপর শিল্প সৃষ্টির পরিচয় পেয়েছিলাম। এই এত সংখ্যক গায়ক-বাদকের প্রত্যেককেই দেখেছি তাঁরা বিশুদ্ধ বড় রাগই অঙ্কিত করে শিল্পসৃষ্টির দক্ষতা প্রদর্শন করতেন। এজন্য রাগরূপের বৈচিত্র্য মহিমার স্বরূপ সন্ধানে যথেষ্ট জ্ঞান ও অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করে তুলার সহায়ক হয়েছিল। ভেজাল রাগ যাঁরা পরিবেশন করেন, তাঁরা সাধনায় অগ্রসর হয়ে কতখানি দূরত্বে এগিয়ে এসেছেন, তা ঠিক ধরা যায় না, কারণ ওইসব রাগের রূপ অঙ্কনের সময় রূপান্তরে পরিবর্তিত হয় বলে অর্থাৎ বড় রাগের সল্পাংশ বস্তু নিয়ে মিশ্রিত করে রচিত হয় বলে সেই সীমিত গঠন উপভোগ্যও যেমন হয় না—তেমনি শিল্পীর পরিচয়ও যথাস্থানে থাকে না। এ বিষয় নিয়ে বোধ হয় পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

এই প্রসঙ্গের মাধ্যমে একটা কথা বলার আছে। সেই কম বয়স থেকে

যত সংখ্যক গায়কের গান শুনেছি তারমধ্যে কম-বেশী নিয়ে দৃষ্টিকটু মুদ্রাদোষ যাঁদের মধ্যে দেখেছি তাঁরা প্রায় সবই মুসলমান খেয়াল গায়ক। এজন্য আমার ধারণা আছে এই গানের চর্চারত ওই গোষ্ঠীর লোকেরাই এর প্রবর্ত্তক। এখন দেখছি আমাদের দেশে হিন্দু গায়কদের মধ্যে অনেকেরই এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। মুদ্রাদোষ আসে সংযম ও সাত্বিকভাবের অভাব থাকলে, অথবা অসঙ্গত আবেগ উচ্ছ্বাসে। এই দোষ গায়কের কণ্ঠের অধিকারের উপর স্বয়ম্ভরতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়; তার সংগে যদি আবার যন্ত্রাদির সহযোগীতার অধিক আড়ম্বর থাকে। আগে যন্ত্রাদির সহযোগীতার আবশ্যক আছে বলে খুব কম গায়কই মনে করতেন।

মুদ্রাদোষ কথার যেমন ব্যবহার আছে—মুদ্রাগুণ কথারও তেমনি ব্যবহার আছে। আবেদন, কামনা ও প্রার্থনার মত হয়ে সুরের মধ্যে দিয়ে যখন আকুতি আসে তখন স্বভাবতই হাতের ও মুখের আন্দোলন একটু এসে পড়ে, তখন সেটি স্বভাব সুন্দর হয়ে গুণের পর্য্যায়ে এসে যায়।

পূর্বসূত্রে—লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আমরা উপস্থিত হবার জন্য যখন যাচ্ছি সে সময় আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব মেজকাকাকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে এসে নতজানু হয়ে কুর্ণিস করে বললেন—আপনার গ্রন্থ 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকায়' ফটো দেখে তাই চিনতে পেরে ছুটে এসেছি দর্শনের জন্য। আপনি আমার গ্রন্থগুরু, আপনার দুই খণ্ডের ওই গ্রন্থ দুটির ধ্রুপদ আমার রাগরূপের উপর জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়ক হয়েছে—গ্রন্থ হতে আমি অনেক ধ্রুপদ কণ্ঠে তুলেছি। আপনার দাদার প্রণীত সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থটি অতি উৎকৃষ্ট বলে শুনেছি, এবং এ-ও শুনেছি ওতে আছে সমস্তই প্রাচীন ধ্রুপদ। আমি আনতে দিয়েছি।"

এই সম্মেলনে আলাউদ্দীন সাহেবের নিজস্ব সৃষ্টি ভারতীয় রাগরূপের উপর মাইহারবেণ্ড পার্টির বাদ্য হয়েছিল। বিস্তার ও তান-ছন্দের এই বাদন ক্রিয়া খুব ভাল লেগেছিল। এঁরা সে সময় সকলেই বিলেতী ধরণের বেণ্ড পোষাক পরেছিলেন।

সম্মেলনে খাঁ সাহেব একদিন বেহালাও বাজিয়েছিলেন। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন—আমি এখন [illegible]বাদ্য অভ্যাস করছি, বেহালা যন্ত্রটি আমাদের সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের মধ্যে তেমন মর্য্যাদা নাই, এত ভাল যন্ত্রটি প্রথম থেকেই আমাদের দেশের যাত্রার দলে, এবং রাস্তায় গাওয়া মানুষের

হাতে স্থান পেয়ে যাওয়ার জন্যই এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।”

বেহালা যন্ত্রটি এখন তার শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার পেয়েছে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে। তবে যে কোন যন্ত্রই হোক যার মধ্যে শাস্ত্রীয়-সংগীতের রাগরূপের অনন্ত বিস্তারি মহিমা এবং রস-মাধুর্য্য বেশী করে প্রকাশিত হবে সেই যন্ত্রই শীর্ষস্থানে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে।

তারপর লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্নে অনুষ্ঠানসূচীমত আমার খেয়াল গান হল। মুলতান রাগের উপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে গান চলেছিল। গাইবার সময় মাঝে মাঝে আগ্রহের আকর্ষণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম সকলেই বেশ মনযোগ দিয়ে শুনছেন। গান শেষ হবার পর মঞ্চ থেকে নেমে আসতে সঙ্গীতজ্ঞরা ও অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

তৃতীয় দিনের সকালে থাকার স্থানে গান সাধ্‌ছি হঠাৎ নজরে আসে দরজার সামনে একটি প্রৌঢ় ও আর একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তাঁদের ভেতরে আসবার জন্য আহ্বান জানাতে তাঁরা এসে কাছে বসেই হিন্দীতেই বলতে লাগলেন—আমরা কিছুক্ষণ এসেছি, আপনার ধ্যান ভঙ্গ করিনি—খুব ভাল লাগছিল তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। আমরা কাল রাত্রে শুনলাম একজন কোলকাতা থেকে আসা বাঙালী যুবা বয়সের এক গায়ক খেয়াল খুব তৈরী গেয়েছেন তাই বিস্মিত হয়ে সন্ধান নিয়ে ঠিকানা জেনে আমরা এসেছি তাছাড়া আমরা গায়ক-বাদকদের পরিচয় পাবার আশায় তাঁদের থাকার স্থানেও যাচ্ছি।

আপনি একটু গান দয়া করে আমাদের শুনান।”

আমি কিছুক্ষণ ধরে তোড়ীরাগের আলাপ করলাম। দু'জনেই খুব মাথা নাড়তে লাগলেন আহা'র ভঙ্গীতে।

আমি এঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—দেবার মত পরিচয় আমাদের কিছু নেই, তবে আমার এই ছেলেটি ভাতখণ্ডেজীর কাছে শিখছে, তিনি খুব যত্ন করে শেখান। আমি মাত্র শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের অনুরাগী।” আমি যুবকটির নাম জিজ্ঞেস করায়—বললেন, শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর। আমি খুব হাসি মুখে আপ্যায়ন করে বললাম—৺কাশী সম্মেলনে পণ্ডিতজীর থাকার স্থানে তাঁর মুখে আপনার কথা শুনেছি, আপনি একটু আমাকে গান শুনান। অতি বিনীতভাবে রতন জনকর জানালেন—আমি আপনার কাছে কি গাইব! এখন তো

শিখছি মাত্র, আপনাদের শোনাই এখন আমার খুব বেশী প্রয়োজন।" রতন জনকরের সেই বিনয়ভাব মূর্তিটি এখনও মনে আছে। এই বিনয়ভাব বরাবর থাকে, যদি সংগীতের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারা যায়।

লক্ষ্ণৌর সম্মেলনে ভারতবিখ্যাত বীণকার উজীর খাঁ সাহেব অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। শুনেছিলাম ঐ সময়ের কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ওখানের দৈনিক এক্সপ্রেস সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের অনুরোধে তাঁর গৃহে আমার গান হয়েছিল। আমার সংগে আমার বড়কাকার বড়ছেলেও (তখন খুব ছোট) ওখানে গান গেয়েছিল। কনফারেন্সেও তার গান হয়েছিল। তার সুমধুর কণ্ঠ শুনে সকলে খুব উৎসাহ ও আনন্দ জানিয়েছিলেন। চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়, মেজকাকা এবং আমার একত্রে বহুক্ষণ ধরে ছাড়-ধরতাই এর উপর আলাপ ও ধ্রুপদ হয়েছিল। এই পরিবেশন অনুষ্ঠানটি সকলকেই বেশ আকৃষ্ট করেছিল, এ কথা ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি অনেকেই জানিয়েছিলেন। এই ত্রিমুখী গানের শেষে ভাতখণ্ডেজী গান্ধার রাগের ধ্রুপদ শুনতে চাওয়ায় গোঁসাইজী মেজকাকাকেই এককভাবে গাইবার ভার দিলেন। রাগরূপের রচনা-পদ্ধতির উপর একান্ত মনোযোগ রেখে ভাতখণ্ডেজী শুনতে লাগলেন। তিনি আগেই বলেছিলেন—প্রাচীন রাগের স্বরূপ সন্ধান আপনাদের ঘরাণা ধ্রুপদের মধ্যেই সংরক্ষিত হয়ে আছে।" বাঙলার মধ্যে মেজকাকাকেই কনফারেন্সের মেম্বরপদ দেওয়া হয়েছিল। এই পদ ধ্রুপদী আলাবন্দ খাঁ ও আরো দু'একজনই পেয়েছিলেন সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে।

একদিন আমি সুযোগ-সুবিধা করে নিয়ে ভাতখণ্ডেজীর সংগে একা মিলিত হয়ে সংগীতের তত্ত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গের বিজ্ঞান বিষয়ে কিছুক্ষণ ধরে আলোচনার মাধ্যমে যে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করে মতভেদ ও সন্দেহের অবকাশ আছে তারই সমাধানে আমার বিচার যুক্তির কথা তাঁর সামনে তুলে ধরেছিলাম—আমার সিদ্ধান্ত যাচাই করে নেবার জন্য। তিনি সেগুলির উপর কোন বিতর্কেই এলেন না। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন—যুক্তিগুলি এখন দেখছি আমার মনেও বেশ রেখাপাত করেছে,...।

আমি শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে যখন উঠে পড়লাম তখন তিনি অতি সমাদর দেখিয়ে দরজা পর্য্যন্ত বিদায় জানাতে সংগে এলেন।

এখন কেবলি মনে হয় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের প্রকৃত কল্যাণচিন্তা ও সংরক্ষণের জন্য এবং শিল্পীগুণীদের সম্মান ও যথাযথ মর্য্যাদা দেবার জন্য ভাতখণ্ডেজীর মত হৃদয়বাণ, উদার, মহৎ এবং বিচারবোধজ্ঞ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি যেমন আগে অনেক ছিল তেমনি যদি এখন অন্ততঃ দু'পাঁচজনও থাকত তাহলে চারিদিকে তাকালেই দিশাহারা হতে হতনা। যাঁরা শাস্ত্রীয়-সংগীত প্রচারের জয়ঢাক কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁরা নিজের স্বার্থেই সুবিধামত তাতে মাঝে মাঝে কাটি পাড়েন,- সেইজন্য তাতে সঠিক তাল-ছন্দ থাকেনা।

এই সম্মেলনে ছ'দিন ধরে বহু বিশিষ্ট গায়ক-বাদকদের সংগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বহুকিছু অভিজ্ঞতা ও তাঁদের সংগীত পরিবেশনে খুব তৃপ্ত ও উপকৃত হয়েছিলাম। এই রকম কয়েকটি 'নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলনে' আহুত হয়ে এবং বাল্যকাল হতে ভ্রমণের মাধ্যমে ভারতের নানান স্থানের বড় বড় গায়ক-বাদকদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা, বহু রকমের গায়কী ও বন্দেজী বস্তু এবং বাদন ক্রিয়ার পরিচয় পেয়েছিলাম সুদীর্ঘকাল ধরে তা ভগবানেরই অশেষ কৃপায়।

লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে যত সংখ্যক উচ্চস্তরের বীণকার দেখেছিলাম এবং কিছু ধ্রুপদ গায়কও, সেই দেখা ক্রমশঃ কমে এসে শেষের মজঃফরপুর কনফারেন্সে আর তেমন দেখাই গেলনা। সেখানে ধ্রুপদ গান কেবল মেজকাকার, আর কপূর্রতলার রাজগায়কেরই হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। শাস্ত্রীয়-সংগীতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গান এখন বাঙলাদেশেই বেঁচে থাকার মত হয়ে আছে। বীণকার আজ প্রায় তিরিশ বছর ধরে না থাকারই মত। অর্থাৎ আগে বহু বীণকারের মধ্যে যে উচ্চ ধরণের বীণবাদন এবং বড়কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে যে আলাপ শুনেছি সুরবাহারে, তারপর ওই দু'টি যন্ত্রের বাদন যখন ঘটনাচক্রে কাণে আসে তখন কেবল বুঝতে পারি শুধু বাদ্য দু'টির নাম।

ধ্রুপদের মত শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং আলাপের জন্য বীণা, সুরবাহারের মত শ্রেষ্ঠ যন্ত্রের আজ এইদশা কেন হল ? একি শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতির পরিচয় ? এবং গ্রহণেচ্ছু মনের যোগ্য প্রস্তুতি ?

আলাপ অবশ্য সেতার যন্ত্রে খুব ভালভাবেই প্রকাশ করতে পারা যায় কিন্তু বীণা, সুরবাহারের টানের উপর তার তারে যে স্বর শক্তির প্রকাশ ও রসঘন বস্তু উৎপন্ন হয় ঠিক তেমনটি সেতারে আসতে পারেনা। তাছাড়া

ওই দুটি যন্ত্রের গঠনও উচ্চ আভিজাত্যের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষৌতে কন্‌ফারেন্স সমাধা হবার পর টিকারার মহারাজের দেওয়ানজী উক্ত মহারাজার পুত্রের বিবাহের সাল্‌গিরা (পাকা দেখা) উপলক্ষ্যে গানের আসর হবে সেজন্ত আমাকে ও মেজকাকাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। উনি এই উদ্দেশ্যেই কন্‌ফারেন্সে এসেছিলেন। আমাদের গান তাঁর কাণে ভাল লেগেছিল তাই…।

বেলা ২টার ট্রেণে চড়ে সেখানে পৌঁছলাম রাত ৭টায়। যাবার পথে বহু সুন্দর আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখেছিলাম।

বিজলীবাতির আলোকে রাজবাড়ীর জম্‌কাল রূপ ও ফুলের গাছে ফুলে ভরা সুদৃশ্য বাগান দেখে মন মোহিত হয়ে গেছল। আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল সুসজ্জিত এক তাঁবুর মধ্যে। তখন প্রচণ্ড শীত, তাঁবুর ভেতরে আগুনের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও শীতের হাড় কাঁপনির দাপট কম ছিলনা। রাত প্রায় ১১টার সময় বিরাট এক সুসজ্জিত তাঁবুর মধ্যে সঙ্গীতের আসর বস্‌ল। মহারাজা প্রভৃতির বাম পার্শ্বে লক্ষৌএর বিখ্যাত-বাঈজী এবং কালকা-বিন্দা ঘরাণার দু'জন প্রসিদ্ধ নর্তক উপবিষ্ট হলেন। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করলাম।

প্রথমে আমাদের গান হল, তারপর বাঈজীর এবং শেষে অদ্ভুত তৈরির উপর বিস্ময়কর সৃষ্টি আনল সেই দু'জন নর্তকের নাচের দ্বারা এবং ভাও বাত বাত্‌লা নয় ও তার সংগে তানবহুল গানে। এই বস্তু উপভোগ করার মাধ্যমে পেলাম প্রকৃত শিক্ষা ও সাধনার এক বিরাট রূপ। বহু নামকরা নর্ত্তকের নর্ত্তন দেখেছি কিন্তু তাঁদের শিক্ষা-সাধনায় এ রকম বিস্ময় লাগেনি। এঁরা যদি শুধু গানই করতেন তাহলেও নিঃসঙ্কোচে বলা যেত খুব বড় গায়ক। পরের দিন আমাদের বিদায়ের সময় মহারাজা বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করে অর্থ উপহার দিলেন।

বিকেলে রওনা হয়ে দু'দিন ধরে ট্রেণের মধ্যে থেকে হাওড়ার ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

(৬৭)

লক্ষৌ হতে ফিরে আসার পরই সেণ্টপলস্ কলেজের দু'জন অধ্যাপকের স্ত্রী এবং আরো দু'চারটি স্থানে শেখানর ভার নিতে হল।

সেগুলির মধ্যে নামকরার মত হল যামিনীভূষণ কবিরাজের এবং ছাতুবাবু-নাটুবাবুদের বাড়ী। নূতন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়ার আর সময় রইলনা। এত পরিশ্রম ও সময়ের চাপ থাকা সত্বেও নিয়মিত সাধনায় ব্যাঘাত কোন-দিন ঘটতে দিইনি।

১৯২৬ সালের বড়দিনের সময় গোয়ালীয়রের মহারাজা এলেন গঙ্গাতীরস্থ তাঁর ব্যারাকপুরের প্রাসাদে। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সংগে এঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ঠাকুর মহারাজের কাছে সঙ্গীতজ্ঞ আছে শুনে গোয়ালীয়ররাজ সঙ্গীত শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ঠাকুর মহারাজ সানন্দে দিন স্থির করে নেন এবং আমার থাকার ঘরে নিজেই এসে এই সংবাদ জানান। আমি খুব উৎফুল্ল হই।

দু'দিন সময় ছিল, টিউশনী বন্ধ করে গান ও সেতার সাধতে লাগলাম। যথাদিনের সকালে মহারাজা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন হিজ্ হাইনেস্ এর কাছে যাবার মত পোষাক পরিচ্ছদ আছে কি না ?

বল্লাম এখন তো আমি খদ্দরই পরি।

শুনে মহারাজ চম্‌কে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, না-না, ওসব প'রে যাওয়া চলবে না, দেখি আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি। ভেবেছিলাম বাঙালী সাজেরই উন্নত কিছু ব্যবস্থা করবেন কিন্তু যা ব্যবস্থা করলেন তা আমার পক্ষে এল খুব আঘাত হয়ে। বেয়ারা হীরণ নিয়ে এল ট্রেএ করে মহারাজার ব্যবহৃত দড়ি ঝুলান এক গাউন। সঙ্গীত শিল্পীদের মর্য্যাদা রক্ষায় যে রকমভাবে অবহেলা এই জাতের মানুষরা করে আসছেন তারই একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এল।

বেয়ারাকে একটু দাঁড়াতে বলে তার হাতে ছোট্ট করে লিখেদিলাম ব্যবহার্য্য পোষাক-পরিচ্ছদ ভদ্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দিতেও নেই এবং নিতেও নেই, মাপ করবেন ফেরৎ পাঠালাম। মনে মনে বেশ অনুভব করতে লাগলাম, মহারাজা দারুণ ক্রুদ্ধ তো হবেনই এবং ভয়ে আর কাউকে পাঠাতেও পারবেন না—কি পরে যাব তার খবর জানতে।

আমার ধরণ-ধারণ কিরূপ তা ভাল করে জানা থাকা সত্বেও তিনি এতবড় ভুল কেন করে ফেললেন তাই আশ্চর্য্য লেগেছিল। আমার মনে হয় তখন আমার স্বভাবের কথা ভুলে গিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ গোষ্ঠীর যাচ্ঞা, প্রার্থনা ইত্যাদি দুর্বলতার ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্রই তাঁর চোখের সামনে ঝল্‌মলিয়ে উঠেছিল।

যাই হোক্—গোয়ালীয়রের মহারাজকে শুনাবার বিপুল আগ্রহ যেন স্বাভাবিকের অনেক নীচে নেমে গেল।

কেবল ভাবতে লাগলাম সঙ্গীত এমন জিনিস যার অধিকারে গাছতলায় বসে গাইলেও খাদ্যাদির অভাব মিটে যায়, সেই সঙ্গীতকে ধরে থেকে অপরের কাছে যাচ্ঞা ইত্যাদি হীন কাজ করে নিজের সবকিছু ঘুচাতে হবে? সঙ্গীতকে ধরে সঙ্গীতের মত সর্ব্বোচ্চ বিদ্যার সম্মানকে রক্ষা না করতে পারলে সে রকম ব্যক্তির সঙ্গীতের সাধনায় আসা কোন রকমেই উচিত নয়। আত্মবঞ্চনার মধ্য দিয়ে বাইরের বাহাবা পাওয়াই বড় জিনিস নয়, ভেতরের দেবতার কাছ থেকে বাহবা পেতে হবে সুতরাং তার মত প্রস্তুতিই হচ্ছে সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

রাত ৬টার সময় মহারাজা জানতে চেয়ে হীরণকে পাঠালেন আমি প্রস্তুত হয়েছি কি-না, এবং তাঁর কাছে যেতেও বলেছেন।

প্রস্তুত আগে থাকতেই হয়েছিলাম। কাউকে বসিয়ে রেখে প্রস্তুত হতে যাওয়া নির্দিষ্ট সময়কে উপেক্ষা করে এবং আসরে সময়সূচীমত না যাওয়া এই সব এখনকার মর্য্যাদা রক্ষার সুঅভ্যাস আমার কোনদিনই নেই এবং আমাদের বংশের কাউকেও দেখিনি। হীরণের সংগেই গেলাম মহারাজার কাছে।

কাছে দাঁড়াতেই কঠোর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় লিখে পোষাক ফেরৎ পাঠিয়েছি বলে এই বিস্ময়কর অঘটন ও অসম্ভব ব্যাপারে বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন,—আগে আমাদের বাড়ীতে বহু বড় বড় গায়ক-বাদক ছিলেন, এঁরা আমাদের এই রকম দানে কৃতার্থ বোধ করতেন, এমনকি পুরাতন গাত্রবস্ত্রাদি পাবার জন্য প্রার্থনা করতেন, আর তুমি তাঁদের তুলনায় অনেক জুনিয়র হয়েও এতবড় স্পর্দ্ধা দেখিয়ে অপমান করলে?

আমি এর উত্তরে বললাম—যে কাজ করতে এবং যে বস্তু গ্রহণ করতে বিবেকে এবং আত্মসম্মানে আঘাত লাগে সে কাজ করা কারো পক্ষেই উচিত নয়; বড়-ছোটর প্রশ্ন তুলে মানবাত্মাকে অপমান করা হয়। আপনি যদি সামান্য অর্থে নূতন কিছু পরিধানযোগ্য ক্রয় করিয়ে আনিয়ে দিতেন তাহলে আমি সানন্দে গ্রহণ করতাম। আমি মস্তবড় ওস্তাদ একথা আমি কোন দিনই মনে করিনা, অপার-অনন্ত সঙ্গীতবিদ্যাকে লাভ করা সারা জীবনে কতটুকুই বা হয়! আমি তো মনে করি একশ' বছর যদি পরমায়ু হয় আর ততদিন যদি শুধু সাতটি স্বরকে নিয়েই সাধনা করা যায় তাহলেও

বোধ হয় প্রত্যেকটির স্বরূপমহিমা উপলব্ধি হবে না! আমি নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে শুনেছি একটি যুবক ভাগ্যগুণে হিমালয়ের এক সিদ্ধযোগীর কাছে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রায় সর্ব্বদা পাঁচ বছর ধরে শুধু 'সা' সুর সাধনা করে চলেছিল, তাঁর মুখে এই সংবাদ শুনে আপনার পিতা মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দরবারের গায়ক-বাদকরা যখন সেই যুবকের কাছে ধারণাতীত দমের উপর 'সা' সুরের গম্ভীরধ্বনি শুনেন তখন সকলে স্তম্ভিত ও ভাবে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই যুবক শুনাতে কোন রকমেই স্বীকার করেনি, কারণ তার গুরুর আদেশ ছিল না,—চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সে খুব শ্রদ্ধা করত এবং প্রায়ই তাঁর কাছে যেত বলে তাঁর নিতান্ত অনুরোধে খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বে শুনাতে হয়েছিল কিন্তু তারপরেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। চক্রবর্ত্তী মশায় বলেছিলেন সেই যুবক 'সা' গেয়ে যখন ছেড়ে দিলে তখন মনে হল যেন দরবার ঘরে 'সা' এর স্তম্ভ দাঁড়িয়ে গেছে। তাহলে দেখুন মহারাজ আমি স্বর সম্বন্ধে যে কথা বললাম সত্য কি-না? সুতরাং বড় ওস্তাদ হওয়া কি সোজা কথা?

মহারাজা একেবারে গলার স্বরকে নীচে নামিয়ে স্নিগ্ধতার উপর বললেন—সত্যই আমারই ভুল হয়েছে—তোমাকে চিনেও আমি খেয়াল রাখতে পারিনি, কিছু মনে কর না। বললাম, মহারাজ আপনার এই স্বীকৃতিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এইটাই যেন বজায় থাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

তারপর আমার গায়ে জড়ান শালের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই তো এত দামী ও খান্দানী, বৃহৎ পাল্লাদার শাল তোমার ছিল তা আমাকে বলনি কেন—তাহলে আমার এই অবস্থা ঘটত না, যাই হোক্—এবারে আমাদের যাত্রা করতে হবে—তুমি বাদকের সহিত প্রস্তুত থাক গাড়ী আনতে বলি।"

মহারাজার শেষের ব্যবহারে আমি খুব প্রসন্ন হয়ে হাসতে হাসতে নীচে নেমে এলাম।

মহারাজা নিজের মিনার্ভা গাড়ীতে এবং আমি ও বাদক আর একটিতে চড়ে যাত্রা করলাম।

যেতে যেতে মনে হতে লাগল যে মেঘ কেটে পরিষ্কার হয়ে গেছে—সেই মেঘে আবার কোন আদর্শ রক্ষার জন্য না সংঘর্ষ বেধে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমার কাছে কারণ বড় রকম থাকে না—তাই—।

গন্তব্যের পথ শেষ হয়ে যাবার পর বিরাট ফটকের ভেতর দিয়ে গাড়ী

প্রবেশ করে' লাল কাঁকরের উপর ঘর্ ঘর্ শব্দে প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

মহারাজা আমাদের বোসবার ঘরে বসিয়ে রেখে হিজ্ হাইনেসের ইংরেজ সেক্রেটারীর সংগে প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

রাত প্রায় ৯টার সময় অর্থাৎ নৈশভোজ সারা হবার পর আমাদের কাছে মস্ত জব্বর এক আরদালী এসে বল্ল—আপ্ লোগ চলিয়ে।

অপূর্বভাবে বহু মূল্যবান দ্রব্যে সজ্জিত বিরাট হলঘরে প্রবেশ করলাম। যেমনি পুরু তেমনি সুন্দর নক্সাসমৃদ্ধ একটি কার্পেটে অতবড় হলঘরে পাতাছিল, তারই মূল্য যে কত তা ধারণায় আনতে পারিনি। ঠাকুর মহারাজ তৎক্ষণাৎ এসে পড়েই বললেন—হিজ্ হাইনেস এবার আসছেন তুমি শীঘ্র যন্ত্রপাতি মিলিয়ে নাও।

আমি বল্লাম কোথায় বসে গাইব ?

বললেন—মহারাজ গোয়ালীয়র বসবেন সামনের সিংহাসনে, আমরা দু'পাশের কোচে বস্ব, তুমি এই কার্পেটে বসে শুনাবে।

বাধ্‌ল সংঘর্ষ, বললাম—এ সঙ্গীত শুধু শাস্ত্রীয়-সংগীতই নয় এ ব্রহ্মবিদ্যা, তাকে আমি কারোর পায়ের তলায় এনে সঙ্গীতের সেই প্রতীককে অঞ্জলি দিতে পারব না ; সঙ্গীতের দেবতার মর্য্যাদা নষ্ট করে ফেলবার জন্য তিনি আমাকে এই বস্তু দান করেন নি।

ঠাকুর মহারাজ আবার আমার মুখে এতবড় স্পর্দ্ধার কথা শুনে বোমা ফাটার মত হয়ে সেই আগের বড় বড় ওস্তাদদের কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন।

কিন্তু আমাকে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে সেক্রেটারী মহারাজকে খুব বিব্রত হয়ে বললেন—হিজ্ হাইনেসের এসে পড়ার বিলম্ব নেই শীঘ্র প্রস্তুত হতে বলুন।

মহারাজ তাঁকে বললেন—আমার মিউজিশিয়ানের একটা এ্যাবসেসের জন্য বসে গান বাজনা করতে অসুবিধা হবে বলে তিনি জানাচ্ছেন।

ইংরেজ সেক্রেটারী বোধ হয় আমাদের কথাবার্ত্তায় উত্তপ্ততা লক্ষ্য করে ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝতে পেরেছিলেন তাই আমার দিকে তাকিয়ে ভেরিগুড বলে সংগে সংগে দু'জন বেয়ারাকে দিয়ে একটা খুব বড় সোফা আনিয়ে দিয়ে বললেন—এর উপর বসে আপনার সুবিধে হবে তো ?

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম খুব ভাল হবে।

ভাল মোটেই হয়নি—স্প্রিং-এর মধ্যে ঢুকে যাওয়ার মত অবস্থায় সোজা হয়ে বসা গেল না। তাতেই বসে তাড়াতাড়ি সুর মিলিয়ে নিলাম।

হিজ্‌ হাইনেস সাঙ্গপাঙ্গ সংগে নিয়ে (তারমধ্যে ইংরেজই বেশী) সিংহাসনে গা' এলিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়লেন।

প্রত্যেককেই দেখে মনে হল কারণ দেবীকে ষোড়শোপচারে দেহাভ্যন্তরে পূজা করে এসেছেন, সেই পূজার রক্তজবার ফুল টেলিভিশন্ যন্ত্রের মত প্রত্যেকের চোখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

হিজহাইনেস্ আমার দিকে শিবনেত্রে তাকিয়ে বললেন—আপ্ গানা সুরু করিয়ে।'

আমার মহারাজা হিজ্‌ হাইনেসের নিবিড় বন্ধু থাকায় তাই তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ বলেই বোধ হয় চিরাচরিত ভাষায় তুম গানা সুরু করো'— বলতে পারলেন না এবং গানেওয়ালা ও বাজানেওয়ালা ব্যক্তির শোফায় বসার অনুপযুক্ত অধিকার সহজভাবেই গ্রহণ করে নিলেন।

গানের আগে আলাপ না করে একেবারে মধ্যলয়ের খেয়াল ধরলাম দরবারী কাণড়া রাগে। সুর কাণে ঢুকতেই গোয়ালীয়র চাঙ্গা হয়ে বসার চেষ্টা করে বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা করতে লাগলেন। মিনিট দুই শুনেই আবার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, এই রকমভাবেই প্রায় মিনিট কুড়ির মধ্যে গানের সময় পেতে লাগলাম প্রশংসা।

মহারাজা কাণে কাণে বললেন—এবার সেতার ধর, নচেৎ ওটা শুনবার আর সামর্থ্য থাকবে না।

সেতারে বেহাগরাগের উপর মীড়ের টান দিতেই আচম্‌কা উঠে বসে আহা-আহা করে উঠলেন। শুনার একান্ত আকর্ষণে নিজেকে প্রকৃতস্থ করে রাখবার জন্য খুব চেষ্টা করেও দশ, বার মিনিটের বেশী পারলেন না, জড়িত কণ্ঠে বললেন—ম্যায় ঔর ব্যায়ঠ্‌নে নহী সেকতা হুঁ। ওই দশ-বার মিনিট মুহুর্মুহু আহা-বহুৎ আচ্ছা করে উঠেছিলেন।

মন কেবল বলছিল—ভাল অবস্থায় থেকে যদি শুনতেন তাহলে এত বড় সমঝ্‌দার শ্রোতাকে শুনিয়ে খুবই তৃপ্তি পেতাম। আগে এঁরাই সব ছিলেন প্রকৃত খান্দানী শ্রোতা। এঁদের তারিফ্‌ই শিল্পীদের সাধনায় অনুপ্রাণিত করত এবং থাকত তারমধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবও।

রাজপুতনার যশবন্তসিংহের বংশধরকে জনা দুই মেম-সাহেব ধরা ধরি করে নিয়ে গেল।

ভারতের এই সব বড় বড় দেশীয় মহারাজাদের এই অবস্থা দেখে মনে অত্যন্ত বেদনা ও দুঃখ এসে গেছল ইংরেজী প্রভাবের পরিণতি দেখে। ইংরেজরা তাদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গকে এই রকম-ভাবে প্রলুব্ধ করে সব কিছু যোগান দিয়ে সর্বনাশের পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

সেদিন ওখান হতে ফিরে রাত প্রায় ১২টার সময় ঠাণ্ডা লুচি খেয়ে তারপর শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলাম। মহারাজা একদিন বলেছিলেন— তুমি এই বয়সে যে রকম অদ্ভুত সাধনার দ্বারা গানে ও যন্ত্রে দৃষ্টান্ত কৃতিত্ব অর্জন করেছ তা দেখাবার জন্য আমি ভারতের বড় বড় রাজাদের ও উচ্চপদাধিকারী ইংরেজদের কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচিত করে এক উচ্চ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে দেবো। বলেছিলেন—দেখছ তো, মহীশূর হায়দ্রাবাদ, গোয়ালীয়র, বরোদা, পাতিয়ালা প্রভৃতির মহারাজরা আমাকে বিশেষ বন্ধু বলে মনে করেন ও ভালবাসেন এবং লাট সাহেব প্রভৃতিও।"

কিন্তু আজকার এই ঘটনার পর তা আর সম্ভব হবে না। কারণ এই সব মহারাজ গোষ্ঠীরা সঙ্গীতজ্ঞদের আবার ব্যক্তিগত রক্ষণীয় কিছু থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করেন না।

সত্যই বরাবর সেলাম ঠুকে আসা, পেছু হেঁটে যাওয়া, করজোড়ে যাজ্ঞা করা ইত্যাদি দ্বারা ভৃত্যের মত যে পরিচয় দিয়ে আসা হয়েছে এবং প্রভুরা পেয়েছেন। তার থেকে কারো স্বাধিকারে আসা প্রভুদের ভাল লাগতেই পারে না, কারণ ও জিনিসগুলোও তাঁদের মনের এক তৃপ্তিকর বস্তুর মত, এবং ওগুলোই বিশেষ করে প্রভুত্ব ও পদ মর্য্যাদার প্রত্যক্ষ দর্শনের আয়নার স্বরূপ।

মহারাজ যে আশার কথা আমাকে দিয়েছিলেন—তা সঙ্গীতজ্ঞ গোষ্ঠীর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের আমাকে মনে করে পেছু হেঁটে গেলেন, এগোতে আর সাহস করলেন না বা নিজেও পছন্দ করলেন না।

পরের দিন বেলা ৯টার সময় ডাক পেয়ে মহারাজার কাছে যেতেই বললেন এই শোফাতে বো-স। এরূপ অভাবনীয় পরিবর্তনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করলাম।

মহারাজ বললেন—কাল ওই রকম অবস্থার মধ্যেও তোমার গান ও বাজনা খুব ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল গোয়ালীয়রের কাণে ঢোকাবার জন্য তুমি খুব মেজাজ এনে অসম্ভব দরদ দিয়ে পরিবেশন কোরছিলে।

আমার নিজেরও বেশ একটা গর্ব আসছিল। তবে বুঝতেই ত পারছ, ওদের কাছে গান-বাজনা শুনান এখন এই রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে. ঠিকমত শুনবার আগ্রহ থাকলেও প্রকৃতস্থ থাকতে আর পারেন না। যাই হোক্— তুমি কাল বসার ব্যাপার নিয়ে যে অসম্ভব কাণ্ড করে এলে তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে এই ভাবছি তোমাকে বড় বড় রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া আর বোধ হয় সম্ভব হবে না। এটুকু জানবে—হিজ্ হাইনেস আমার জন্যই এই স্পর্দ্ধা মেনে নিয়েছিলেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে নমস্কার করে চলে এলাম। তখন এই মনে হতে লাগল— তানসেন পর্য্যন্ত যখন নতজানু হয়ে মাটিতে বসে হাতজোড় করে দিল্লীশ্বরের মুখপানে চেয়ে ধ্রুপদের মত ভগবৎ ভজনের গান গেয়ে শুনিয়ে গেছেন তখন অন্যেরা তাঁদের পালকপ্রভুদের ভৃত্যান্তরে নামবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

এই সমস্ত দেখে শুনে কেবলি হনে হয় তানসেন গুরু হরিদাস স্বামীর আদর্শকে অনুসরণ করে যদি আসতে পারা যেত তাহলে সত্যকারের সবকিছুই পাওয়া যেত।

একদিন ঘরোওয়া আসরে মণীন্দ্র কলেজের বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক এবং আমার বহুবছরের নিয়মিত ছাত্র শ্রীমধুসুদন ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন— গুরুজী যদি একটু নিজেকে নামিয়ে আনতে পারতেন এবং তার সংগে অন্যায়কে সহ্য করে নিতে পারতেন তাহলে এখানে আজ গাড়ী বাড়ী সবই হত এবং চতুর্দিকে নাম আরো বিস্তৃত হয়ে সর্ব্বোচ্চ স্তরে থাকত, কিন্তু ওঁর ধাতে ওসব সহ্য হলনা, প্রতিরোধ করতে গিয়ে কেবল নিজেরই ক্ষতি করে আসছেন।" এর উত্তরে আমার একটি কবিতা শ্রোতাদের শুনিয়ে দিই.—

অন্যায় সয়ে থাকা সে যদি গুণের হয়
চাহি না সে গুণ মোর থাকুক।
নিজ মর্য্যাদা ত্যাগ সে যদি বিনয় হয়
সে বিনয় পারে যে হো' রাখুক॥
নির্ভিক হলে যদি বলে বড় দাম্ভিক
সত্য বচনে হয় ক্রুদ্ধ
কিবা যায় আসে তায় দুর্বল এ কথায়
ভিতরে রহিলে সদা শুদ্ধ।
নিজ বিদ্যার সদা মর্য্যাদা হবে রাখা
তার কাছে বড় নহে কেহ

মানের তরেতে কভু লালসা আসিবে না
যাবে না সে আশে কারো গেহ।
ভাবিব আমার তরে সতত তিনিই শুধু
তিনি ছাড়া কেহ নাই ভবে
আমার সাধন মাঝে নিরত সকল কাজে
তাঁহারই ধ্যান শুধু রবে॥

(৬৮)

বিভিন্ন সংবাদ—

বোধ হয় ১৯২৬ সালেই হবে কোলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ আন্তঃকলেজ সংগীত প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করলেন প্রকৃত নীতি-নিয়মের পদ্ধতি অনুসরণ করে।

প্রথম বর্ষে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের বিচারক নির্ব্বাচনে প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞদের সংগে আমাকেও স্থান দিয়েছিলেন। যতদুর স্মরণ হচ্ছে অন্য বিচারকদের নাম এই ছিল,—ধ্রুপদগুণী রায় যোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ সাহেব (সরোদ বাদক), সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

এই প্রথম বর্ষে প্রতিযোগীদের মধ্যে রমেশচন্দ্র, রত্নেশ্বর প্রভৃতি বহু ছাত্রও যোগ দিয়েছিল। নাটোরের মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন ইনষ্টিটিউটের এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি।

সেই প্রথমবারে প্রতিযোগিতা অন্তে পুরস্কার বিতরণের দিনে বিচারকদের গান-বাজনার পর উক্ত মহারাজ সর্বসমক্ষে আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞদের সংগে যোগ্য এই নবীন সঙ্গীতজ্ঞকে বিচারকের পদে স্থান দেওয়ায় আমি নির্বাচক মণ্ডলীকে বিশেষ প্রশংসা করি, ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা খুব আদর্শসম্মত কাজ করে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রতিযোগিতার বৎসরিক এই অনুষ্ঠানে বিচারকের এই দায়িত্ব একাদিক্রমে বহুবৎসর পালন করে এসেছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে

শচীন, মতিলাল, ভীষ্মদেব, অম্বিকা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

* * * *

ঠাকুর রাজবাড়ীতে থাকার প্রথম সময়ে অর্থাৎ আমার পঁচিশ বছর বয়সের সময় প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। দু'তিন বছর পরে একটি পুত্র-সন্তান এল, নাম রাখলাম অমিয়রঞ্জন। ছেলেটি খুব কৃশ হয়ে জন্মেছিল বলে —খুব ভোরে উঠে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী এক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধার কাছে দেশী ছাগলের দুধ আধসের করে নিয়ে আসতাম। এবং গায়ে মাখাবার জন্য মানিকতলায় গরু দিয়ে পেশাই করান কাঠের ঘানীর সরষের তেল নিয়ে আসতাম। তার দূরত্বও মাইল দুই হবে। তখন বাসা করেছিলাম নিমতলা ষ্ট্রীটের সন্নিকট। এই ব্যবস্থার উপর খুব যত্ন নিয়ে ছেলেটিকে বলিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছিলাম। ছ' মাসের মধ্যে চেহারা দেখে লোকে অবাক। দেড় বছর বয়স থেকেই সঙ্গীতের উপর আকর্ষণ পরিলক্ষিত হতে লাগল। ঐ বয়সের সময় তার মা তাকে রান্না ঘরে বসিয়ে একটা ছোট লাঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রান্না করতেন, পুত্রটি লাঠিটাকে কাঁধে ফেলে তানপুরা ধরার ভঙ্গীতে তার উপর আঙ্গুল চালিয়ে আ আ করে গলায় সুর আনত। এই ছেলে শৈশব হতে এম-এ পাশের বয়স পর্য্যন্ত অদম্য নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত গান ও লেখাপড়া চালিয়ে এসেছিল। আমার এই বয়সে আজও তাকে কোনদিনই আলস্যে কাল কাটাতে দেখিনি। বাইরে খেলাধুলা ও সঙ্গী জুটান এসব একেবারেই ছিল না, এখন ত নেইই। গরমের দিনে বেলা দু'টোর সময় কলেজ থেকে এসে জল খেয়েই গান সাধতে বসে যেত এবং সমানে দু' ঘণ্টা রেওয়াজ করে যেত। যদি বলতাম পড়ার পরিশ্রম করে এসে এখন নাইবা সাধলে, তাহলে বলত এখন না সাধলে কখন সময় পাব বাবা! সন্ধ্যার পরই পড়তে বসতে হবে। সাধনার প্রণালী ও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনকরে যেত। গান সাধতে বা পড়তে কোনদিনই বলার অবকাশ দেয়নি। আদর্শ ও কর্ত্তব্যের উপর গভীর নিষ্ঠা রাখার জন্য অন্য চারটি পুত্রসন্তানও তাদের অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণে মনকে উদ্বুদ্ধ করে রেখে যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পেরেছে উচ্চ শিক্ষায় ও গানে।

বড়পুত্র আট বছর বয়সে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় মজঃফরপুরে তার গ্রুপে ধ্রুপদ, খেয়ালে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এবং বরাবরই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে এসেছিল।

তখন বৃহৎ আকারে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে এক একটি প্রতিযোগিতা সাত-আট দিন ধরে দু'বেলা চলত। ছাত্র-ছাত্রীদের সে এক অভূতপূর্ব উদ্যম ও আগ্রহের পরিচয় নজীরের মত ছিল। পুরুষ ও মহিলার পৃথক গ্রুপ থাকত চারটি করে। প্রত্যেক গ্রুপে ৬০।৭০।৮০ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী থাকত। বিষয় ছিল—আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ভজন, রামপ্রসাদী, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ইত্যাদি এবং যন্ত্র-সংগীতে সেতার, এসরাজ, তবলা, পাখোওয়াজ ইত্যাদি। এই সংবাদ আজ প্রায় চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার। এই রকম পর পর কয়েক বছর পর্যন্ত চলেছিল। প্রত্যেকটিতেই আমাকে পরীক্ষকের দায়িত্ব পদ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঠাকুর মহারাজের কাছে থাকার প্রথম সময়ে তাঁর পোষ্যপুত্র কুমার প্রবীরেন্দ্রমোহনের বিবাহ অভূতপূর্ব জাঁকজমকের সহিত সমাধা হল।

দিন কয়েক পরে মহারাজা আমাকে বললেন—তুমি খোকার বৌকে (বৌরাণীকে) গান শেখাতে আরম্ভ কর। আমাদের বংশে এই ব্যবস্থা এই প্রথম, কারণ ইচ্ছে থাকলেও কাউকে অন্দরে প্রবেশের অধিকার এবং রাণীদের কাছে বসে শেখান অসম্ভব ছিল কিন্তু তোমার প্রতি আমার অন্য এক ধারণা প্রগাঢ় হয়ে আছে বলে আমার আকাজ্ক্ষা পূরণের সুযোগ পেয়েছি। কাল থেকেই তাহলে তুমি আরম্ভ কর শেখাতে। আমি বৌমাকে তোমার সব পরিচয় দিয়ে বলে রেখেছি—খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতে।" আমি খুব আনন্দপ্রকাশ করে চলে এলাম। এই রকম পাওনার বস্তুগুলিই শ্রেষ্ঠ পাওনা রূপে আমার কাছে গণ্য হয়ে এসেছে। বেশ বুঝি—রাখতে পারার মত নিজের আধার প্রস্তুত থাকলে এগুলো আসে।

বধূরাণীকে একাদিক্রমে সাত বছর শিখিয়েছিলাম।

মহারাজার কাছে থাকা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় উনিশ বছর। বাসা করে থাকার সময়ও রাজবাড়ীর মধ্যে আমার থাকার ঘরটি বরাবরই নিজের ব্যবহারের জন্য ছিল।

বহু রাজবাড়ীতে আমি ৬দুর্গাপূজা দেখেছি কিন্তু এখানের মত জাঁকজমক, আলোক সজ্জার বৈশিষ্ট্য, ৬পূজার দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্যের ও রত্নে খচিত শিল্পের বিবিধ বস্তুসম্ভার আমি আর কোথাও দেখিনি এবং ৬পূজার বিধি ব্যবস্থারও ছিল শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ। সবকিছুতে নীতি, নিয়ম ও ব্যবস্থা দেখে মনে হত এ যেন এক কৃষ্টি-ঐতিহ্যের মূর্ত্ত রূপের মত। যে

বিরাট জৌলুস দেখেছিলাম, এখন তার কিছুমাত্র নেই।

তখন গুর্খাসৈন্য ছিল, তার ক্যাপ্টেন ছিল গর্ডন সাহেব। প্রত্যহ চারবার করে নহবতখানার নাম করা সানাইবাদকের বাদন হত; দু'কটকের দু'পাশে বন্দুকধারী সিপাহী থাকত, দেউড়ীতে অস্ত্রধারী দারোওয়ান থাকত, তোষাখানা, খাজাঞ্চিখানা, আরো কত কি ছিল, প্রত্যহ একশ'একজন করে দরিদ্র নারায়ণকে অন্ন দেওয়া হত। প্রাসাদের নাচঘর—সে এক অপূর্ব দ্রষ্টব্য ছিল, তার মধ্যে একটি বৃহৎ আকারের কারুকার্য্য বিশিষ্ট যে ঘড়ি ছিল সেই ঘড়ি মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর বহু সংস্র টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন। সেখানে কাঁচের ঘেরা পাত্রে কিওপ্লেটোরার মূর্ত্তির কাছে গেলে দেখার আকর্ষণ শেষ হতে চাইত না। কত রকমের কত বড় বড় ঘড়ি ছিল, প্রত্যেকটায় বাজবার আগে সুন্দর গৎ বাজত। আমাদের খাদ্যাদির ব্যবস্থাও ছিল উচ্চস্তরের।

ক্যাসল্ বাড়ীতে হত কাছারীর কাজ, তাতে কত লোক নিযুক্ত ছিল। ম্যানেজারের মাইনে ছিল তখনকার দিনে ষোল শ' টাকা। বি, টি, রোডের উপর এমারেল্ড বাওয়ার নামে যে বাগান ও তারমধ্যে প্রাসাদ ছিল সেও আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যের মত ছিল। সেখানে হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি বড় বড় স্বাধীন নৃপতিরা এসে থাকতেন বড়দিনের সময়। পাকিস্থান হয়ে জমীদারী যাওয়ায় স্বাধীনতার পরই মুহূর্ত্তে সব ধ্বংস হয়ে গেল।

লক্ষ্মী ছেড়ে চলে গেলে এই রকমই হয়। যারা থাকে তারা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে মতিচ্ছন্নের পথে চলে যায়। নচেৎ জমীদারী গিয়েও শেষ মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন (উক্ত বৌরাণীর স্বামী) ক্যাসেল্ বাড়ীটা এবং এমারেল্ড বাওয়ার বিক্রী করে প্রায় দু'কোটি টাকা পেয়েছিলেন, ওই টাকা যদি গচ্ছিত রেখে তার সুদে চালাতেন তাহলে এমন চরম অবস্থায় আসতে হত না।

এই রাজবাড়ীর পরিচয় আরো একটু দেবার মত আছে,—

ধ্রুপদ গান যে সত্যই দেবতার্থবস্তু তার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করে মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় ৺দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর সন্ধীর সময় বরাবরের জন্য ধ্রুপদ গানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য দু'চার জন ধ্রুপদ গায়ককে নিমন্ত্রণ স্থায়ীভাবেই করা ছিল। তাঁরা ওই সময় উপস্থিত হয়ে সন্ধীপূজার সময়ের মধ্যে ধ্রুপদ গান মাকে শুনিয়ে যেতেন। পূজার সেই সময় গানের বিঘ্ন উৎপাদন হবে বলে মন্ত্রাদির উচ্চারণ শুনার মত করে

থাকত না। এই সময় বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী আহ্বান পেয়ে দু'চার জন মহা মহা পণ্ডিত উপস্থিত হতেন এবং তাঁরা উপযুক্ত প্রণামী পেতেন। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতী তর্কতীর্থ প্রভৃতি এঁদের উপস্থিত থাকতে দেখেছিলাম।

আমার যাবার প্রথম বছর থেকেই সন্ধীপূজার গান আমারই প্রায় সর্ব্বক্ষণ হত, যাঁরা আসতেন তাঁরা ব্যবস্থা মত টাকা ঠিক পেয়ে যেতেন। দু'পাঁচ বছরের মধ্যে আগত গায়কদের মৃত্যু ঘটে গেল।

সন্ধীপূজার সময় মহারাজা মায়ের চরণে একশত আটটি করে স্বুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত চাঁপা অর্পণ করেই গাইতে বলতেন। পণ্ডিত ও পুরোহিত-মণ্ডলী বিভিন্ন রৌপ্যপাত্রে এক হাজার আটটি রক্তপদ্ম সেই সময় মায়ের চরণে অর্পণ করে যেতেন।

সন্ধীর মুহূর্ত্তে রৌপ্যনির্মিত এক সুন্দর আধারে একশ' আটটি প্রদীপকে তখন জ্বেলে দিয়ে দীপ দান হত, কুশের দ্বারা সরু দড়ি পাকিয়ে তাতে বাঁধা থাকত, সেই দড়ি সেই মুহূর্ত্তে তৎক্ষণাৎ দেবীর চরণে অর্পিত হত। তারপর আরতির সঙ্গে সঙ্গেই গানও শেষ হত। রূপোর তৈরি আরতি করার বস্তুই কত রকমের ছিল—কোনটি গোড়ুরাকৃতি, কোনটি গোক্ষুরসর্পের আকৃতি, কোনটি অষ্টসখি একযোগে দাঁড়িয়ে মাঙ্গলিক বস্তু ধারণ করে শেষে এক একটি প্রদীপ নিয়ে আছে—কোনটি দ্বাদশ সর্পচক্র সমন্বিত হয়ে বক্রাকারে দাঁড়ান অবস্থার উপর প্রত্যেক ফণায় থাকত প্রদীপ, কোনটি বৃক্ষের শাখাসমৃদ্ধ হয়ে তাতে তার ফুলগুলি এক একটি প্রদীপের রূপ নিয়েছিল। এইগুলির প্রত্যেকটিই আরতির সময় ব্যবহৃত হত। কুল-দেবতা ব্রহ্মগোপাল চারদিনই সেখানে থাকতেন। প্রত্যেক দিনই তাঁকে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত নূতন নূতন সিংহাসনে রাখা হত এবং রকম রকম চূড়ায় থাকত মণি, মুক্তাদি জহরত দিয়ে সাজান। একটা বৃহৎ ঝুড়ের মত আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুতে আটকান বড় বড় রূপার পাত্রে চক্রাকারে নানাবিধ মিষ্টান্নে ও ফলে ভর্ত্তি হয়ে থাকত এবং তার মাথায় মস্ত বড় রূপোর থালায় আতপের নৈবিদ্যতে সুপক্ক কলাদিয়ে ভর্ত্তি করা হত এবং তার মাথায় মন্দিরাকারে একটি সন্দেশ থাকত দু'সের ওজনের। এই ব্যবস্থাগুলি সন্ধীপূজার সময়ই ছিল।

কাঠের ফ্রেমে টাঙ্গান রকম রকম গোলাকৃতির কাঁসর আটটি এবং ওইভাবে ঘড়ি আটটি ঝুলান থাকত, ষোলজন বাজাত আরতির সময়।

আরতি শেষ হলেই সাঁনাইএ মধুর আলাপ সুরু হত। ওই চারদিন ১২টি করে নূতন থালায় ভর্ত্তি করে চিনির নৈবিদ্য প্রদত্ত হত। আমি একটা করে পেতাম।

পূজার নির্ঘণ্ট আগে থাকতে ছাপান হত। দেবী প্রতীমায় দ্বাদশ জনের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থায় থাকত এক একটি আসনের সামনে রূপোর ঘটিতে গঙ্গাজল এবং দাঁতনাদি। বেলা ৯টায় বারটি খেজুরী ভোগ, এগারটায় ১২টি অন্ন ভোগ, রাত ৮টায় ১২টি বড় বড় চেঙ্গাড়িতে লুচি, মিষ্টান্নাদিতে ভর্ত্তি হয়ে থাকত।

এই বিভিন্ন সময়ের বারটি ভোগ ও রাত্রের শিতল-সামগ্রী, বারজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের গৃহে পৌঁছে দেওয়া হত। তার মধ্যে আমিও ছিলাম গণনায় ধার্য্য হয়ে। তাছাড়া চারদিনের জন্য বাড়ীর সকলের নিমন্ত্রণ ত ছিলই। এক একটা ভোগে খাদ্যের পরিমাপ যথেষ্ট থাকত এবং তার মত বহুপ্রকারের রান্না দ্রব্য, দৈ ও পায়স। রাত্রে নিবেদিত জল-খাবারের বস্তু যা আসত তাতে থাকত আট গণ্ডা লুচি, আটটা করে অমৃত্তি, গজা, বালুসাই, সিঙ্গাড়া, খাস্তা কচুরি, পানতোয়া, রসগোল্লা, খাজা, সন্দেশ। প্রত্যেকটাই বড় আকৃতি বিশিষ্ট থাকত।

প্রতিপদ থেকে চণ্ডীর গান হত নবমী পর্য্যন্ত। ঐ রাত্রে মজলিস হত। খাদ্যাদির আয়োজনে দিয়তাং ভোজতাং এর মত দেখেছি। পরিচয় দিয়ে শেষ করা যায় না। তখন সুন্দর শিল্পপুজনীর উপর ৺পূজার দালানও আমি কোথাও দেখিনি এবং ইলেকট্রিকের অমন সুন্দর ঝাড় দিয়ে সাজানও। মহারাজা পূজায় ১ মাসের করে বোনাস দিতেন। মহারাজা জ্যোতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর উইলে পাকা করে দিয়েছিলেন—৺দুর্গাপূজার দশ হাজার টাকা, ৺কালী পূজায় দু' হাজার, জগদ্ধাত্রী পূজার চার হাজার, তারপর অন্য পূজাতেও টাকার অঙ্ক ধার্য্য ছিল। উইলে এও ছিল, তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দরিদ্র-নারায়ণকে খাওয়ান ও শ্রাদ্ধাদির জন্য আট হাজার, তাঁর স্ত্রীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দু' হাজার টাকা। এই সমস্ত ক্রিয়া-কর্মে খরচ যথাযথ সুব্যবস্থার উপর ট্রাষ্টির তত্ত্বাবধানে হত। এই সব পরিচয় দেবার মত বলেই না দিয়ে পারলাম না। রাজা জমীদারদের এই রকম বহুবিধ ক্রিয়া ও উৎসবানুষ্ঠানের অপূর্ব্ব পরিচয় পেয়ে এসেছিলাম।

এঁরাই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্টি-ঐতিহ্যের বাহক এবং শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ের ও সঙ্গীতজ্ঞদের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক এবং সব বিষয়ে

অভিজ্ঞ। এখন শাসনযন্ত্র যাঁরা পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে বোধ হয় একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের মত শ্রেষ্ঠ শিল্প ও আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে বুঝবার মত শক্তি সামর্থ্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শাস্ত্রীয়-সংগীত পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে বহুদিন আগে থাকতেই কিন্তু প্রধানদের মধ্যে কেউই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে জানা যায় না, যাঁরাই আসেন। এজন্য শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের অর্ণবপোত একরকম কর্ণধার হীন হয়েই চলেছে দাঁড়বাহীদেরই আপ্রাণ চেষ্টায়। এই রকমভাবে সঙ্গীতের রত্নসম্ভার নিয়ে দাঁড়বাহীরা কতদিন তাকে রক্ষা করে যাবেন জানি না। তা-ও আবার দাঁড়বাহীদের মধ্যে অনেকেরই হাত শক্ত নয় এবং ঠিক পথে পরিচালনা করবার মত আগ্রহের ~~অভাবের~~ অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিও তেমন থাকে না। তাই অর্ণবপোত ঠিক লক্ষ্যে চলছে না, তাকে যেন টানছে ক্যানেলের দিকেই বেশী।

সুতরাং ভবিষ্যতের কথা খুবই ভাবতে হয়, যদিও ভেবে কিছু করবার নেই। চর্চ্চা এখন খুবই বেড়েছে সত্য কিন্তু চর্চ্চারত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি প্রকৃত গুরুর কাছে শিক্ষা এবং তার সংগে নিষ্ঠা, ভক্তি, দর্শনের চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাব থাকে তবেই এই এত বড় শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন। যে কোন বিদ্যার অদর্শ-ধর্ম-দর্শনচিন্তা রেখে তার উদ্দেশ্যের স্বরূপকে জ্ঞানগত করে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে তবেই সেই বিদ্যা কল্যাণরূপে আমাদের অন্তরকে ভরিয়ে তুলবে।

ঠাকুর রাজবংশে এবং তখনকার গুণী ও বিশিষ্ট শ্রোতাদের কাছে সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ নীতিধারা কিরূপ পছন্দের উপর ছিল তার একটু পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক মনে করলাম।

শুনেছি এবং দেখেছি ওঁরা রাগরূপকে নিয়ে খুব বেশী দ্রুত তৈরীর কাজ পছন্দ করতেন না। খেয়াল গানের ভাবকে ধরে তার মত রসলালিত্যের উপর তানাদি অলংকার প্রয়োগই বেশী পছন্দ করতেন। মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ও রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই এঁরা দু' ভাই তখনকার সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার কণ্ট্রোল বোর্ডের অধিকর্ত্তার মত ছিলেন। তখন এঁদের দরবারে এবং সহরের অন্য স্থানে যে সমস্ত গুণী গায়ক-বাদক ছিলেন এবং বহিরাগত হয়ে আসতেন তাঁদের সকলের মধ্যেই ছিল সমন্বয় নিয়ে রাগরূপের অঙ্কন নীতি-ধারা প্রাচীন ধ্রুপদ গানে যেরূপ আছে তাকে অনুসরণ করে—আমাদের ঘরাণার মত।

এই সমন্বয়ের বিশুদ্ধধারা যদি অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে এঁরা দেখতেন ব্যাহত হয়েছে তাহলে ঘোরতর আপত্তির কারণ হত। কারণ তাঁরা বিচারবোধ রেখে এই মনে করতেন প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যেই রাগ রূপের বিশুদ্ধ পরিচয় প্রামাণিকভাবে আছে, সুতরাং তার পরিবর্তনে ক্ষতি হতে পারে। নূতনের উপর উচ্ছ্বাস আকর্ষণে আসল রূপের পরিচয় লুপ্ত হয়ে যায়। ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি এইসব যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে তাঁদের যুক্তিবদ্ধ নীতি-বিজ্ঞান ও আদর্শকে শ্রদ্ধার সহিত মেনে নিতেন।

মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুরের কাছে থাকার সময় ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর কোলকাতায় এসে উক্ত মহারাজার এমারেল্ড বাওয়ারে অবস্থান করেন।

একদিন ঠাকুর মহারাজ তাঁর প্রাসাদে বিপুল আয়োজনের মাধ্যমে নিজাম বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা জানান। তার অনুষ্ঠান সূচীতে গান-বাজনার ব্যবস্থা ছিল। তখন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব কনফারেন্সে আহুত হয়ে এসেছিলেন। এঁদেরকে ঐদিন আহ্বান করেছিলেন উপযুক্তভাবে। সেই আসরের ষ্টেজে আমার গান ও সেতার এবং আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের বেহালা বাদন হয়েছিল। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গান হবার মত সময় রইল না, বিবিধ আরো অনুষ্ঠান থাকার জন্য। পরের দিন ঠাকুররাজ বলেছিলেন—তোমার গান ও সেতার শুনে নিজাম বাহাদুর খুব প্রশংসা করে গেছেন।" সেদিন নিজামও তেমন প্রকৃতস্থ ছিলেন না, তবে গোয়ালীয়রের মত অতটা হয়ে পড়েন নি। যাই হোক এঁদের কাছে প্রশংসা লাভ খুবই উৎসাহ জনক।

একদিন পৃথকভাবে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে আহ্বান করে মহারাজা সন্ধ্যায় গান শুনলেন। আমাকে উপস্থিত থাকবার জন্য বিশেষ করে বলেছিলেন। আমি মহারাজকে বলেছিলাম— খাঁ সাহেবকে যদি দু' একটা রাগের নীতি-নিয়ম ও পার্থক্য সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রশ্ন করি তাহলে তা অনুচিত হবে কি? উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন— নিশ্চয়ই করবে।

গান শুনার ব্যবস্থা দেখে আমার মন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কারণ—গিয়ে দেখি মহারাজ, প্রণবেশ সিংহ এবং মহারাজের ভাগ্নে সোফায় বসে আছেন, আর খাঁ সাহেব ও তাঁর হার্মোনীয়ম ও তব্‌লা বাদক পায়ের তলার নীচে কার্পেটের উপর উপবিষ্ট। মনে মনে

করলাম এঁরা ত বিকিয়ে দিয়ে এসেছেন আত্মমর্য্যাদা ও তার সংগে সঙ্গীতেরও, কিন্তু এঁরা কি করে সঙ্গীতের এত বড় শিল্পীদের প্রতি এইরূপ সৌজন্যহীনতা দেখাতে পারলেন? মানবতা বিসর্জ্জন দিয়ে ধনের গর্ব ও প্রভুত্বের মধ্যেই কি এঁরা আনন্দ পান? খাঁ সাহেব তাঁর অধীনস্থ গায়ক হলেও না হয় এই অন্যায় তিনি করতে পারতেন কিন্তু বরদার মত অত বড় মহারাজার এত বড় গায়ককে সম্মান দিয়ে নিজেরা নীচে বসে গান শুনে সেই কর্ত্তব্যটুকু পালন করতেও পারলেন না। সত্যই এঁরা আমাদের ব্যক্তিত্বকে যেভাবে দেখে এসেছেন তাতে এঁদেরকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু আসে না। কি করব! খাঁ সাহেবের পক্ষে এটা অতি সহজ হলেও আমাকে খুবই অনিচ্ছাসত্বে বসতেই হল— সেখানে আর বিপ্লব আনতে পারলাম না, কারণ আমার ব্যক্তিগত নয়, আর জানি খাঁ সাহেবদের তাতে আত্মচেতনা আসবে না। যাই হোক্— কল্যাণ রাগে গান শুরু করলেন—তবে সে রকম মেজাজ নিয়ে নয়। প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের মত দৃশ্যরূপ থাকলে সেখানে কোন রকমেই মেজাজ (Mood) আসতে পারে না। কল্যাণ রাগ গাওয়ার পর খাঁ সাহেবকে দু' চারটি বিষয় রাগরূপ সম্বন্ধে প্রশ্নচ্ছলে জানতে চাইলাম কিন্তু তিনি যা উত্তর দিলেন তাতে আশ্চর্য্য হলাম, মহারাজও বিস্মিত হলেন। আপত্তি জানাতে খাঁ সাহেব একটু আমতা আমতা করলেন। মহারাজও তা বুঝতে পেরে ইসারায় চোখটিপে এই প্রসঙ্গ চাপা দিতে বললেন।

তারপর খাঁ সাহেব গাইলেন জয়জয়ন্তী রাগের একটি খেয়াল। তারপরই শেষ। আমি খাঁ সাহেবকে খুব সম্বর্দ্ধনা ও প্রশংসা জানিয়ে বললাম—এখন ত দু' চারদিন আছেন যদি আমার বাসায় একদিন যান তাহলে আমি তারমত ব্যবস্থা করব এবং খুব আনন্দিত হব। খাঁ সাহেব বললেন—জরুর যায়েঙ্গে, কব্ কহিয়ে।' একটি বাঙালী চেলা বলে উঠল—আমি গিয়ে খাঁ সাহেবের সুবিধা মত সময় জানিয়ে আসব। পরে শুনেছিলাম তারই মন্ত্র প্রদানের জন্য খাঁ সাহেব আসতে পারলেন না, মনে হয় মন্ত্রদাতা আরো ছিল।

ওই সময় আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁর পুত্র আলি আকবরকে সংগে নিয়ে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমি আহ্বান করেছিলাম। অনেক রাত পর্য্যন্ত গান বাজনা হয়েছিল, প্রথমে আমার তারপর পিতা পুত্রের। তাঁদের আহারাদির জন্য উপরের ঘরে

নিয়ে গেলাম। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম— ঠাকুর মহারাজ আমার সাক্ষাতে সেদিনের জন্য আপনাকে একশ' এবং ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে দেড়শ' টাকা দেবার জন্য কোলকাতায় কন্‌ফারেন্সের প্রধান ও প্রথম উদ্যোক্তা প্রণবেশ সিংহকে দিয়েছেন। আপনি পেয়েছেন তো? আলাউদ্দীন সাহেব বললেন—কৈ না—একশ' টাকা তো পাইনি, মাত্র পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি।" শুনে আমি অবাক, পরের দিন সকালে উঠেই মহারাজার কাছে গিয়ে তাঁকে ওই কথা বললাম—তিনি সংগে সংগে প্রণবেশকে ফোন করলেন। প্রণবেশ বল্‌ল বাকী টাকাটা এক্ষণি আলাউদ্দীন সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সংগে দেখা হতে হাত দুটো ধরে বললেন—আপনার জন্যই আমার পঞ্চাশ টাকা আদায় হল—আপনি কথা না তুললে তারই হয়ে যেত, ছি-ছি-ছি এই রকম প্রবৃত্তির লোক সঙ্গীতের কন্‌ফারেন্স করছে!"

তারপর বললেন—শুনলাম, আপনাকে না কি কন্‌ফারেন্সে আহ্বান করা হয়নি। বিষ্ণুপুরের ঘরাণাই বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচার ও বিস্তৃতি ঘটিয়েছে, আপনি তার একজন বড় প্রতিনিধি তাছাড়া বাংলা দেশে আপনাদের মত গুরুস্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞদের বাদ দিয়ে এখানে সঙ্গীতের কোন বড়রকমের আসর হতে পারে—এ ভাবাই যায় না, অত্যন্ত লজ্জার কথা।" আমি বললাম ভাতখণ্ডেজী, নবাব আলি সাহেব, শিবেনবাবু, রায় উমা নাথ বালি' প্রভৃতির মত ব্যক্তি যদি এখানে থাকত তাহলে বিচার ও কর্ত্তব্যবোধের অভাব হত না। ওই সব ব্যক্তি যে সব স্থানে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন' করেছিলেন সেখানের সঙ্গীতজ্ঞদের সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে সমাদরে আহ্বান করেছিলেন এবং অনুষ্ঠান-সূচীতে তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

এবার ঠাকুর রাজ বাড়ীতে থাকার সময় যে এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল তার খবরটুকু দিয়ে এখানে উনিশ বছর থাকার আরো বহু অভিজ্ঞতার বিষয় বাদ রেখে শেষ করব।

মহারাজার একজন ছিলেন মাণিকতলা ষ্ট্রীটে খুব ব্যয়-বাহুল্যের উপর। এঁকে একজন প্রবীন সঙ্গীতজ্ঞ গান শেখাতেন। তিনি মারা যেতে গান শেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহারাজকে খুব তাগিদ দিয়ে সেই তিনি বললেন ওগো তুমি আমার গান শেখার মাষ্টার শীগ্‌গীর ঠিক করে দাও— আমাকে ভাল করে শিখতেই হবে।"

এই কথা মহারাজা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী শরৎবাবুকে জানিয়ে বলেন কি করা যায় বলুন দেখি—কাকে বলি,—কে এমন পছন্দ মত লোক আছে? গোপন ব্যাপার বিশ্বস্ত লোক দরকার। শরৎবাবু আমার নাম করাতে, মহারাজা চমকে বলে উঠেন—চুপ করুন, চাকররা শুনতে পেয়ে যদি সত্যর কাণে তুলে দেয় তাহলে আপনার অপমানের অন্ত থাকবে না। তাকে আপনি শুধু গায়কগোষ্ঠীর লোক মনে করবেন না, আমি অনেক চেষ্টা করেছি মনের মত করে আনতে, গেলাস নিজে হাতে দিতে গেছি, এক টেবিলে বসে খাওয়াতে চেষ্টা করেছি কিন্তু একটুও টলাতে পারিনি, ভীষণ ব্যক্তিত্ব রক্ষাকারী এবং সর্বদা মর্য্যাদা রক্ষায় সচেতন, এই মস্ত গুণ থাকার জন্য আমি অন্দরের ভেতর বধূমাতাকে শিক্ষা দেওয়ার ভার দিয়েছি। বধূমাতা ওকে প্রণাম করে এবং অন্যেরা শ্রদ্ধা করে, আজ পর্য্যন্ত ওই জিনিস আমাদের বাড়ীর কারো কাছ থেকে এই রকম পদের কেউ পায়নি।” এ সব কথা শুনেও শরৎবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা আমি একবার সত্যবাবুর সংগে কথা বলে দেখি টাকার অংক খুব বেশী দেখিয়ে।” মহারাজ আঁৎকে উঠে বলেছিলেন—অমন কাজ করবেন না, কেউটে সাপের পেছনে টান দেওয়া হবে—আপনি ও আমি দু'জনেই কামড় খাব।”

মহারাজার টাইপিষ্ট ছিল হরিচরণ নামে এক যুবক, সে আমার পাশের ঘরেই থাকত, আমাকে নিজের দাদার মত মনে করে' ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাত, সে, ওই দিন আমার কথা উঠতেই পাশের ঘরের দরজাটা অল্প ফাঁক করে খুব কাণ পেতে শুনে, তারপর নেমে এসে আমাকে এই পরিচয় খুব হাসতে হাসতে দেয়, আমিও শুনে খুব হেসেছিলাম এবং সেই সঙ্গে মহারাজার মন্তব্যে খুব আনন্দও এসেছিল।

এই রাজবাড়ীতে উনিশ বছর ছিলাম। এখানে বাৎসরিক পাওনা অনেককিছু ছিল। যেমন,—চৈত্র সংক্রান্তিতে পেতলের কলসী ও গামছা, মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহনের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে কাঁসার থালায় চালভর্ত্তি ও ভাল কাপড়, তাঁর স্ত্রীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে থালা ও কাপড়, নব-বর্ষে আটটা খুব বড় আকারের রাজভোগ ও আটটা মনোহরা সন্দেশ, ৺পূজার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া সোনার ও রূপোর চাঁপা চারটে করে। আমার মেয়েদের মহাষ্টমীর দিনে এবং ৺কালীপূজায় মহারাণী কুমারীপূজা করতেন, তাতে পাওনা থাকত, একটি কাঁসার থালা, চারটি বাটি, একটি গেলাস, একটি শাড়ী, থালাভর্ত্তি সন্দেশ, আতর, গন্ধ তেল, সাবান, চিরুণী, তোওয়ালে,

ব্রাউজ ইত্যাদি ও টাকা॥

(৬৯)

আর এক নূতন বাসায়,—

কোলকাতায় তৃতীয়বার বাসা পাল্টালাম, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে। এখানে থাকার সময় বেশ একটা বলবার মত পরিচয় আছে। আমার ওই বাসাবাড়ীর সামনেই থাকতেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক প্রভাসচন্দ্র নন্দী (এল, এম, এস—মেডিক্যাল কলেজ)। এইখানে আসার পর বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর সংগে কোন পরিচয় ছিল না। তারপর একদিন চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর কাছে যেতেই খুব সমাদরে আমাকে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললেন—আগে আমার বিপদের. কথা শুনাব তারপর আপনার অসুখের কথা শুনব। আপনি যখন যন্ত্রপাতি নিয়ে এই বাসায় উঠলেন—তখন আমি বেশ ভয় পেয়ে মনে করেছিলাম—এবার আমাকে দারুণ মুস্কিলে পড়তে হবে। সত্যই তাই হল—আপনার ওস্তাদি গান ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হতে লাগল। আপনি যখন আমার চেম্বারের সামনে আপনার বৈঠকখানায় লম্বা ডাণ্ডির যন্ত্রটা হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিসব সাঁইয়া-মাইয়া বলে আ-আ করতেন, আবার যেদিন ওই আ-আ-র সংগে ধপাধপ্ চামড়ার আওয়াজ হত তখন আমার যে কি অবস্থা হত তা বোধ হয় ভগবানেরও সাধ্য ছিল না বুঝবার। কেবলই মনে হতে লাগল কি করি! কি করে এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাই! পুলিসে খবর দিলেও কোন ফল হবে না—কারণ রাত দশটার বেশী এই উপদ্রব চলত না। নিজের বাড়ী ছেড়ে কোথায় বা যাব ইত্যাদি চিন্তায় আমাকে যেন পাগল করে তুলতে লাগল।

অধৈর্য্যের উপর আপনাকে উদ্দেশ্য করে যে সব কথা বেরিয়ে আসত তা সাক্ষাতে বলা চলে না। কোন দিকেই উপায় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে ঠাণ্ডা মাথায় এই সিদ্ধান্তে এলাম, মনের কাঁটা সুরের কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে। অর্থাৎ এই বাড়ীতেই যখন টিকে থাকতে হবে তখন তান্ত্রীকদের শ্মশানে সবের উপর বসে সাধনার মত একাগ্র হয়ে এর ভেতর কি আছে তা দেখতে হবে,—সুতরাং ঠিক করলাম, আপনি যখন গান সাধতে বসবেন সেই সময় আপনার গানের কুইনাইন মিকশ্চার এই যন্ত্রণার রোগ সারাবার

জন্ম কাণের গলায় প্রবেশ করাবার চেষ্টা করব। সেইদিন থেকে গান ধরলেই জানালার ধারে চেয়ারের উপর বসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শুনতে লাগলাম। তারপর খুব মনযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে বিচার করতে লাগলাম— আমাদের কণ্ঠনালী তো এইটুকু—তার সাহায্যে গলায় এত রকম কি করে আসছে,—উঠছে, নামছে, ছুটছে, লুফালুফি করছে—খুব আশ্চর্য্য তো!

আমি তো কথা কইতে, জোরে হাসতে ও কাঁদতে ছাড়া আর কিছু পারিনা, তাহলে সত্যই এ এক খুব সাধনার জিনিষ। এই বিচারবোধের মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ শুনার আগ্রহ বাড়তে লাগল। বিস্ময় সহকারে উপলব্ধি করতে লাগলাম—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষটা গেয়ে যাচ্ছে সুরকে নিয়ে কত রকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে-উঠা-নামা করে, যেন কণ্ঠনালীর কাছে বিরাট একটা সুরের কারখানা সৃষ্টি করে ফেলেছে। এখনও আমি এইভাবেই বিচারের উপর আকর্ষণ রেখে গান হলেই অবাক হয়ে শুনি। রাগ, তাল, মান, ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে তার কিছুমাত্র ধারণা যে আমার নেই তা হাড়েহাড়েই বুঝছেন, তবে এটুকু এখন বুঝতে পারছি যে গানে সুরের এই রকম লীলা-খেলা নেই সেগুলো রাস্তা-ঘাটের গান,—গলা থাকলেই গাওয়া যায়। তাই এখন এও বেশ বুঝতে পারি—ওই সোজা গানগুলোর শিক্ষা-সাধনার কোন দরকার হয় না। সত্যই এখন আমি খুব আনন্দিত যে, আপনি এখানে আসায় এই এতবড় একটা বিষয়ের পরিচয় জ্ঞানে খুব উপকার হয়েছে. সুতরাং এ বিষয়ে আপনাকে আমি গুরু বলে স্বীকার করছি।

একটা কথা আপনাকে আমার বলবার আছে—আপনাদের এই গান কি আমাদের মাতৃভাষায় হয় না? হলে কিন্তু আমাকে এত বিব্রত হতে হত না। আমাদের মত অবুঝ লোকেদের জন্য এই গান মাতৃভাষায় গাওয়া যদি সম্ভব হয় তাহলে তার চেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহ রাখা উচিত মনে করি। আপনাদের গানগুলো যে ভাষায় রচনা হয়েছে সেগুলো তো সেখানকার সেই ভাষাতেই হয়েছে,— তাদের ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষায় তো হয়নি, সুতরাং আপনারাই বা সকলের জন্য নিজের ভাষায় তৈরী করে গাইবেন না কেন? ওদের দেশের রাগ-রাগিনী নেওয়া চলবে না এমন কোন বাধা আছে কি?

আমি বললাম—আপনার শেষের মন্তব্য খুবই সঙ্গত। রাগরূপের একচেটিয়া অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। বহুকাল ধরে হিন্দী ভাষার

উপর শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেণীগত গান নির্ভর করে এসেছে বলে এবং শিক্ষা-সাধনায় তাই থেকে এসেছে বলেই একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে। তা থেকে মুক্ত হবার জন্য কর্তব্য রেখে মন তৈরী করা সত্যই একান্ত আবশ্যক নিজের ভাষায় গাইবার জন্য। নির্দিষ্ট কোন ভাষার উপর শাস্ত্রীয়-সংগীত নির্ভর করে থাকবে এটা কোন যুক্তির কথা নয়।

তারপর বললাম—আপনার প্রথম বক্তব্যটি যেমনি মুখরোচক তেমনি হাস্যরসে পূর্ণ এবং বহুলোকের শিক্ষাপ্রদ। রাগ-সংগীত আপনার কাছে ভীষণ বিভীষিকার মত হয়েছিল বলে উপায় নিরূপণের দ্বারা একান্ত ধৈর্য্য নিয়ে এই পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাই আপনার বুদ্ধিদীপ্ত মন সাধনার আসল বস্তুকেই ধরে ফেলেছে। যাঁরা শাস্ত্রীয়সংগীত বুঝেন না তাঁরা যদি আপনার মত জ্ঞান, বুদ্ধি নিয়ে বিচার করে কণ্ঠ সাধনার শক্তির দিকটার প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্য্য সহকারে শুনেন তাহলেও তাঁদের যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু তা না করে ওস্তাদি গান হচ্ছে! ওরে বাবারে বলে বাঘের সামনে পড়ার অবস্থার সৃষ্টি করেন। আবার দেখা যায় আসরে গিয়ে মজা দেখবার জন্য বসে আসরের সম্ভ্রম ও শিল্পীর প্রতি সম্মান রক্ষা না করে গান-বাজনার সময় গল্প জুড়েদেন, সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, আবার কেউ বা উঠে পড়েন। সে সময় মনে হয় এঁরা জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভদ্রতাবোধের বাইরের মানুষ। ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন—আমি কিন্তু এখন ওই দলভুক্ত নই।

আমি বললাম আপনি এখন একজন প্রকৃত বিচারক। তারপর ওষুধ নিয়ে জানিয়ে এলাম— এই বাস্তব ঘটনার পরিস্থিতির বিবরণটি খুবই চমকপ্রদ এবং লোকের কাছে বলার মত মূল্যবান॥

(৭০)

১৯৩০ সালে ওই বাসা পাল্টে উঠে এলাম খুব নিকটেই একটি নূতন তিনতালা বাড়ীতে। বাড়ীর মালিকের বাড়ী রাস্তার উপরে ছিল। তারই পশ্চাতে চতুর্দিক খোলা ওই তিনতালা বাড়ীটি তৈরি হয়েছিল। নূতন বাড়ীতে উঠে আসার সময় ডাঃ প্রভাসবাবু বললেন—আরো কিছুকাল আপনার এই বাসায় থাকা হলে সংগীতের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যার উপর আরো

কিছু হয়ত বোধশক্তি লাভ করতাম, জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা দু' চারটে রাগকেও হয়ত চিনতে পারতাম এবং সমঝদার শ্রেণীর পর্য্যায়ে স্থান পেয়ে যেতাম।"

নূতন গৃহটির মালিক যিনি তিনি ছিলেন সুবর্ণবণিক এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত, আধুনিক রুচি সম্পন্ন, ব্যবসায়ী ধনী ও উচ্চমনা রূপে পরিচিত। সঙ্গীতও ভালবাসতেন। আমাকে অত্যন্ত বন্ধুভাবে দেখতেন ও তার সংগে সম্মান দিতেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর বাড়ী ছেড়ে শ্যামবাজার অঞ্চলে চলে আসার পরও আমাদের বন্ধুত্ব ও ঘরোওয়া ভাব অব্যাহত ছিল। তাঁর বাড়ী ছাড়ার কারণ হল—ওই বাড়ীটির তিনতালায় থাকতেন ঠাকুর মহারাজের পুত্র অর্থাৎ মহারাজ কুমারের গৃহশিক্ষক। কুমার বাহাদুরই তাঁর হাত খরচ থেকে ভাড়ার টাকাটা দিতেন তিরিশ টাকা করে। আমি দিতাম পঞ্চাশ টাকা। কুমার বাহাদুরের ব্যয় বাহুল্যতা হেতু ভাড়ার টাকা দিতে সক্ষম না হওয়ায় মাষ্টার তারাচরণ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্রে খুব কম ভাড়ায় চলে যায়। অপরিচিত অন্য কাউকেই রাখতে পারব না, সুতরাং অত বড় বাড়ীকে ফাঁকা রেখে শুধু শুধু আশী টাকা করে ভাড়া দেওয়া নিরর্থক ভেবে বাড়ীর মালিক জানকীবাবুকে জানালাম আমি বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি, তিনি শুনে বলেন,—আপনি চলে যাবেন না, আমাকে মোট পঞ্চাশ টাকা করে মাসে দেবেন।" তাঁর ক্ষতি করা আমি পছন্দ করলাম না, উঠে এলাম।

ওখানে থাকার সময় জানকীবাবু দার্জ্জিলিংএ তাঁর 'হিল চার্ম' বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গিয়ে অতি যত্নের সহিত এক মাস রেখেছিলেন। আর একবার নিয়ে গেছলেন শিলং-এ, সেখানে ১০/১২ দিন থেকে চেরাপুঞ্জি ইত্যাদি দেখে ফেরার পথে গৌহাটিতে নেমে ৺কামাক্ষ্যামাতাকে দর্শন ও পূজাদি করে এসেছিলাম। পাহাড়ের উপর কামাক্ষ্যা দেবীর মন্দির, গুহার মধ্যে যোনীপীঠ, বহির্ভাগে বসবাসকারীদের গৃহাদি এবং আরো নানান স্বভাব সুন্দর দৃশ্য খুবই মুগ্ধকর হয়েছিল। এখানের পাণ্ডাদের ব্যবহার অতি সুন্দর—এমনটি কোন তীর্থ স্থানে আমি দেখিনি এবং অনেক তীর্থস্থানে গেছি কিন্তু এখানের মত এমনভাবে কোথাও মনকে আকর্ষিত করেনি।

এই তিন জায়গায় আমার পরিচয় পেয়ে স্থানীয়রা গানের আসর করেছিলেন, এর মধ্যে বড় আকারে হয়েছিল দার্জিলিংএ।

কোলকাতার এই বাড়ীতেই, ভাইপো, ভাগনে, বড় শালাকে মানুষ করে তুলেছিলাম। তার সংগে আরো অনেককেই প্রতিপালন করতে হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে।

রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ যখন ই, আই, রেলওয়ের এ, টি, এস পদে থেকে লিলুয়ার কোয়ার্টার্সে ছিলেন তখন তাঁর মেয়েকে শেখাতাম, তারপর ডি. এস হয়ে আসানসোলে গিয়ে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ সহকারে সপ্তাহে একদিন করে তাঁর মেয়েকে শিখাবার জন্য জানান।

আমি বড় শালাটির কথা ভেবে চিন্তা করে দেখলাম যদি ঘোষসাহেব একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন তাহলে শারীরিক কষ্ট ও অর্থের ক্ষতি স্বীকার করে আসানসোলে যাওয়া লাভজনকই হবে। শেখাতে যেতে লাগলাম; কয়েক মাস পরে ঘোষসাহেব বদলী হয়ে মোরাদাবাদে চলে গেলেন। সেখান থেকে খুব শীগ্‌গীরই সি, ও, পি, এস, হয়ে হাওড়ায় এসেই আমাকে তাঁর সংগে দেখা করার জন্য লোক পাঠান। তাঁর কথামত বড় শালার টিকিট কালেক্টার পদের জন্য দরখাস্ত হল এবং কাজে বাহালও হয়ে গেল। আমার শ্বশুর বাড়ীর দায়িত্ব অনেকটা হাল্‌কা হল। আমার বিবাহের দু' বছরের মধ্যে শ্বশুর মারা যান, বড় শালা তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারল না। তার নীচে তখন দু'টি ভাই ও একটি ভগিনী। সেই শালিটির বিবাহের দায় দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়েছিল।

এই রকমভাবে দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে অনেকের জন্যই দীর্ঘকাল ধরে নিতে হয়েছিল,—কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মকেই বড় ভেবে এসে। ভাগনেটি যখন মা হারা হয়ে আসে তখন তার বয়স আট। স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিই। ক্রমশঃ ম্যাট্রিক পাশ করে এবং গানে ও সেতারে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠে। তখন যে কোন সংগীত প্রতিযোগিতার গানে ও সেতারে প্রথম স্থান অধিকার করত, জন্মগত সংগীতের প্রতিভা বেশ ভাল ছিল। বছর খানেক লালগোলার রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাকে গায়করূপে রেখেছিলেন লালগোলার প্রায় তিরিশ বছর আগে। তারপর থেকে মেদনীপুরে স্থায়ীভাবে আছে।

এখনকার পরিচিত সেতারবাদক ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র নাগ এক সময় আমার ওই বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটের বাসায় কিছুদিন থেকে আমার কাছে শিক্ষা করেছিল।

গোকুলচন্দ্র প্রথম থেকেই তার নিজ দেশ বাঁকুড়া থেকে বিষ্ণুপুরে এসে বড় কাকার কাছে শিখত। আমার বাড়ীতে থাকায় কোন কোন সময়

গোকুল শিখতে এসে বড় কাকার অনুপস্থিতিতে আমার কাছেই শিখে নিত। কোলকাতায় তখন বিশেষ করে এই বাসায় থাকার সময় যে সব বহিরাগত সঙ্গীতজ্ঞরা প্রথম আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার কাছে আসা যাওয়া করতেন এবং ওখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের নাম করা ছাত্র হংসরাজজী কোলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছে নিয়ে কোলকাতায় এসে আমার ওই বাসায় যেদিন প্রথম আসেন কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী গুজরাঠীদের সংগে করে সেদিন আমার গান-বাজনা শুনে বলেছিলেন—আপনি সঙ্গীতে বাংলার 'চাইনিজ-ওয়াল'। এই রকমভাবে ভগবানের আশীর্ব্বাদে বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে নিজ গৃহেও আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। এখন ওই রকম আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে।

১৯৩০ সালের পর থেকে যে সব 'নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে' আহুত হয়ে ধ্রুপদ, খেয়াল ও সেতার পরিবেশন করে এসেছিলাম তার স্থান সমূহের নাম, মজঃফরপুর, কাশী ও এলাহাবাদ। পরে আর এ রকম সম্মেলন কোথাও হয়নি, যা হয় তা নামে জলসা মাত্র। উক্ত সনের পর থেকে যাঁরা আমার কাছে শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাঁদের নাম তাঁরা হলেন ইলা পাল চৌধুরী (ভূতপূর্ব এম্-পি)। ছাতুবাবুর বাড়ীর শচীনদেবের স্ত্রী ও ভগিনী, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুরের পুত্রবধূরা, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সহ অধ্যক্ষ ডক্টর নন্দলাল কুণ্ডু, ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুরের নাতি ও নাতনীরা—ইত্যাদি।

বিষ্ণুপুরের নীলমণি সিংহ নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের সন্তান আমার কাছে কোলকাতায় থেকে বহুদিন ধরে শিক্ষা নিয়ে আজ প্রায় ২৫ বছর হিজ্‌লী হাই স্কুলের (খড়্গপুর) সঙ্গীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়ে আছেন।

ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় নামে একটি আমার ছাত্র নৈহাটীতে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বহু ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়ে আসছেন। এই রকম ভাবে আরো কয়েকটি আমার ছাত্র নানান স্থানে শিক্ষকতা করতেন। তাঁদের বহুদিন আর কোন সংবাদ পাইনি।

১৯৩৮ সালে পাবনায় শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সেখানের পরিচালক মণ্ডলীর আয়োজনে বড় রকমের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

উক্ত মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি এসে নিয়ে যাবার জন্য যাঁদের ব্যবস্থা করে যান তাঁদের মধ্যে আমি ছিলাম, আর ছিলেন—আমার গুরু মেজকাকা, শরোদবাদক—আমীর খাঁ, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব, পাখোওয়াজী কেবলবাবু ও একজন তব্‌লা বাদক। বহু শ্রোতার উপস্থিতিতে খুব জমজমাটের সহিত গান বাজনার আসর হয়েছিল।

১৯৪০ সালে, আমাকে এবং ধ্রুপদ গায়ক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও এক হিন্দুস্থানী ভাল পাখোওয়াজীকে নিয়ে গেছলেন চট্টগ্রামের আর্য্য সঙ্গীত-পীঠের প্রধান শিক্ষক। সেখানে দু'দিন ধরে গানের আসর হয়েছিল। প্রত্যেক দিনই সাত-আট শ' ক'রে লোকের সমাগম হয়েছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা যে রকম প্রকৃত শ্রোতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন তাতে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। এখানের শিক্ষকরা আমার কাকাদের গ্রন্থ থেকেই ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি শিখিয়ে এসেছিলেন। দুই দিনই এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদ খেয়াল পরিবেশন অতিশয় উপভোগ্য হয়েছিল। শিক্ষকরা কেউই তেমন শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু নিজদের প্রতিভায় ও আদর্শের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা রেখে চমৎকার শিখিয়ে এসেছিলেন। এখানের সকলের কাছে যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা পেয়েছিলাম সে জিনিস ভুলবার নয়।

পরের বছর এঁরা বিপুল আকারে বাংলার সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়ে সঙ্গীত সম্মেলন করেছিলেন। দেখেছি পশ্চিমমুখী এঁদের মন ছিল না, তাঁরা সব কিছুর প্রয়োজনে বাংলার সঙ্গীতজ্ঞদেরই কেবল রেখেছিলেন মনের মণিকোঠায়। চট্টগ্রামের মানুষ কিনা তাই বিচার বোধে ভেজাল ছিল না।

এই সম্মেলনে আমি গেছলাম এবং আর যাঁরা যোগদান করে-ছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, রমেশচন্দ্র, তারাপদ চক্রবর্ত্তী, বেহালাবাদক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বেতার কেন্দ্রের নৃপেণ মজুমদার প্রভৃতি এবং ঢাকার কয়েকজন গায়ক-বাদক। এই আসরে আমার একদিন ধ্রুপদ, এবং আর একদিন খেয়াল গান হয়েছিল।

সে যুগে আমার যে সব ছাত্র-ছাত্রী বেশ নাম করেছিল তাদের মধ্যে আইভি বন্দ্যোপাধ্যায়—(চক্রবর্ত্তী) উমাশঙ্কর (বেতার শিল্পী ছিল); বেতার-কেন্দ্রের গায়িকা অঞ্জলি, গীতা, সুপ্রভা; এরা সকলেই খেয়াল গানে,

বীরেন মুখোপাধ্যায় এসরাজে, (বেতার শিল্পী ছিল); বেতার কেন্দ্রের গোউর গোস্বামীর দাদা ব্রজেশ্বর এবং মিহিকা মিত্র সেতারে। ধান্ত কুড়িয়ার জমীদার পুত্রবধূ খেয়াল গানে বেশ নাম করেছিলেন। সম্প্রতি-কালে—বেলজিয়মের অধিবাসী ফিলিপকালিস ধ্রুপদ ও আলাপে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে,—এখন দিল্লীতে বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্টের দূতাবাসের সহকর্মীর পদে নিযুক্ত।

১৯৪১ সালে বর্ত্তমানের এই বাসায় আসার পর যে সব ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পেয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে রেখাপণ্ডিত (বড়ুয়া) স্নিগ্ধা দাসগুপ্ত (সেন) খেয়াল গানে বেশ উন্নতি করে বেতারে স্থান পান।

১৯৫৯ সালে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তোগী হয়ে বিরাট আড়ম্বরের সহিত আমার জন্মদিন পালন উৎসবের প্রথম সূত্রপাত করেন। এই অনুষ্ঠানে মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহারাণী, ভূতপূর্ব ডেপুটি স্পীকার আশুতোষ মল্লিক, মন্ত্রী কমলকৃষ্ণ রায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জয়কৃষ্ণ সান্তাল (ধ্রুপদী), করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগদান করতেন। এর মধ্যে একবার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ হলে খুব আড়ম্বরের সহিত জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। তখনকার মেয়র বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি এবং কলেজ অধ্যক্ষ অনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথি হয়েছিলেন। সেদিনের এই অনুষ্ঠানে আমার গুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং আরো দু' চারজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাপতির ভাষণে মেয়র বিজয়বাবু আমার সম্বন্ধে বহু কথা বলে পরিশেষে বলেন আমি সর্বান্তঃকরণে কোলকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(৭১)

আমার একান্ত আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় এবং কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীর সহযোগিতায় কোলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে আমার সঙ্গীত-গুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছিল। এই বিরাট অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

হয়েছিলেন পাইকপাড়ার রাজা বিমলচন্দ্র সিংহ, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন নাটোরের মহারাজা, নির্দ্ধারিত দিনে সঙ্গীতাচার্য্যের দুই পার্শ্বে উপবেশন করেছিলেন এবং ভাষণ দিয়েছিলেন, মহারাজা নাটোর, রাজা বিমলচন্দ্র সিংহ, মেয়র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমীদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর বিশ্বপতি চৌধুরী, সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদরদাস খান্না প্রভৃতি। বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের, সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞদের এবং বহিরাগত গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগমে ইন্‌ষ্টিটিউট হলের নিম্ন ও উপরস্থল ভরে গেছল। প্রধান ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে সঙ্গীত নায়কের গুণাবলী ও অবদান বিষয়ের পরিচয় মানপত্রে রেখে সেটি সঙ্গীতাচার্য্যকে প্রদান করা হয় এবং তার সংগে দেওয়া হয় দুই সহস্র টাকার তোড়া এবং রেশম বস্ত্রাদি।

সভাশেষে নাটোর মহারাজ আমাকে বলেছিলেন— সঙ্গীতগুণীর এ রকম জয়ন্তী উৎসব আমার মনে হয় ভারতের কোন সঙ্গীতজ্ঞের হয়নি, আপনি খুব আদর্শ শিষ্যের কাজ করেছেন, এ রকম কই দেখিনি ও শুনিনি।

আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনাদের মত বড় বড় ব্যক্তিদের শাস্ত্রীয়-সংগীতের উপর যথেষ্ট বিচারবোধ থাকায় এবং তার ধারক-বাহকদের অবদান সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্বীকৃতি থাকায় এবং আমার এই প্রচেষ্টাকে সানন্দে স্বাগত জানানর জন্যই এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হল। আমি ধন্য হয়েছি।

(৭২)

ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন,—

ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন নাম দিয়ে কোলকাতায় যখন প্রথম বেতার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন হল, আমার যতদূর মনে আছে—তখন তার পরিচালক সমিতির প্রধান ব্যক্তিরূপে ছিলেন ষ্টেপলটন্ সাহেব। আর তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।

এই বেতার কেন্দ্রে ভারতীয় সংগীতের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা প্রথম

আমাকে দিয়েই আরম্ভ হয়। এই ব্যবস্থা করে দেওয়ার ভার ছিল মহারাজার উপর। প্রথম দিনে মহারাজা আমাকে সংগে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

কয়েক দিন যাবৎ নানাবিধ যন্ত্র এবং শ্রেণীগত গানের প্রোগ্রাম আমার নিজের পরিবেশনেই চালিয়ে আসতে হয়েছিল। তখন ষ্টুডিও হয়নি, কলকব্জার ঘরেই সংগীত হত। কাণে টেলিফোনের মত যন্ত্র দিয়ে শুনতে হত।

মহারাজা একদিন ডেকে বললেন—ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব তোমার গানে ও যন্ত্রে অদ্ভুত যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে আমাকে অনুরোধ সহকারে জানিয়েছেন যদি তুমি ভারতীয় সংগীতের প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ কর তাহলে শুনে খুব আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হবেন। তবে এই প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকা সম্বন্ধে অনেক কিছুর উপর নির্ভর করছে। তাহলেও মনে হয় টিকে থাকবেই এবং ক্রমশঃ বড় আকার নেবে এই আমাদের বিশ্বাস।

আমি মহারাজকে বললাম—স্থায়ী অস্থায়ীর কথা আমি ধরছি না। আমার অভিমত এই সব পদের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পদ গ্রহণ করলে সংগীত সাধনা আর থাকবে না এবং ঘরাণা নষ্ট হয়ে যাবে, —যার মত ক্ষতি আর আমার কাছে কিছু নেই। পদ মর্য্যাদা যত বড় ও যত লোভনীয়ই হোক না কেন সঙ্গীত সাধনায় ও শিক্ষা দানে যদি বিঘ্ন আসে তাহলে সে পদ আমার জন্য নয়।

মহারাজা খুব খুসী হয়ে বললেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ,—তোমরা হলে বাংলার সংগীত পীঠস্থানের প্রধান পূজারী, তোমাদের তার উপর পূজা-অর্ঘ যথাযথভাবে প্রদান করে যেতেই হবে সেই পীঠস্থানের ঐতিহ্য ও গৌরবকে রক্ষা করে যাবার জন্য।

আমি তোমার কাছে এতেও হেরে গেলাম বটে কিন্তু তুমি 'আসলে' জিতলেও এখন নকলটাই যে আসল সেই তাতেই হেরে রইলে। সেদিন সেখানে নলিনী সরকার ষ্ট্রীটে অবস্থিত মহারাজার ভাগ্নে উপস্থিত ছিলেন তিনি বললেন—ষ্টার থিয়েটারে পিয়ানো ও ফ্লুট বাজায় নৃপেন মজুমদার নামে এক ব্যক্তি। আমাদের বাড়ীতে সে প্রায়ই আসে,—ইংরেজী লেখা-পড়াতেও পাশ, সব দিক দিয়েই তুখোড় সে,—তাকে যদি ওই কাজের দায়িত্ব দাও তাহলে আমার মনে হয় সে ভালভাবেই তার ভার বহন করতে পারবে। মহিলা গায়িকা জোগাড় করতে হলে সেই পারবে—তাদের সংগে মেলামেশা তার যথেষ্ট আছে।

মহারাজা বললেন—তোমার এই লোকটির সংগে পরিচয়াদি আছে? আমি বললাম—মোটামুটি জানি—মৌখিক আলাপ তেমন নেই, তবে আমার মনে হয় এই ধরণের লোকই উপস্থিত সময়ে ওই পদের উপযোগী হবে।

মহারাজা আমার কথার উপর নির্ভর করে নৃপেনবাবুকেই ওই পদে বাহাল করে দিলেন।

খুব টিমে তালে প্রোগ্রাম কিছুকাল চলতে চলতে দ্রুত লয়ে এল। মহিলাদের গান সেই এক শ্রেণীর গায়িকাদের দিয়েই হত। কারণ আগে নারীদের সম্ভ্রম-মর্য্যাদার মন্দির উঁচু পাঁচির দিয়ে ঘেরা থাকত। যাই হোক্ সেই সময় বেতার কেন্দ্রে আমি যদি ওই পদ নিতাম তাহলে অনেক উঁচু স্তরে উঠে এখন অবসর গ্রহণ করতাম। তাহলে সেই পদে চার পায়ায় বসে চার পা' প্রাপ্ত হতাম। কত লোক তোষামোদের খোল-কুড়ো ঘাস দিত, আমি তাকাতাম অত্যন্ত কৃপার চক্ষে সিং নাড়ার ভঙ্গীতে, কারোর দিকে না তাকিয়ে পেন্টের দু' পাশের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বা চুরুট টানতে টানতে গেট্‌ম্যাট করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতাম—নীচে নামতাম, মুখে এক রকম বলতাম—ভিতরে এক রকম করতাম। তবে একটা বিষয়ে দোষ থাকত সঙ্গীত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খেতে পারতাম না। এবং [illegible] খেয়াল গানের সময় শেষ হবার মুখে তালের মাঝে বন্ধ করে দিয়ে অত বড় সঙ্গীতের এবং শিল্পীর অসম্মান করতে পারতাম না। এই দারুণ দোষের জন্য চাকরী কদিন টিকে থাকত তাতে অবশ্য সন্দেহ ছিল। যাই হোক্— ভগবান আমাকে ওই পথে যেতে যে মতি দেননি তার জন্য আমাকে অশেষ কৃপা করেছেন সব হারানর ক্ষতি থেকে।

(৭৩)

নিয়মিত শিল্পীরূপে,—

বেতার কেন্দ্রে সেই থেকেই আমার আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও সেতারের নিয়মিতভাবেই প্রোগ্রাম ছিল ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত। অবশ্য তার মধ্যে কয়েক বছর সেতার বাজান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

এবং গানের প্রোগ্রামও কয়েক মাস বন্ধ ছিল। তার কারণ জুরি সৃষ্টি হয়েছিল শ্রেণী নির্দ্ধারণের জন্য অডিশন দিতে নির্দ্দেশ এল বলে। উচ্চ শ্রেণীতে যারা থাকার সুযোগ পেয়ে বেশী টাকা পাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের প্রভাব-প্রতিপত্তি কেন্দ্র মধ্যে থাকায় নানান কৌশল করে তাঁদের অডিশন থেকে রেহাই দেওয়া হল। আমার সে সুযোগ ছিল না, এজন্য ওখানের দু'চার জন আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি বললেন—আপনি নির্ভীক মানুষ,—সদর দরজা দিয়ে ঢুকে যোগ্যস্থানে সহজেই আসতে পারবেন,— আপনার অডিশন ঠিক অডিশনের মত করেই হবে। অর্থাৎ আপনি শুধু ষ্টুডিওতে গান ও সেতার পরিবেশন করবেন,—জুরিরা উপর থেকে কেবল শুনবে, আপনার সম্মান ব্যাহত হবে না। আমরা সেইরূপ ব্যবস্থা করব। তাঁদের কথায় এবং নিজের তরফের অনেকের অনুরোধে রাজি হলাম।

অডিশন দেবার নিয়ম ফর্মে যে সব সর্ত্ত ছিল, তার ঘরে ঘরে পূরণ করে দিলেন আমার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাশীল শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। রাগ সংখ্যা জানানর ঘরে জ্ঞানচন্দ্র নিজেই লিখে দিলেন—সব রাগ জানা আছে।

অডিশন নেওয়ার প্রধান জুরি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর। সেই রতন জনকর। যাঁর কথা আগেই জানিয়েছি—লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে গিয়ে থাকার স্থানে পিতার সংগে এসেছিলেন আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে। আমি গান শুনাতে বলায় বলেছিলেন আপকো গানা শুননে পর ম্যায় ক্যা গাউঙ্গা,—আপকো পাস ম্যায় শিষ্য মাফিক হুঁ। সেই রতন জনকরের কাছে আমাকে অডিশন দিতে হল, অদৃষ্টের পরিহাস!! সঙ্গীতকে প্রকৃত-ভাবে ধরে থেকে তাকে সত্যকারের বুঝতে পারলে যে মানবতা বোধ আসে তার অভাব অনেকের মত রতন জনকরেরও থাকার পরিচয় সেদিন পেয়ে সেই বিস্ময়ের মূর্ত্তি আর মনে রইল না। গায়কের গলার একটু সুর শুনলে এবং যন্ত্রীর আঙ্গুলের একটু টিপ ও টান শুনলেই সম্ভ্রম দেখানর বিচার বুদ্ধি এসে যায়—যদি সে জ্ঞান থাকে এবং নিজের বড় শিল্পীর মত যোগ্যতা লাভ হয়। রতন জনকরের একমাত্র খেয়াল গানের উপর যেটুকু পরিবেশন সামর্থ্য ছিল তাতে মনে হয় যেন লক্ষ্ণৌএ সেই তাঁর মুখ দিয়ে 'ম্যায় ক্যা গাউঙ্গা' এই কথারই সত্যতা বজায় থেকে গেছল। বাঁশী, পাখোওয়াজ, তব্‌লা থেকে সব বিষয়েই প্রধানতম বিচারক হয়ে এঁর

বিচারেই শ্রেণী নির্ণয় ও বাতিল হয়েছে। অথচ ইনি কোন দিন বোধ হয় সেতারের জন্য অঙ্গুলে মেচরাফ্ পারেননি, পাখোওয়াজে চাঁটি মারেননি, বাঁশীতে ফুঁ দেননি, বেহালা এসরাজের ছড়ি হাতে করেননি।

মরিস কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাতখণ্ডেজীর প্রসংশিত ছাত্র ও মানসপুত্র সুতরাং সেন্ট্রালের কাছে সব বিষয়ে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা থাকবেই। স্বাধীনতার পর আমাদের এই রকমই অবস্থা চলছে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বিষয়ে। যাই হোক্, সেদিন রতন জন্‌কর্ আমার অডিশন নেবার সময় অডিশনের অর্থ ভুলে গিয়ে প্রভুত্ব গর্বের উপর তড়িৎ ঘড়িত নির্দেশ দিতে লাগলেন—আমি উঠে চলে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অনুরোধে····"সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এই কথাকে ধরে অডিশন দিলাম।

রতন জনকরের নির্দেশ অনুযায়ী এই রকমভাবে গাইতে বাজাতে হয়েছিল। ভৈরব রাগের আলাপ ও চৌতাল তালে ধ্রুপদ গাইবার পর সংগে সংগে আলাইয়ার ধামার, তারপর সাঙ্গ করার সংগে সংগেই ললিত রাগের খেয়াল, তারপরই তৎক্ষণাৎ ঝিঁঝিঁট রাগের টপ্পা। সেতারে তড়ীরাগের আলাপের সংগে সংগেই শ্রীরাগের গৎ।

রাগ ভৈরব মেঁ ধ্রুপদ গাইয়ে—আলাইয়া মেঁ ধামার গাইয়ে—ললিত মেঁ খেয়াল গাইয়ে—····এই রকমভাবে নির্দেশ চলছিল।

যাই হোক্—শ্রেণী পর্য্যায়ের শীর্ষতেই আমার স্থান থেকে গেছল। আমার বড় ছেলে অমিয়রঞ্জনের জুরীর সমক্ষে অডিশন দেবার সময় রতন জনকরের সংগে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ বেধে যায় প্রশ্ন করার জন্য। বাক্য সঙ্ঘর্ষ ইংরেজীতেই চলেছিল। ছেলে প্রতিবাদ করে বলেছিল,—অডিশন দিতে এসেছি অডিশনের অর্থ হল শুনা, আমার গান শুনে আপনি ভাল-মন্দ বিচার করবেন—প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নাই—আমি পরীক্ষার্থী নই।

রতন জনকরও উত্তেজিত হয়ে বলেছিল—এগুলো প্রশ্ন নয় জানতে চাওয়া।

অমিয় বলেছিল—জানতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার বাক্য ভঙ্গী আলাদা, আপনি প্রশ্নের মত বাক্যভঙ্গীই দেখাচ্ছেন,—এ রকম Tone এর উপর যদি জবাব আমাকে দিতে হয় তাহলে আপনাকেও আমি ঐ রকম Tone এ প্রশ্ন করব—জবাব দিতে হবে। জুরীরা উপরে থেকে মাইকের সাহায্যে গান-

বাজনা শুনতেন এবং বলতেন। নীচের ষ্টুডিওতে থাকত শিল্পীরা। শুনেছিলাম সেদিন অভাবনীয় দুর্ঘটনার মত এই ব্যাপারে সবাই হকচকিয়ে গিয়ে বেশ কৌতূহল উপভোগ করেছিলেন।

যাই হোক্ অবশেষে রতন জনক্‌র্ স্বাভাবিক বোধকে ফিরিয়ে এনে অমিয়রঞ্জনকে গাইতে অনুরোধ করেন। গান শুনে শ্রেণী নির্ব্বাচন যোগ্য স্থানেই ধার্য্য করে গেছলেন। এদের জাতিদের এই একটা গুণ আছে মনের ভাব অন্য যাই থাকুক যোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করতে ভুলে না ক্ষিপ্ত হয়েও। প্রথম থেকেই অমিয়র উপর বেতার কেন্দ্রের বেশ জন কয়েক কর্ম্মকর্ত্তার সুনজর ছিল, অর্থাৎ গানে তাঁদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। এই ঘটনার পর শিল্পীমহলে বেশ একটা সর্‌গোল পড়ে গেছল। অনেকে আমার ছেলেকে উদ্দেশ করে বল্লেন—বাঘের বাচ্চা কিনা তাই।

অডিশনের পর থেকে আমার সেতার বাজান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হল। কারণ,—দুটো বিষয়ে অর্থাৎ কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে পৃথকভাবে পত্রের মাধ্যমে ষ্টেশন ডিরেক্টরের কাছ থেকে টাকার অংক থাকা সত্বেও যখন তাঁরা একই কন্ট্রাক্টে গান ও সেতারের প্রোগ্রাম দিয়ে ধার্য্যমত শুধু গানের টাকাই তাতে উল্লেখ রাখলেন, সেতারের জন্য ধার্য্য টাকা যোগ করলেন না তখন জানতে চাইলাম এর কারণ কি?

দুটো আলাদা বিষয় বলে আলাদা করে ফর্ম হয়েছিল এবং সেই-ভাবে ফর্ম ফিলাপ করে দিয়ে অডিশনের নিয়ম পালন করেছি, আপনারাও সেই আইন মাফিকই দু'টোর পৃথক ভাবে টাকার অংক ধার্য্য করে আমাকে চিঠিও দিয়েছেন অথচ দুটো বিষয়ের উপর মাত্র একটার টাকায় দু'টো প্রোগ্রাম কি করে কোন্ সঙ্গত যুক্তিতে আপনারা দিতে পারেন? এর উত্তরে কর্মকর্ত্তা যা বললেন তার মধ্যে অন্যায় ও গাজোরি ছাড়া আর কিছু ছিলনা। তাঁর সুযুক্তির উত্তর হল— কোন ষ্টেশনেই একই শিল্পী দুটো বিষয়ের অধিকার রেখে প্রোগ্রাম করেন এবং দুটোর জন্য টাকা পান এমন নজির নেই, এজন্য দেবারও নিয়ম নেই। তবে আপনি যদি পৃথকভাবে কন্ট্রাক্ট নিতে ইচ্ছে করেন তাহলে দিতে পারি এই নিয়মে, যথা,—'এ' ক্লাসের ধার্য্য মত বছরে যে কটা প্রোগ্রাম রাখা হয় গানের শিল্পীদের জন্য তার অর্দ্ধেক থাকবে এবং সেতারের জন্য থাকবে অর্দ্ধেক। চমৎকার যুক্তি! সেতার বাদকরা বছরে যে কটা প্রোগ্রাম পাবে তার অর্দ্ধেক পাব আমি এবং অনুরূপভাবে থাকবে ধ্রুপদ, আলাপ, খেয়াল ও

টপ্পার জন্য অর্থাৎ কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য।

কর্মকর্তার কথা শুনে বললাম,— বেশ সুন্দর স্বীকৃতিপূর্ণ যুক্তি আমার জন্য রচনা করে ফেললেন দেখছি। দু'টো বিষয়ের অডিশন দিয়ে তার ফলাফলের উপর দুটোর পৃথকভাবে টাকা ধার্য্য করে তা দেবার জন্য আপনারা আইনতঃ বাধ্য হয়েছেন কিনা তার উত্তরই আমি জানতে এসেছি, যদি আপনারা এই নিয়মবিধিকে পালন না করেন তাহলে আমার করবার কিছু নেই, তবে আপনাদের এই রকম অন্যায় ও অসম্ভব বিচারের নজির নিশ্চয়ই কোন দেশে নেই, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এত বলা সত্ত্বেও কোন ফল হল না। কি আর করা যাবে, সেতার বাজান বন্ধ করে দিলাম। দু'টো বিষয়ে দক্ষতা লাভের মূল্য এঁদের কাছে কিছু নেই এই বুঝলাম। জানি না কেন এঁরা এই নির্দেশ দেননি—আপনি ধ্রুপদ কিংবা খেয়াল যে কোন একটাই গাইতে পারেন। কারণ—অত বড় দু'টো বিষয়ের অধিকার রেখে কোন ষ্টেশনে কোন শিল্পীর গাওয়ার নজির নেই— সুতরাং আপনাকেও বড় গুলোর সব গাইতে দেওয়া হবে না, ওগুলোর অডিশন দিয়েছেন বলেই যে আমাদের তা মানতে হবে এমন কথা নয়।" এখানের প্রভুদের কাছে যে সুবিচার পেয়ে এসেছি তাতে ওই নির্দেশনামা —হুকুম জারি হলে আশ্চর্য্যের কিছু থাকত না॥

(৭৪)

বাংলা খেয়াল গাওয়া নিয়ে সঙ্ঘর্ষ,—

বেশ কিছুদিন ধরেই আমি মনে করছিলাম শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেণীগত গান নিজেদের মাতৃভাষায় গাওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা সাধারণ শ্রোতাদের ভাষায় ভাব বুঝতে পেরে এই সব গানে তাদের মনকে আকৃষ্ট করবে এবং ক্রমশঃ শুনার আগ্রহ ও অনুরাগ বাড়বে। এ বিষয়ে আমার খুব কম বয়স থেকেই অভিজ্ঞতা আছে। তাই একান্তভাবে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে রেডিওর প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ললিত রাগের উপর বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গাইলাম। নাম ঘোষিকাকে পূর্বাহ্নে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—কেন

গাইবেন না, এই সব গানও মাতৃভাষায় গাওয়া আপনাদের কর্ত্তব্য।

১৯৬২ সালের জানুয়ারীর প্রোগ্রামেও নির্বিঘ্নে বাংলা খেয়াল গাইলাম। সঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ কেরামত খাঁ, ও সগিরুদ্দীন খাঁ, এঁরা দু'জনেই বলেছিলেন,—বাংলা কথা দিয়ে এমন সুন্দরভাবে সব কিছু ক্রিয়া প্রকরণ দেখিয়ে যদি খেয়াল গাওয়া যায় তাহলে সবাই এরকমভাবে গান না কেন ?

বহু লোক শুনে ওই অভিমতই প্রকাশ করেছিলেন। ওই সালের ১০ই মার্চ্চের প্রোগ্রাম পেয়ে বিকেল ৫টার গাইতে বসলাম মুলতান রাগে বাংলা খেয়াল গাইব বলে। বিখ্যাত তব্‌লা বাদক কেরামত খাঁ ও সারেঙ্গী বাদক সগিরুদ্দীন খাঁ সুর মিলিয়ে প্রস্তুত হলেন। বাঙালী ঘোষক মহাশয় এসে বললেন—গানের প্রথম অংশের কথাটুকু বলুন। বাংলা কথা শুনে আৎকে উঠে বললেন—বাংলা ভাষায় এ খেয়াল গাইতে দেওয়া হয় না—আপনি হিন্দীতে গান করুন। আমি বললাম এর আগে দুবার বাংলা খেয়ালই গেয়েছি কিন্তু কেউই আপত্তি করেন নি। তাছাড়া কণ্ট্রাক্ট ফর্মে যে কয়েকটি বিষয়ের নির্দ্দেশ পালনের কথা লেখা আছে তার মধ্যে এমন কোথাও লেখা নেই—আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়মে হিন্দী খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, ভজন ইত্যাদিই গাইতে হবে ? সুতরাং এই আপত্তি আইনগতই টিকে না। মাতৃভাষায় শাস্ত্রীয়সংগীত গাইব এতে কারো আপত্তি থাকতেই পারে না। হিন্দীতেই গাইবার জন্য যদি আইনও থাকত তাহলেও সেই যুক্তিহীন অন্যায় আইন আমি মানতাম না। আপনারা যদি গাইতে না দেন তাহলে আমি উঠে যাচ্ছি,—জানিয়ে দেন নির্দ্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে অমুকের রেকর্ড বাজিয়ে শুনান হচ্ছে।" শুনে ছিলাম এই ব্যাপার দেখে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানের রেকর্ড বাজাবার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

যাই হোক্—সঙ্কল্পে অটল দেখে ঘোষক একটু অপেক্ষা করতে বলে ছুটে গেলেন ষ্টেশন ইন্‌চার্জের কাছে, তিনিও তাড়াতাড়ি এসে আমাকে হিন্দীতে গাইবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

আমি বললাম—দেখুন এই অনুরোধ সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং গায়কের গাওয়ার সামর্থ্যের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ। যদি বুঝেন আপনাদের চাকুরীর ক্ষতি হবে তাহলে আমি আগেই জানিয়েছি শিল্পীর অনুপস্থিতির কথা জানাতে। এই অহেতুক নির্দ্দেশ আমি পালন করতে পারব না।

এই বলে আমি উঠে পড়তে তিনি বলেন দাঁড়ান আমি ষ্টেশন ডিরেক্টরকে ফোন্ করি।

এসে বললেন—ডিরেক্টর জানালেন—যখন জিদ্ কচ্ছেন তখন গাইতে দিন। সে সময় পাঁচটার ঘরে ঘড়ির কাঁটা এসে গেছে। গাইলাম আধ ঘণ্টা। সেই প্রোগ্রাম শুনে অনেকেই বলেছিলেন বাংলায় খেয়াল গাওয়া হিন্দীর চেয়ে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট মনে হয়েছিল। সকলেরই উচিত নিজেদের ভাষায় এই রকমভাবে গান গাওয়া। এর চার পাঁচদিন পরে বেতার কেন্দ্র হতে চিঠি এল হুকুমের সমন জারি হয়ে। লেখা ছিল—আপনি বাংলা খেয়াল গাওয়ার জিদ ধরে আমাদের কর্ত্তব্যরত ব্যক্তিকে আইন অমান্য করতে বাধ্য করেছেন—শীঘ্র এর কৈফিয়ত পাঠান…।" আমি আমার আর্জি পেস করে প্রথমে জানালাম—আমি আইন অমান্য করতে বাধ্য করাইনি, নির্দ্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতির ঘোষণা জানিয়ে রেকর্ড বাজানর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। সুতরাং এই উক্তিতে সত্য নেই। তারপর বাংলা খেয়াল গাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও কর্ত্তব্যের সপক্ষে অনেক বিচার যুক্তি দেখিয়ে লেখা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। তার উত্তরে তাঁরা জানালেন—আপনার যুক্তি আপনার কাছে থাকুক—মোটের উপর আপনাকে বারান্তরে আর বাংলা খেয়াল গাইতে দেওয়া হবে না। দুইটি চিঠিই কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পড়ে খুব দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—আপনার মত ব্যক্তিকেই শুধু নয় কাউকেই এ ধরণের ভাষায় চিঠি পাঠান খুবই অনুচিত ও সভ্যতা বিরুদ্ধ। বেতার কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাঁদের তরফের কেউ আপনার কাছে এসে কিংবা আপনাকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কি যুক্তি আছে তা জানিয়ে আপনার যুক্তি গ্রহণ করার সুপারিশ দিয়ে দিল্লীতে জানান এবং সেখান থেকে কোন নির্দ্দেশ না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে আগের মত প্রোগ্রাম করে যাবার জন্য অনুরোধ করা। আমি তাঁদের বলেছিলাম—আমার মনে হয় বাংলা খেয়াল ইত্যাদি গাইব এই অপরাধজনক সঙ্কল্পকে ওঁরা খুব শাস্তিমূলক মনে করে বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে চিঠিতে ভদ্রসম্মত ব্যবহার তাঁদের মতে আমাকে দেখান আর প্রয়োজন মনে করেননি। তাছাড়া আরো যে সব ব্যাখ্যা আছে সেগুলো আমি আগেই জানিয়েছি। সুতরাং আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

আমাকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—আগের দু'টো প্রোগ্রামে তাঁরা

আপনাকে বাংলা খেয়াল গাইতে দিলেন কি করে ?

বললাম গাইতে দিয়েছিলেন— ঘোষিকা, সকলের মনের জোর ও বিচারবোধ ত সমান থাকে না, যাঁদের থাকে তাঁরা নীতি আদর্শের উপর কর্তব্য পালনে ভয় পান না। খুঁচিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালী ঘোষক ভাই উপরওয়ালারা জানতে পেরেছিলেন—ওঁরা তো নিজের নিজের ভালেই থাকেন। তারপর সেই মার্চ মাসের পর থেকে জুলাই পর্যান্ত যে কয়টা কণ্ট্রাক্ট এসেছিল তাতে বাংলা খেয়াল লেখা থাকায় প্রত্যেকটাতেই নূতন কণ্ট্রাক্ট পাঠিয়ে তাঁরা জানান হিন্দী খেয়াল লিখে কণ্ট্রাক্ট ফর্ম ফিলাপ করে পাঠাবার জন্য। তাঁরা এটা জানতেন—আকাশবাণীই হল শিল্পীদের একমাত্র প্রচার-প্রতিপত্তির নির্দিষ্ট স্থান, সুতরাং আমাদের হুকুম পালন না করে অত বড় ক্ষতি আমি করব না,—শেষ পর্যান্ত নতি স্বীকার করবই। গাইতে পাওয়ার জন্য লোকে কত কাণ্ড করছে,—সুতরাং আমি নিজের জন্য বেতার কেন্দ্রে গাওয়া ছেড়ে দিতে পারব না। কিন্তু এটা যে জিদ্ নয়, বাস্তব সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য,—সে কথা যদি এঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে তাঁরাও সমর্থন করে আমাকে নানান কৌশলে সাহায্য করতে পারতেন। বেতার কেন্দ্রে সবাই বাঙালী ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রীয়সংগীতে মাতৃভাষার স্থান রাখার প্রচেষ্টায় তাঁদেরও কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম ছিল। শুধু স্থান রাখার জন্যই নয় জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্যও। হুবহু সুর, গায়কী ও বন্দেজ রেখে—মালকৌশের হিন্দী খেয়াল 'রঙ্গরলিয়া করত সোতনকী সঙ্গ...।" এর পরিবর্ত্তে যদি 'এস মদনমোহন বেশে নন্দ দুলাল'''।' ভাবের এই রচনা ধরে যদি তার ন্যায্য নামে খেয়াল বলে পরিচয় দিয়ে বেতার কেন্দ্রে গাওয়া হত তাহলে বাড়ীর মেয়েরা রান্না ঘর থেকেও বলত ওরে রেডিওটা একটু জোর করে দে' আহা বেশ ভাল লাগছে শুনতে। এই রকমভাবে নিজের ভাষায় ভাবের উপর আকৃষ্ট হয়ে ক্রমশঃ তাদের শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেণীগত গানের প্রতি শ্রদ্ধা আসত এবং গাওয়া সার্থক হত অপরের জন্য এবং নিজের প্রয়োজনেও। কিন্তু গোঁড়ামী ও মোহাচ্ছন্নতা এই দুটির প্রভাব থাকলে মানুষের মনে তার উপর কোন কল্যাণ চিন্তা আসে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে সব হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়ালের এবং শোরীর টপ্পার শুধু কথাগুলি বাদ দিয়ে নিজের ভাষায় রচনা করেছেন সেগুলি গাইবার সময় মনে হয় গান গাওয়া সার্থক হচ্ছে—শুধু সুর গাওয়া হচ্ছে না।

প্রায় অধিকাংশ হিন্দী খেয়ালের সবকিছু বজায় রেখে আমি বাংলায় যে সব গান রচনা করেছি তার অধিকাংশ গানেই এই আনন্দ ও আবেগ—অনুরাগ আসে তাঁর কৃপালাভের জন্য কামনা রেখে।

এরপর আগের কথায় আসি,—তারপর সেই সময়কার একটা কণ্ট্রাক্টের ফর্মে কর্তৃপক্ষের মনোভাব বেশ ভালভাবে জেনেও ইচ্ছে করেই সেই ফর্মে গাওয়ার সময়ের দু'জায়গায় আগের মতই বাংলা খেয়াল লিখে অন্য আর একটা সময়ে গাইবার জন্য স্বরচিত হিন্দী লিখে কণ্ট্রাক্ট ফর্ম ফিলাপ করে পাঠিয়ে দিলাম।

হিন্দী গানটি স্বরচিত দেখে তাঁদের বেশী করে মাথা বিগড়ে গেল। চিঠিতে জানালেন—স্বরচিত হিন্দী চলবে না, ট্রেডিশনাল হিন্দী খেয়াল গাইতে হবে। গানে ট্রেডিশনাল কথাটা আমার জন্যই সেই প্রথম ব্যবহারে এসেছিল।

এরকম বেয়াদপী নির্দেশের কোন জবাব থাকে না, তত্রাচ জবাব একটা দেওয়া উচিত মনে করেই জানালাম,—আমি যদি আমার স্বরচিত হিন্দী খেয়ালকে প্রাচীন বলে লিখে দিতাম তাহলে কি উপায়ে আপনারা জানতেন প্রাচীন নয় বলে? তাহলে কি ভারতের যত গায়ক গান করেন তাঁদের সেই সমস্ত গান প্রমাণের উপর নির্দ্ধারিত হয়েছে সেগুলি সবই প্রাচীন? সব ঘরাণা থেকেও কি আপনারা গানের লিষ্ট সংগ্রহ করে প্রমাণে রেখেছেন ট্রাডিশনাল বলে? লিষ্ট যদি কেউ রাখেনও তাহলেই যে সে গানগুলোর সবই প্রাচীন বলে মনে করতে হবে তারই বা কি দাবী আছে, অনেকে নিজের রচিত গানকে জনপ্রিয় করবার জন্য প্রাচীন-কালের বড় বড় গায়কদের নামে চালিয়েছেন। আমার গুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সাক্ষাতে বহু ধ্রুপদ, খেয়াল রচনা করে তাতে তানসেন, বৈজু, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ প্রভৃতির নাম দিয়েছেন। আমি কিন্তু জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা নিয়ে আমার রচিত কোন গানই পরের নামে চালাইনি ও চালাবও না। ছদ্মনাম এবং ছদ্ম উপাধি নেওয়ার মতই আমি ক্ষতিকর মনে করি।

যাই হোক্—আপনাদের কখন সময় হবে জানাবেন—আমি সেই সময় গিয়ে প্রাচীন গানের লিষ্ট দেখে আসব এবং এ বিষয়ে আরো আলোচনা করে আসব। আপনারা বোধ হয় জানেন না ট্রেডিশনাল কথাটায় সৃষ্টি প্রথমেই হয় না, বহুকাল পরে হয় তার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে এলে

তবে। কিন্তু তাবলে তার প্রত্যেকটাকেই চিরকাল আঁকড়ে ধরে সেই তার উপরই নির্ভর করে থাকতে হবে শক্তিকে পঙ্গু করে এমন কোন কথা নয়। যে কোন আদর্শ সৃষ্টিকে সম্মুখে রেখে তাকে করায়ত্ত করার পর নিজের সাধনায় সেই সৃষ্টির মহিমাকে আরো বহুভাবে বাড়িয়ে যেতে হয়, সেই সৃষ্ট বস্তুগুলিই পরে ট্রেডিশন নামে পরিচিত হয়। উত্তম সৃষ্টিতে বাধা থাকতে পারে না, থাকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা।

যে দায়িত্বপদ আপনারা গ্রহণ করেছেন সেখানে বিচারবোধ একান্তভাবে প্রত্যাশা থাকে। আমার এই সব জিজ্ঞাসায় কোন সদুত্তর নেই বলেই বেতার কর্তৃপক্ষের চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় রইল না।

আমি বাল্যজীবন হতে হিন্দী ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি গেয়ে আসছি—আমার কি সে বোধশক্তি নেই যে বাংলাভাষায় শ্রেণীগত গান গাইলে হিন্দীর মত হবে না, অর্থাৎ শ্রেণীগত গানের কৌলীন্য মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে? —তা যদি হত তাহলে আমিই বা গাওয়ার আগ্রহ রাখব কেন? কিন্তু মুস্কিল হয়ে গেল বেতার শিল্পীরা এইভাবে গাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তার দিকে বিচার রেখে এত বড় কর্ত্তব্যে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হলেন না।

তাঁরা গেয়ে যান না হিন্দীতে, তাতে আপত্তি কি আছে? কিন্তু বাংলা ভাষায় গাইবার অধিকার আদায় করে নিতে কি দোষ ছিল?

আমিও ত হিন্দীতে গাওয়া ছেড়ে দিই নি,—তবে এখন নিজের মাতৃভাষাতেই খুব বেশী গাই এবং গেয়ে সত্যিকারের তৃপ্তি পাই। দেখেছি আসরের অধিকাংশ শ্রোতাই এইভাবে গাওয়া গানে খুবই আকৃষ্ট হন।

এস্থলে আমার রচিত স্বরলিপি করা পুস্তকের দু'চারটি গান উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি গানগুলি গাওয়ার উদ্দেশ্যে কত বেশী কার্য্যকরী ও মনের উপযোগী।

১। ভৈরব বিলম্বিত একতালে—হিন্দীর কথা—"এ বক্‌স দীজিয়ে মৌজছিন ··।"

হুবহু সুর ও বন্দেজ রেখে বাংলায়—

(আস্থায়ী) হে প্রভু দাও প্রসাদ মোরে
সব কাজে সব করমে যাহা রহি ধরে।
(অন্তরা) নিরত যেন রহে মন তব পদে
রেখো সদা তোমারি করে॥

২। আশাবরী বিলম্বিত একতাল। হিন্দী—"অব ক্যায়সে জাঁউ রে জমনা··· ।"

ঐ বাংলা,—(আস্থায়ী) "পথ মোরে দাও দেখায়ে
যাইতে তব আলয়ে।
(অন্তরা) ভ্রমিলাম এত দিন শুধু ওগো অর্থ হীন
ভ্রমেতে রেখো না আর দিন গেল বয়ে॥

৩। রাগ ওই তাল দ্রুত তেতাল। হিন্দী,—"বচায়ো লায়ো আয়োরে··· ।"
বাংলা (আস্থায়ী) মনরে ধাও ধাওরে যাও যাওরে
খুঁজ নিরত তাঁর চরণ।
(অন্তরা) বহিরে না পাও যদি ফিরে এস অন্তরে
রাখোরে মুদিয়া সেখানে নয়ন॥

অনেকে হয়ত বলতে পারেন সুরই গানের ভাষা,—তার কথার উপর এত গুরুত্ব কেন? কথাটা সত্য হলেও গানের বিচারগত অর্থে অনেকখানি ফাঁক থেকে যায়। কারণ, আকার ইঙ্গিতেও ত মনের কথা প্রকাশ করা যায় কিন্তু তাতে মন ওঠে কি? মানুষের মত গানেরও বাকাস্ফূর্ত্তি চাই, নইলে মনের কথা প্রকাশ পায় না। বাক্য ও অর্থের সম্পৃক্তি যেমন ভাষার প্রাণ, সুর ও কথার সম্পৃক্তিও তেমনি গানের প্রাণ। একে অস্বীকার কেবল গায়ের জোরেই করা চলে। একমাত্র সুরেই যদি মন ভরত তাহলে যন্ত্র সংগীতই যথেষ্ট ছিল এবং কণ্ঠে শুধু সুর ভাঁজলেই গাওয়ার কাজ সিদ্ধ হয়ে যেত—শত শত গান সৃষ্টির আবশ্যক ছিল না।

একদিন গানের কথা নিয়ে আলোচনায় ভাতখণ্ডেজীও বলেছিলেন—গানে যদি কথার মূল্য ও অবদান না থাকে তাহলে গান রচনার দরকার কি? তাহলে খাট্, টেবেল, চেয়ার ইত্যাদি বলে গাইলেই হল ·· ।'

কিন্তু আমরা হিন্দী গানের কথাগুলোকে গানের সময় ওর বেশী আর কিছু মূল্য দিই কি?

যাই হোক্ এই প্রসঙ্গের শেষ সূত্রে বেতার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা রইল—কেউ যদি পারেন তাহলে জেনে নেবেন তাঁরা কি উত্তর দেন। জিজ্ঞাসা এই,—রাশিয়ার বা কোন বড় রাষ্ট্রের কোন বড় গায়ক যদি এখানের কোন বড় খেয়াল গায়কের কাছে ভাল করে খেয়াল গান শিখে নিয়ে বলেন, আমার নিজের ভাষায় এই খেয়াল

এখানের বেতার কেন্দ্রে গাইতে চাই, তাহলে কর্তৃপক্ষ কি করবেন? তাঁকে গাইতে দেবেন না? আমার মনে হয় সাগ্রহে ও সম্মানে তাঁরা তাঁকে গাইতে দেবেন। কারণ আমেরিকা, বিলেত, রাশিয়া ইত্যাদি বড় রাষ্ট্রের গায়ক আর বাংলার গায়ক—অনেক তফাৎ। বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে যার দল্‌-বল্‌ ইত্যাদি কিছুই নেই। তারপর বাংলা খেয়াল গাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আমার সংগে বেতার কর্তৃপক্ষের যে কাণ্ড ঘটে গেল—কর্তব্য ও আদর্শের উপর সজ্ঘর্ষ বেঁধে তার খবর জানতে পেরে 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রতিনিধিরা এসে আমার কাছ থেকে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ও কাগজপত্র সমস্ত নিয়ে গিয়ে তাঁদের পত্রিকায় আমার পক্ষ অবলম্বন করে প্রচণ্ডভাবে লেখালেখি আরম্ভ করলেন বেতার কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। এই পত্রিকা দুইটিতে আমার বক্তব্য ও বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠি-পত্রের স্তম্ভেও বাংলা খেয়ালের সমর্থনে অনেকেই লিখেছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার 'তির্যকে' আমার চেহারাকে ধরে বাঁ হাতটার আগাগোড়া বেণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রেখে এবং মাথার উপর মারের চোটে বলের মত ফুলিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পথিকের প্রশ্নের উত্তরে লেখা ছিল—'বাংলা খেয়াল গাইব বলেছিলাম তাই…।' পশ্চাতের দোতালার বারাণ্ডায় একটি কোট-পেণ্ট পরা সভ্যমূর্তি এঁকে তার হাতে মস্ত এক লাঠি উঁচিয়ে ধরা অবস্থায় ছিল এবং সেই দোতালা বাড়ীর মাথায় লিখে দেওয়া হয়েছিল 'আকাশ-বাণী'। ভাষা সংবিধান আইনের উপর নির্ভর করে কোলকাতা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলাম কিন্তু দাবির উপর বেতার শিল্পীদের সমর্থন ছিল না বলেই হোক্‌ বা যে কারণেই হোক্‌ স্বপক্ষে ডিগ্রি এল না।

এই ঘটনার শেষের সময় বেতার মন্ত্রী ডক্টর গোপাল রেড্ডি মহাশয় কোলকাতায় এসেছিলেন কি এক জরুরি কারণে।

সাংবাদিকরা রাজ্যপালের প্রাসাদে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন—কোন্‌ সঙ্গত কারণে বাংলার একজন প্রবীন শিল্পীকে বাংলা খেয়াল গাইতে দেওয়া হল না?

উত্তরে রেড্ডি মহাশয় জানান—আমি তো এই ব্যাপারের কিছু জানি না! এই পদে আমি নূতন বাহাল হয়েছি, গাইতে না দেওয়ার কারণে আমি তো কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, যাই হোক আমি দিল্লীতে ফিরে

গিয়ে উচ্চ পর্য্যায়ে আলোচনা করে এর বিহিত ব্যবস্থা করব।”

আমার চতুর্থ পুত্র নিহাররঞ্জন ওই বছর বেতার সংগীত প্রতিযোগিতার বাংলা কেন্দ্র হতে আলাপ ও ধ্রুপদে প্রথম স্থানে নির্ব্বাচিত হওয়ায় শীর্ষ প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য তাকে নিয়ে আমি অক্টোবর মাসে দিল্লী যাই। প্রতিযোগিতায় আমার পুত্র শীর্ষস্থান লাভ করে। সেই উপলক্ষ্যে ২২শে অক্টোবর (১৯৬২) মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকিষণ মহোদয় কর্ত্তৃক পুরস্কার বিতরণের জন্য যে দরবার সভা হয় তাতে বেতার মন্ত্রী রেড্ডি মহাশয় তাঁর ভাষণে জানান—এখন থেকে প্রত্যেকেই তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় শাস্ত্রীব সংগীতের শ্রেণীগত গান যথাযথভাবে তার নিয়ম-নীতি বজায় রেখে গাইতে পারবেন।”

এই ঘোষণাকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন—আমি বেতার মন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি, এ কথা খুবই সত্য যে—শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা প্রত্যেকের মাতৃভাষায় মাধ্যমেই হওয়া উচিত, এর দ্বারাই এত বড় বিদ্যার ও শিল্পের প্রচার বিস্তৃতি ঘটবে। সুতরাং এ অধিকার সকলেরই ন্যায়তঃ প্রাপ্য।

এই ঘোষণা ও অভিমত শুনে শুধু আমিই নই—সকলেই খুব উল্লসিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বললেন আপনার জয় হল। আমি বললাম—এতো জয়ের ব্যাপার নয়—ন্যায়তঃ অধিকারের ব্যাপার এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

ভেবেছিলাম কোলকাতা বেতার কেন্দ্র হ'তে এই স্বীকৃতির কথা প্রচারিত হবে কিন্তু চার-পাঁচ মাসের মধ্যেও কোন খবর না জানতে পারায় সেখান থেকে খবর নিয়ে বুঝলাম দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে কোন সংবাদই আসেনি। সেই সময় হাইকোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করে তারপর রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী মহোদয়কে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই বিষয় বিস্তারিত-ভাবে লিখে জানালাম। তখন ডাঃ রেড্ডি মশায় বেতারের মন্ত্রীত্ব পদে ছিলেন না—পরিবর্তে তখন মাননীয়া ইন্দিরা দেবী।

আমার চিঠি পাওয়া মাত্র রাষ্ট্রপতি উত্তরে জানালেন—আপনার পত্রটি বেতার মন্ত্রী ইন্দিরা দেবীর নিকট পাঠিয়েছি তিনিই এর বিহিত ব্যবস্থা করবেন।” ইন্দিরা দেবীও সেই চিঠি পেয়ে সত্বর জানালেন—আপনার চিঠি রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে পাঠিয়েছি তিনিই এর ব্যবস্থা করবেন।”

সেখান হতে তিন-চার মাস পরে বিচারহীন অভদ্র উত্তর এল—আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিচার করে দেখলাম—বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয়-সংগীত পরিবেশনের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়, বাংলা ভাষায় রাগপ্রধান গাইতে পারেন।" বেতার মন্ত্রীর ঘোষণা এবং রাষ্ট্রপতির ঐকান্তিক সমর্থন—এই রকমভাবে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে, এ যেন অভাবনীয় কাণ্ড বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয় ওখানের হিন্দী গোড়ার চাঁইরা রাষ্ট্রপতি ও ডাঃ রেড্ডিকে রাগসংগীতের গানে হিন্দী কথাই যে একমাত্র নির্ভর করে সে সম্বন্ধে উক্ত বড় ব্যক্তিদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এমনভাবে বুঝিয়ে দেন যে অবশেষে তাঁরাও হয়ত আর কিছু বলতে পারেননি। যদিও আমার এই মনে হওয়াটা স্বাভাবিক পর্য্যায়ে আসে না, কিন্তু এছাড়া খারিজ করার দুঃসাহস অন্য পথে কি করেই বা আসবে? এস্থলে ওই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতে পারা যায়? ওঁরা যদি ক্রিয়াজ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রেখে বলতে পারতেন কোলকাতা কেন্দ্র থেকে বাংলা খেয়ালের টেপ্ আনা হোক্—আমরা শুনব, তাহলে বুক ফুলিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হত হিন্দীর চেয়ে সর্ব বিষয়ে কিসে কম! আর এই হক্ দাবি আদায়ের যে উদ্যোক্তা তার সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা এসে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সুগন্ধ কুসুমের মালা হাতে এসে গেছল তাকে চাঁইচিলে ছো মেরে কেড়ে নিলে। বিভাগীয় মন্ত্রী এবং আরো উপর স্তরের ব্যক্তিদের হাতে শক্তি সামর্থ্যের লাঠি না থাকলে এই রকমই হয়।

অগত্যা মনে করতে হল, এখন চতুর্দিকে যে উপায় নিয়ে সঙ্গত দাবি আদায় হচ্ছে সেই পথের কর্ত্তব্যপরায়ণ যাত্রীরা যদি আসেন সমবেতভাবে এগিয়ে তবেই সহজ হবে। আমি না দেখে যেতে পারলেও শাস্ত্রীয়সংগীতে মাতৃভাষার ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় অধিকার আসবেই যেদিন এর গুরুত্ব সমধিকভাবে উপলব্ধি হবে। কি অদ্ভুত মনবৃত্তির পরিচয় থাকে, যাঁরা বলেন—গানে মাতৃভাষা নিয়ে অহেতুক এত কাণ্ড করার কি আছে?

এই মিরজাফরী স্বভাবের কথা শুনে নূতন করে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—কারণ আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে মনের পরিচয় এই রকমভাবে বহুর উপরই দিয়ে এসেছি ও আসছি, এখন আরো বেশী করে অন্ততঃ এই শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

শাস্ত্রীয়সংগীতের গান যদি আমাদের দেশে সৃষ্টি হত তাহলে কি আমরা বলতে পারতাম হিন্দীতে গাওয়া চলবে না—বরং সাঁওতালী

ভাষাতেও চলতে দেবো ?

হিন্দী গানের বহু আগেই আমাদের দেশে এর সৃষ্টি হয়ে প্রচারিত হয়ে এসেছিল তবে ব্যাপকভাবে নয়,—এখানে ভারতের রাজধানী হলে তাই হত।

নিজ বাড়ীর মধ্যে একটি প্রাচীন খাতা হঠাৎ পেয়ে গেলাম। তাতে বহুরাগের বহু সংস্কৃত ও বাংলা গান লেখা আছে। খাতার এই গানগুলি বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীত চর্চার বহু শতাব্দীর প্রাচীন পরিচয়।

(৭৫)

সঙ্গীত আসরের কথা,—

আগে ভারতের বড় বড় জায়গায় যে সব কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম—প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকটি অধিবেশনে প্রায় সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞদেরই উপস্থিতি। এমনকী এখানে যখন পাথুরিয়াঘাটার (কোলকাতা) জমীদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জোড়াসাঁকোর দামোদর খান্না এবং কেশরী সিংহ, প্রণবেশ সিংহ এঁরা যখন কনফারেন্সের মত খুব বড় করে গান-বাজনার আসর করেছিলেন তখনও এই সমাবেশ লক্ষণীয় ছিল। কয়েকবছর আগেও 'তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে'র আসরে পর পর দু'বছর ধ্রুপদ-খেয়াল গাইবার সময় দেখেছি—আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, আমীর খাঁ, আলি অকবর খাঁ, রবিশঙ্কর, বিশমিল্লা সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আসরে উপস্থিত থাকতে; এজন্য গাইবার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এখন শুনা যায় সে শোভা সৌন্দর্য্যের আর পরিচয় থাকে না। শিল্পীদের উপস্থিতিতেই আসরের গৌরব বৃদ্ধি করে। শুধু তাই নয় শিল্পীদের দেখা-সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের মাধ্যমেই সৌহার্দ গড়ে উঠে। সঙ্গীত পরিবেশককে উৎসাহ প্রদান করা এবং তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া প্রত্যেক শিল্পীরই প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে বড় বড় বাঙ্গালী শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনের সময় বহিরাগত শিল্পীদের উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের ধারণা থাকা উচিত এখানের বাঙ্গালী শিল্পীরা কি রকম উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের প্রসংশায় এখানের ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা

আরো গাঢ়তর হবে এবং শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও গর্ব বৃদ্ধি করবে। আমি জানি সাধন সমৃদ্ধ বাঙালী শিল্পীদের অবাঙালী শিল্পী ও শ্রোতারা অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি দেন, হীনমন্যতার পরিচয় তাঁদের কারোর মধ্যেই আমি পাইনি। সেই দৃষ্টান্ত এখানের ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জ্ঞানে আসা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়—শুনা যায় কোন কোন আসরের অনুষ্ঠাতারা নামকরা বাঙালী শিল্পীকে আহ্বান করে কিছু টাকা দিয়ে গান বা বাজনা শুনে মনে করেন আর কোন কর্ত্তব্য নেই। তাই শিল্পীকে নিজেই টেক্সি ডাকবার ও বাজনা বইবার ব্যবস্থা করতে হয়। ওঁরা বোধ হয় মনে করেন দেশের শিল্পীর প্রতি যা করা হল তা যথেষ্ট। এই রকম বোধহীন ব্যবহার দেখে মনে হয় সেই আগেকার কতকগুলি রাজা-মহারাজা, জমীদারদের প্রেতাত্মাই যেন এঁদের মনে ভর করে আছে। খুব লজ্জার কথা।

তৃতীয়—দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেকটি বড় রকম আসরেই শিবরহিত যজ্ঞের মত চলছে। অর্থাৎ ধ্রুপদের মত শাস্ত্রীয়সংগীতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিবতুল্য এই গানের রূপ-গুণের পরিচয় এইসব আসরে একান্তভাবেই অনুপস্থিত থাকে। অথচ ধ্রুপদ গায়কের নামে (তানসেন) একটি সম্মেলনের নামকরণ আছে। আসর অনুষ্ঠাতারা কি মনে করেন ধ্রুপদকে কোন্‌ঠেসা করে রাখলে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের কল্যাণ হ'বে? স্বচ্ছ বোধশক্তি নিয়ে বুঝা উচিত ধ্রুপদকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে তার ব্যাপক প্রচারের প্রচেষ্টা রাখার উপরই বিশেষ করে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের সর্ববিধ কল্যাণ নির্ভর করে আছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য, যে কোন বিষয়বস্তুর প্রকৃত সত্যকে ও কল্যাণকে রক্ষার ঐকান্তিকতা না থাকলে অর্থাৎ আদর্শ ভ্রষ্ট হলে তার গোষ্ঠীভুক্ত সমগ্র বস্তুরই অবক্ষয় হতে থাকে॥

চতুর্থ—সম্প্রতি এক আসরে একজন সংগীতে বিশেষ প্রত্যক্ষদর্শী—অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি বললেন,—সঙ্গীত সম্মেলন নাম দিয়ে যে আসর অনুষ্ঠিত হয় এখানে, তার প্রথম সৃষ্ট সময় থেকেই পেয়ে আসছি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় এবং বহুবিধ বিষয়ের ত্রুটিতে ভরা। আদর্শমূলক কোন গঠন ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয়সংগীতে চর্চারত ব্যক্তিদের শুনার সুযোগ, গাইতে-বাজাতে দিয়ে উৎসাহ দান, এখানের যে সমস্ত শিল্পী এই বিদ্যার এত বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ্য করে গড়ে তুলেছেন, সমকক্ষতার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই সব বাঙালী শিল্পীদের একান্তভাবে এইসব সম্মেলনে আহ্বানের আগ্রহ রাখা যে একান্ত কর্ত্তব্য ও বিবেক

ধর্ম্মসম্মত সে কথা অনুষ্ঠাতারা মনে রাখবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানবতা রাখার আবশ্যক করেন না, কারণ এটাকে ব্যবসার মত করা হয়েছে বলে। পরিণতি এইভাবে দাঁড় করানর জন্ম কতকগুলি 'থোড়-বড়ি-খাড়া, 'খাড়া-বড়ি-থোড়' এইসব শিল্পীদের এখানে জমীদারীর মত বাৎসরিক আরে দাঁড়িয়ে গেছে। আর স্থানীয় শিল্পীদের অবস্থা? বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের আহ্বান করলে বহিরাগত শিল্পীরা তাঁদের গুণপণাতে মুগ্ধ হতেন, দেশের গৌরব বৃদ্ধি হত তাঁদের অধিকাংশই সম্মেলন অনুষ্ঠানের কাছে উপেক্ষিত। কারণ—আগেই বলেছি ব্যবসা নষ্ট হবার ভয়। অনেকের মুখে শুনেছি এইসব সম্মেলনে উদীয়মান বাঙালী শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশনের জন্ম যদি একান্ত আগ্রহী হন তাহলে গোপনীয় ব্যবস্থার দ্বারা তাঁরা সেই সুযোগ নিতান্ত কৃপা প্রদত্তরূপে পান। সেই ব্যবস্থার অতি নিম্নস্তরের গায়ক-বাদকরাও স্থান পেয়ে যান। এইসব ছল-চাতুরীর সুযোগে কর্তৃপক্ষরা সাধারণের কাছে দেখিয়েছেন দেশের চর্চারত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁদের কত আদর ও কর্তব্যবোধ। ভেতরে ঢুকলে জঘন্যতার পরিচয় বিস্তর পাওয়া যাবে। এর প্রতিকার একমাত্র দেশপ্রেমিক শ্রোতাদের কাছে। বাংলাদেশের কন্‌ফারেন্সে বাঙালী শিল্পীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বতা থাকবে, তাঁদের শক্তি সামর্থ্যের উচ্চাসনকে অন্তরালে রাখার প্রয়াস নিয়ে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ও শ্রোতাদের কাছে অন্যদের বড় প্রতিপন্ন করে রাখার মতলব, সিদ্ধ করতে দেওয়া হবে কেন? কেউ হয়ত বলতে পারেন —এইসব সম্মেলন শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রতি আকর্ষণে অনেক লোকের মনকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আমি বলব বিশেষ কিছু ফললাভ যদি হয়ে থাকে তাহলে উপেক্ষিত যোগ্য শিল্পীদের অভিসম্পাত, আর প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে অনুষ্ঠাতাদের বিচার বুদ্ধির জৌলুস। যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ সেই সব ছাত্র-ছাত্রীরা এইসব অনুষ্ঠানে গান-বাজনা শুনার তেমন কোন সুযোগই পান না। যাঁরা পান তাঁদের বছরে দু'একদিন কোন কোন নামকরা শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনের প্রভাব কতটুকু থাকতে পারে? বরং দেখেছি তাদের কাঁচা মনকে বিভ্রান্তিতে এনে নিন্দনীয় সমালোচক করে দিয়েছে।

এখানের অনুষ্ঠাতাদের কাণে এইসব অব্যবস্থা ও অনুপযুক্ত মনবৃত্তির কথা পৌঁছে দিয়েছি অনেকবার কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করেন না, কারণ তাঁরা অন্য পন্থার মানুষ।

আমার মনে হয় বাঙালী শিল্পী, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে

মিলে শুধু তাঁদের নিজেদের দ্বারা 'বঙ্গীয়-সঙ্গীত-সম্মেলন' নামে যদি সম্মেলন করতে পারেন তাহলে সবদিক দিয়েই যথার্থ হবে।

এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার সমাধানের জন্ম সবচে' বেশী প্রয়োজন হবে এই চর্চার স্বগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের মন প্রত্যেকের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে নিয়ে আসা এবং সময়ের ক্ষতির জন্ম কিছু স্বার্থত্যাগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রোতাদের মনে করতে হবে এর ব্যবস্থাপনায় মন-প্রাণ দিয়ে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য ও ধর্ম।

এই রকম আদর্শ ও একান্ত প্রয়োজনীয় সম্মেলন করতে পারলে আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারও এর সাফল্যের উপর সবিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

খুব দুঃখ লাগে—আমাদের দেশের বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা, সমালোচক, এমন কি সাধারণ স্তরের গায়ক-বাদক ও শিক্ষকরাও অন্তদের কেষ্ট, বিষ্টু, ভগবানের মত ভাবেন বলে দেশের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শিল্পীরা যথার্থ মান-মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি পান না। বড়-ছোটর বিচার করা কি সোজা কথা? গলায় কে কতগুলো তান করল, সর্গম্ করল, কত বিস্তার করল, তৈরি দেখাল— শুধু এর উপরই কি কেষ্ট, বিষ্টু ভাবার অধিকার থাকে? তা থাকতে পারে না, থাকতে হবে তার সংগে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সৃষ্টি-শক্তির উন্নত মান কতখানি আছে, এবং তার সংগে এ-ও থাকতে হবে—যোগ্য আচার্য্যের প্রামাণিক পরিচয়, তত্ত্বাঙ্গে ও ক্রিয়াঙ্গে সমধিক অধিকার লাভ ও গ্রন্থাদি রচনার প্রত্যক্ষ পরিচয়, সঙ্গীতের বিষয়ে বড় রকমের অবদান ইত্যাদি।

বিচারে এইসব ছাড়াও আছে, গাওয়ার মধ্যে এবং বাদনের মধ্যে এমন সব বড় বড় বস্তু যার স্বরূপের মূল্যমান নির্দ্ধারণ করা সেই বিষয়ের ক্রিয়াঙ্গে ঠিক সম অধিকারী ছাড়া কারো সাধ্য নেই। সুতরাং বড় ছোটর অর্থাৎ কেষ্ট-বিষ্টুর স্থান নিয়ে বিচার ও সমালোচনা আমাদের মত সল্পজ্ঞান নিয়ে করতে যাওয়া সম্পূর্ণ মূর্খামি। কিন্তু অতি সল্প সঞ্চয় নিয়েই আমাদের মধ্যে অনেকেই মস্ত বোধজ্ঞ ও বিচারক বলে প্রতিপন্ন করবার জন্ম আধিপত্য স্থানের পত্রিকাদিতে সমালোচনার কলম চালিয়ে যান। অনেকে আবার বিরাট বিজ্ঞতার মুখোস ধারণ করে দু'একজন মনোমত ব্যক্তির নাম করে তারপর প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের নসাৎ করেন। আবার বর্ত্তমানের শিল্পীদের শক্তি-সামর্থ্যকে স্বীকার না করার অভিপ্রায় নিয়ে

বলতে থাকেন,—সে যা শুনেছি তেমনটি আর শুনব না, ওমুকের মত কেউ আর হচ্ছে না, আর (অবশ্য নিজের লোকের নাম দু'একটি ছাড়া) হবেও না,—ইত্যাদি বাক্যগুলি বাঁহাতে করে পা'য়ের তলা রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে অভিভাবকত্ব মুরুব্বিচালে বলে যান। এইসব ত্রিকালজ্ঞ মুনিরা একটু ভেবে দেখেন না সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে যে, এই রকম মনোভাব ব্যক্তর দ্বারা কত যোগ্য ব্যক্তিকে অসম্মানিত করে গুরুতর অপরাধ করা হয়॥"

সেই প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এই সমস্ত যুক্তিপূর্ণ কথা শুনার পর আমি তাঁকে শিল্পীদের যোগ্যতার স্থান নির্ণয়ের বিচার সম্বন্ধে একটি শোনা ঘটনার কথা বললাম,—আমি যখন ভালাইডিহা রাজার সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলাম, সে সময় কি এক জরুরি কাজে এসেছিলেন মেদনীপুরের জেলা শাসক এক বাঙালী আই, সি, এস্। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি আমার ধ্রুপদ গান শুনবার জন্য সেদিন সেখানে থেকে যান। তাঁর রাগ শুনার আগ্রহ মত আমি ছায়ানট, কেদার ও দরবারী কানাড়া ধ্রুপদ শুনাই। আমার গানে শ্রুতি, মীড় ও গমকের প্রকাশনার উপর মন্তব্য রেখে নিজের পরিচয়ের মাধ্যমে একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলেন। যথা,—"আমার জন্ম মৈমনসিং জেলার মধ্যে এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের জমীদার নামে পরিচিত এক বংশে। আমার পিতাঠাকুর একজন হিন্দু বড় গায়ককে রেখে তাঁর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করে বরাবর চর্চা রেখেছিলেন এবং আমাকেও ছোট থেকে শেখাতে থাকেন। আমার গান শিক্ষা ও সাধনায় এবং পড়াশুনাতে খুবই আগ্রহ ছিল, তার সংগে ছবি আঁকাতে। স্কুলের অঙ্কন পরীক্ষায় আমি বরাবরই প্রথম হতাম। তারপর স্কুলের শিক্ষা সমাধা করে এলাম কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে। এখানে গান শেখার সুযোগ সুবিধা হয়ে উঠল না, তবে হোষ্টেলে ছেলেদের অনুপস্থিতিতে তানপুরা নিয়ে সাধতে বসে যেতাম। ছবি আঁকার প্রবল আগ্রহ থাকায় আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হই। সেখানে আমার আঁকার উপর খুব উৎসাহ পেতে লাগলাম। আমার এক আঁকা ছবি সেখানের প্রদর্শনীতে দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল।

তারপর বিলেতে এলাম আই, সি, এস, পড়তে। সেখানের হোষ্টেলে দু'জন ভারতীয় বন্ধু জুটে গেল। এই দু'জনের মধ্যে একজন আই, সি, এস, এবং অপর জন ব্যারিষ্টারী পড়তে এসেছিলেন। এঁরাও

ছবি আঁকার উপর অনেকখানি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আই, সি, এস; পড়া দু'জন ইংরেজের সংগে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাঁরা এলেই আমাদের আঁকা ছবি খুব আগ্রহ সহকারে দেখতেন। এঁরা ছবি আঁকার তেমন ক্ষমতা না রাখলেও গুণগ্রাহী ও সমঝদার ছিলেন বলে বেশ বুঝা যেত।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে যাবার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল পাশ্চাত্যদেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর আঁকা চিত্র প্রদর্শিত হবে অমুক মাসে এবং বিচারকদের দ্বারা বিচারের মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থান অধিকারী শিল্পীরা পুরস্কৃত হবেন।

এই সংবাদে আমরা খুবই উৎফুল্ল হলাম। দিন গুণতে লাগলাম অধীর আগ্রহে। যেদিন উদ্বোধনের দিন এসে গেল সেদিন ওই দুই ইংরেজ বন্ধু এবং আমরা তিনজনে সেখানে উপস্থিত হলাম।

শিল্পীদের অঙ্কন দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সমস্ত অঙ্কন বস্তুগুলি নিবিষ্ট মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর আমাদের চিত্রাঙ্কন বিদ্যার দখল মাপকাটি নিয়ে আবার মনমত এক একটিকে বহুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে কোন্‌টি প্রথম স্থান পাবে, কোনটি দ্বিতীয় স্থান পাবে, এই রকম ভাবে বিচার সিদ্ধান্তের উপর প্রত্যেকটি চিত্রের রূপ পরিচয় এবং শিল্পীর নাম-ধাম নোটবুকে লিখে রাখলাম।

তারপর যেদিন সংবাদ পত্রে স্থান নির্ণয়ের ফলাফল বেরোল সেইদিন তৎক্ষণাৎ আমাদের নোটবুকে লেখার সংগে মিলিয়ে দেখতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম আমাদের নির্দ্ধারণের সংগে একটাও মিলেনি, অর্থাৎ ধারণামত জ্ঞানের যে গরিমা ছিল তাতে ধরা দেয়নি। ছুটলাম আমরা তিন জনে সেখানে। ইংরেজ বন্ধু দু'জন আমাদের আগেই সেখানে এসে গেছলেন। যে চিত্রটি প্রথম স্থান অধিকার করেছে সেটির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল ও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাতে আলংকারিক শিল্প চাতুর্য্যের কোন সমাবেশ ছিল না,—তুলিতে করে লম্বা লম্বা মোটা টানের উপর খণ্ডখণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্য্যের ঢলেপড়া উজ্জ্বল রক্তিমাভা কিরণকে বিকীর্ণ ও বিস্তৃত করা হয়েছে—একেবারে প্রত্যক্ষর মত। কি অদ্ভুত দক্ষতার উপর শিল্পীর সৃষ্টি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের এতকাল ধরে এই বিদ্যার চর্চ্চা করে যে এক অহং ধারণা ছিল তা ওখানের চিত্রগুলি প্রত্যক্ষ করে মনে হয়েছিল এই সাধকদের বহু পশ্চাতে আমরা থেকে গেছি এবং

দাঁড়িয়ে আছি,—এগোইনি। বুঝলাম আমাদের সাধনা ঠিক সাধনা নয়,—চর্চা বলা যায় মাত্র। সেদিন সেখানের বিচারকদের উদ্দেশে মাথা নেমে এসেছিল। বিচার দক্ষতা কত উর্দ্ধে থাকতে হয়—হাতে কলমে জ্ঞানের উপর তা প্রত্যক্ষ করে ফিরে এলাম। মনে থাকা বিরাট খাঁটি কথাটি সেদিন যথার্থরূপে প্রতিয়মান হল,—স্বামীজী বলেছিলেন—"আমাকে বুঝতে হলে আর একটা বিবেকানন্দের দরকার।" সত্যই সঙ্গীত সাধকদের সংগীত শুনে এবং কিছু শিখে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। ধ্রুপদের মধ্যে যে মীড়, সূক্ষ্মশ্রুতি, গমকের কাজ ইত্যাদি এঁর গানে সেই চিত্রের মত কণ্ঠের দ্বারা মোটা তুলির টানে যা দেখলাম এবং যাঁরা দেখাতে পারেন তাকে আয়ত্তে আনার তপস্যাগত শক্তির মূল্যায়ণ করা কি সোজা কথা! আমি তো বহুকাল ধরে চর্চা করে আসছি কিন্তু কৈ এ জিনিস তো গলায় আনতে পারিনি এবং এ সকলের চিত্ররূপ ধারণাতেও আসেনি! তাহলে বুঝতে হচ্ছে আমাদের সাধনার পথ সাধারণের গন্তব্য পথের মত, আর এঁদের পথ অসাধারণ,—যে পথ দিয়ে গেলে অভিষ্ট সিদ্ধ হবে সেই পথ। কিন্তু এখনই সম্মুখের দিকে তাকিয়ে খুব আশঙ্কা হয় এই জিনিসের বোধ শক্তি, মর্য্যাদা, সম্মান এবং উৎসাহ দান থাকবে কি না॥"

শিল্প রচনার পরিচয় সম্বন্ধে,—

শিল্প সাধকদের শিল্প সৃষ্টি শুধুমাত্র শিক্ষাগত ও তার ধারাবাহিকতা নিয়ে থাকে না। অন্তর্ধ্যানী শিল্পীরা শিক্ষাগত বস্তুর সৃষ্টি মহিমাকে ও তার নীতি-ধারাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে নিজের ভাবগত অভিলাষ নিয়ে অঙ্কনধারা আরো উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট থাকেন, নিছক অনুকরণ নিয়ে নয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই,—সাধক সুরশিল্পীও নব নব উন্নততর সৃষ্টির দ্বারা নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করেন। তাঁর সেই সৃষ্ট বস্তু কেউ পছন্দ করবে কি না এবং তার মধ্যে ছোট-বড়র বিচার থাকবে কি না সে চিন্তা বা ভাবনা তাঁরা রাখেন না, তা রাখলে সৃষ্টির তাৎপর্য্য ও স্রষ্টার ধ্যান-চিন্তা বিঘ্নিত হত এবং অগ্রগমন ব্যাহত হত। শিল্পী তাঁর ন্যায্য পাওনার জন্য লালায়িত ও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন না বলেই শিল্প থমকে দাঁড়ায়নি কখনও, বিস্ময়কর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে, বিভিন্ন

চিত্রাঙ্কনে, বিভিন্ন মাধুর্য্যে এবং বিভিন্ন রূপে, রসে তার সৃষ্টিকে মহিমময় করে আসছে। গড়ার আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্যের কথায় বলাযায়,—সেই মহান স্রষ্টা গড়ার ইচ্ছায় যেমন হিমালয়, নদী, গিরি, সমুদ্র, বনানী, আকাশের বিচিত্ররূপ প্রভৃতির মধ্যে বিরাট ও বিস্ময়কর দৃশ্যবস্তু সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আবার বিহঙ্গ, পুষ্প, মৃগাদি ও বৃক্ষশোভা প্রভৃতি সৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন মনমুগ্ধকর শোভা-সৌন্দর্য্যেরও পরিচয় রেখেছেন। এই দুই সুরের মধ্যে প্রথম গুলিতে থাকে বিস্ময় ও অভিভূত করার আকর্ষণ, এবং দ্বিতীয়টিতে আমরা পাই রসতৃপ্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে সহজ-সরল উদ্বেলিত আকর্ষণ। এই উপমার মধ্যে দিয়ে সংগীতের ক্ষেত্রেও তেমনিভাবে শিল্পীরা উদ্দেশ্যগত হয়ে ভাবকে ধরে তার আবেগে অঙ্কন করে যান এবং তাতেই তৃপ্তি পান। সেই অঙ্কন মূর্ত্তির প্রকাশনায় কোন কোন শিল্পী—শ্রোতাদের বিস্মিত ও অভিভূত করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি আনিয়ে দেন ভক্তি-শ্রদ্ধা ; আবার কোন কোন শিল্পী দেন সুরের রসমদিরা ঢেলে। এই দুই এর সমন্বয় যে শিল্পীর সুরাঙ্কনের মধ্যে থাকে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে উপযুক্ততা ও যোগ্যতার অধিকার নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের উপর স্থান নির্ণয় করবে কে ?—সমকক্ষ না হলে ?

ঘরাণার কথায়,—

বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন—আপনাদের ঘরাণাসম্পদসমূহ চর্চা ও শিক্ষাদানের দ্বারা বাঙলার একমাত্র ঘরাণার গৌরব সংরক্ষিত হচ্ছে কি না ?

তাঁদের জানাই,—যাঁরা এই ঘরাণার গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করেন এবং সংরক্ষার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে বলে মনে করেন স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই ঘরণার বিপুল সম্পদকে গ্রহণ করে প্রচারে ব্রতী হয়ে থাকেন।

আগেই বোধ হয় জানিয়েছি এই ঘরাণার গান, গৎ ইত্যাদি সমস্তই ভারতের বিভিন্ন ঘরাণার গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় সংরক্ষিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর ঘরাণাকে বরাবরই বাঙালী জাতির প্রত্যেকেই নিজের ঘরাণার মত দেখে এসেছেন—শ্রদ্ধান্তঃকরণে। এখানের গুণীদের দ্বারা বাংলা দেশে এত প্রচার বিস্তৃতি ঘটেছিল যে বর্ত্তমানেও

যে সমস্ত চর্চারত ব্যক্তি আছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশরই সঙ্গীতের প্রবাহ-ধারা বিষ্ণুপুর ঘরাণার উৎস উদ্ভূত, অর্থাৎ যোগাযোগ সংযুক্ত।

যাঁরা গান বাজনা তেমন কিছু বুঝেন না তাঁদের কাছেও এই ঘরাণার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষিত হয়ে গর্ব অনুভব হতে পারবে এই সংবাদে, কোলকাতার ঠাকুর রাজগোষ্ঠীতে এবং রবীন্দ্রনাথের বংশে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের চর্চা বিষ্ণুপুরের গুণীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এইখানের শিক্ষাতেই রাগসংগীতের সুরে, তালে দখলকার হয়েছিলেন। তাঁর রাগসংগীতের উপর যে সব গান রচিত আছে তা বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির সুর ও তাল-ছন্দকে হুবহু গ্রহণ করে। যদি বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষা ও তার উপর জ্ঞান সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক হয় তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরাণারই নাম করতে হবে।

বিষ্ণুপুর ঘরাণার রাগরূপের সংগে বিভিন্ন ঘরাণার নীতিধারার মিল একই নিয়মের উপর যে ছিল তা আমিও প্রত্যক্ষ করে এসেছি বাল্যকাল থেকে ভারতের বড় বড় ঘরাণাগুণীর সংস্পর্শে এসে। কিন্তু এখন কোন কোন রাগের স্বরসম্পর্কের প্রাচীন নীতিধারা ও দর্শনের উপলব্ধিতে বিজ্ঞান সংযুক্ত রূপের উপর দৃষ্টি দানের অনবকাশ বশতঃ নির্দ্ধারিত কোন কোন স্বরের পরিবর্তন হতে দেখছি। বাইরের যাঁরা খেয়ালখুসী নিয়ে এরূপ করে যাচ্ছেন তাঁদের বোলবার কিছু নেই কিন্তু তাকে এখানের বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা অহেতুক অনুসরণ করছেন তাঁরা যদি এই অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তনের উপর বিচার রেখে চলেন তাহলে দেশের ঘরাণা অর্থাৎ বিষ্ণুপুর ঘরাণার অকৃত্রিম কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রকৃত পরিচয় বজায় থাকবে এবং প্রমাণ স্বরূপ এখানের ধ্রুপদাদি গান যা নায়ক গোপাল, বৈজু, তানসেন, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা রচিত হয়ে আছে তাকে উপস্থাপিত করে দেখাতে পারবেন। দেশের অকৃত্রিম ও শাশ্বত নীতিধারার এই ঘরাণাকে ত্যাগ করা আমি দেশ ও পিতাকে ত্যাগ করার মতই মনে করি। প্রত্যেকটি রাগের প্রকৃত রূপ রক্ষা এবং স্বরসংযোজন সম্বন্ধে আমি আমার 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি॥

(৭৭)

শেষ পর্য্যায়ে,—

(১) আগের নিজ পরিচয় প্রদানের পর ছয়ের দশক থেকে চুয়াত্তর সালের মধ্যবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আমার চুয়াত্তর বছর বয়সের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিচয়। যথা,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, মিউজ,—বি, মিউজের অধ্যাপক পদে এবং প্রশ্নপত্রকারক ও পরীক্ষক ছিলাম। দিল্লীর সঙ্গীত একাডমি থেকে দুই ব্যক্তি এসে খেয়াল ইত্যাদি গানের টেপ্ করে নিয়ে গেছেন। গানগুলি স্বরচিত ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত ছিল।

আমেরিকার চিকাগো ইউনিভার্সিটির দু'জন ডক্টর অধ্যাপক মেম্ ও সাহেব এসে আমার বিষ্ণুপুরের বাস গৃহে চার-পাঁচদিন থেকে শাস্ত্রীয়-সংগীতের তত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গ বিষয়ের তথ্য ও ইতিহাস এবং আমার কণ্ঠের আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি এবং সেতার ও এসরাজ বাদ্যের আলাপ ও গৎ এর টেপ্ তুলে নিয়ে গেছেন।

জার্ম্মেন থেকে এক সাহেব এসে অনুরূপভাবে টেপ্ তুলে নিয়ে যান।

১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে তিন মাসের জন্য বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-ভবনে পরিদর্শক অধ্যাপকের পদে ছিলাম। তখন বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে দু'দিন ধরে আমার আলাপ, ধ্রুপদ এবং বাংলা খেয়াল গান হয়েছিল—বহু ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে। থাকায় ওই সময় একজন ইংরেজ আমার আলাপ ও খেয়াল গানের টেপ্ তুলে নিয়েছিলেন আমার থাকার স্থানে গিয়ে।

ধ্রুপদী আমিনউদ্দীন ডাগর সাহেব আমার কাছে এসেছিলেন। আমার আলাপ ধ্রুপদ শুনবার জন্য বিড়লা ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বিরাট আয়োজনের মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে আসর করেছিলেন ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে। এই রকম আরো দু' চারটি আসরে ধ্রুপদ ও বাংলা খেয়াল পরিবেশিত হয়েছিল।

(২) বর্ত্তমানে দেশের ছাত্র পরিচয়ে বাঁকুড়ার অধিবাসী আমার এক উপযুক্ত ছাত্র এই সহরের বহু সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে মেয়েদের বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি শিখিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই তানপুরা

ধরে বেশ গাইতে পারছে। এই ছাত্রটির পূর্বে কেউই এখানে এরূপ প্রচার বিস্তৃতি ঘটাতে পারেনি। উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক এবং আমার ছাত্রটির নাম শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওখানের আমার আর একটি ছাত্র খেয়াল গানে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছেন এই দু'জনেই আদর্শ শিষ্য॥

(৩) দিবা প্রথম প্রহর থেকে অষ্টম প্রহরের শেষ পর্য্যন্ত স্বরলিপি-সহযোগে চুয়াত্তরটি রাগের উপর বিলম্বিত ও দ্রুত তালে নিবদ্ধ করে নূতন নূতন বন্দেজের উপর প্রায় দু'শ হিন্দী খেয়াল, কতকগুলি তেলানা কয়েকটি নূতন রাগ, রাগমালা, ঠুম্‌রী ও ভজন অনেকগুলি করে রচনা করা আছে। রচনার সুরু হয়েছিল একুশ বছর বয়সের সময় থেকে।

সঙ্গীতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই সমস্ত রচিত বস্তু শ্রবণ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আমারও এক সময় তা মনে হয়েছিল কিন্তু দেশের সঙ্গীত চর্চারত বিরাট গোষ্ঠীর মনোভাবের দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ তাঁদের অত্যধিক বহির্মুখী মন দেখে আর ইচ্ছে এল না। গ্রহণযোগ্যের সম্ভাবনার উপর আস্থা আমার রচনার মূল উদ্দেশ্যের কোন দিনই সহায়ক ছিল না। আমার যা কিছু সৃষ্টি প্রেরণার মূলে থেকে এসেছে শক্তি-সামর্থ্যের পরীক্ষার নজির রেখে যাওয়া। আমি যে গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেছি—সেগুলি ঘরমুখী মন নিয়ে উপযুক্ততার বিচার যদি থাকত তাহলে আমার ধারণা ওগুলির প্রত্যেকটিরই সংস্করণের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। এক সময় ভেবেছিলাম অনেকের হয়ত উপকারে আসতে পারবে তাই আট প্রহরের আটটি খণ্ডে 'সঙ্গীত গুরু' নাম দিয়ে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। সঙ্কল্প ছিল প্রত্যেক প্রহরের প্রত্যেকটি রাগের বিচার-বিশ্লেষণের যাবতীয় পরিচয় দিয়ে তারপর সেই রাগের বিস্তারিত আলাপ, ধ্রুপদাঙ্গের চৌতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, তেওরা, সুরফাঁকতাল এবং বিলম্বিত ও দ্রুততালের খেয়াল—সবিস্তারে ও তানালঙ্কারে ভূষিত করে শেষে 'তেলানা' থাকবে। এই রকমভাবে প্রথম প্রহরের রাগ নিয়ে স্বরলিপিসহ লেখার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছলাম। কিন্তু ক্রমশঃ মানসিক পরিস্থিতি এমন হয়ে আসতে লাগল যে লেখার কাজে আর উৎসাহ রইল না। 'সেতারের-মজলিসী-গৎ' নাম দিয়ে প্রধান প্রধান রাগের উপর বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ-এ বহু প্রকারের তানালঙ্কার, ছন্দ ও জোড়-ঝালা দিয়ে লিখতে আরম্ভ

করেছিলাম কিন্তু পরে ভাবতে বাধ্য হলাম—শুধু শুধু কেবল অসম্ভব পরিশ্রমই সার হবে এবং তার সংগে বহু অর্থব্যয়ও।

সুতরাং এগুলি গড়ার মুখেই পড়ে রইল। সাহিত্য ও কবিতা রচনার উপরও আগ্রহ ও প্রচেষ্টা থাকার এক সময় ষোলটি ছোট গল্প লিখেছিলাম। গল্পগুলি যাঁরাই শুনেছিলেন তাঁরাই সেগুলির মূল্য নির্দ্ধারণে কার্পণ্য করেননি। তাঁদের মন্তব্য আমাকে উৎসাহিত করেছিল। আমার 'সংগীত ও কাহিনী' নামক গ্রন্থটিতেও ওই অধিকারের কিছু পরিচয় আছে। স্বরচিত কবিতাগুলি প্রশংসা লাভ করায় ছাপার অক্ষরে 'কবিতাশতু' নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অনেকে সতর্ক করা সত্বেও তখন বুঝতে পারিনি ছন্দ ও মিলযুক্ত আদর্শমূলক ও বাস্তব চিত্রের উপর কল্যাণকর সহজ বোধগম্য কবিতা এখনকার দিনে তেমন উপযোগী হবে না বলে। তাই স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ সাধনার মত নানান বিষয়ে রচনার আগ্রহও আমার বরাবরই থেকে এসেছিল। কি রকম একটা জিদ্ আছে নানান বিষয়ের উপর সাধ্যমত অধিকার থাকবে না কেন! আমার রচিত বস্তুর পরিচয় প্রকাশ্যে বিস্তার লাভ করবে কি করবে না তা নিয়ে আমি কোন চিন্তা রাখি না। তবে যে ঘরাণায় জন্মে সংগীতের পথ ধরে গুরুপ্রদত্ত সম্পদ লাভ করতে পেরেছিলাম, যেমন,—প্রত্যেকটি রাগের বেশ কয়েকটি করে ধ্রুপদ, খেয়াল, অনেকগুলি করে টপ্পা, ঠুম্‌রী; স্বরগ্রাম, তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, হংসরঙ্গ, স্বররঙ্গ সংগীত নামে শ্রেণীগত এক ধ্রুপদ, রাগমালা, তার সংগে অষ্টাদশ কানড়া, দ্বাদশ মল্লার, ত্রয়োদশ তোড়ী, সপ্তসারঙ্গ, নবনট, এইসবের ধ্রুপদ ও খেয়াল, ভারত বিখ্যাত যন্ত্রীদের যথা,—বাজপেয়ীর, মজিদ ও আলিরেজার, সজ্জাদ্ মহম্মদ খাঁর ও আরো অন্যান্যের অপূর্ব বন্দেজযুক্ত বহু সংখ্যক বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ের গৎ। এই উল্লেখ্য সবগুলির প্রত্যেকটিকে দেবতার মত ভেবে সুরের উপর সাধনার পূজার্চনা করে এসেছি পরম তৃপ্তির সহিত। তাদের এরপর ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়ে আসায় মনকে খুব কাতর করে শোকাহতর মত কষ্ট এনে দেয়।

মনে হয় এইসব সম্পদ যদি পরজন্মে আবার পাই তাহলে তারচেয়ে বড় কামনা আর কিছু নেই। কিন্তু সে সম্ভাবনা ও সৌভাগ্য আর কি হবে! এবারের পাওয়ার মত অমন শ্রেষ্ঠ গুরুই বা লাভ করব কোথায়! অবশ্য পরে কি হব—কি পাব এখন সে চিন্তার চেয়ে পাওয়া জিনিসকে

ছেড়ে যাওয়ার বেদনাই বেশী করে আসছে। বার বার মনে পড়ে আমার সেই শিক্ষাদাতা মহানগুরু বলেছিলেন—ঘরাণার সব জিনিস তোমাকে রাখতে হবে, তোমার হাতেই থাকবে বিরাট ভাণ্ডারের চাবি।" কিন্তু রেখে কি গতিই বা তাদের করে গেলাম !!

(৪) মনের এইসব কথা কলমে লিপিবদ্ধ করার পরই হঠাৎ এসে পড়লেন সেই যুক্তিবাদী সঙ্গীত-বোদ্ধা প্রবীণ ব্যক্তি। সামনে লেখার সাজ-সরঞ্জাম দেখে তিনি বললেন কি লিখছেন? আমি সংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে তারপর আমাদের ঘরাণার শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রায় সমস্ত শ্রেণীগত বস্তুতে যে বিরাট ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল তার থেকে আমি কতটুকু পেয়ে সাধনায় সংরক্ষিত করে রাখতে পেরেছিলাম তার পরিচয় জ্ঞাপক লেখাটি পড়ে শুনালাম।

শুনে তিনি সংগ্রহের সংখ্যাতত্ত্বের পরিচয়ে খুব চমৎকৃত হলেন। তারপর বললেন—আপনাদের ঘরাণার সংগে আমারও বহুকাল ধরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকে এসেছিল। আমি বিশেষরূপেই জানি—আমাদের দেশের বিষ্ণুপুর ঘরাণা কিরূপ শাশ্বত রাগরূপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের একমাত্র এতবড় ঘরাণা—যে ঘরাণার আদর্শের উপর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের উৎকর্ষ হয়ে দিক্‌পাল বিশেষ বহু গুণী সংগীতজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল ও এখনও করে রেখেছে, তত্ত্বাঙ্গের চর্চাও সমধিক-ভাবে হয়ে এসেছে, নানান গ্রন্থ রচনার দ্বারা ঘরাণা সম্পদকে প্রকাশ্যে তুলে ধরে রাখা হয়েছে, যে ঘরাণার তুলনা ভারতের আর কোন স্থানে পাওয়া যাবে কিনা তা বলা খুবই শক্ত, সেই ঘরাণাকে এখনকার সঙ্গীতজ্ঞরা রক্ষা করতে চাইলেন না। রক্ষা করা যে কতবড় কর্ত্তব্য তা কেউ ভেবে দেখছেন না, সবাই খেয়াল নিয়ে মত্ত। এইসব অমূল্য ঘরাণা সম্পদ বোধ হয় এরপর লোপ পেয়েই গেল। ধৈর্য্য, সংযম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে এইসব বস্তুকে আয়ত্তে এনে জ্ঞানী-গুণী হবার আর আবশ্যক করছে না। শাস্ত্রীয়সংগীতে বহুবিধ শ্রেণীবস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণ করবার জন্য এবং সংগ্রহ-সংরক্ষণে শক্তিশালী হবার জন্য। সব বিষয়ের উপর অধিকার থাকলে তবে তাঁকে জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত বলা হত।

এখন আর তার দরকার হচ্ছে না। এখন এসব কথা নিয়ে আর কিছু বলব না। আমি আজকে এসেছি কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করতে ও জানতে। আচ্ছা বলুন তো যে গান শাস্ত্রীয়সংগীতের অন্তর্ভুক্ত,

যার পরিবেশনায় শাস্ত্রীয়সংগীতের বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের নীতি-নিয়মকে অনুসরণ করে চলবার দায়িত্ব বর্ত্তে আছে, প্রকাশনায় রাখা যায় সুরের প্রভূত শিল্প সম্পদ সেই গানের নাম খেয়াল কেন হল ? যদি বলেন টপ্পা, ঠুম্রীও তো শাস্ত্রীয়সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে ; তা আছে সত্য, তবে থাকার অধিকার নিয়ে এখন আমি তার আলোচনায় যাব না। তা হলেও এ কথা বলতে পারা যায় ওই দুই শ্রেণীর গানে তাদের স্বরূপ অনুযায়ী নাম যথার্থ অর্থবহ হয়েই আছে কিন্তু 'খেয়াল' নামের অর্থ করতে হলে তার স্বরূপের সত্য পরিচয় ও মর্য্যাদা থাকে না।"

আমি তাঁকে বললাম,—আপনার প্রশ্ন ও মন্তব্যের গুরুত্ব আছে। সত্যই খেয়াল গানের মত এরকম উচ্চস্তরের সাধনালব্ধ বস্তুর খেয়াল নাম থাকা আমার বিচারে খুবই অনুচিত।

এই গানের নাম ও জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে উর্দ্ধতন থেকে ধারাবাহিকভাবে গুণী পরম্পরায় যে সংবাদ প্রচারিত হয়ে এসেছে তাতে জানা যায়, মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের সম্রাট—বাহাদুরশা ভিন্ন পরিচয়ে মহম্মদশা বাদশার দরবার গায়ক সদারঙ্গ সেই সময়েই তখনকার সেখানের মানুষদের ধ্রুপদের মত শ্রেষ্ঠ ও ভাবাদর্শ গানের প্রতি আস্থার অভাব দেখে তাই কথা ও সুরকে সংক্ষিপ্তসীমায় রেখে তার সংগে রচিত কথায় কৃষ্ণলীলা ইত্যাদির সাধারণ ভাব মিশিয়ে—তানাদি অলংকারের জৌলুস দেখাবার নিয়ম জানিয়ে—তৎপর আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই গান রচনা করে নাম দেন 'খেয়াল'।

এই গানে সংগীতধর্ম্মী ধ্রুপদের মত আধ্যাত্মিকভাব ও তার প্রভাবকে সংরক্ষিত করে রাখার সম্ভাবনা রইল না মনে করে অর্থাৎ ভজন-সাধনের উপযোগী হল না বুঝে তাই আধ্যাত্ম গানের সাধনায় ব্রতী সেই ধ্রুপদ গায়ক ভাল নাম দিতে ইচ্ছে না রেখেই মনে হয় এই গানের ওই রকম নাম দিয়েই মনকে তিনি তুষ্ট করেন। প্রচারিত এই তথ্য গ্রহণে অসম্মত থাকলে সেখানে এই ব্যাখ্যাও আসতে পারে সদারঙ্গের খেয়াল এসেছিল এই রকম গান রচনা করতে তাই সেই খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে 'খেয়াল' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মতে আগের পরিচয়টিই যথার্থ। কারো কারো ধারণা সদারঙ্গের বহু পূর্বে খেয়াল গানের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই ধারণা সত্য সন্ধানের উপর বিচার ভিত্তিক নয়। এ সম্বন্ধে

আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার 'রাগ-অভিজ্ঞান' গ্রন্থে। মোটের উপর শিল্প সম্ভার যুক্ত শাস্ত্রীয়সংগীতের অন্তর্ভুক্ত এ রকম উচ্চশ্রেণীর গানের উপর খেয়াল নাম স্থায়ী করে রেখে যাওয়া খুবই অসমীচীন বলে মনে করি। আমার মতে যখন থেকে এই গান বিশেষ আকর্ষণীয়রূপে প্রদর্শিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেই সময়েই সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের উচিত ছিল এর এই অযোগ্য নাম পরিবর্ত্তন করে যোগ্য নাম দেওয়া। যদি কেউ বলেন নামেতে কি এসে যায়, গুণই সর্বস্ব। এ কথা আমার কাছে সঠিক উত্তরে আসে না, কারণ নামের অর্থের সংগে তার গুণগত একটা সম্বন্ধ থাকেই।

এই গানের পরিবেশন ক্রিয়ায় পরিচয় দৃষ্টে বিজ্ঞ শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বলেন—খেয়াল নামার্থের জন্যই বোধ হয় পরিবেশকদের মধ্যে অনেকেই নীতি-নিয়মের তোয়াক্কা করেন না, থাকে স্বেচ্ছাচার।" আবার কেউ কেউ বলেন ও রকম ত হবেই— ও যে খেয়াল, সুতরাং আমার খুসী এ ভাব থাকবেই।" এইসব মন্তব্য শোনা খুবই দুঃখের কারণ হয়।

আর একটা কথা,—খেয়াল নাম থাকার জন্য গায়কের পরিচয় প্রদানের সময় তাঁর পক্ষে লজ্জাকর হয়ে পড়ে যখন বলা হয় ইনি একজন মস্তবড় খেয়ালী, কিন্তু ধ্রুব-পদ গায়কের পরিচয় প্রদানের সময় যদি বলা হয় ইনি একজন মস্তবড় ধ্রুপদী তাহলে মর্য্যাদা যথাযোগ্য স্থানেই থাকে। সুতরাং সবদিক দিয়েই নাম পরিবর্ত্তনের যৌক্তিকতার গুরুত্ব যে সমধিক আশাকরি তা সহজেই উপলব্ধিতে আসবে। প্রয়োজনে বহু প্রাচীনকালের নাম পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একটি উপযুক্ত কম অক্ষরের নাম খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত আছে। পাঁচ অক্ষরের একটি নাম আমার মনে ধরেছিল, তাহল 'শিল্প-সমৃদ্ধ গান' এই নামে পরিচিত করা। এই নামটি ওই গানের যোগ্য মর্য্যাদা নিয়ে পরিচিত হয়ে থাকার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি। ইনি শিল্পসমৃদ্ধ গান গাইবেন, ইনি শিল্পসমৃদ্ধ গায়ক—এই পরিচয়ে আমার বিচারে সঠিক ও সুন্দর পরিচয় থাকছে। গ্রহণযোগ্য হলে বলায় অভ্যাস গুণে এই সম্বোধনের আড়ষ্টতা আর থাকবে না। যাইহোক্—এই নাম পছন্দ না হলে, পরিবর্ত্তে যোগ্য নাম দেবার জন্য সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের একান্তভাবে অগ্রণী হওয়ার আবশ্যক আছে— উক্ত মন্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার না করলে।

সেই প্রবীণ ব্যক্তি এই গান সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা ও মন্তব্য যথাযথ হয়েছে বলে, তারপর তিনি পর পর কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করে

গেলেন। প্রথমতঃ উপাধিপ্রসঙ্গ নিয়ে বলতে লাগলেন,—"গান-বাজনা জানা সকলস্তরের অনেক ব্যক্তিই এখন রাষ্ট্রীয় উপাধি এবং বিভিন্ন ধরণের সম্মানাদি ও অর্থও পাচ্ছেন ; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা কোন বড়রকমের বিষয়বস্তুর উপর গবেষণায় কৃতকার্য্য হলে তাতে ডি, লিট্ নামক যে উপাধি লাভ হয় সেভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যতার প্রয়োজন হচ্ছে না, এমনই সম্মান স্বরূপ পেয়ে যাচ্ছেন। এস্থলে আমার একটা কথা—এইসব প্রদত্তবস্তু যাঁরা প্রদান করেছেন তাঁরা এই এতবড় বিদ্যার উপর কতখানি দখল রেখে বিচারশক্তি লাভ করেছেন এবং প্রত্যেকটি গ্রহীতার প্রকৃত জ্ঞানের, শিল্পশক্তি-সামর্থ্যের এবং অবদান সম্বন্ধীয় পরিচয়ের উপর কতখানি ওয়াকিবহাল সে সম্বন্ধে সবিশেষ কৌতূহল আছে। কারণ উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখিয়ে বলা যায় সর্বাগ্রে থাকা এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন যাঁদের কথা দাতাদের অগ্রে নিশ্চয়ই স্মরণে আসত যদি তাঁদের যোগ্যতা ও বিচারবোধের দৃষ্টি স্বচ্ছ হত।

এই প্রসঙ্গের সংগে একটা বিশেষ প্রয়োজনের কথা মনে আসে,—যথা,—সম্মান প্রদানের বস্তুগুলির বিষয়ে বয়ঃসীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করবার আছে। আমার মতে যাঁরা যে সময়ে যে কোন বিদ্যায় কৃতবিদ্য হয়ে উঠেন, সাধনাগত বস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং সেই বিদ্যায় প্রকৃত জ্ঞানীগুণী বলে পরিচিত হন তাঁদের সম্মান স্বরূপ সম্বর্দ্ধনা, উপাধি ইত্যাদি প্রদান করতে হলে বয়সের শেষ সীমায় অর্থাৎ বৃদ্ধত্বে আসার অপেক্ষায় থাকা কোন মতেই উচিত নয়।

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃদ্ধ বয়সেই কোন কিছু তাঁরা পান, যেন নিতান্ত দয়া ভিক্ষার মত। বয়সের শেষ সীমাতে এই পাওয়া তাঁদের সত্যকারের পাওয়া বলে মনে হয় না। তাঁরা মনে করেন যেটুকু পেলাম তা কেবল এতকাল বেঁচে থাকার জন্যই।

দেশ বিখ্যাত মনীষী বাঁকুড়া জেলার যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়কে মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে শতাধিক বয়সের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বাঁকুড়ায় গিয়ে তাঁর বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে শয্যাশায়ী বিদ্যানিধিকে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান স্বরূপ ডি, লিট্ উপাধি প্রদান করে এসেছিলেন।

আমার মনে হয়, বিদ্যানিধির আত্মা উপাধি ইত্যাদি প্রদানকারী প্রভুদের নিদ্রামগ্ন অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে কাণে কাণে জানিয়ে এসেছিলেন—ওগো! ও প্রভুরা! আর দেরি না করে দয়া পূর্বক যা দেবার বিদ্যানিধিকে

দিয়ে দাও, আমি ওই জীর্ণ খাঁচা থেকে বেরিয়ে বাঁচি,—অনেক দিন আগেই বেরিয়ে যেতাম কিন্তু পারিনি তোমাদের কৃপাপ্রদত্ত বস্তু ওর কপালে আছে বলে তাই।'

বিষ্ণুপুর ঘরাণার যিনি ছিলেন মস্তবড় গুণী সঙ্গীতজ্ঞ-ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত-নায়ক, যাঁর সঙ্গীতের উপর আছে রচিত হয়ে বহু গ্রন্থ—সেই সর্ব্বজন-বিদিত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিয়াশী বছর বেঁচে থেকেও ওই সব প্রদত্ত বস্তুর কিছুই পেলেন না, মনে হয় বাঁকুড়া জেলায় এই ব্যক্তিটি বয়সের প্রতিযোগিতায় যদি বিষ্ণুনিধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন তাহলে হয়ত এই সব কৃপাপ্রদত্ত বস্তু পেয়ে যেতেন। এইসব দেখে শুনে মনে হয় সবই কি ভাগ্যের উপর নির্ভর!!"

আমি তাঁকে বললাম,—এই কথাটাই যদিও এখনকার দিনে বিশেষ করে আসল, তত্রাচ আমি মনে করি না এই সব অকিঞ্চিৎকর বস্তু পাবার আশায় শিল্পীসাধকও জ্ঞানী-গুণীরা উন্মুখ থাকেন। সুতরাং আমি অন্ততঃ মনে করি ওই সবের জন্যে ভাগ্যকে টেনে আনার কোন অর্থ নেই। এই উত্তর শুনে খুব খুসী হয়ে তিনি আরো বলতে লাগলেন,—পেলেও পাওয়ার বস্তু যদি যথা সময়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি বহন করে আনে তবেই থাকে নিয়ে তৃপ্তি, কিন্তু ঢকা নিনাদিত বড় বড় স্থান হ'তে প্রদত্ত বস্তু গুলো মনে হয় পূর্ব্বোক্ত আসল বস্তুগুলি তাদের বহন করে আনে না, যেন নিক্ষেপিত হয়। সঙ্গীত বিষয়ের উপর দাতাদের অভিজ্ঞতা ও বিচার জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝা যায় যেন তাঁরা বলেন সেই তাঁদেরকে "আপনারা যখন বলছেন ও জিদ্ ধরছেন ওমুককে মর্য্যাদার বস্তু দেবার জন্য তখন বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি পাবার উপযুক্ত বলেই আপনারা জানাচ্ছেন, সুতরাং ঠিক আছে—দেওয়া যাবে, ওহে! নাম-ধামটা লিখে নাও।" এইসব দানের ব্যাপারে এই রকম কাণ্ড না ঘটলে কখনই নিক্ষেপিত স্থানে লঘু গুরু সব একাকার হয়ে যেত না। এজন্য যাঁদেরই পাওয়ার অধিকার আছে তাঁরা পেলেও পাওয়া বস্তুর যথার্থ মূল্য খুঁজে পান বলে মনে হয় না।

আর এক বিষয় সম্বন্ধে বলি—কোলকাতা বেতারকেন্দ্রে সঙ্গীত পরিবেশনকারীদের নাম ঘোষণার পূর্ব্বে যাঁরা প্রকৃত শিল্পী তাঁরা শিল্পী সম্বোধন না পেলেও যারা একেবারেই শিল্পীনামের যোগ্য নয় তারাই পায় শিল্পী নাম। এ একটি হাস্যকর ব্যাপার।

আপনার গ্রন্থেও আছে, শিল্পী নামের অর্থে থাকতে হবে যাঁদের শিল্প

সৃজনীশক্তি প্রমাণিত হয়ে আছে। অর্থাৎ রাগসংগীতকে ধরে যাঁরা নূতন নূতন ভাবে তার চিত্ররূপ অলংকারাদির সহিত সর্বদা এবং মুহূর্ত্তে অঙ্কন করতে পারেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে শিল্পী নামের যোগ্য। যাঁরা গুরু প্রদত্ত কতকগুলি শিল্পবস্তু সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারেন তাঁরা শুধু পরিবেশক নামেরই যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন,—শিল্পী নাম কদাচ পাবেন না। আর যাঁরা একেবারে ছাঁচে গড়া বস্তুটুকুই শুধু প্রদর্শন করেন তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয়ে কি থাকবে তা ভেবে পাওয়া মুস্কিল, সুতরাং ওটা না ভাবাই ভাল। যাইহোক্ এখানের কর্ত্তৃপক্ষের শিল্পীকথার অর্থ না জানা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়!

এখানের সম্বন্ধে আরো দু চার কথা না বলে পারছি না। শাস্ত্রীয়-সংগীতের উপর অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু কারো কারোর জন্য পণ্ডিত, ওস্তাদ, এইসব উপাধি মুখে প্রকাশ করা অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও ঘোরতর অন্যায়। নাম সম্বোধনে এবং ব্যবহারিকক্ষেত্রে শিল্পীদের সম্মান সমভাবে রাখাই শিষ্টাচার সম্মত। অবশ্য যদি এমন কোন শিল্পী থাকেন যাঁকে অন্য সমস্ত শিল্পীরা ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মান্য করেন এবং মনে করেন তাঁদের অপেক্ষা সত্যই তিনি অনেক উচ্চস্তরের গুণী সঙ্গীতজ্ঞ, সেই রকম ব্যক্তির জন্য সর্বসম্মতিক্রমে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধনের ব্যবস্থা থাকা অতীব সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে।

আর একটির বিষয়,—আপনি সঙ্গীতরূপী দেবতার স্বরূপ মহিমা সম্বন্ধে একদিন একটি আসরে যে আলোচনা করেছিলেন তা খুবই অন্তরস্পর্শী হয়েছিল, সেই ব্যাখ্যাটি প্রয়োজন বুঝে এ স্থলে তুলে ধরছি। বলেছিলেন—সঙ্গীত দেবতার স্বরূপ মহিমা দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে আছে—দুই বাহুর মত দুই দিকে। দক্ষিণ পার্শ্বে আছে অধ্যাত্ম-সাধনার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ রাগসংগীতকে ধরে তাতে দর্শনের সেই বস্তুর মধ্যে বিজ্ঞান-ব্যাকরণ প্রযুক্ত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায় পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় তার সৃষ্টির শিল্প বৈচিত্র্যময় বিস্ময়কর অনন্ত মহিমার প্রভাব ও প্রত্যক্ষরূপ। আর বামপার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে প্রেমিক সাধক ও সুর ভক্তদের অন্তর হতে গানরূপে প্রকাশিত হয়ে স্বভাব সুন্দরের মত পবিত্রতা নিয়ে সর্বসাধারণের কাছে তার ধর্ম্মীয় প্রভাবের অন্তরস্পর্শী আনন্দময় রূপ। সংগীতের সৃষ্টি তাৎপর্য্যকে এইভাবে পবিত্র মন নিয়ে দেখতে হয়, তার সংস্পর্শে আসতে হয় এবং শ্রবণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা

রাখতে হয় মনের ও চিন্তার সর্ববিধ কল্যাণের জন্য। যদি কোন সংগীতের সুরে বা গানে ওই দুই বস্তুর একটিও না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই গান বা সুর তার প্রকৃত স্বরূপের উপর নির্ভর নয় এবং সে জিনিস গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য ও ক্ষতিকারক। শাস্ত্রকার মুনিরা বলেছেন,— জপ, তপ, ধ্যান ও সমাধিস্থ, এ সকলের বহু উর্দ্ধে গান; গানের উপর আর কিছু নেই। সুতরাং মনে রাখতে হবে গানের প্রকৃত অর্থ কি এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব কত বড়।"

আর একটি বিষয়ের কথা,—হার্মোনীয়ম যন্ত্রটি কণ্ঠসংগীতে স্বরস্তরতার পক্ষে অত্যন্ত যে ক্ষতিকারক সে কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেই বেতারকেন্দ্রের প্রধান স্থানে এই যন্ত্রটিকে বাতিলের কথা জানান, তখন ইংরেজ আমল বলে উপযুক্ত লোকের হাতে রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি পৌঁছান মাত্র যন্ত্রটি বাতিল হয়ে যায়, লিখিত বিষয়টির যুক্তি সম্যকভাবে গ্রহণ করতে বিলম্ব হয়নি। সেই যন্ত্রকে আবার স্বাধীনচেতারা সর্ব্বজ্ঞ হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই সম্বন্ধে কল্যাণকর উপদেশকে উল্লঙ্ঘন করে সমাদরে স্থান দিয়েছেন। তাও আবার কেবলমাত্র শাস্ত্রীয়সংগীতের গানে, যে সংগীতের রাগরূপের বৈচিত্র্যময় আকৃতি গঠনে আলংকারিক শ্রেষ্ঠ বস্তু থাকে যথা,—আশ, মীড়, গমক, শ্রুতি এবং রাগ হিসেবে স্বরশ্রুতির তারতম্য প্রধানতম হয়ে,—এইসব হার্মোনীয়মে যা একেবারেই অনুপস্থিত। এই যন্ত্রটি এবং জলতরঙ্গ, কাষ্ঠতরঙ্গ, তবলাতরঙ্গ, ইত্যাকারের বাদ্যযন্ত্রগুলি কেবল ফাঁকি দিয়ে মনভুলান মাত্র।

এবার বেতারকেন্দ্রে শিল্পীদের স্থান নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কিছু বলব,— আমি বিশেষভাবে অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছি,—যাঁরা কোলকাতা কেন্দ্রের উচ্চস্তরের অর্থাৎ 'এ' ক্লাশের শিল্পী তাঁদের যোগ্যতার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রকৃতভাবে বিচার করতে গেলে এমন সব ক্রটী ও সীমিত শক্তির দুর্বল পরিচয় পাওয়া যাবে যাতে অনেকেরই ওই স্থানে থাকার অযোগ্যতার প্রমাণ এসে যাবে, কিন্তু এখানে অনেক কারণে সবই সম্ভব। তা নাহলে 'এ' ক্লাসে থাকার অনেক শিল্পীর সংগীত পরিবেশনের শক্তি অত্যন্ত নেমে যাওয়া সত্ত্বেও প্রোগ্রাম থাকত না। আবার প্রমাণের উপর আছে 'এ' ক্লাসের নীচের স্তরে স্তরে এমন শিল্পী আছেন যাঁদের 'এ' ক্লাসে থাকার পরিপূর্ণ অধিকার আছে শীর্ষস্থানে। আমার মনে হয় স্থান নির্ণয় কারকদের বোধ হয় কোন দুর্বল মনোভাব থাকে কিংবা মস্তিষ্কের ব্যাধিতে সব সময়

ঠিক মত জ্ঞান, বুদ্ধি পরিচালিত হতে চায় না।

শাস্ত্রীয়সংগীতের উপর কৃতবিদ্য শিল্পীদের বেতারকেন্দ্রই হ'ল এখনকার দিনে পরিচয়ের ও প্রচারের একমাত্র প্রধানস্থল কিন্তু যদি শিল্পীদের স্থান নির্ণয়ে এ রকম বিচার বিভ্রাট ও প্রহসন চলতেই থাকে তাহলে তারমত পরিতাপ ও ক্ষতিকারক আর কিছু নেই ॥

কোলকাতা বেতারকেন্দ্রে মাঝে মাঝে রাগসংগীত সম্বন্ধীয় আলোচনা-চক্রের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে অনেক সময়েই রাগরূপের এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যাদি নীতি বিজ্ঞানসম্মত ও তার সত্যসন্ধানের উপর হয় না। এজন্য আমি জানি অনেক আগ্রহী-শ্রোতা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আবার অনেকে বলেনও—"আমরা বেশ বুঝতে পারি অধিকাংশ আলোচনাই সঙ্গত পথ ধরে চলে না, এজন্য এর কোন গুরুত্ব থাকে না।"

এই ব্যবস্থাটি কিন্তু খুবই ভাল এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব সমধিক। এই আলোচনাচক্রে তাঁদেরই স্থান থাকা উচিত যাঁদের ক্রিয়াঙ্গে এবং তত্ত্বাঙ্গের উপর যথেষ্ট অধিকার ও বহুদর্শীতা আছে। এই বিষয়ের সাফল্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই,—যে বিষয় আলোচিত হবে তৎপূর্ব্বে সেই বিষয়টি ওই উক্তি মত বিশেষজ্ঞদের কাছে যুক্তি-মন্তব্য ও সমর্থন সংগ্রহ করে উপস্থাপিত করতে পারলে অনেক কিছু মতান্তরের সমাধানে আসতে পারবে এবং তাতে শিক্ষার্থী ও চর্চারত ব্যক্তিদের অশেষ কল্যাণ হবে যথার্থ দিক্ নির্ণীত হয়ে। এবার আর একটি বিষয়ের কথা বলে বলা শেষ করব। মনের অভিপ্রায়ের এই সব কথা আপনাকে বলার জন্য খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। আজ সুযোগ পেয়ে গেলাম।

দিল্লীর বেতার কেন্দ্রে প্রত্যেক শনিবার রাত্রে শাস্ত্রীয়সংগীতের যে অনুষ্ঠানটি হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান। সর্ব ভারতীয় অনুষ্ঠানও বলা হয়। অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট যে ভাবে থাকে তাতে ওই নামের সংগে কি এমন সম্পর্কের পৃথকত্ব নিয়ে গুরুত্ব আছে তা বুঝা যায় না। কারণ সব কেন্দ্রই তো রাষ্ট্রের অধীন, সুতরাং আলাদা করে রাষ্ট্রীয় নামের তাৎপর্য্য কি? তাছাড়া সঙ্গীত পরিবেশিত যাঁদের দ্বারা হয় তাঁরাও তো সেই বিভিন্ন কেন্দ্রেরই শিল্পী? শুনেছি তা-ও এখন শিল্পীদের দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয় না, নির্ব্বাচিত শিল্পীর সংগীত টেপ্ করে সেখানে আনা হয় শিল্পীর স্থানের বেতার কেন্দ্র থেকে। তাই মনে হয় আজকাল গান-বাজনা শেষ হওয়া মাত্র সেখানের চাকর-বাকরকে দিয়ে হাততালি দেওয়ানর যে

ব্যবস্থা ছিল তা উঠে গেছে। এই অনুষ্ঠানটির এখন আর তেমন কোন গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না,—যেন এক মামুলী ধরণের মত। বেশীর ভাগ শিল্পীদের শিল্প পরিবেশন মনে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করে না। সত্যই যদি আদর্শমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এই অনুষ্ঠানটির প্রবর্ত্তন হয়ে থাকে তাহলে তার কোন তেমন পরিচয়ই নেই। কারণ তাহলে এত সাধারণ স্তরের শিল্পী নির্বাচন হত না এবং হার্মোনীয়মের মত অতি সহজ যন্ত্রের বাদ্যানুষ্ঠান থাকত না।

এই অনুষ্ঠানটির জন্য একটা খুব কার্য্যকরী কথা মনে হয়, তাহল এই,—যদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অন্ততঃ দু'জন করে একই বিষয়ের উচ্চস্তরের শিল্পীর একই রাগের উপর সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা হত তাহলে সব দিক দিয়েই খুব ভাল হত। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, যদি অন্ততঃ ছ' মাস অন্তরও দরবারের মত আয়োজন করে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়ে— দু'চার জন করে বড় বড় গায়ক বাদকদের গান-বাজনা শুনে তাঁদের উৎসাহিত ও বিবিধ প্রকারে সম্মানিত করতেন তাহলে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান যথার্থ হত। কিন্তু সে আশা কোথায়! ওঁরা প্রায় সকলই যে শাস্ত্রীয়সংগীতের "সে রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।" আর এই জন্যই তো প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী-শিল্পীসাধকদের বাইরের পাওয়া আসল বস্তুর এত অভাব।

আশ্চর্য্য লাগে পাঠান, মোঘল সম্রাটরা ও আগের বড় বড় রাজা-মহারাজারা শাস্ত্রীয়সংগীত বিশেষ কিছু না শিখেই (দু' একজন ছাড়া) কি করে তাঁরা এত বড় গুণগ্রাহী হয়েছিলেন ? তাঁরাও তো রাজ্য পরিচালনা করেছেন, এমন কি নিজেরা যুদ্ধও করেছেন। আর এখন কেন সমস্ত প্রদেশের প্রশাসনিক হোমরা চোমরাদের দিকে তাকিয়ে দিশাহারা হতে হয় প্রকৃত শ্রোতারূপে একজনকেও খুঁজে পেতে!!"

আমি তাঁকে বললাম,— আপনার দেখছি সংগীতের সব ব্যাপারের উপরই প্রখর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা আছে এবং মন্তব্যের গুরুত্বও সমধিক। সত্যই এই সব আলোচনা করার কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে, অভিষ্ট সিদ্ধ হোক না হোক।

এখন আমি একটা কথা ভাবছিলাম, সেই ১৯৩২ সালের ঘটনার সময় যদি বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে খেয়াল নামের কথা উচ্চারণ না করে বলতাম শিল্প সমৃদ্ধ গান গাইব (নিজের ভাষার একেবারে খাঁটি খেয়াল

গানের মত সমগ্র উপস্থাপনা রেখে) তাহলে তাঁরা যদি গাইতে দিতে রাজি হতেন তাহলে সব দিক দিয়েই উদ্দেশ্য সফল হত। হিন্দীভাষার জন্য না হয় তার খেয়াল নামই থাকত, আর আঞ্চলিক ভাষায় অর্থবহ হয়ে এই নূতন নাম থাকত। অবশ্য সবই তাঁদের মনমর্জির উপর নির্ভর ছিল, তত্রাচ এই নূতন নামের উপর কি প্রতিক্রিয়া আসত তা জানবার সুযোগ পেতাম॥

লেখা অনেক বেড়ে গেছে, আর নয়। এবার আমার কামনার আর এক শেষ কথা, যদি যাবার দিনে তাঁর নাম গান করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি তাহলে সুরের পথে যাত্রার সার্থক সমাপ্তি হল মনে করে পরম তৃপ্তি নিয়ে চলে যাব॥

—শেষ—

পরিশিষ্ট

বাংলা ১৩৫৭ সালের ১৭ই চৈত্র "যুগান্তর" পত্রিকায় আমার আলোক-চিত্র সমেত এক পৃষ্ঠাব্যাপী আমার পরিচয় সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বাল্যজীবন হতে বহু ঘটনার পরিচয়, নাটোরের মহারাজার উক্তি এবং পত্রিকার তরফের নিজস্ব অভিমত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই লেখার মন্তব্য থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত হল। অনুরূপভাবে জীবনের পরিচয় "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি মাসিক পত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

১। "......সত্যকিঙ্করবাবু যে কয়টা বাজনা তিনি আয়ত্ত করেন, তা হচ্ছে সেতার, সুরবাহার, বীণ, এসরাজ, জলতরঙ্গ, ন্যাসতরঙ্গ, ব্যাঞ্জো, বাঁশী, তব্‌লা, পাখোওয়াজ। তবে এতগুলোকে সমানভাবে আয়ত্তে রাখার উদ্দেশ্য তেমন ছিল না। আয়ত্তে আনার আগ্রহের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল "না শেখা থাকবে কেন?" এ যেন প্রতিভার বিজয়কেতন উড়িয়ে একটার পর একটা দুর্গ দখল করার আনন্দ।

এখন উত্তমভাবে আয়ত্তে রেখেছেন সেতার ও এসরাজ। এই দু'টির উপর আলাপে ও গৎএ তিনি সিদ্ধহস্ত···।"

২। "......গানে সত্যকিঙ্করবাবু নিজেকে ধ্রুপদী বলতে ভালবাসেন। এর কারণ বোধ হয় প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরের ঘরাণা ধ্রুপদের জন্য বিখ্যাত; আর দ্বিতীয়তঃ আজকাল ধ্রুপদ গানের প্রচলন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে দেখে তিনি যেন নিজের সবটা ওজন দিয়েও তাকে যথাসাধ্য বড় কোরে তুলে ধরতে চান। টপ্পাতেও তাঁর স্বকীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আসলে তাঁর গানের পরিপূর্ণ দীপ্তি ধরা পড়ে খেয়ালে। রাগশুদ্ধি ও রাগের মহিমময় মূর্ত্তি প্রকাশকেই তিনি গায়কের শ্রেষ্ঠতার মান বলে ধরেন। গানের ক্ষেত্রে আজ হাল্কা গীত-গজলের ঢং আর পাঞ্জাবী তক্‌রিফের কাজের জয়জয়কার; মোটা তুলির আঁচড়ে যে কি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়, তা কি সাধারণ সঙ্গীতরসিকরাই সবখানি বুঝতে পেরেছেন? মোটা তুলির টানের এই বিস্ময় সত্যকিঙ্করবাবু সৃষ্টি করতে পারেন।

গানে তাঁর নিখুঁত গায়কী 'ছাপটী' ভাবের বন্দেজ যা কেবল পুরাণো ঘরাণা থেকেই আসে—দুধর্ষ লয়দারী আর সকলের শেষে অপূর্ব-অলংকরণ

ক্ষমতাসম্পন্ন বিচিত্র তানের সমাবেশ। এ যেন গানের পরম সুন্দর মূর্ত্তি রচনা করে তার মাথায় নানা কারুকার্য্যের সোনার মুকুট পরানো। তাঁর গানে তানের সমাবেশ দেখে বোদ্ধা শ্রোতার শুধুই মনে হবে ভারতের সকল স্থানের সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তানের যেন একটা চিত্র প্রদর্শনী।"

"এই প্রসঙ্গে সত্যকিঙ্করবাবুর সেতার বাজনা সম্বন্ধেও সামান্য দুই একটি কথা বলা দরকার। সেতারে তাঁর ষ্টাইল আজকাল প্রচলিত সাধারণ ষ্টাইল থেকে আলাদা। এই পার্থক্যের প্রধান কথা হল বাজনায় প্রধান তারের সঙ্গে মেচারাপের আঘাতে অন্য তারে ধাক্কার ঝম্‌ঝমানির উপর বিতৃষ্ণা। তাঁর ধারণা ওই শব্দের আড়ালে অনেক দোষ চাপা পড়ে যায় আর ঐশ্বর্য্যের অনেকখানি দৈন্যও গোপন করা যায়। তার বদলে তিনি বরং মীড় ও তানের খেলা ও তারপর অন্য সমস্ত যন্ত্রের কাজ দেখিয়ে যাবেন। তর্জনী ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা তিনি যে সমস্ত আকৃষ্টকর ঝালার কাজ দেখান সেরূপ কোন বাদকের বাদ্যে দেখা যায় না। এছাড়া আরো যে সব ক্রিয়াঙ্গ থাকে তাও অদ্বিতীয়রূপে।

একবার বেতার কেন্দ্রে সেতার বাজানর একটা অনুষ্ঠান শেষ করে সত্যকিঙ্করবাবু বেরোতে যাবেন এমন সময় তিনি খবর পেলেন একজন নামকরা বড় ব্যক্তি তাঁকে টেলিফোনে ডাকছে। ভদ্রলোক সত্যকিঙ্করবাবুর পরিচিত নন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা বাজনা যা করলেন সেটা কি যন্ত্রের ?"

যন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "প্রোগ্রাম ছিল কিসের ?"

'সে তো সেতারের' উত্তর—"তাই তো বাজল।" প্রশ্ন "সঙ্গে আর কোন যন্ত্রই বাজান হয় নি ?" উত্তর—"আজ্ঞে না।"

ভদ্রলোকের বোধ হয় বিশ্বাস হল না। বাঙালী ওস্তাদদের সততা সম্বন্ধে একটা অস্ফুট কটুক্তি করে তিনি টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।"

৩। "গত বৎসরের একটি দিনের প্রত্যক্ষ করা একটি ছোট্ট ঘটনার কথাও এই প্রসঙ্গে লিখতে হোলো। গত বৎসর কোলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সময় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব এসেছিলেন। সত্যকিঙ্করবাবু ধ্রুপদ গান করছিলেন। গান শেষ করে তিনি যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন আলাউদ্দীন খাঁ আসন ছেড়ে উঠে আবেগভরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সে একটা দৃশ্য। পুত্র আলি আকবর কাছেই দাঁড়িয়ে একটু কৌতূহল মিশ্রিত আগ্রহের সঙ্গে বৃদ্ধের এই আকস্মিক ভাবাবেগ লক্ষ্য

করছিলেন। তা দেখে আলাউদ্দীন খাঁ বললেন—"একে নমস্কার কর; মনে রেখো এঁরাই হচ্ছেন একালের সেই আচার্য্য স্থানীয় গুণী। কোলকাতায় যখনই আসবে এঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে।" জামাতা—রবিশঙ্কর এগিয়ে এসে বলেন "খুবই আশা ছিল কন্‌ফারেন্সে ওঁর সেতার বাজনাও শুনতে পাব।"

কিন্তু এ সম্মান ও সমাদর বাংলা দেশে তেমন সুলভ নয়। মনে হয় শিল্পী হয়তো সত্যই অনুযোগ করতে পারেন।

একজন একাধারে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার ও সঙ্গীত গ্রন্থাদি প্রণেতা ভারতবর্ষে আর কোন প্রদেশে বর্ত্তমানে তো কেউ নেই-ই আগে কখনও কেউ ছিলেন কিনা জানি না। এ হিসেবে যতটুকু তাঁর প্রাপ্য দেশ কি তাঁকে তা দিয়েছে?"

৪। "সত্যকিঙ্করবাবুর আর এক দুঃখ সঙ্গীত সাধকদের আর্থিক দুর্গতি ও দেশে উপযুক্ত মর্য্যাদার অভাব। অন্যান্য বিষয়ে যাঁরা শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন তাঁরা তো সঙ্গীত শিল্পীদের মত সমাজে এমন অবহেলিত, অনাহত ও উপেক্ষিত হন না। কিন্তু এঁরা যেন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিতান্ত করুণার পাত্র।

একবার সঙ্গীত সম্মেলনের একজন বিত্তশালী উদ্যোক্তা কয়েকজন গুণীর সামনেই দম্ভ করে বলেছিলেন যে, তিনি যখন গায়ক-বাদকদের ডাকেন তখন তাঁদের "চাঁদির জুতো মেরেই নিয়ে আসেন।" সে সম্মেলনে সত্যকিঙ্করবাবু আর কখনও রজত পাদুকার স্পর্শ লাভ করতে যান নি। কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী ফল দিনে দিনে কোণঠাসা হয়ে পড়া আর লোক-চক্ষুর সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়া। পেশাদার গায়ক-বাদকদের পক্ষে এ অতি মারাত্মক আত্মঘাতী সঙ্কল্প।······তবে আর কি হবে? দিন কি ঠিক এমনই চলতে থাকবে? উত্তর কোলকাতায় বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে শিল্পীর বাড়ী থেকে ফেরবার সময় এমনি কয়টি প্রশ্ন বার বার করে আপনার মনে উঠতে থাকবে। মনে হবে সঙ্গীত সম্মেলনের যে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা সেই আনন্দোজ্জ্বল রূপটিই সঙ্গীত জগতের সবটুকু পরিচয় নয়—সৌখীন চিত্তহারী রেশমের কাজেরও একটা উল্টোপিঠ আছে॥"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' রবিবার, ১১শে ভাদ্র, ১৩৭৮।

রামপ্রসন্ন শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান

"……ঘরাণাগুলি যে ঐতিহ্য রেখে গেছে ও যাচ্ছে তার মূল্য অপরিসীম, তার স্বীকৃতি দিতেই হবে,—সে যে ইতিহাস। বাংলার এই রকম অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য রেখে এসেছে বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুর ঘরাণার একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হল 'ইন্দিরা'র উদ্যোগে ২৯শে আগষ্ট (১৯৭২) বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে। অক্লান্ত বর্ষণেও সেদিন বহু বিশিষ্ট অতিথি এসেছিলেন এই গুণী শিল্পী তথা বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। রামপ্রসন্ন গানে যেমন ওস্তাদ ছিলেন, তেমনি পারদর্শী ছিলেন সুরবাহার ও সেতারে।

……অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার একজন প্রবীণ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তোড়ীরাগে ধ্রুপদ ও ধামার গাইলেন আধ ঘণ্টা কিন্তু তার তুলনা নেই। হিল্লি-দিল্লি থেকে খাঁ সাহেব, পণ্ডিতজীরা আসেন, অনেক ওস্তাদি দেখিয়ে যান, আমরা ধন্য ধন্য করি। কিন্তু সত্যকিঙ্করবাবুর গান শুনে অশ্রুসজল চোখে স্তব্ধ হয়ে গেছলাম। এ বস্তু আমাদের আছে, এই শিল্পী আমাদের আছে, এই সাধনা আমাদের আছে—আর আমরা স্বীকৃতি দিই কাদের? কী তারা আমাদের দিয়ে যাচ্ছে? সত্যকিঙ্করবাবুর সংগে চলে যাবে এক বিরাট ঐতিহ্য বাঙলার সঞ্চিত ধ্রুপদ। আমরা এ সব রাখব কি করে? আত্মসচেতন হব আর কবে?

—(*)—

স্বাধীনতা-সংগ্রাম-শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতা দশম বার্ষিকী
উৎসব উপলক্ষে

সঙ্গীত সুধাকর—শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে—

হে সঙ্গীতাচার্য্য,

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শত বর্ষ পূর্ত্তি ও স্বাধীনতা-দশম বার্ষিকী উৎসবের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র দিবসের এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলা-বাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনি গ্রহণ করুন—আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

হে সঙ্গীত-জ্ঞান-জলধি,

আপনার জীবনের সার্থকতা—একাগ্র সাধনার অতুলনীয় কৃতিত্ব, আপনার সুরমাধুর্য্য—একাধারে সঙ্গীতে ও যন্ত্রে অসামান্য প্রতিভা শুধু বাঁকুড়া-জেলাবাসীর নয়—সমস্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌরব।

হে সুর-তাল-লয়, মহার্ণব,

আপনার আদর্শ সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের অনুসরণীয় হোক্, সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয় আনন্দিত হোক্। আপনার জীবন কল্যাণময় হোক্। আপনার দীর্ঘজীবন লাভে সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে আপনার চিন্তাধারা, কলাকৌশল, অভিজ্ঞতা প্রচারিত হোক্, পরম-কারুণিক জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা॥

ইং ১৬।৮।৫৭
বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির
সভ্যগণ।

ভারতবিশ্রুত-গীত-বাদ্য কলাবিৎ পরমাদরণীয়
শ্রীমৎ সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ায়
প্রদীয়মাণং মান পত্রম্

সঙ্গীতশাস্ত্র বিধিসঙ্গত শুদ্ধধারাং
গঙ্গাতরঙ্গ সরণীমিব ধারযন্ যঃ
ষড়্ রাগগীতি বহুবাদ্যকলাজ্ঞ ! স ত্বং
হে সত্যকিঙ্কর ! নবোদিত শঙ্করোঽসি ॥

গোপেশ্বরাদি বহুসাধকসিদ্ধবংশে—
জাতস্ত্বমিন্দুরিব সিন্ধুসমে দ্বিজন্মা ।
গীতস্য মর্ম্মসরহস্যমহো ! প্রকাশ্য
গ্রন্থাবলী-মমলরত্ন ততিং ত নোষি ॥

অদ্য প্রমোদভর—বিহ্বল ভট্টপল্লী—
বিদ্বদগনৈরিহতু বঙ্কিমচন্দ্রতীর্থে ।
“সঙ্গীত শাস্ত্রি”—পদপূতমুপাধিরত্নং
তুভ্যং সযত্ন মুপদীক্রিযতে গৃহান্ ॥

নৈহাটী সঙ্গীত পরিষৎ
পক্ষত স্তদ্গুণ পক্ষপাতি—
ভট্টপল্লী বিদ্বদ্ভিরূপ কল্পিতম্ ॥

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মভিঃ
শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মভিরিত্যাদি ॥

বাং ১৩৬৪ । পৌষ

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে—

হে ভারত বিশ্রুত-গীত-বাদ্য-কলাকুশল,

গৌরীপুর রাজবংশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কীর্তিভাক্ পৃষ্ঠপোষক, স্বর্গতঃ ব্রজেন্দ্রকিশোরের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠানে আজ আমরা আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে গুণসমুদ্র, বঙ্গদেশের শাস্ত্রীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের আপনি প্রবীণ প্রতিভু! আপনি এক বিরাট সংগীতিক ঐতিহ্যের অধিকারী।

বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর সংগীতের এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। শত শত বৎসর ধরিয়া বিষ্ণুপুরের রাজবংশের আশ্রয়ে বহুগুণী, শিক্ষিত ব্যক্তি বিষ্ণুপুরের পবিত্র উচ্চাঙ্গ সংগীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। স্বনামধন্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও বিষ্ণুপুরের সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারতীয় কলাবন্ত গুণীগণের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। হে সংগীতশাস্ত্রী, আপনিও সেই বিখ্যাত বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন। আপনি একই সংগে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের তত্ত্বাঙ্গ ও ক্রিয়াঅঙ্গে সমভাবে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হে মহান শ্রষ্টা,

আপনার বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার মধ্যে সম্প্রতি আপনি যে বৃহৎ "রাগ-অভিজ্ঞান" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শাস্ত্রীয়-সংগীতের ক্রিয়াঅঙ্গ এবং ঔপপত্তিক বিষয়ে বহুবিধ গবেষণামূলক তত্ত্বের তাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা যে আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা সত্যই অদ্ভূত ও অতুলনীয়।

ভগবান আপনাকে সুস্থ ও শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন দান করুন। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ রূপে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে অসংখ্য শিষ্য গঠনপূর্ব্বক উচ্চাঙ্গ-

সংগীতের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করুন—আপনার নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

হে সঙ্গীতাচার্য্য,

আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রগাঢ় বিদ্যার জন্য আজকার এই অনুষ্ঠানে আপনাকে "গুণসমুদ্র" উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়া আমরা আজ সত্যই চরিতার্থ।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সমিতি
৫৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলি-১৯
ইং ৩০-১১-৬৯

স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতি,
শ্রীপারেশনাথ মুখোপাধ্যায়
বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সমিতির পক্ষ
হইতে
বিনয়াবনতঃ—
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
সভাপতি।

শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য্য
সাধারণ সম্পাদক।

সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য্যের শুভ দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথি
মহোৎসব উপলক্ষে
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে
প্রদত্ত মানপত্র

হে সঙ্গীত-সাধক !

আজিকার এই শুভলগ্নে সৎসঙ্গের পক্ষ হইতে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। নির্লিপ্ত, নির্লোভ, উদার, হে মহান সঙ্গীত-পূজারী, আপনার ঐকান্তিক সুনিষ্ঠ সাধনা—সমগ্র সঙ্গীত-সাধক সমাজের আদর্শ স্বরূপ। কণ্ঠ ও বাদ্য-যন্ত্রাদি নিঃসৃত, আপনার সুবিপুল প্রতিভা-সঞ্জাত অপরূপ সুরমাধুরী সঙ্গীতকলাকে অভূতপূর্ব উচ্চাসনে অধিরূঢ় করিয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রাদি রচনায় আপনার নিরলস প্রয়াস সঙ্গীত-বিজ্ঞানে নূতন দিগন্তের সূচনা করিয়াছে।

আজকার এই পুণ্য অনুষ্ঠানে সৎসঙ্গের পক্ষ হইতে আপনাকে "সঙ্গীত-ভাস্কর" উপাধিতে ভূষিত করা হইতেছে।

ক্বণন-কম্পনে নিত্য-প্রবহমান সৃজনোৎস প্রণব-প্রবাহে আপনি অবগাহন করুন—সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ধরণী আপনার সুর-সুরধুনী-ধারায় আপ্লুত হউক,—পরম পিতার রাতুল চরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা !

সৎসঙ্গ, দেওঘর,
২০শে অগ্রহায়ণ,
সোমবার, ১৯৭৯

সৎসঙ্গের পক্ষ হইতে
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক, সৎসঙ্গ।

অভিনন্দন পত্র

কলিকাতা গাঙ্গুলী কলেজ অফ মিউজিক কর্ত্তৃক
প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে
সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি গুণমুগ্ধ
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃ—

হে সঙ্গীতাচার্য্য !

কণ্ঠ তব শত সুধা বরষায় যেন
বাণীর অমরপীঠে তুমি সুধাকর।
স্রোতবিহঙ্গিনী-সম সুধাকণ্ঠ তব
কখনও মন্ত্র, কখনও বজ্র,
লহ প্রণাম, লহ প্রণাম,
হে সত্য, হে সুন্দর, হে সঙ্গীত প্রভাকর ॥
সুরের সমুদ্রে অবগাহি তুমি,
আসন পেতেছ এ বঙ্গভূমে—
অতি সুখ্যাত সেই যে ঘরাণা
'বিষ্ণুপুর' নামে যাহা খ্যাত।
উত্তরাধিকার পরম্পরায়
কস্তুরী-সম পরিব্যাপ্ত ॥
বিচ্ছুরিত-বর্তিকা তাহে তুমি,
হে সঙ্গীতগুরু
লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম ॥

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
২০সি, নলিন সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

বিনীত—
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মেমোরিয়েল এসোসিয়েশনের
সহ-সভাপতি কর্তৃক লিখিত (তাং ২৫-১২-৭২)

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতশাস্ত্রী মহোদয়ের করকমলে—

মান্যবরেষু,

বিগত ১৭ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় গুরুদেব স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩৮তম বার্ষিক স্মরণ সভা উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে আপনি অংশগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অশেষ অনুগৃহীত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আপনি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন ॥

আপনার সে দিনের পুরিয়ারাগের আলাপ ও ধ্রুপদ শুনিয়া মনে হইতেছিল আপনি যেন সুরের দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করিতেছেন, আর তাহার প্রভাবে শ্রোতারা যেন আপনার সংগে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানটি সুরমাধুর্য্যে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এ জাতীয় অনুষ্ঠান সত্যই দুর্লভ।.........

আপনার অমায়িক ও বিনম্র ব্যবহার সঙ্গীত শিল্পীদের আদর্শ। আপনার সুমধুর সাহচর্য্যও আপনার সঙ্গীতের ন্যায় সমান আনন্দদায়ক ॥.........॥

প্রণামান্তে
আপনার আশীর্বাদপ্রার্থী
হরিভূষণ বসু
সহ-সভাপতি ॥

এই অনুষ্ঠানে প্রায় বার শতর মত সমঝদার শ্রোতা ও শ্রোত্রীবৃন্দ উপস্থিত হন। সকলেই প্রায় বিশিষ্ট নাগরিকরূপে পরিচিত। বহু শিল্পীও অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করেন ॥

সঙ্গীতাচার্য্য পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষ্যে—

বিদায় বড় নিষ্ঠুর। সমস্ত কারুণ্য সমস্ত বেদনাকে বিদ্রুপ করে বিদায় আসে। আপনাকে বিদায় দিতে গিয়ে আজ আমাদের এই কথাটিই মনে পড়ছে।

'বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর…'

শ্রাবণের বাদল ধারা শেষ করে ভাদ্র পড়লো, আর আপনিও আপনার সব সংগীত মুছে নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। আপনি আমাদের গান দিয়ে এমনভাবে ভরিয়ে রেখেছিলেন যে আপনি চলে যাওয়াতে যে আমাদের শুধু ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, আমাদের কাছে আজ সব কিছুই শূন্য মনে হচ্ছে। আপনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু আপনি যেভাবে আমাদের ভরিয়ে রেখেছিলেন সে শূন্যস্থান বুঝি কেউ-ই পূর্ণ করতে পারবে না। গানের ক্লাশে আপনি যে কি এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতেন, সে ইন্দ্রজালের আবেষ্টনী ভেদ করে বুঝি ছুটির ঘণ্টাও আমাদের কাছে পৌঁছত না।

আপনি আমাদের ভিত্তি প্রস্তর রচনা করে গেছেন, এখন অনেকের কাছেই হয়তো গান শিখবো কিন্তু আপনার অভাব আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করবো, এর চেয়ে বড় সত্য বোধ হয় আর নেই।

ত্রিবেণীতে ডুব দিলেও উৎস তো সেই গঙ্গোত্রী।

আজ আমাদের এইখানেই বিদায় নিতে হবে। ইতি—

প্রণতা—

শিক্ষিকা ও ছাত্রীবৃন্দ।

ইং ১৯৬২—সেপ্টেম্বর

ইউনাইটেড মিশনারী হাই স্কুল,-কলিকাতা

সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় উপলক্ষ্যে

১৯৬৬

সুধি,

যাবার বেলা পিছুডাকে, আপনার পথ পিছল করা অহেতুক জেনেও, দিতে এসেছি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলিটুকু আপনাকে।

• বহু বৎসর ধরে জড়িত ছিলেন আপনি এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে। তখনকার বহু শিক্ষিকা ও ছাত্রী আপনার কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল।

• আপনার অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম যত্ন ও অটুট কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আপনার স্মৃতিকে উদীয়মান সূর্য্যের মত আমাদের হৃদয়াকাশে উজ্জল করে রাখবে।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন এবং আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন—এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ইতি—

সহকর্ম্মীগণ

সেণ্ট মার্গারেট বিদ্যালয়

(কলিকাতা)